

আশ-শিফা

মির্জা নবী হক্কিন মুত্তফা

الشفافا

بفتح الشافا

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম কাযী আশায আন্দুলুজী

(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

[১৭৯৬ হি./১০৮০ বি. - ১১৪৪ হি./১১৪৯ বি.]



সম্পাদিত পাবলিকেশন

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

- **ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম বুখারী**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **ইমাম আবু হানিফা আহলে বায়ত থেকে হাদীস গ্রহণ**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **তাসাউফের আসল রূপ**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **এশ্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **আত্মার বিপর্যয় ও তার প্রতিকার**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **ইসলাম ও নারী**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **দোয়া ও দোয়ার নিয়মাবলী**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **হাসনাদ্দিনে কারীমের পদমর্যাদা**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **কিতাবুত তাওহীদ (১ম খণ্ড)**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **কিতাবুত তাওহীদ (২য় খণ্ড)**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **ইসলামী দর্শনে জীবন**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **হাদীসের আলোকে সাহাবীদের মর্যাদা**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **সূফীদের পথচলার কার্যপদ্ধতি**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **মা'মুলাতে মীলাদ**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **রোজার দর্শন ও বিধান**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **নবী আকরাম (দ.) এর নামাযের পদ্ধতি**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **উম্মতের আলোক দিশা (হিদায়াতুল উম্মাহ)**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **খতমে নবুয়্যাত**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **নবীগণের চরিত্র**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **হায়াতুনাবী (প্রিয় নবীর পরকালীন জীবন)**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **নেযামে মুস্তাফা**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **হাদিসের আলোকে প্রিয় নবীর পরকালীন জীবন**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **হাদিসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা**
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ﷺ

আশ-শিফা

বিতারীফি হক্কুল মুস্তফা

[মুস্তফা ﷺ'র অধিকার ও মর্যাদা বর্ণনায় হৃদয়ের আরোগ্য]

الشِّفَاءُ بِتَغْرِيفِ حُقُوقِ الْمُضْطَّغِي

আশ-শিফা

বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা
[মুস্তফা ﷺ এর অধিকার ও মর্যাদা বর্ণনায় হৃদয়ের আরোগ্য]

[২য় খণ্ড]

মূল

ইমাম কাযী আয়ায আন্দুলুসী
(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
[৪৭৬হি/১০৮৩খ্রি.-৫৪৪হি/১১৪৯খ্রি.]

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

সম্পাদনায়

ড. কামাল উদ্দীন আল-আযহারী

সন্জরী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০



مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ
فَانْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ
وَانْسُبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ

﴿ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ﴾

আশ-শিফা (২য় খণ্ড)

মূল : ইমাম কাযী আয়ায আন্দুলুসী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

ভাষান্তর :

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

সম্পাদনায় :

ড. কামাল উদ্দীন আল-আযহারী

প্রকাশক :

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী,

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

© সন্জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নূরে মাওয়া ইফা

প্রকাশকাল :

১০ জানুয়ারি ২০১৭, ১১ রবিউল সানি ১৪৩৮, ২৭ পৌষ ১৪২৩ সাল।

প্রকাশনায় :

সন্জরী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৮৪২-১৬০১১১

৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১

E-mail : Sanjarypublication@gmail.com

FB Page : Sanjary Publication - সন্জরী পাবলিকেশন

পরিবেশনায় : সন্জরী বুক ডিপো, চট্টগ্রাম

আবতাহী ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

মূল্য : ৭০০ [সাতশত] টাকা মাত্র।

Ash-Shifa(Vol-02): By Imam Kazi Aiaz Anduluchi Rahamatullahi Alihi, Translated By: Mawlana Mohammad Abdul Mazid, Edited By: Dr. Kamal Uddin Al-Azhari. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 700/- USD \$ 27.00

প্রকল্প পরিচালকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিজগতের জ্ঞান ও প্রাণ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃজন করেছেন। দরুদ-সালাম অবতীর্ণ হোক আমাদের প্রিয় আকা ও মাওলা হাবীবে খোদার প্রতি যিনি বিশ্বজগতের রহমত ও উম্মতের কল্যাণকামী। তাঁর পুতঃপবিত্র পরিবার-পরিজন, সাহাবীদের প্রতি, যারা হিদায়তের আকাশের নক্ষত্রতুল্য, সকল পুণ্যত্মা আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের প্রতিও পরিপূর্ণ রহমত অবতীর্ণ হোক।

ইমাম কাযী আয়ায (৪৭৬হি./১০৮৩খ্রি-৫৪৪হি./১১৪৯খ্রি) ছিলেন* হিজরি পঞ্চ শতকের শ্রেষ্ঠ মুহাদিস ও ফকীহগণের অন্যতম। বিশেষতঃ সীরাতে রাসূলের উপর অনবদ্য গ্রন্থ ‘আশ-শিফা’র জন্য ইলম মহলে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। হাদিস ও তাফসীরের ভাষ্যকারগণ যেখানে ‘ক্বলাল কাযী’ (قَالَ الْقَاضِي) বলেছেন বলে যে উদ্ধৃতি পেশ করেন সেখানে এক কথায় ইমাম কাযী আয়াযকে বুঝিয়ে থাকেন। সীরাতে গ্রন্থগুলোর মধ্যে ‘শিফা’ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। তিনি এ গ্রন্থে সীরাতে ও শ্যামাইল-ই রাসূলকে এক অভিনব পন্থায় উপস্থাপন করার প্রয়াস পান। যা অন্যান্য সীরাতে গ্রন্থগুলোতে প্রায় দেখা যায় না। বিশেষতঃ উম্মতের উপর সম্মানিত নবীগণের প্রতি কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, এ কর্তব্যগুলো পালন ও বিশ্বাস লালন না করলে কী শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কীরূপ বিশ্বাসের উপর উম্মতের ইমান-নির্ভরশীল ইত্যাদি বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে রয়েছে। ‘শিফা’র এ অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে উহার রচনাকাল থেকে এ গ্রন্থের উপর বড় বড় মুহাদিসগণ মূল্যবান ভাষ্য রচনা করতে দেখা যায়। যা এ গ্রন্থের মাকবুলিয়াতের বড় দলীল। শুধু তা’নয় এ গ্রন্থটি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে মাকবুল হয়েছে মর্মে অনেক বর্ণনাও পাওয়া যায়। ফলে গুরুতর রোগ থেকে আরোগ্য লাভ এবং বৈধ মনোবাসনা পূরণের জন্য অনেক আল্লাহর মাকবুল বান্দাগণ এ গ্রন্থের খতমের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মূল্যবান গ্রন্থটি পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনুবাদ হলেও বাংলাভাষায় এটি শিফার প্রথম অনুবাদ। মূল গ্রন্থের অনুবাদের শুরুতে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আলেম-ই দ্বীন পাকিস্তান নিবাসী আল্লামা শরফ কাদেরী লিখিত ইমাম কাযী আয়ায-এর শিফা শরীফের উপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এবং ‘মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল’-এর প্রতিষ্ঠাতা শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী রচিত শিফা শরীফের উপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা (মা’রিফুশ্

শিফা' (مَعَارِفُ الشَّفَاءِ) র অনুবাদ আমরা সংযোজন করেছি। উক্ত দু'টি রচনায় শিফা শরীফের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে অতি চমৎকার ভাষায়। আমরা এ দু'জন মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'সন্জরী পাবলিকেশন' বিজ্ঞ অনুবাদ ও সম্পাদকের মাধ্যমে গ্রন্থটির অনুবাদ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে বাংলাভাষীদের পক্ষ থেকে ফরযে কিফায়ার দায়িত্ব পালন করেছে বলে আমার বিশ্বাস। এ জন্য আমি সকলের পক্ষ থেকে এ প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী জনাব আবু তৈয়ব চৌধুরীর শুক্রিয়া আদায় করছি। বিশেষ করে বিজ্ঞ অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ ও সম্পাদক ড. কামাল উদ্দীন আযহারী, অঙ্গসজ্জায় রিদুয়ানুল হক, মীর মুহাম্মদ খাইরুল্লাহ ও মুহাম্মদ রুবাইয়াত বিন মূসার শুক্রিয়া আদায় করছি, যাদের দিনরাত পরিশ্রমে এ গ্রন্থটি আমরা প্রকাশ করতে পেরেছি। আল্লাহ তা'আলা সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন!

অনুবাদ ও প্রফ নির্ভুল করার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন-প্রকার ভুল-ত্রুটি কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে ধন্য করবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন!

মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন
প্রকল্প পরিচালক
সন্জরী পাবলিকেশন, বাংলাদেশ

সূচীপত্র

الْقِسْمُ الثَّانِي

দ্বিতীয় পর্ব

فَيَا يَحِبُّ عَلَى الْإِيمَانِ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

হযরত ﷺ র প্রতি সৃষ্টির আবশ্যকীয় অধিকারসমূহের আলোচনা/ ০৩

■ প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

فِي قَرْضِ الْإِيمَانِ بِهِ وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ইমান আনয়নের আবশ্যকতা, তাঁর আনুগত্য ও সুনাত অনুসরণের বাধ্যবাধকতা প্রসঙ্গে/ ০৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

وُجُوبِ طَاعَتِهِ فِي

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার বিবরণ/ ১১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

فِي وَجُوبِ اتِّبَاعِهِ وَامْتِنَالِ أَمْرِهِ وَالْإِقْدَاءِ بِهَذِيهِ

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করা ওয়াজিব প্রসঙ্গে/ ১৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

مَا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ وَالْأَيُّمَةِ مِنْ اتِّبَاعِ سُنَّتِهِ وَالْإِقْدَاءِ بِهَذِيهِ وَسَيْرَتِهِ

সলফে সালেহীন ও ইমামগণ কর্তৃক উদ্ধৃত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনাত অনুসরণ, পথোদ্দেশ্য অনুকরণ, ও সীরাতে প্রসঙ্গে/ ২৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

فِي مُحَالَفَةِ أَمْرِهِ وَتَبْدِيلِ سُنَّتِهِ ضَلَالٌ

তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ ও রীতির পরিবর্তন পথভ্রষ্ট হওয়া প্রসঙ্গে/ ৩৩

■ দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

فِي لُزُومِ عَجَبَتِهِ ﷺ

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসা অপরিহার্য হওয়া প্রসঙ্গে/ ৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

فِي ثَوَابِ مُحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মহব্বতের প্রতিদান প্রসঙ্গে/ ৪১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

فِيمَا رُوِيَ عَنِ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ مُحَبَّتِهِمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَشَوْقِهِمْ لَهُ

হযর ﷺ-এর প্রতি পূর্ববর্তী ইমামদের ভালবাসা ও অনুরাগ প্রসঙ্গে/ ৪৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

فِي عَلَامَةِ مُحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার নিদর্শন প্রসঙ্গে/ ৪৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

فِي مَعْنَى الْمَحَبَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقِيقَتِهَا

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসার মর্মার্থ ও এর স্বরূপ প্রসঙ্গে/ ৫৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

فِي وَجُوبِ مُنَاصَحَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্যাণ কামনার আবশ্যিকতা প্রসঙ্গে/ ৬২

■ তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

فِي تَعْظِيمِ أَمْرِهِ وَوُجُوبِ تَوْقِيرِهِ وَبِرِّهِ

হযর ﷺ-এর আদেশ ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে/ ৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

فِي عَادَةِ الصَّحَابَةِ فِي تَعْظِيمِهِ وَتَوْقِيرِهِ وَإِجْلَالِهِ ﷺ

সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক হযর ﷺ-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পদ্ধতি/ ৭৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

فِي تَعْظِيمِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ

ওফাতের পর হযর ﷺ-এর প্রতি তা'যিম প্রসঙ্গে/ ৮০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

فِي سِيرَةِ السَّلَفِ فِي تَعْظِيمِ رِوَايَةِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسُنَّتِهِ

হাদীস শরীফ বর্ণনায় পূর্ববর্তী আলেমদের শ্রদ্ধা ও শিষ্টাচার প্রসঙ্গে/ ৮৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

وَفِي تَوْقِيرِهِ ﷺ وَبِرِّهِ بِرُّ آلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَزْوَاجِهِ

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ, মু'মিনদের জননী তাঁর রমণীকুলের প্রতি সম্মান প্রসঙ্গে/ ৮৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

فِي تَوْقِيرِهِ وَبِرِّهِ ﷺ تَوْقِيرُ أَصْحَابِهِ وَبِرُّهُمْ

হযর ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের প্রতি সম্মান ও সদাচার প্রসঙ্গে/ ১০১

সপ্তম পরিচ্ছেদ

فِي إِعْزَازِ مَالِهِ مِنْ صَلَاةِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْكِنَةٍ وَمَشَاهِدِ

হযর ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত বস্তু ও স্থানের প্রতি প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে/ ১১৪

■ চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيمِ وَفَرْضِ ذَلِكَ وَفَضِيلَتِهِ

সালাত ও সালামের বিধান, মাহাত্ম্য ও অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে/ ১২২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠের বিধান/ ১২৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

হযর ﷺ-এর প্রতি সালাত ও সালামের মুস্তাহাব সময় প্রসঙ্গে/ ১৩০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيمِ

দরুদ-সালামের ধরণ ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে/ ১৩৮

مُقَدِّمَةُ الْقِسْمِ الثَّالِثِ

তৃতীয় পর্বের প্রারম্ভিকা/ ২০১

■ প্রথম অধ্যায়

فِي مَا يَخْتَصُّ بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالْكَلامُ فِي عِصْمَةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَسَائِرِ
الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

দ্বীনি বিষয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষত্ব এবং তাঁর ও সকল
নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া প্রসঙ্গে/ ২০৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

فِي حُكْمِ عَقْدِ قَلْبِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَقْتِ نُبُوَّتِهِ

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকালীন দৃঢ়চিত্ততা প্রসঙ্গে/ ২০৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

فِي عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ

নবুওয়াতের পূর্বে সম্মানিত নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া প্রসঙ্গে/ ২০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

فِي عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ بِأُمُورِ الدُّنْيَا

পার্বিষ বিষয়ে আশিয়া আলাইহিমুস সালামের নিষ্পাপ হওয়া প্রসঙ্গে/ ২৫১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

فِي إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عِصْمَةَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الشَّيْطَانِ

শয়তানের প্রভাব থেকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরক্ষিত হওয়ার
ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য প্রসঙ্গে/ ২৫৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

فِي صِدْقِ أَقْوَالِهِ ﷺ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সত্যতা প্রসঙ্গে/ ২৬৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

فِي دَفْعِ بَعْضِ الشُّبُهَاتِ

কতিপয় সন্দেহের অপনোদন/ ২৭৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

فِي فَضِيلَةِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ وَالِدَعَاءُ لَهُ

দরুদ সালামের ফযিলত প্রসঙ্গে/ ১৫১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

فِي ذَمِّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَآلِهِ

হযুর ﷺ এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ না করার নিন্দা ও পরিণতি/ ১৫৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ

فِي تَخْصِيصِهِ ﷺ بِتَبْلِيغِ صَلَاةٍ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَوْ سَلَّمَ مِنَ الْأَنَامِ

দরুদ-সালাম পাঠকারীদের সাথে হযুর ﷺ এর বিশেষ সম্বন্ধ প্রসঙ্গে/ ১৬৩

অষ্টম পরিচ্ছেদ

فِي الْإِخْتِلَافِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ

নবী ও রাসূল ব্যতীত অন্যদের প্রতি দরুদ পাঠে মতবৈতন্যতা প্রসঙ্গে/ ১৬৭

নবম পরিচ্ছেদ

فِي حُكْمِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ ﷺ وَفَضِيلَةِ مَنْ زَارَهُ وَكَيْفَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ

রওয়া মুবারক যিয়ারতের বিধান, ফযিলত ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে/ ১৭৫

দশম পরিচ্ছেদ

آدَابُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ وَفَضْلِهِ

মসজিদে নববীতে প্রবেশের আদব ও ফযিলত/ ১৮৮

❖ তৃতীয় পর্ব

فِي مَا يَحِبُّ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَمَا يَسْتَحِبُّ فِي حَقِّهِ أَوْ يَجُوزُ عَلَيْهِ وَمَا يَمْتَنِعُ أَوْ يَصَحُّ مِنَ
الْأَحْوَالِ الْبَشَرِيَّةِ أَوْ يُضَافُ إِلَيْهِ

ওই সব বিষয় যা হযুর ﷺ এর পবিত্র সত্ত্বার জন্য অপরিহার্য এবং যা অসম্ভব,
অথবা যা তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত করা বৈধ এবং যা বৈধ নয়, কিংবা তাঁর প্রতি মানবীয়
ও নাবলি সম্পৃক্ততার উপযুক্ততা ও অনুপোয়ুক্ততা প্রসঙ্গে/ ২০০

সপ্তম পরিচ্ছেদ

فَيَمَّا يَتَصَلُّ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَأَخْوَالِ نَفْسِهِ

আত্মিক ও দুনিয়াবী দিক থেকে হযুর ﷺ এর নিষ্পাপ হওয়া প্রসঙ্গে/ ২৯৩

অষ্টম পরিচ্ছেদ

رَدُّ بَعْضِ الْأَعْتَزَاتِ

কতিপয় আপত্তির নিরসন/ ২৯৮

নবম পরিচ্ছেদ

عِصْمَةُ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَالْكَبَائِرِ الْمُؤَبَّاتِ

সম্মানিত নবীগণ কবীরাগুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র হওয়া প্রসঙ্গে/ ৩১০

দশম পরিচ্ছেদ

فِي عِصْمَتِهِمْ مِنَ الْمَعَاصِي قَبْلَ النُّبُوَّةِ

নবুওয়াতের পূর্বে সম্মানিত নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া প্রসঙ্গে/ ৩১৬

একাদশ পরিচ্ছেদ

السَّهْوُ وَالنَّسْيَانُ فِي الْأَفْعَالِ

কর্মে ভুল ও বিস্মৃতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে/ ৩২০

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

فِي الْكَلَامِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورِ فِيهَا السَّهْوُ مِنْهُ ﷺ

ভুল সংক্রান্ত হাদীসসমূহের বিবরণ/ ৩২৪

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَجَارَ عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّغَائِرِ

সম্মানিত নবীগণ কর্তৃক সগীরা গুনাহ সম্পাদনের ধারণার খণ্ডন প্রসঙ্গে/ ৩৩৩

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

حَالَةُ الْأَنْبِيَاءِ فِي خَوْفِهِمْ وَاسْتِغْفَارِهِمْ

আমিয়াকে কেরামের ভয়-ভীতি ও ক্ষমাপ্রার্থনার রহস্য/ ৩৬৯

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

فَائِدَةٌ مَأْمَرٌ مِنَ الْفُضُولِ الَّتِي بُحِثَتْ مَسْأَلَةُ الْعِصْمَةِ

ইসমত প্রসঙ্গে আলোচনার সারমর্ম/ ৩৭৭

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

عِصْمَةُ الْمَلَائِكَةِ

ফিরিশতাদের নিষ্পাপ হওয়া/ ৩৮০

■ দ্বিতীয় অধ্যায়

فَيَمَّا يَخُصُّهُمْ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَمَا يُطْرَأُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَوَارِضِ الْبَشَرِيَّةِ

মানবীয় চাহিদা ও পার্শ্বব কাজে আমিয়া কেরামের বিশেষত্ব/ ৩৮৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

حَالَتُهُمْ بِالنُّسْبَةِ لِلْمُسْخَرِ

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদুর প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে/ ৩৯৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

أَخْوَالُهُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পার্শ্বব কাজের অবস্থাসমূহ প্রসঙ্গে/ ৩৯৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

أَحْكَامُ الْبَشَرِ الْجَارِيَةُ عَلَى يَدَيْهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে শর'ঈ বিধান প্রচলন/ ৪০৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

أَخْبَارُهُ الدُّنْيَوِيَّةُ

পার্শ্বব বিষয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী/ ৪০৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

حَدِيثُ الْوَصِيَّةِ

হাদীসে কিরতাস প্রসঙ্গে/ ৪১৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

دِرَاسَةُ أَحَادِيثَ أُخْرَى

অন্যান্য হাদীসসমূহের পর্যালোচনা/ ৪২১

সপ্তম পরিচ্ছেদ

أَفْعَالُهُ الدُّنْيَوِيَّةُ

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পার্শ্বব কর্মসমূহ প্রসঙ্গে/ ৪৩০

অষ্টম পরিচ্ছেদ

حُكْمُ الْمَرَضِ وَالْإِنْبِلَاءِ هُمْ

আমিয়ায়ে কেরামের রোগব্যাধি ও পরীক্ষার রহস্য প্রসঙ্গে/ ৪৪০

❖ চতুর্থ পর্ব

فِي تَصَرُّفِ وَجْهِ الْأَحْكَامِ عَلَى مَنْ تَنَقَّصَهُ أَوْ سَبَّهُ ﷺ

হযরত ﷺ এর মর্যাদা হননকারী ও তাঁকে গালিদানকারীর বিধান/ ৪৫৪

○ ভূমিকা/ ৪৫৫

■ প্রথম অধ্যায়

فِي بَيَانِ مَا هُوَ فِي حَقِّهِ سَبٌّ وَتَنَقُّصٌ مِنْ تَغْرِيضٍ أَوْ نَصٍّ

হযরত ﷺ এর মর্যাদাহানিকর গালি ও ক্রটি সংযোজনের স্বরূপ/ ৪৬১

প্রথম পরিচ্ছেদ

الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَنَقَّصَهُ

হযরত ﷺ কে গাল-মন্দকারী ও মর্যাদা হননকারীর বিধান প্রসঙ্গে/ ৪৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

فِي الْحُجَّةِ فِي إِجَابِ قَتْلِ مَنْ سَبَّهُ أَوْ عَابَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালমন্দকারী বা দোষক্রটি বর্ণনাকারীদের প্রাণবধ করা আবশ্যিক হওয়ার দলীল প্রসঙ্গে/ ৪৭০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

أَسْبَابُ عَفْوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْضِ مَنْ أَذَاهُ

হযরত ﷺ কর্তৃক কতিপয় কষ্টদানকারীকে ক্ষমার কারণসমূহ/ ৪৮৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

حُكْمُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ دُونَ قَصْدٍ أَوْ إِعْتِقَادٍ

অনিচ্ছাকৃতভাবে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানহানির বিধান/ ৪৯৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

حَقِيقَةُ قَائِلِ ذَلِكَ هَلْ هُوَ كَاذِبٌ أَوْ مُرْتَدٌّ

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপকারীর প্রকৃতি / ৪৯৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْكَلَامُ يَحْتَمِلُ السَّبَّ وَغَيْرَهُ

গাল-হৃদের সম্ভাবনাময় কথা হযরত ﷺ এর সাথে সম্পৃক্ত করার বিধান প্রসঙ্গে/ ৫০১

সপ্তম পরিচ্ছেদ

حُكْمُ مَنْ وَصَفَ نَفْسَهُ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْأَنْبِيَاءِ رَفْعًا لِشَأْنِهِ أَوْ اسْتِصْغَارًا لِشَأْنِهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

নবীগণের গুণাবলীকে তুচ্ছজ্ঞান করে কারো সাথে উপমা দেয়ার বিধান প্রসঙ্গে/ ৫০৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ

حُكْمُ النَّاقِلِ وَالْحَاكِي لِهَذَا الْكَلَامِ عَنْ غَيْرِهِ

কুফরী বক্তব্য বর্ণনা ও উদ্ধৃতকারীর বিধান/ ৫১৩

নবম পরিচ্ছেদ

ذِكْرُ الْحَالَاتِ الَّتِي تَجُوزُ عَلَيْهِ ﷺ عَلَى طَرِيقِ التَّعْلِيمِ

শিক্ষার উদ্দেশ্যে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব বিষয় বর্ণনা বৈধ/ ৫১৯

দশম পরিচ্ছেদ

الْأَدَبُ اللَّازِمُ عِنْدَ ذِكْرِ أَخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত ﷺ এর বাণীমালা বর্ণনার প্রাক্কালে আবশ্যকীয় শিষ্টাচার প্রসঙ্গে/ ৫২৫

■ দ্বিতীয় অধ্যায়

فِي حُكْمِ سَائِهِ وَشَأْنِهِ وَمُتَنَقِّصِهِ وَمُؤْذِيهِ وَعُقُوبَتِهِ وَذِكْرِ اسْتِثْنَائِهِ وَوَرَائَتِهِ

হযরত ﷺ কে গালিদান, বিদ্বেষপোষণ, মানহানি, কষ্টদান ও শাস্তিদানকারীর তাওবা ও উত্তরাধিকার সম্পদের বিধান প্রসঙ্গে/ ৫২৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

الْأَقْوَالُ وَالْأَرْاءُ فِي حُكْمِ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ تَنَقَّصَهُ

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিদান ও মানহানিকারীর বিধান সংক্রান্ত মতব্যসমূহের পর্যালোচনা/ ৫২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

حُكْمُ الْمُرْتَدِّ إِذَا تَابَ

মুর্তাদের তাওবার বিধান/ ৫৩৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

حُكْمُ الْمُرْتَدِّ إِذَا اشْتَبَهَ ارْتِدَادُهُ

সন্দেহজনক মুরতাদের বিধান/ ৫৩৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

حُكْمُ الذِّمِّيِّ فِي ذَلِكَ

যিম্মী কর্তৃক মর্যাদাহানির বিধান/ ৫৪২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

فِي مِيرَاثٍ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

হযরত ﷺ কে কটুক্তির দায়ে নিহত ব্যক্তির মিরাস ও দাফন কাফন প্রসঙ্গে/ ৫৫১

■ তৃতীয় অধ্যায়

فِي حُكْمٍ مَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيََاءَهُ وَكُتُبَهُ وَآلَ النَّبِيِّ ﷺ وَزَوَاجَهُ وَصَحْبَهُ

আল্লাহ তা'আলা, ফিরিশতা, আশিয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের পরিবারবর্গ ও সহচরদের গাল-মন্দের বিধান প্রসঙ্গে/ ৫৫৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

حُكْمُ سَابِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمُ اسْتِثْنَائِهِ

আল্লাহ তা'আলাকে গাল-মন্দকারী ও তাঁর বিধান প্রসঙ্গে/ ৫৫৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

حُكْمُ إِضَاقَةِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ تَعَالَى عَنْ طَرِيقِ الْإِجْتِهَادِ وَالْخَطَا

গবেষণার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার শানে অশোভনীয় গুণাবলী সম্পৃক্তের বিধান/ ৫৫৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

فِي تَحْقِيقِ الْقَوْلِ فِي إِكْفَارِ الْمُتَأَوِّلِينَ

অপব্যাক্যকারীদের কুফরী প্রসঙ্গে/ ৫৬৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

فِي بَيَانِ مَا هُوَ مِنَ الْقَالَاتِ كُفْرٌ وَمَا يُتَوَقَّفُ أَوْ يُخْتَلَفُ فِيهِ وَمَا لَيْسَ بِكُفْرٍ

কুফরী ও অকুফরী বাক্যসমূহের ব্যাপারে পর্যালোচনা, মতদ্বৈততা প্রসঙ্গে/ ৫৭৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

حُكْمُ الذِّمِّيِّ إِذَا سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى

আল্লাহর প্রতি কটুক্তিকারীকে বন্দীর বিধান প্রসঙ্গে/ ৫৯১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

حُكْمُ ادِّعَاءِ الْإِلَهِيَّةِ أَوْ الْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ عَلَى اللَّهِ

খোদায়ী দাবী কিংবা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ ও অপবাদের বিধান প্রসঙ্গে/ ৫৯৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ

حُكْمُ مَنْ تَعَرَّضَ بِسَاقِطِ قَوْلِهِ وَسَخِيفِ لَفْظِهِ لِجَلَالِ رَبِّهِ دُونَ قَصْدٍ

অনিচ্ছাকৃতভাবে আকাঙ্গদ ও শরীয়তের বিষয়ে ঠাট্টা করার বিধান প্রসঙ্গে/ ৫৯৮

অষ্টম পরিচ্ছেদ

حُكْمُ سَبِّ بَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ

সম্মানিত নবীগণ ও ফিরিশতকূলের প্রতি গালমন্দের বিধান প্রসঙ্গে/ ৬০২

নবম পরিচ্ছেদ

الْحُكْمُ بِالنُّسْبَةِ لِلْقُرْآنِ

কুর'আন মাজীদ অবমাননার বিধান প্রসঙ্গে/ ৬০৬

দশম পরিচ্ছেদ

الْحُكْمُ فِي سَبِّ آلِ الْبَيْتِ وَالْأَزْوَاجِ وَالْأَصْحَابِ

হযরত সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ, সহধর্মিণীগণ ও সাহাবীদের প্রতি গালমন্দের বিধান প্রসঙ্গে/ ৬১০

الشِّفَاءُ بِتَغْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفَى ﷺ

আশ-শিফা

বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা

[মুস্তফা ﷺ'র অধিকার ও মর্যাদা বর্ণনায় হৃদয়ের আরোগ্য]

[২য় খণ্ড]

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقِسْمُ الثَّانِي

দ্বিতীয় পর্ব

فِي مَا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি
সৃষ্টির আবশ্যকীয় অধিকারসমূহের আলোচনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

الْبَابُ الْأَوَّلُ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

فِي قَرْضِ الْإِيمَانِ بِهِ وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ

হযুর ﷺ এর প্রতি ঈমান আনয়নের আবশ্যিকতা, তাঁর আনুগত্য ও সন্মত

অনুসরণের বাধ্যবাধকতা প্রসঙ্গে

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হযুর সাহ্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এখন তাঁর উপর ঈমান আনয়ন, আনীত হিদায়াতের সত্যতার স্বীকৃতি দান ওয়াজিব হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন-

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا^১

-সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ওই নূরের প্রতি, যা আমি অবতীর্ণ করেছি।^১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

-নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত প্রত্যক্ষকারী করে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে; যাতে হে লোকেরা তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো।^২

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

-সুতরাং ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পড়াবিহীন অদৃশ্যের সংবাদদাতার উপর। যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের উপর ঈমান আনেন এবং তাঁরই অনুসরণ করো, তবেই তোমরা পথ পাবে।^৩

^১. আল কুরআন : সূরা তাগাবুন, ৬৪:৮।

^২. আল কুরআন : সূরা ফাতহ, ৪৮:৮-৯।

^৩. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৫৮।

উক্ত আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া ঈমান যেমন পূর্ণ হয় না, তেমনি ইসলাম গ্রহণও বিগত হয় না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿٢٢﴾

-আর যারা ঈমান আনেনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর, নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন তৈরী করে রেখেছি।^১

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

-আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকি যতক্ষণ না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) সাক্ষ্য দেয়, আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আমি যা নিয়ে এসেছি তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। যদি তাঁরা এমনটি করে তবে তাদের জীবন ও সম্পদ আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। যদি তারা তা না করে তাহলে তাদের জ্ঞান ও মাল ক্ষতিগ্রস্ত করা সঠিক হবে। আর তাদের হিসাব আল্লাহ তা'আলার উপরই।^২

কাযী আবুল ফযল আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন) বলেন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনয়নের অর্থ হলো, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে তাসদিক বা আন্তরিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন, তিনি যা কিছু নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি যা বর্ণনা

^১ আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:১৩।

^২ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু দু'আয়ীন্ নবী, ১০:৯৭, হাদিস নং : ২৭২৭।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুল আমরি বি কিতালিন্ নাস, ১:১১৬, হাদিস নং : ৩১।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু ওজুবিজ্ জিহাদ, ১০:১৩১, হাদিস নং : ৩০৩৯।

করেছেন, তাবৎ বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। মানুষের অন্তর তাঁর মুখের অনুসারী হয় অর্থাৎ মানুষ মুখে যা বলে অন্তরে তা স্বীকার করে, এভাবে ঈমান পূর্ণ হয়। আলোচ্য হাদীসে তাই বলা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

-আমাকে ওই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।^১

এছাড়া হাদীসে জিবরাঈলে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে- যখন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ইসলাম কী? আপনি ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলুন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-ইসলাম হলো- আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই ও হযরত মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়া।^২

এরপর তিনি ইসলামের অপর চারটি স্তম্ভের উল্লেখ করেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঈমান হলো আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফিরিশতাদের উপর, কিতাবসমূহের উপর ও তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। অতঃপর তিনি পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ঈমানের জন্য আন্তরিক বিশ্বাস অত্যাৱশ্যক। আর ইসলাম গ্রহণের জন্য মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট। আন্তরিক ও মৌলিক স্বীকৃতি উভয়ই প্রশংসনীয়। তবে নিকৃষ্ট অবস্থা হলো, মানুষ মুখে কালেমার সাক্ষ্য প্রদান করে, কিন্তু অন্তর ওই সাক্ষ্য অস্বীকার করে, ওই অবস্থাকে নিফাক বা কপটতা বলা হয়।

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ফা ইন তাবু আও আকামুস্ সালাতি, ০১:৪২, হাদিস নং : ২৪।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুল আমরি বি কিতালিন্ নাস, ১:১১৬, হাদিস নং : ৩১।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু ওজুবিজ্ জিহাদ, ১০:১৩১, হাদিস নং : ৩০৩৯।

^২ বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু বায়ানিল ঈমান, ওয়ালা ইসলাম ওয়ালা ইহসান, ১:৮৭, হাদিস নং ৯।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾

-যখন মুনাফিকরা আপনার সম্মুখে হাযির হয় বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাক।^১

অর্থাৎ তারা নিজেদের এ কথায় মিথ্যাবাদী। কারণ তাদের এ মৌখিক সাক্ষ্য তাদের আন্তরিক বিশ্বাসের বিপরীত, তারা আন্তরিকভাবে একথায় বিশ্বাসী নয় যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল। আর যখন তাদের অন্তর মৌখিক স্বীকৃতিকে স্বীকার করে না, তখন শুধু তাদের মৌখিক অস্বীকার কোনো কাজে আসবে না। এ ভাষণে তারা ঈমান থেকে অপসৃত হয়ে পড়েছে। এ কারণে আখিরাতে তারা ঈমানদার একথা তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। কারণ তাদের নিকট ঈমানের কোনো নিদর্শন নেই। আর তারা কাফিরদের সাথে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। তবে ইসলামের হুকুম তাদের উপর বলবৎ থাকবে। এজন্য যে, তারা প্রকাশ্যে তাওহীদ ও রিসালাতের মৌখিক স্বীকৃতি দিয়েছে। এই মূল ভিত্তির উপর মুসলমানদের যাবতীয় বিধান কার্যকর হবে। কারণ মুসলমান বিচারক তো বাহ্যিক অবস্থার উপর হুকুম জারী করেন। আর ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন তার মধ্যে পাওয়া যায়। আর মানুষের নিকট এমন কোনো নির্ভরযোগ্য পন্থা নেই, যার মাধ্যমে সে অন্তরের সঠিক অবস্থা জেনে নেবে। আর না মানুষকে অন্তরের ঈমানের খোঁজ-খবর নেয়ার আদেশ করা হবে। বরং হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে মুনাফিক বলতে নিষেধ করেছেন। আর এ কাজ নিন্দনীয় উল্লেখ করেছেন। এক ঘটনায় হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

هَلَا شَقَقْتُ عَنْ قَلْبِهِ.

-তোমরা কী তার অন্তর চিরে দেখেছো (তাতে ঈমান আছে কী না)?^২

^১ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তাহরীমি কুতলুল কাফির, ১:২৫৮, হাদিস নং : ১৪০।

খ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, 'আলা মা ইউক্কাতিলুল মুশরীকুন, ৭:২৩৪, হাদিস নং : ২২৭২।

গ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম পরিচ্ছেদ, কিতাবুল ফিসাস, পৃ. ২৮৫, হাদিস নং : ৩৪৫০।

^২ তাবরীযী : মু'জামুল কবীর, ৪:১৩৬।

মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক দৃঢ়তার মধ্যে পার্থক্য ওটাই। যা হতে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের বর্ণিত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাক্ষ্য ইসলামের সাথে সম্পর্ক রাখে। আর তাসদীক বা আন্তরিক স্বীকৃতি ঈমানের সাথে সম্পর্কিত হয়।

এখন এ দু'অবস্থা অবশিষ্ট রয়েছে। যা এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে। তন্মধ্যে এক হলো- আন্তরিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর মৌখিক সাক্ষ্য দেয়ার সুযোগ পায়নি, এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে- তার সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ পূর্ণাঙ্গ ঈমানের জন্য মৌখিক স্বীকৃতির শর্তারোপ করেছে। আর কেউ কেউ তাকে মু'মিন বলে স্থির করে জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য বলেছে। কারণ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ.

-ওই ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে যার অন্তরে অনুপরিমাণ ঈমান থাকবে।^১

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্তরিক স্বীকৃতি ব্যতীত অন্য কোনো বিষয় উল্লেখ করেননি। ওই ব্যক্তি তো অন্তরের দিক থেকে মু'মিন। সুতরাং সে গুনাহগার হবে না। আর না সে মৌখিক সাক্ষ্য ত্যাগের কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের ধারণা অনুযায়ী এ অভিমত সঠিক।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো- সে তো আন্তরিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে আর সে সুযোগও পেয়েছে। আর সে এটাও জানতে পেরেছে, ঈমান পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য মৌখিক সাক্ষ্য জরুরী। একথা জানা সত্ত্বেও সে মৌখিক অস্বীকার করেনি। আর সারা জীবনে একবারও মৌখিক সাক্ষ্য দেয়নি। সে একবারও এ কাজ করেনি; (ওই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে) ওই ব্যক্তির সম্পর্কেও মতদ্বৈততা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আন্তরিক স্বীকৃতির সাথে মৌখিক সাক্ষ্য মিলিত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মু'মিন হবে না। কারণ সাক্ষ্য এক অস্বীকার। অস্বীকার পূর্ণ করার মাধ্যমে ঈমান সুদৃঢ় হয়। এ কারণে আন্তরিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর অবকাশ পাওয়া অবস্থায় মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান ব্যতীত ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না। একথা সঠিক।

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু যিয়াদাতিল ঈমান ওয়া নুক্ষানিহি, ১:৭৭, হাদিস নং : ৪২; (২২:৬৫৬০)।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু আদনা আহলিল জাহান্নাতি, ১:৪৪৬, হাদিস নং : ২৮৫।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফীল কবর, ৭:২৮০, হাদিস নং : ১৯২২।

এটা হলো ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আর যদি ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাহলে আলোচনা অতি দীর্ঘায়িত হবে। তবে শুধু আন্তরিক স্বীকৃতির বুনিয়েদের উপর ভাগ করা কী অসম্ভব? সংক্ষেপে এটা সঠিক নয়। কারণ এর দ্বারা অতিরিক্ত বিষয়ের প্রতি প্রত্যাভর্তন করতে হয়, যে গুণাবলীর ভিন্নতার কারণে তার বিশ্বাসের দৃঢ়তা কিরূপ ছিলো। আকীদা ও বিশ্বাসে কিরূপ দৃঢ়তা ছিলো। অন্তরে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পোষণ করতো কম না বেশী। যদি ওইসব বিষয় আলোচনা করি তাহলে আমি আমার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবো। সুতরাং এ সম্পর্কে আমি যা আলোচনা করেছি তাই যথেষ্ট মনে করি। আর আমার উদ্দেশ্যে এটাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

فِي وَجُوبِ طَاعَتِهِ ﷺ

হযুর ﷺ-র আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার বিবরণ

যখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে আগমন করেছেন তার উপর আন্তরিক স্বীকৃতি প্রদান করা ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

-হে বিশ্বাসীগণ নির্দেশ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য করো রাসূলের।^১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

-আপনি বলুন! নির্দেশ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য করো রাসূলের।^২

আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٦﴾

-আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করো, তবে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে।^৩

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

- আর যদি রাসূলের আনুগত্য করো, তবে সৎপথ পাবে।^৪

^১. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৫৯; সূরা আনফাল, ৮:৫৯।

^২. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩২; সূরা নূর, ২৪:৫৪।

^৩. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩২।

^৪. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৫৪।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

—যে ব্যক্তি রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করেছে।^১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

—আর যা কিছু তোমাদেরকে রাসূল দান করেন তা গ্রহণ করো। আর যা হতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো।^২

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

—আর যে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মান্য করে, তবে সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করবে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন— অর্থাৎ নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদ এবং সংকর্মপরায়ন ব্যক্তিগণ— এরা কতই উত্তম সঙ্গী।^৩

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

—আর আমি কোন রাসূল প্রেরণ করিনি কিন্তু এ জন্য যে, আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হবে।^৪

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে তাঁর নিজের আনুগত্য উল্লেখ করেছেন। আর তাঁর আনুগত্যকে নিজের আনুগত্যের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য অগণিত সাওয়াবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তাঁর বিরোধিতার জন্যে মর্মান্তিক শাস্তির উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আদেশ মান্য করা ওয়াজিব ঘোষণা করেছেন। তিনি যে সমস্ত বিষয় নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দান করেছেন।

^১. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৮০।

^২. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:৭।

^৩. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৬৯।

^৪. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৬৪।

এ সম্পর্কে তাফসীরবিদ ও ইমামদের অভিমত হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার মর্মার্থ হলো— পুরোপুরিভাবে তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা, তিনি যা নিয়ে আগমন করেছেন সেগুলো মান্য করা।

আলেমগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যত রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁদের আনুগত্য করা প্রত্যেক গোত্রের জন্য ওয়াজিব করেছেন। যে গোত্রের প্রতি যিনি প্রেরিত হয়েছেন, সে গোত্রের উপর তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব করেছেন।

অপর একদল আলেম বলেন, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করলো, সে আল্লাহ তা'আলার ফরয আনুগত্য আদায় করলো।

হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ রাখিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

—আর যা কিছু তোমাদেরকে রাসূল দান করেন তা গ্রহণ করো।^১

এটাই ইসলামী শরীয়াত। আল্লামা সমরকন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, أَطِيعُوا—ফরয আদায়ে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করো। আর সুন্নাত আদায়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করো।

কেউ কেউ বলেন, أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، وَالرَّسُولَ فِيمَا بَلَّغَكُمْ—যেসব বিষয় আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন ওইসব বিষয়ে আল্লাহর আনুগত্য করো। অর্থাৎ হারাম কাজ করো না, আর ওইসব বিষয় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করো তিনি যা তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, أَطِيعُوا اللَّهَ بِالشُّهَادَةِ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَالنَّبِيَّ بِالشُّهَادَةِ لَهُ بِالنُّبُوَّةِ—আনুগত্যের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়াতের সাক্ষ্য প্রদান করে তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করে তাঁর আনুগত্য করা।

^১. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:৭।

হযরত আবু হুরায়রা রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.

-যে আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করলো, আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করলো, সে আল্লাহ তা'আলারই বিরোধিতা করলো। আর যে ব্যক্তি আমার মনোনীত বিচারকের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। আর যে আমার মনোনীত বিচারকের বিরোধিতা করলো সে আমারই বিরোধিতা করলো।^১

মোটকথা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করাই হলো আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্য করার আদেশ করেছেন। সুতরাং তাঁর আনুগত্যই আল্লাহ তা'আলার আদেশ মান্য করা। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ওই কাফিরদের কথা উল্লেখ করেছেন। যারা জাহান্নামে অবস্থান করে বলবে-

يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا

الرَّسُولَ

-যে দিন তাদের মুখমণ্ডল উলট-পালট করে আগুনের মধ্যে জ্বালানো হবে, একথা বলতে থাকবে- হায় কোনমতে যদি আমরা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করতাম, আর রাসূলের নির্দেশ মান্য করতাম।^২

তখন ওইসব লোক তাঁর আনুগত্য করার আকাঙ্ক্ষা করবে, তাদের সে আক্ষেপ কোনো উপকারে আসবে না।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা ওয়া আতিউল্লাহা, ২২:৪২, হাদিস : ৬৬০৪।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ওজুবি তায়্যাতি ইমরাযি, ৯:৩৬৫, হাদিস নং : ৩৫১৮।

গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনা, বাবু তুওয়াতুল ইমাম, ৮:৩৯৩, হাদিস নং : ২৮৫০।

^২ আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৬৬।

-আমি যখন তোমাদেরকে কোনো বিষয় নিষেধ করি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে। আর যখন কোনো কাজের আদেশ করি তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী তা পালন করবে।^১

হযরত আবু হুরায়রা রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

-আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যারা আমাকে অস্বীকার করেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সাহাবায়ে কেবলমাত্র আবেদন করেন, আপনাকে অস্বীকার করার মর্মার্থ কী? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আমার আনুগত্য করবে সে বেহেশতে যাবে। আর যে বিরোধিতা করলো সে যেনো আমাকে অস্বীকার করলো।^২

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنِي وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالْتَجَاءُ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْجُوا فَأَنْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَتَجَعُوا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَضْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاَحَهُمْ فَذَلِكَ نَتْلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ.

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল ইকতিদায়ী বিসুনানি রাসূলিল্লাহ, ২২:২৫৫, হাদিস নং ৬৭৪৪।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফরখিল হজ্বি মাররাতান ফীল উমরা, ৭:৪২, হাদিস নং : ২৩৮০।

গ) তাবরী : মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল মানাসিক, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৬৩, হাদিস নং : ২৫০৫।

^২ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল ইকতিদায়ী বিসুনানি রাসূলিল্লাহ, ২২:২৫৫, হাদিস নং ৬৭৪৪।

খ) হাকেম : আল মুস্তাদরাক, বাবু লি তাদখুলুনাল জান্নাতা ইব্র, ১৭: ৪৮৮, হাদিস নং : ৭৭৩৪।

গ) তাবরী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ, পৃ. ৩১, হাদিস নং :

(১৬)

আশ-শিফা [২য় খণ্ড]

-আমারও যা নিয়ে আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেছেন, তার উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের নিকট এসে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি স্বচক্ষে শত্রুবাহিনী দেখেছি। যারা তোমাদের উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এখন আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যে ডয় দেখাচ্ছি। সুতরাং এখন তোমরা নিজেদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করো। একথা শুনার পর একদল লোক আনুগত্য করে রাতের আরামকে পরিত্যাগ করে বেরিয়ে গেলে তারা নাজাত পেয়ে গেলো। আর তাদের মধ্যে একদল লোক ভীতিপ্রদর্শনকারীকে অবিশ্বাস করে সকাল পর্যন্ত গৃহে অবস্থান করলো, ভোর বেলায় শত্রু বাহিনী তাদের উপর হামলা করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিল। এটা হলো ওই ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার আনুগত্য করলো, এবং যে আমার নিয়ে আসা সত্যকে মিথ্যা স্থির করলো।^১

অনুরূপ অপর এক হাদীসে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ
دَخَلَ الدَّارَ وَآكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ
مِنَ الْمَأْدُبَةِ فَقَالُوا أَوْلَوْهَا لَهُ يَفْقَهُهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ
الْعَيْنَ نَائِمَةً وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا فَالِدَارُ الْجَنَّةُ وَالِدَّاعِيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ
عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَرَقٌ بَيْنَ النَّاسِ.

-আমার উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে একটি গৃহ নির্মাণ করে মেহমানদের জন্য উন্নতমানের আহারের ব্যবস্থা করলো। আর একজন আহ্বানকারীকে আহ্বান করার জন্য প্রেরণ করে, যে সে সকলকে

আহ্বান করে। সুতরাং যে আহ্বানকারীর আহ্বান কবুল করে ওই ঘরে এসে দাওয়াত খেলো। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করেনি না সে ওই ঘরে এসেছে না সে দাওয়াত খেয়েছে। ওই ঘরের উদাহরণ হলো বেহেশত। আহ্বানকারী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ তা'আলার আদেশ মান্য করলো। আর যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করলো, সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হলো। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে পার্থক্য নিরূপনকারী। সত্যপন্থি ও বাতিলপন্থিদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপনকারী। সত্যপন্থি ও বাতিল পন্থিদের মধ্যে তাঁর পবিত্র সত্তার দ্বারা পার্থক্য হয়ে যায়।^২

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল ইকতিদায়ী বিসুনানি রাসূলিল্লাহ, ২২:২৫১, হাদিস নং ৬৭৪০।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু শাফকাতিহি উম্মাতিহি, ১১:৩৯৭, হাদিস নং : ৪২৩৩।

গ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ, পৃ. ৩২, হাদিস নং : ১৪৮।

২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল ইকতিদায়ী বিসুনানি রাসূলিল্লাহ, ২২:২৪৯, হাদিস নং ৬৭৩৮।

খ) দারেমী : আস্ সুন্নাহ, বাবু শিফাতিন্ নবী কুবলা মা'আয়াসিহি, ১:১০, হাদিস নং : ১১।

গ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ, পৃ. ৩১, হাদিস নং : ১৪৮।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

فِي وَجُوبِ اتِّبَاعِهِ وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ وَالْإِقْتِدَاءِ بِهَدْيِهِ ﷺ

হযরত ﷺ এর অনুসরণ করা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা ওয়াজিব। তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করা ও তাঁর উত্তম আদর্শের উপর আমল করার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

—হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, হে মানবকুল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকো তবে আমার অনুগত হয়ে যাও, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন।^১

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

—সুতরাং ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, পড়া-বিহীন, অদৃশ্যের সংবাদদাতার উপর যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণী সমূহের উপর ঈমান আনেন এবং তাঁরই গোলামী করো, তবেই তোমরা পথ পাবে।^২

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

لَا يَحْجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَتُسَلِّمُوا ۖ تَسْلِيمًا ﴿٦٦﴾

—সুতরাং হে মাহবুব! আপনার পালনকর্তার শপথ, তারা মুসলমান হবে না যতক্ষণ পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না,

^১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১।

^২. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৫৮।

অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন, তাদের অন্তরসমূহে সে সম্পর্কে কোনো দ্বিধা পাবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে।^১

যখন কেউ অনুগত হয়ে যায় তখন اسْتَعْلَمَ ও إِنْقَادَ বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

—নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর অনুসরণই উত্তম আদর্শ তারই জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে।^২

হযরত মুহাম্মদ বিন আলী তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘উসওয়ায়ে রাসূল’ (الْأُسْوَةُ فِي الرُّسُولِ) এর মর্মার্থ হলো, তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা, আর তাঁর কথা ও কাজের বিরোধিতা পরিত্যাগ করা। অধিকাংশ তাফসীরবিদগণ বলেন, উক্ত আয়াতের মর্মার্থ এটাই। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এটা ওই সমস্ত লোকদের জন্য সতর্ক সংকেত যারা সুন্নাতের অনুসরণ থেকে পিছপা হয়েছে।

হযরত সাহল রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ তা'আলার বাণী— صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ (সে পথে পরিচালিত কর, যে পথে তোমার প্রিয়জন চলেছেন) এর তাফসীর বর্ণনা করে বলেন, এর মর্মার্থ হলো, হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা। আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে মানুষকে হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করার আদেশ দান করেছেন। আর প্রতিশ্রুতি দান করেছেন, যে হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করবে সে তাঁর মাধ্যমে হিদায়াত পাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সত্য জীবনব্যবস্থা ও আর হিদায়াত সহকারে প্রেরণ করেছেন। তিনি মানুষের অন্তরকে পবিত্র করেন। তাদের কিতাব আর প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন। সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে এ অঙ্গীকার করেন, যদি তারা হযরত সালাল্লাহু আলাইহি

^১. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৬৫।

^২. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:২১।

^৩. আল কুরআন : সূরা ফাতিহা, ১:৭।

ওয়াসাল্লামের সুনাতের অনুসরণ করে, আর স্বীয় প্রবৃত্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর তাঁর অনুসরণকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে তাদেরকে তিনি স্বীয় মাহবুব বানাবেন। আর তাদের ঈমান তখনই সুদৃঢ় হবে, যখন তারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করবে। তাঁর আদেশের উপর সম্ভ্রষ্ট হবে, তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করা পরিত্যাগ করবে।

হযরত হাসান বসরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একদল সাহাবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসি, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন—

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿১৬৬﴾

—হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, ‘হে মানবকুল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকো তবে আমার অনুগত হয়ে যাও, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন, তোমাদের পাপরাশি মার্জনা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।’

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কা'ব বিন আশরাফ প্রমুখ লোকদের সম্পর্কে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ তারা বলাবলি করছিলো, আমরা তো আল্লাহ তা'আলার পুত্র ও তাঁর বন্ধু, আর আমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভীষণ ভালোবাসি। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে যুজাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, **إِنْ كُنْتُمْ** এর মর্মার্থ হলো— যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভালবেসে থাকো অর্থাৎ তোমরা তাঁর আনুগত্য করার ইচ্ছা করো তাহলে ওই কাজ করো তিনি যে কাজের তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ বান্দার আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসার মর্মার্থ হলো, বান্দা কর্তৃক তাঁদের আনুগত্য করা ও তাঁদের আদেশ নির্দেশের উপর সম্ভ্রষ্ট থাকা। আর আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে ভালবাসার মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা বান্দার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া ও রহমত অবতীর্ণ করা।

কেউ কেউ বলেন, **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ** এর মর্মার্থ হলো, বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা স্থাপন হলো, তিনি বান্দাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখবেন এবং তাঁর ইবাদত করার সামর্থ্য দান করবেন। আর বান্দার ভালবাসার অর্থ হলো, বান্দা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করবে। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন—

تَغِييَ إِلَهِ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا لِعُمْرِي فِي الْقِيَّاسِ بَدِيعُ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لِأَطْعَمْتَهُ إِنَّ الْمَحَبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

অবাধ্য তুমি ইলাহ'র সকাশ, বাধ্যচারণ করছো প্রকাশ
এই যে আমার জীবনের কসম, আজব লাগে ভাবতে ভীষণ,
ভাল যদি বাসতে তবে, অনুগত হতেই তারই
প্রেমিক যে বাধ্য হবে, প্রেমাস্পদে সঁপে দিতে।

বলা হয়েছে, বান্দা আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বতের মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করা, ভয় করা। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে ভালবাসার অর্থ হলো, বান্দার প্রতি দয়াদ্র হওয়া, তার সম্পর্কে ভালো আশা করা। আবার কখনো এরূপ অর্থও হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার প্রশংসা করা।

আল্লামা কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যখন মহব্বতের অর্থ রহমত, নেক কাজের ইচ্ছা, আর প্রশংসা হয়, তখন তা আল্লাহ তা'আলার সন্তান সিফাতের সাথে সম্পৃক্ত হয়। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় এ বিষয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

হযরত ইরবাদ বিন সারীয়াহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّدِينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا
بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِذَعَةٍ وَكُلُّ بِذَعَةٍ ضَلَالَةٌ.

—তোমরা আমার সুনাতকে আঁকড়ে ধরো। আর আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুনাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, ধর্মের মধ্যে নতুনত্ব সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকো। কারণ প্রত্যেক অতিরিক্ত সংযোজন হলো বিদ'আত, আর সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।^১

^১. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী লুযুমিস্ সুন্নাহ, ১২:২১১, হাদিস নং : ৩৯৯১।

খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ইত্তিবায়া সুন্নাতিল খোলাফায়ির রাশিদীন, ১:৪৯, হাদিস নং : ৪২।

^১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১।

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় এসেছে- وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ¹ হযরত আবু রাফে' রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَذْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ.

-তোমাদের কারো অবস্থা যেনো এরূপ না হয় যে, তোমরা আরাম আয়েশে বসে থাকবে, আর তোমার নিকট আমার কোনো আদেশ আসবে যা আমি আদেশ করেছি, অথবা এমন কোনো আদেশ আসবে যা আমি নিষেধ করেছি, আর কেউ তৎক্ষণাৎ বলে দেবে যে, আমি জানি না, আমি যা আল্লাহর কিতাবে পাবো তার উপর আমল করবো।²

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, একদা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ করেন আর লোকদের ওই কাজের অনুমতিও দেন, তবুও কিছু লোক ওই কাজ থেকে বিরত থাকে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা জানার পর আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করার পর ইরশাদ করেন,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَزَهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدَّهُمْ لَهُ خَشْيَةً.

-লোকদের কী হয়েছে যে, তারা এমন বস্তু পরিহার করছে যা আমি গ্রহণ করেছি? আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে অত্যাধিক জ্ঞাত, আর আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করি।³

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الْقُرْآنَ صَعْبٌ مُسْتَضَعَبٌ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ. وَهُوَ الْحَكْمُ، فَمَنْ اسْتَمْسَكَ بِحَدِيثِي وَفَهِمَهُ وَحَفِظَهُ جَاءَ مَعَ الْقُرْآنِ، وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْقُرْآنِ وَحَدِيثِي خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، أَمَرْتُ أُمَّتِي أَنْ يَأْخُذُوا بِقَوْلِي، وَيُطِيعُوا أَمْرِي، وَيَتَّبِعُوا سُنَّتِي. فَمَنْ رَضِيَ بِقَوْلِي فَقَدْ رَضِيَ بِالْقُرْآنِ.

-ওই ব্যক্তির জন্য কুরআন কষ্টকর, যে কুরআনকে অপছন্দ করে। অথচ কুরআন সব বিষয়ের মীমাংসাকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, মুখস্থ করে, সে কিয়ামতের দিন কুরআনের সাথে উঠবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহের বিরোধিতা করবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমার উম্মাতকে আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেনো আমার আদেশ মান্য করে আর আমার বিধি-বিধানের অনুসরণ করে। আমার সুন্নাহের আনুগত্য করে। যে ব্যক্তি আমার বাণীর উপর সম্মত হবে সে যেনো কুরআন মজিদের উপর সম্মত হয়েছে।⁴

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ⁵ وَاتَّقُوا اللَّهَ ⁶ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

-আর যা কিছু তোমাদেরকে রাসূল দান করেন তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো! নিশ্চয় আল্লাহর শাস্তি কঠিন।⁷

আর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ اقْتَدَى بِي فَهُوَ مِنِّي وَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي.

খ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ, পৃ. ৩২, হাদিস নং : ১৪৬।

গ) তাহাভী : মুশকিলুল আসার, বাবু মা বালু ইয়াতানায্জাজ্জাহনা, ১৩:৯১, হাদিস নং : ৫১৩৮।

১. ক) খাতাবী : আল জামি' লি আখলাকির রাবী, ২:১৮৯।

খ) যাহাবী : আল-মিয়ান, ৫:৩৭২।

২. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:৭।

-যে আমার অনুসরণ করে সে আমার হয়ে গেলো। আর যে আমার সুন্নাতের বিরোধিতা করে সে আমার দলভুক্ত নয়।^১

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا.

-সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কালাম, আর সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বস্তু হলো দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা।^২

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ.

-ইলম তিন ধরনের। আর তা ছাড়া অবশিষ্ট বিষয়সমূহ মুহকাম আয়াত, প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত ও ন্যায়পূর্ণ ফরয আদায়ের জ্ঞান।^৩

হযরত হাসান বিন আবুল হাসান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَمَلٌ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلٍ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ.

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু তারগীব ফিন্ নিকাহ, ১৫:৪৯৩, হাদিস নং : ৪৬৭৫।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ইসতিহাবিন্ নিকাহ, ৭:১৭৫, হাদিস নং : ২৪৮৭।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু নাহী আনিত্ তাবতুল, ১০:৩০৯, হাদিস নং : ৩১৬৫।

ঘ) আহমদ ইবনে হামল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসু রজুলি মিনাল আনসার, ৪৭:৪৫১, হাদিস : ২২৩৭৬।

২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল ইকতিদায়ী বি সুনানি রাসূলিল্লাহ, ২২:২৪৬, হাদিস নং : ৬৭৩৫।

খ) আহমদ ইবনে হামল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি জাবির ইবনে আবদিল্লাহ, ২৮:৪৫৮, হাদিস নং : ১৩৯০৯।

গ) ইবনে বাত্তা : আল ইবানাতুল কুবরা, বাবু আহসানিল হাদিস..., ১:১৮৩, হাদিস নং : ১৭৭।

৩. ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী তা'আলিমিল ফরাযিজ, ৮:৮৬, হাদিস নং : ২৪৯৯।

খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ইজতিনাবির রাযি ওয়াল ক্রিয়াস, ১:৬২, হাদিস নং : ৫৩।

গ) তাবরানী : মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ইলম, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫১, হাদিস নং : ২৩৯।

(কারিয়ায়ে আদীলা হলো সম্পদ বন্টনের এ নীতিমালা যাতে কেউ বঞ্চিত না হয়।)

-সুন্নাত মোতাবেক অল্প আমল বিদ'আতযুক্ত অধিক আমল থেকে উত্তম।^১

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْخُلُ الْعَبْدَ الْجَنَّةَ بِالسُّنَّةِ تَمَسُّكَ بِهَا.

-আল্লাহ তা'আলা সুন্নাতের অনুসরণ অবিচলতার উপর ভিত্তি করে বান্দাহকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الْتَمَسْتُ بِسُتِّي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ مَائَةِ شَهِيدٍ.

-আমার উম্মত যখন ফিতনা-ফ্যাসাদে লিপ্ত হয়ে যাবে ওই সময় যে আমার একটি সুন্নাত আঁকড়ে থাকবে, সে একশ' শহীদে সাওয়াব পাবে।^২

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقُوا عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ أُمَّتِي تَفَرَّقُوا عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَقَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي.

-বনী ইসরাঈল বাহাস্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আমার উম্মত তিয়াস্তর দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একদল ব্যতীত সবাই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেলাম আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাঁরা কারা? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে পথটির উপর আজ আমি ও আমার সাহাবাগণ রয়েছেন।^৩

১. ক) আবদুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, ১১:২৯১।

খ) ইবনে বাত্তা : আল ইবানাতুল কুবরা, বাবু আমালিন্ কলীলিন ফিস্ সুনানি, ১:১৬৪, হাদিস নং : ১৫৮।

গ) বায়হাকী : তা'আবুল ইমান, বাবু ফফলু ফী মা ইয়াকুলুল উত্বাস, ২০:১২, হাদিস নং : ৯২০৩।

২. ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, বাবুল কিতাবাতি মিনাল মাফকুত, ২০:৫০।

খ) ইবনে বাত্তা : আল ইবানাতুল কুবরা, বাবুল মুতামাসসাকি বিস্ সুনানি, ১:১৫৭, হাদিস নং : ১৫১।

গ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবুল মিম মিন ইসমিহি 'মুহাম্মদ', ১২:১৫০, হাদিস নং : ৫৫৭২।

৩. ক) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ইফতিরাফিল উম্মাত, ১১:৪৯৪, হাদিস নং : ৩৯৮৪।

খ) আহমদ ইবনে হামল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবদিল্লাহ ইবনে মাসুদ, ৯:৯৬, হাদিস নং : ৪০৬১।

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ أَحْيَا سُنتِي فَقَدْ أَحْبَبَنِي وَمَنْ أَحْبَبَنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ.

-যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে জীবিত করলো, সে যেনো আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে বেহেশতে আমার সাক্ষী হবে।^১

হযরত আমর বিন আউফ মুযানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল বিন হারেস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন,

مَنْ أَحْيَا سُنَّةَ مَنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِذَعَةٍ ضَلَالَةٍ لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا.

-যে ব্যক্তি আমার পর আমার মৃত সুন্নাত জীবিত করবে, সে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সাওয়াবের অধিকারী হবে। অথচ এতে তাদের সাওয়াবের পরিমাণ একটুও কম হবেনা। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো ভ্রান্ত বিদ'আতের প্রচলন করে, তার জন্য সে পরিমান গুনাহ রয়েছে যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এতে তাদের গুনাহের পরিমাণ একটুও হ্রাস হবে না।^২

গ) আবদুর রায্যাক : আল মুসান্নাফ, ৩:৫৮৩।

ঘ) ইবনে বাত্তা : আল ইবানাতুল কুবরা, বাবু লি ইয়াতিনা আলা উম্মাতী..., ১:২৮১, হাদিস নং : ২৭৪।

ক) তিরমিযী : আস্ সুন্নান, বাবু মা জা'আ ফীল আখযি বিস্ সুন্নাত, ৯:২৮৯, হাদিস নং : ২৬০২।

খ) ইবনে বাত্তা : আল ইবানাতুল কুবরা, বাবু মা আহইয়াইয়া সুন্নাতী..., ১:৫৫, হাদিস নং : ৫২।

গ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবুল মিম মিন ইসমিহি 'মুহাম্মদ', ১৩:২৪৫, হাদিস নং : ৬১৬৭।

ঘ) তাবরানী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাত, ১:৩৮, হাদিস নং : ১৭৫।

ক) তিরমিযী : আস্ সুন্নান, বাবু মা জা'আ ফীল আখযি বিস্ সুন্নাত, ৯:২৮৮, হাদিস নং : ২৬০১।

খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুন্নান, বাবু মা আহইয়াইয়া সুন্নাতী..., ১:২৪৩, হাদিস নং : ২০৫।

গ) তাবরানী : মু'জামুল ক্ববীর, ১১:৪০৩।

ঘ) তাবরানী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাত, ১:৩৬, হাদিস নং : ১৬৮।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

مَا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ وَالْأُئِمَّةِ مِنْ اتِّبَاعِ سُنَّتِهِ وَالْإِقْتِدَاءِ بِهَذِهِ وَسِيرَتِهِ

সলফে-সালেহীন ও ইমামগণ কর্তৃক উদ্ধৃত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুসরণ, পথোদিশার অনুকরণ ও সীরাত প্রসঙ্গে

সলফে-সালেহীন ও ইমামগণ কর্তৃক উদ্ধৃত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুসরণ, পথোদিশার অনুকরণ ও সীরাত প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, খালিদ বিন রশিদ গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমরা কুরআন মজিদে ভয়কালীন নামায ও মুকিমের নামাযের আদেশ দেখতে পাই, কিন্তু কুরআনে মুসাফিরদের নামায কসর করার আদেশ পাই না। তারপরও মুসাফিরদের কসর করার আদেশ দেয়া হয়েছে কেন? তখন হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বললেন, إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ -হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! আল্লাহ তা'আলা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। আমরা দীন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। তাই আমরা তা করি যা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতে দেখেছি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে কসর করেছেন। তাই আমিও কসর করি।^১

হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلاَةُ الْأَمْرِ بَعْدَهُ سُنَّتًا. الْأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتِعْمَالٌ لِمَا لَطَاعَةُ اللَّهِ. وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ تَغْيِيرُهَا، وَلَا تَبْدِيلُهَا، وَلَا النَّظَرُ فِي رَأْيٍ مَنْ خَالَفَهَا

-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদীন যে আমলের প্রচলন করেছেন, সে অনুযায়ী আমল করা আল্লাহর কিতাব সত্যায়ন করা, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা ও দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি করা। আর না কারো এর বিপরীত কিছু করার অধিকার আছে। আর না তার অভিমতের বিরোধিতা করার অধিকার আছে।

^১ ইমাম মালেক : মুয়াত্তা, ১:১১২ হাদীস নং ১১৯।

মোদাকথা হলো, যে সুন্নাতের অনুসরণ করে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহকে সাহায্য করে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে সাহায্য করেন। আর যে সুন্নাতের বিরোধিতা করে, সে মু'মিনের বিপরীত পথে চলে। আল্লাহ তা'আলা তাকে তার পছন্দনীয় বস্তুর সাথে রাখবেন। আর তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তা অতি নিকৃষ্ট আবাসস্থল।

হযরত হাসান বিন আবিল-হাসান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, **عَمَلٌ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ** -সুন্নাতসম্মত অল্প আমল বিদ'আতযুক্ত অধিক আমলের চেয়ে উত্তম।

হযরত ইবনে শিহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জ্ঞানী বরণ্য ব্যক্তিগণ বলেন, সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার মধ্যে মুক্তি রয়েছে। হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রাদেশিক গভর্নরদের নিকট নির্দেশ জারী করেন, সুন্নাত ও ফরযসমূহ আদায় করবে আর আরবী ভাষা শিক্ষা করবে, মানুষ যখন কুরআনের আয়াত সম্পর্কে তোমাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে, তখন সুন্নাতের সাহায্যে তাদের মোকাবিলা করবে। কারণ সুন্নাত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কুরআন মজীদ ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে পারে।

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি যুলহুলায়ফা নামক স্থানে দুই রাক'আত নামায আদায় করার পর বললেন, আমি হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা করতে দেখেছি তাই করেছি।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি যখন হজ্জের কিরান আদায় করেন, তখন হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আপনি জানেন, আমি হজ্জের কিরান করতে নিষেধ করেছি। অথচ আপনি হজ্জের কিরান করেছেন। তখন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, **لَمْ أَكُنْ** -আমি ওইসব লোকদের মতো নই, যারা কারো কথায় হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ছেড়ে দেয়।^১ তিনি আরো অতিরিক্ত বলেন, আমি তো নবী নই, আমার নিকট তো ওহী আসে না, তবে আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব! আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের উপর আমল করবো।

১. ক) আহমদ : আল মুসনাদ, ২:৩৫৩ হাদীস নং ১১৩৯।

খ) আবু ইয়াল্লা : আল মুসনাদ, ১:৩৪১ হাদীস নং ৪৩৪।

হযরত ইবনে মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুন্নাতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা বিদ'আত সম্পর্কে বেশী চেষ্টা করা থেকে উত্তম।

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, সফরে চার রাক'আতের স্থলে দু'রাক'আতই আদায় করতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সুন্নাতের বিরোধিতা করলো, সে যেনো আল্লাহ তা'আলার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ فَإِنَّهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ عَبْدٍ عَلَى السَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ ذَكَرَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِ فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ أَبَدًا، وَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ عَبْدٍ عَلَى السَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ ذَكَرَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ فَاقْشَعَرَ جِلْدُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ إِلَّا كَانَ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ قَدْ يَسَّرَ وَرَقُهَا فَهِيَ كَذَلِكَ إِذْ أَصَابَتْهَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَتَحَاتَّ عَنْهَا وَرَقُهَا الْأَحْطُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتَّ عَنِ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا. فَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سَبِيلِ وَسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اجْتِهَادٍ فِي خِلَافِ سَبِيلِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ وَمُوَافَقَةٍ بِدْعَةٍ وَانْظُرُوا أَنْ يَكُونَ عَمَلُكُمْ - إِنْ كَانَ اجْتِهَادًا أَوْ اقْتِصَادًا - أَنْ يَكُونَ عَلَى مِنْهَاجِ الْأَنْبِيَاءِ وَسُنَّتِهِمْ.

-তোমরা সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো, কারণ যমীনে এমন কোনো বান্দা নেই, যে সুন্নাত পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে, আল্লাহ তা'আলার ভয়ে অশ্রুসিক্ত হয়, আর আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দেবেন? অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির শাস্তি ভোগ করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। যমীনে এমন কোনো বান্দা নেই, যে সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করবে, আল্লাহ তা'আলার ভয়ে প্রকম্পিত হবে, তার উদাহরণ হলো ওই বৃক্ষের মতো যে বৃক্ষের সব পাতা শুকিয়ে গেছে আর বৃক্ষ ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ বাতাস বয়ে গেল আর পাতাসমূহ ঝরে পড়লো। ওই ব্যক্তি সম্পূর্ণ ওই বৃক্ষের মতোই যার সব গুনাহ ঝরে পড়লো। কারণ সুন্নাতের অনুসরণে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা সুন্নাতের বিপরীত বিদ'আতে বেশী কষ্ট করার চেয়ে উত্তম। সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে, আমল কম কিংবা বেশী হোক, তবে তা আমিয়া আলাইহিমুস সালামের প্রদর্শিত পন্থায় হতে হবে।

হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কোনো কোনো আঞ্চলিক শাসনকর্তাগণ স্ব-স্ব এলাকার অবস্থা ও চোরের উৎপাত সম্পর্কে অবহিত করেন। আর তাঁর নিকট জানতে চাওয়া হয়, চোরদের গুধু সন্দেহের উপর থেফতার করা হবে? নাকি সুন্নাতে মোতাবেক দলিল প্রমাণ সাপেক্ষে? নাকি অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর থেফতার করে ব্যবস্থা নেয়া হবে? হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নির্দেশ জারী করেন, চোরদের সাক্ষ্য প্রমাণের পর সুন্নাতের নীতি পালন করে থেফতার করতে হবে। কারণ যার সংশোধন সত্যভিত্তির উপর হয় না, আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধন কখনো করেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী—

فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

—অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য ঘটে তবে তা মেটাতে আল্লাহ ও রাসূলের পানে প্রত্যাবর্তিত হও।^১

হযরত আতা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর মর্মার্থ হলো, ওই মতভেদকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিরোধ মীমাংসা করতে হবে।

হযরত ইমাম শাফেঈ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, لَيْسَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اتِّبَاعُهَا —সুন্নাতের অনুসরণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

একদিন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাজরে আসওয়াদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, إِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, —আমি জানি, তুমি একটি পাথর, তুমি না কারো উপকার করতে পারো, আর না কারো অপকার করতে পারো। যদি আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। একথা বলার পর তাতে চুম্বন করলেন।^২

^১ আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৫৯।

^২ ক) আহমদ : আল মুস্নাদ, মুস্নাদু উমর ইবনুল খাত্তাব, ১:৩৪ হাদীস নং ২২৯।

খ) আবু দাউদ : আস সুনান, বাবু ফি তাকবিলিল হাজর, ২:১৭৫ হাদীস নং ১৮৭৩।

গ) নাসায়ী : আস সুনান, ৫:১২৫ হাদীস নং ৩৯০৮।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা কে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর উম্মী নিয়ে একস্থানে প্রদক্ষিণ করছেন, লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি কেনো এরূপ করছেন? তিনি বললেন, لَا أَذْرِي إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْتُ فَعَلْتُ —আমি এ ছাড়া আর কিছু জানিনা যে আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ স্থানে এরূপ করতে দেখেছি, এ কারণে আমিও এ কাজ করছি।

হযরত আবু ওসমান হায়রী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি মৌখিক ও অনুমোদিত সুন্নাতকে নিজের প্রবৃত্তির উপর প্রাধান্য দেয়, সে উত্তম কাজ করতে শুরু করে। আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত প্রবৃত্তির অনুসরণকে প্রাধান্য দেয়, সে বিদ'আতের কাজ করে।

হযরত সাহল তাসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

أَصُولُ مَذْهَبِنَا ثَلَاثَةٌ - الْإِقْتِدَاءُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَخْلَاقِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَكْلِ مِنَ الْحَلَالِ. وَإِخْلَاصُ النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ.

—আমাদের মাযহাবের মূলনীতি তিনটি। (১) আখলাক ও আমলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ, (২) হালাল জীবিকা ডক্ষণ, (৩) সকল আমলের ক্ষেত্রে নিয়্যতের বিশুদ্ধতা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

—আর যেই সৎ কাজ আছে তা সেটাকে উন্নীত করে।^৩

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণই আমলে সালিহ।

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একদিন আমি একদল লোকের সাথে ছিলাম, লোকদের গোসল করার প্রয়োজন ছিলো। তারা নিজ নিজ কাপড় খুলে বিবস্ত্র হয়ে পানিতে নেমে পড়ে। আমি তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই হাদীসের উপর আমল করি যে,

^৩ আল কুরআন : সূরা ফাতির, ৩৫:১০।

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحِمَامَ إِلَّا بِمِثْرٍ.

-যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেনো বিবস্ত্র হয়ে গোসলখানায় প্রবেশ না করে।^১

আমি কাপড় পরিধান করে গোসল করি। সে রাতেই আমি স্বপ্নে দেখি, কেউ যেন আমাকে বলছে, হে আহমদ! তোমার প্রতি সুসংবাদ! সুন্নাতের উপর আমল করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর তোমাকে ইমাম মনোনীত করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করি, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

فِي مَخَالَفَةِ أَمْرِهِ وَتَبْدِيلِ سُنَّتِهِ ضَلَالٌ

তার নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ ও রীতির পরিবর্তন পথভ্রষ্ট হওয়া প্রসঙ্গে

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের বিরোধিতা ও তাঁর সুন্নাতের পরিবর্তন পথভ্রষ্টতা ও বিদ'আত। যার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা ও শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ

-সুতরাং যেন ভয় করে তারা, যারা রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে যে, কোনো বিপর্যয় তাদেরকে পেয়ে বসবে, অথবা তাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।^২

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ

مَصِيرًا ﴿٢٠﴾

-আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এরপরে যে, সঠিক পথ তার সম্মুখে স্পষ্ট হয়েছে এবং মুসলমানদের পথ থেকে আলাদা পথে চলে, আমি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেবো এবং তাকে দোযখে প্রবেশ করাবো, আর কতইনা মন্দ স্থান প্রত্যাবর্তন করার।^২

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন কবরের পার্শ্ব দিয়ে তাশরীফ নিয়ে যান, সেখানে তিনি উম্মাতের অবস্থা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন,

^১ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী দুখুলিল হাম্মাম, ৯:৪৯২, হাদিস নং : ৭২২৫।

খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু রুখসাতি ফী দুখুলিল হাম্মাম, ২:১৪৯, হাদিস নং : ৩৯৮।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৬:৪৬৮, হাদিস নং : ৭৯২৬।

ঘ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু তাবুতুত্ তাবুতুত্, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫১৪, হাদিস নং : ৪৪৭৭।

^২ আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৬৩।

^২ আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪/১১৫।

فَلْيَذَاقَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالَّ فَأَنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ، أَلَا هَلُمَّ، أَلَا هَلُمَّ فَيَقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ فَسُخَّحًا فَسُخَّحًا.

-কিয়ামত দিবসে আমার হাউজ থেকে কিছু লোককে এমনভাবে তাড়িয়ে দেয়া হবে, যেভাবে নেশাখস্থ উটকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। ওই অবস্থা দেখে আমি তাদের আহ্বান করে বলবো, এ দিকে এসো, এদিকে এসো, তখন আমাকে বলা হবে, এরা ওইসব লোক যারা আপনার পর আপনার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে (অর্থাৎ দ্বীনে নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করেছে)। তখন আমি বলবো, তোমরা আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও।^১

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

-যে ব্যক্তি আমার সূনাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সে আমার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।^২

আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

-যে আমার দ্বীনে ওই বিষয় সংযোজন করেছে যা তাতে ছিলো না, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।^৩

^১ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ইসতিহতাবু ইতালাতিল গুরাহ, ২:৫৩, হাদিস নং : ৩৬৭।

খ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু জামিউল অযু, ১:৭৮, হাদিস নং : ৫৩।

গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু যিকরিল হাউদি, ১২/৩৬৩, হাদিস নং : ৪২৯৬।

ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৮:৪৬৭, হাদিস নং : ৮৯২৪।

ঙ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ১:৮৩।

^২ ইবনে খুযাইমা : আস্ সহীহ, বাবু জামিউ আবওয়াবি আলল খুফফাইন, ১:৩৬১, হাদিস নং : ১৯৯।

^৩ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু নকহি আহকামিল বাতিল্লাহ, ৯:১১৮, হাদিস নং : ৩২৪২।

খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু তা'যিমী হাদিসী রাসূলিল্লাহ, ১:১৭, হাদিস নং : ১৪।

গ) তাবরী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ, পৃ. ৩১, হাদিস নং : ১৪০।

ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবুল বাকী আল-মুসনাদিস সাবেক, ৫২:৪৯৭, হাদিস নং : ২৪৮৪০।

ঙ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ১০:১১৯।

হযরত আবু রাফে' রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَذْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ.

-তোমাদের অবস্থা যেন এরূপ না হয় যে, তোমরা আরাম আয়েশের সাথে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, তোমাদের নিকট আমার প্রবর্তিত শরীয়তের আদেশ বা নিষেধ আসবে, যা আমি নিষেধ করেছি আর সে নিষেধাজ্ঞা ওই ব্যক্তির নিকট পৌঁছবে, আর সে বলবে, আমি জানি না। আমি কুরআনে যা পাবো তার অনুসরণ করবো।^১

হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় এসেছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.

-সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যা কিছু হারাম করেছেন তা আল্লাহ তা'আলার হারামকৃতের অনুরূপ।^২

একদা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাড্ডিতে লিখিত এক বিবরণ বকরীর উরুর হাড্ডি পেশ করা হয়।^৩ তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো সম্প্রদায়ের নির্বুদ্ধিতা বা পঞ্চভ্রষ্টতার জন্য

^১ ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফী লুযুমিস্ সুন্নাহ, ১২:২০৯, হাদিস নং : ৩৯৮৯।

খ) ইবনে বাত্তা : আল ইবানাতুল কুবরা, বাবু লা উলফিয়ান্না মুত্তাকিয়ান, ১:৬৬, হাদিস নং : ৬১।

গ) হাকেম : মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন, ১:৩৫০, হাদিস নং : ৩৩৯।

(কোনো কোনো দেশে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ভবিষ্যত বাণী অনুযায়ী আমলকারী লোক দেখা যায়। তারা হাদীস অস্বীকার করে বলছে যে, আমরা শুধু কুরআনের উপর আমল করবো। আরাম আয়েশে অবস্থান করার মর্মার্থ হলো হাদীস অস্বীকারকারীরা শাসক শ্রেণির সাথে সম্পর্ক রাখবে।)

^২ ক) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু তা'যিমী হাদিসী রাসূল, ১:১৫, হাদিস নং : ১২।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসীল মাকদাম ইবনে মা'দী, ৩৫:৫৫, হাদিস নং : ১৬৫৬৪।

গ) দারেমী : আস্ সুনান, বাবু সুন্নাতিল ক্বাযিয়া আলা কিতাবিল্লাহ, ২১:৪৪, হাদিস নং : ৫৯৭।

ঘ) তাবরানী : মুসনাদুশ্ শামেয়ীন, বাবু মা ইনতাহা ইলাইনা মিন মুসনাদি মুহাম্মদ ইবনে ওলীদ, ৬:৫৫, হাদিস নং : ১৯২১।

^৩ একবার বকরীর রানের হাড্ডিতে লিপিবদ্ধ ইহুদীদের এক বর্ণনা লেখা বকরীর রান নিয়ে হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অথবা হযরত হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অথবা হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হন। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা ইরশাদ করেন।

এটাই যথেষ্ট যে, সেই সম্প্রদায় স্বীয় নবীর আনীত জিনিষ থেকে বিমুখ হয়ে
অপর নবীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অথবা নিজের কিতাব ত্যাগ করে অন্য কিতাব
গ্রহণ করে। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়—

أُولَٰئِكَ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أُنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ

فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٦﴾

—আর তাদের জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয়, আমি আপনার উপর কিতাব
অবতীর্ণ করেছি। যা তাদের উপর পাঠ করা হচ্ছে? নিশ্চয় তাতে দয়া ও
উপদেশ রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।^১

হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, هَلْكَ الْمُتَنَطِّعُونَ শরীয়াতের
বিধান পালনে অতিরঞ্জনকারী ধ্বংস হয়ে গেছে।^২ হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু
তা'আলা আনহু বলেন, لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ بِهِ, তা'আলা আনহু বলেন, হযরত সালাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম যা আমল করেছেন তা আমি কখনো পরিত্যাগ করবো না। কারণ
আমার ভয় হয় যদি আমি ওই আমল ছেড়ে দিই তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো।^৩

^১. আল কুরআন : সূরা আনকাবুত, ২৯:৫১।

^২. মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু হালাকিল মুতানাত্‌ত্‌আউন, ১৩:১৫৪, হাদিস নং : ৪৮২৩। বাড়াবাড়ীর অর্থ
হলো সূনাত ছেড়ে দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে ধীনে নতুন কোন বিষয় সংযোজন করা। সেই ব্যক্তি ধ্বংসে
পতিত হবে। এজন্য যে, সে মনে করতেছে যে, সে বড় নেক কাজ করছে। পক্ষান্তরে সে নেকী ধ্বংস
ও গুনাহ অবধারিত হওয়ার কাজ করতেছে।

^৩. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবু ফরঈদিল খুসুস, ৪:৭৯ হাদীস নং ৩০৯২।

(ক) আহমদ : আল মুস্নাদ, মুস্নাদু আবি বকর সিদ্দীক, ১:৬ হাদীস নং ২৫।

(খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু কাওলিন নবী, ৩:১৩৮১ হাদীস নং ১৭৫৯।

(গ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ৩:১৪২ হাদীস নং ২৯৭০।

(ঘ) বায়হাকী : তয়াবুল ইমান, ৬:৪৯০ হাদীস নং ১২৭৩৪।

(ঙ) বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ১১:১৪৩।

(চ) আবু আওয়ানা: আল মুস্নাদ, ৪:২৫০ হাদীস নং ৬৬৭৭।

الْبَابُ الثَّانِي

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

فِي لُزُومِ حُبِّهِ ﷺ

হযরত ﷺ এর ভালবাসা অপরিহার্য হওয়া প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِنْ آلِهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَصُّوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠﴾

-আপনি বলুন! যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের
ভাইগণ, তোমাদের পত্নীগণ, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত ধন-
সম্পদ, তোমাদের সেই ব্যবসা-বাণিজ্য যার ক্ষতি হওয়ার তোমরা
আশঙ্কা করো এবং তোমাদের পছন্দের বাসস্থান- এসব বস্তু আল্লাহ ও
তাঁর রাসূলের এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট
প্রিয় হয়; তবে পথ দেখো আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ
তা'আলা পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।^১

উক্ত আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
মহব্বত করা ওয়াজিব। আর আল্লাহ উক্ত আয়াতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করার জন্য উৎসাহিত করে সতর্ক করেছেন। উক্ত আয়াত
একথার দলিল হয়েছে। আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে ভালবাসা ফরয ও অত্যাৱশ্যক। কারণ আল্লাহ তা'আলা লোকদের
সতর্ক করেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থেকে হযরত সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হতে হবে। আর তাদেরকে এ
কথায় ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে-

فَتَرْتَصُّوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

-তবে পথ দেখো আল্লাহ তাঁর নির্দেশ আসা পর্যন্ত।^২

১. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:২৪।

২. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:২৪।

উক্ত আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ফাসিক বলে উল্লেখ করেছেন।
তাদের ধমক দিয়ে বলেন, নিশ্চয় ওইসব লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে, আল্লাহ তাদের
হিদায়াতের পথ দেখাবেন না।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

-ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত মু'মিন হতে পারবেনা যতক্ষণ না আমি
তোমাদের নিকট তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের
চেয়ে অধিকতর প্রিয় না হই।^১ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা
আনহু থেকেও অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে বর্ণিত

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا
سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ
أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ.

-যার মধ্যে তিনটি বিষয় পাওয়া যাবে সে ঈমানের স্বাদ উপভোগ করতে
পারবে। এক. যার নিকট সব কিছুর চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক প্রিয় হবে। দুই. যে ব্যক্তি শুধু
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অপরকে ভালোবাসে। তিন. যে ব্যক্তি
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে, যেভাবে ইসলাম গ্রহণ করার
পর কুফরীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা অপছন্দ করে।^২

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু হুন্নির রাসূল, ১:২৪, হাদিস নং : ১৪।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ওজু'রী মুহাব্বাতির রাসূল, ১:১৫৬, হাদিস নং : ৬৩।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মিনহ, ৯:৫৫।

ঘ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু আলামাতিল ইমান, ১৫:২১১, হাদিস নং : ৪৯২৭।

২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু হালাওয়াতিল ইমান, ১:২৬, হাদিস নং : ১৫।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু বয়ানি খিসালি মানিত্ তাসাফা, ১:১৫২, হাদিস নং : ৬০।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মিনহ, ৯:৩৪, হাদিস নং : ২৪১৮।

ঘ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু আলামাতিল ইমান, ১৫:১৭০, হাদিস নং : ৪৯০২।

হযরত ওমর বিন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমার নিকট সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় কিন্তু প্রাণ অপেক্ষা নয়। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ عِنْدَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ. قَالَ عُمَرُ فَلَأَنْتَ الْآنَ
وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ.

-যতক্ষণ না আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রাণ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হবো ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ঈমানদার হতে পারবে না। তখন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ওই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় হয়েছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হ্যাঁ, উমর! এবার তুমি পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ও বিশ্বস্তচিত্ত হয়েছো।^১

হযরত সাহল তাসতারী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যে ব্যক্তি সর্বাবস্থায় নিজের উপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ন্ত্রণ অনুভব করেনা আর আপন সত্তাকে তাঁর পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণাধীন মনে করেনা, সে কখনো সূনাতের স্বাদ উপভোগ করতে পারবে না। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ.

-তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় না হবো।^২

^১ ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী আবদিদ্বাহ ইবনে হিশাম, ৩৬:৪৮৭, হাদিস নং ১৭৩৫৫।

খ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবুল মীম মিন ইসমিহি 'মুহাম্মাদ', ১৩:৩০, হাদিস নং ৫৯৫২।

গ) বায়হাকী : শু'আবুল ইমান, বাবু লা ইউমিনু আবদুন হাত্তা, ৪:৩৬, হাদিস নং ১৪৭৮।

ঘ) আবু নঈম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস সাহাবা, বাবু ফাতিমাতা বিনতে উতবা, ২৩:৪১১, হাদিস ৭১৫০।

^২ ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী আবদিদ্বাহ ইবনে হিশাম, ৩৬:৪৮৭, হাদিস নং ১৭৩৫৫।

খ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবুল মীম মিন ইসমিহি 'মুহাম্মাদ', ১৩:৩০, হাদিস নং ৫৯৫২।

গ) বায়হাকী : শু'আবুল ইমান, বাবু লা ইউমিনু আবদুন হাত্তা, ৪:৩৬, হাদিস নং ১৪৭৮।

ঘ) আবু নঈম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস সাহাবা, বাবু ফাতিমাতা বিনতে উতবা, ২৩:৪১১, হাদিস ৭১৫০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

فِي ثَوَابِ مُحِبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযুর ﷺ এর প্রতি মহব্বতের প্রতিদান প্রসঙ্গে

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন, مَا أَغْدَذْتَ لَهَا - তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? সে বললো, আমি কিয়ামতের জন্য নামায, রোযা, দান সাদকা ইত্যাদি বেশী সঞ্চয় করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, أَنْتَ مَعَ مَنْ - তুমি কিয়ামত দিবসে তারই সঙ্গী হবে যাকে তুমি ভালোবাসো।^১

হযরত সাফওয়ান বিন কুদামা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সবকিছু পরিত্যাগ করে হিজরত করে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার পবিত্র হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করবো। তিনি তখন তাঁর হাত প্রসারিত করে দেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে ভালোবাসি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ - মানুষ যাকে ভালবাসে তার সাথে থাকবে।^২ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ, হযরত আবু মূসা, আনাস ও আবু যর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম তা অনুরূপ বাণী করেছেন।

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু আলামাতি হক্কিল্লাহ, ১৯:১৪৮, হাদিস নং ৫৭০৫।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুল মার'যি মা'আ মান আহাক্বা, ১৩:৯১, হাদিস নং ৪৭৭৫।

গ) দারেমী : আস্ সুনান, বাবুল মার'যি মা'আ মান আহাক্বা, ৯:৫, হাদিস নং : ২৮৪৩।

ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আনাস ইবনে মালেক, ২৪:১৭৮, হাদিস নং : ১১৬৩২৩।

^২ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু আলামাতি হক্কিল্লাহ, ১৯:১৪৫, হাদিস নং ৫৭০২।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুল মার'যি মা'আ মান আহাক্বা, ১৩:৯৫, হাদিস নং : ৪৭৭৯।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ আন্বাল মার'রা মা'আ মান আহাক্বা, ৮:৩৯৫, হাদিস নং ২৩০৭।

ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আনাস ইবনে মালেক, ২৪:১২১, হাদিস নং : ১১৫৭৫।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, একদিন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'মার হাত ধরে বললেন,

مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي ذَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

-যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসবে, আর এ দু'সন্তান ও এদের মাতা-পিতাকে ভালোবাসবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতে আমার নৈকট্যভাজন হবে এবং আমার সম স্তরে অবস্থান করবে।^১

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করে, হে আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আমার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ আর আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হয়েছেন। আপনার স্মৃতি আমাকে বিচলিত করে। আপনার বিচ্ছেদ আমার নিকট অসহনীয়। আপনার দর্শন ব্যতীত আমি হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ করতে পারি না। এমন সময় হবে যখন আপনি এ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে পরপারে প্রস্থান করবেন। আপনার সেই বিচ্ছেদ যাতনা আমাকে ব্যাকুল করে তোলে। আপনি বেহেশতে চলে যাবেন। আপনি নবী-রাসূলদের সাথে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অবস্থান করবেন। আমি যদিও বেহেশতে প্রবেশের অধিকারী হই; তখন আমি আপনার দীদার পাবো কী? কারণ তখন আপনি আমার থেকে অনেক উচ্চ মর্যাদার মাকামে অবস্থান করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ

النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ^২ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

-আর যে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মান্য করে, তবে সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করবে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন- অর্থাৎ নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ, আর এরা কতই উত্তম সঙ্গী।^২

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তিকে ডেকে এনে অবতীর্ণ আয়াত পাঠ করে শুনান।

^১ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিবি আলী ইবনে আবী তালেব, ১২:১৯৫, হাদিস নং : ৩৬৬৬।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু ওয়া মিন মুসনাদি আলী ইবনে আবী তালেব, ২:৪৯, হাদিস নং : ৫৪৩।

^২ আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৬৯।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি ফিরাচ্ছিলেন না। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন এভাবে শোয়ান দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী দেখছেন? সে বললো! হে আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আমি আপনার দীদারের স্বাদ উপভোগ করছি। আমার হৃদয় ও দৃষ্টিকে আলোকিত করছি। আর ভাবছি কিয়ামত দিবসে আপনি হবেন অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তখন আমি আপনার দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকবো। তাঁর এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ.

-যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসবে, সে বেহেশতে আমার সাথে হবে।^১

^১ ক) সালেহী : সুবুলুল হদা ওয়ার রাশাদ, বাবু ফী লুযুমী মুহাক্কাতীহি ওয়া সাওয়াবিহা, ১১:৪৩০।

খ) আবদুর রহমান সুফুরী : বাবুল মুহাক্কাত, ১:৫৩।

গ) ইয়ুদীন : শরহ নাহজুল বালাগাহ, ৪:১০৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

فِيْمَا رُوِيَ عَنِ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ مَحَبَّتِهِمُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَشَوْقِهِمْ لَهُ

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ আলাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَأَى بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ.

-আমার উম্মাতের মধ্যে আমাকে বেশী মহব্বতরকারী হবে, ওইসব লোক, যারা আমার পরে আগমন করবে, তারা আমার যিয়ারত লাভের বিনিময়ে তাদের পরিবার ধন-সম্পদ সব কিছু বিসর্জন দেয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে।^১

অনুরূপ বর্ণনা হযরত আবু যর রাঃ আলাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর রাঃ আলাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত উমর রাঃ আলাহু তা'আলা আনহু এক বর্ণনায় বর্ণিত, لَأَنْتَ أَحَبُّ - হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় হয়েছে।^২ আর সাহাবায়ে কেরাম রাঃ আলাহু তা'আলা আনহু থেকে এ ধরনের মহব্বতের অবস্থা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আমর ইবনুল আস রাঃ আলাহু তা'আলা আনহু বলেন,

أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ

-আমার নিকট হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে প্রিয় আর কেউ ছিলো না।

^১ (ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফী মান ইউয়াদি রুইয়াতিনু নবী, ১৩:৪৬৩, হাদিস নং : ৫০৬০।
(খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৯:৭৩, হাদিস নং : ৯০৩০।
(গ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিক্রিল বয়ানি বি আন্না মান্ কুদ আমান্না, ২৯:৪৯২, হাদিস নং : ৭৩৫৪।
(ঘ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু তাসমিয়াতু মিন সুম্মিয়া আহলিল বদর, ৩:৩৭০, হাদিস নং : ৬২৭৫।

^২ (ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কায়ফা কানাত ইমীনুন নবী, ৮:১২৯ হাদীস নং ৬৬৩২।
(খ) তুবারনী : আল মু'জামুল কাবীর, ১৮:৮৩।
(গ) বায়হাকী : শুয়াবুল ইমান, ২:৫০৪ হাদীস নং ১৩১৭।
(ঘ) বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ১:৫১ হাদীস নং ২৩।

হযরত আবদাহ বিন্তে খালিদ বিন মা'দান রাঃ আলাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত খালিদ বিন মা'দান রাঃ আলাহু তা'আলা আনহু যখন বিছানায় আসতেন, তখন তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের সাথে আন্তরিক সাক্ষাতের কথা বলতেন। তাঁদের নাম উল্লেখ করে বলতেন। তাঁরা আমার মূল ও শাখায় পরিণত হয়েছেন। আমার অন্তর তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে। আমার অন্তর তাঁদের সাথে মিলিত হতে আরো বেশী উৎসুক হয়ে পড়েছে। হে আল্লাহ! তাড়াতাড়ি আমাকে মৃত্যু দান করুন। যাতে আমি আমার প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হতে পারি। তিনি এ ধরনের কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে যেতেন।

হযরত আবু বকর রাঃ আলাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরম্ভ করেন, ওই আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে নবী হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। নিশ্চয় আমার পিতা আবু কুহাফার ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা আপনার পিতৃব্য আবু তালিবের ইসলাম গ্রহণ আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিলো। আমার নয়নযুগল অধিক শীতল হতো যদি আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করতো। কারণ তাঁর ইসলাম গ্রহণে রয়েছে আপনার চোখের শীতলতা।

অনুরূপ বর্ণনা হযরত উমর রাঃ আলাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর রাঃ আলাহু তা'আলা আনহু হযরত আব্বাস রাঃ আলাহু তা'আলা আনহুকে বলতেন, আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা আপনাদের ইসলাম গ্রহণ আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। কারণ আপনাদের ইসলাম গ্রহণ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় ছিলো।

হযরত ইবনে ইসহাক রাঃ আলাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, এক আনসার রমনীর স্বামী, পিতা ও ভাই সকলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উহুদ যুদ্ধে যোগদান করে শাহাদাত বরণ করে। যখন মহিলার নিকট পিতা, ভাই ও স্বামীর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছে তখন সেই মহিলার একটাই প্রশ্ন ছিলো যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী অবস্থায় আছেন? লোকেরা বললো, তিনি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে ভালো আছেন, আপনি যেমনটি চেয়েছিলেন। মহিলা বললো, আমাকে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত হয়ে বললো,

-আপনি নিরাপদ থাকায় সকল বিপদই তুচ্ছ।^১

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিলো যে, আপনারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিরূপ ভালোবাসেন? হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন যে, **ثَانِ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَوْلَادِنَا** -আল্লাহর শপথ! হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতা-পিতামহ, স্বীয় মা এমনকি ভীষণ গরমের সময় কোমল পানীয় অপেক্ষাও অতি প্রিয় ছিলেন।

হযরত যায়িদ বিন আসলেহা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, এক রাতে খলিফা হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জনসাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি এক স্থানে দেখেন এক বৃদ্ধা বাতি জ্বালিয়ে কাপড় বুনতে বুনতে এ কবিতা আবৃত্তি করছে-

عَلِي مُحَمَّدٍ صَلَاةَ الْأَبْرَارِ صَلَّى عَلَيْهِ الطُّيُونُ الْأَخْيَارُ

উত্তমজনা পড়ছে দরুদ, তাঁর সকাশে দিবানিশি

পূণ্যবানদের দরুদ তব, হোক তাঁর সনে অহর্নিশি।

قَدْ كُنْتُ قَوَامًا بِكَ بِالْأَسْحَارِ بَالَيْتُ شِعْرِي وَالْمَنَابِتُ أَطْرَارُ

নামাযরত যামিনী কত, প্রত্যুষে আহা ক্ষমার তরে

আহ! মাধুর্য মোতির জানলে প্রকার, মনটি তবে যেত ভরে।

هَلْ تَجْمَعُنِي وَحَبِيبِي الدَّارِ

সান্নিধ্য কী নসিব হবে, জান্নাতে প্রিয় হাবীবের তরে?

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বৃদ্ধার কথা শুনে বসে পড়েন। চোখ বেয়ে বেরিয়ে এলো অশ্রুর স্রোত। এর পরের ঘটনা আরো দীর্ঘ।

এক বর্ণনায় এসেছে, একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা পা অবশ হয়ে যায়। একজন বললেন, **اَذْكُرْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ يَزُلْ عَنْكَ** যিনি আপনার নিকট অধিকতর প্রিয় তাঁকে স্মরণ করুন। দেখবেন এই মুহূর্তে

^১. বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়্যাত, বাবু কুন্নি মসিবাতিন বা'দিকা যালালুন, ৩:৩৬৪, হাদিস নং : ১১৯৩।

আপনি সুস্থ হয়ে গেছেন, তখন হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বললেন, **يَا مُحَمَّدَاةُ فَانْتَشَرْتَ** -ইয়া মুহাম্মাদাহ! এ কথা উচ্চারণ করা মাত্রই তার কষ্ট দূর হয়ে যায়।^১

যখন হযরত বিলাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অন্তিম সময় এসে যায়। তখন তাঁর পরিবারবর্গ চিৎকার করে বলতে শুরু করে আফসোস, তখন হযরত বিলাল বললেন, **وَاطْرَبَاةُ غَدَا أَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ** -কীরূপ আনন্দের কথা যে, আগামী দিন আমি আমার প্রিয় সন্তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের সাথে (ওফাতের পর) মিলিত হবো।

এক বর্ণনায় এসেছে, এক মহিলা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নিকট আবেদন করেন, দয়া করে একবার রওজা শরীফের পর্দা সরিয়ে দিয়ে আমাকে যিয়ারত করতে দিন। তিনি বলেন, আমি পর্দা সরিয়ে দিলাম। মহিলা রওজা শরীফ দেখে কাঁদতে কাঁদতে মৃত্যুবরণ করে।

যখন মক্কার মুশরিকরা হযরত যায়িদ বিন দাসানা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়। তখন আবু সুফিয়ান বিন হার্ব তাঁকে জিজ্ঞেস করে, হে যায়িদ! আমি তোমাকে শপথ দিয়ে বলছি, তুমি সত্যি করে বলো, এখন যদি তোমার স্থানে মুহাম্মদকে হত্যা করা হয় আর তুমি তোমার পরিবারের লোকদের নিকট ফিরে যাও, তাহলে কী তুমি আনন্দিত হবে না? হযরত যায়িদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার এ স্থানে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনবেন, তাঁর শরীরে একটি কাঁটাবিদ্ধ হবে, আর আমি আমার পরিবারের নিকট বসে থাকবো, এটা কখনো পছন্দ করি না।^২ একথা শুনে আবু সুফিয়ান বললো, **مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ أَحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا** -মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাঁকে যে রূপ ভালোবাসে এরূপ ভালোবাসতে আমি কাউকে দেখিনি।

^১. বুখারী : আদাবুল মুফরাদ, ১:২২১।

^২. একবার কতিপয় মক্কাবাসী প্রতারণা করে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে কতিপয় সাহাবায়ে কেঁরামকে সাথে নিয়ে যায়। আর তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ সাহাবীকে শহীদ করে ফেলে। শুধু হযরত খোবাব বিন আদী, যায়িদ বিন দাসানা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কায় নিয়ে কাফিরদের নিকট বিক্রয় করে দেয়। মক্কার কাফিররা বদরের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাদের ক্রয় করে ফাঁসি দেয়। উক্ত ঘটনাকে রাজীর ঘটনা বলা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, যখন কোনো রমণী মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হতো তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শপথ দিয়ে বলতেন, তুমি বল! আমি আমার স্বামীর উপর অসম্ভব হয়ে আসিনি, বা আমি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বসবাস করার ইচ্ছায়ও এখানে আসিনি, বরং আমি শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসায় আমার স্বদেশকে বিদায় জানিয়ে এখানে এসেছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা শাহাদাত বরণ করার পর হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা তাঁর লাশের নিকট দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য দোয়া করে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি যতদূর জানি আপনি রোযা পালনকারী, রাত্রিজাগরণকারী, আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলকে মুহাব্বতকারী ছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

فِي عِلَامَةِ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযুর ﷺ-র ভালবাসার নিদর্শন প্রসঙ্গে

স্মরণ রাখুন! যে বক্তি যে বস্তকে ভালবাসে সে তাকে প্রাধান্য দেয়, আর তাকে ভালবাসার চেষ্টা করে। নতুবা সে স্বীয় ভালবাসায় সত্যবাদী হয় না, বরং মিথ্যা দাবীদার হয়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে সত্যবাদী সেই যার মধ্যে মহব্বতের নিদর্শনাবলী পাওয়া যায়।

প্রথম নিদর্শন : প্রেমাম্পদের পূর্ণ আনুগত্য

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার নিদর্শনাবলীর প্রথম নিদর্শন হলো, তাঁর অকৃত্রিম আনুগত্য করা, তাঁর তরিকা অনুযায়ী আমল করা, তাঁর প্রতিটি বাণী ও কর্মের অনুসরণ করা, তিনি যেসব বিষয় আদেশ করেছেন সেগুলো যথাযথ পালন করা এবং যেগুলো নিষেধ করেছেন সেগুলো বর্জন করা। সুখ-সচ্ছন্দ্যে, দুঃখ-বেদনায় জীবনের যেকোন অবস্থায় নবী করীমের আমলের নিগড়ে নিজের চরিত্রকে রূপদান করা। এর সাক্ষী স্বরূপ এ আয়াত,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

-হে হাবীব! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর।^১

দ্বিতীয় নিদর্শন : প্রেমাম্পদকে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার নিদর্শন হলো, স্বীয় প্রবৃত্তির উপর ওই বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দেয়া যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আদেশ করেছেন, বা যা করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন তা পালন করা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ

أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

^১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১।

-আর এ সম্পদ সে সব লোকের জন্যও হক, যারা (হিজরতকারীরা) গৃহে (মদীনা শরীফে) প্রথম থেকে স্থায়ী এবং ঈমান সহকারে প্রতিষ্ঠিত, এঁদের নিকট যে লোকই হিজরত করে আসেন তাঁকে এঁরা ভালবাসেন (আত্মীয় মনে করেন)। আর যেসব কিছু হিজরতকারীদের করায়ত্ত হয় তা নিয়ে এঁদের অন্তরে ক্রেশ (ঈর্ষা কিংবা কার্পণ্য সৃষ্টি) হয় না। (কেবল তা নয় বরং এঁরা তাঁদেরকে) নিজেদের চেয়েও বেশী গুরুত্ব দেন, যদিও তাতে নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয়তা থেকেও থাকে।^১

তৃতীয় নিদর্শন : আল্লাহ তা'আলার সম্ভূষ্টির আশায় অপরের অসম্ভূষ্টির ভয় না করা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের তৃতীয় নিদর্শন হলো আল্লাহ তা'আলার সম্ভূষ্টির আশায় অপরের অসম্ভূষ্টির ভয় না করা।

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يَا بُنَيَّ إِنَّ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُصَيَّ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَأَفْعَلْ ثُمَّ قَالَ لِي يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحْبَبَنِي وَمَنْ أَحْبَبَنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ.

-হে বৎস! তোমার যদি সামর্থ্য হয় সকাল-সন্ধ্যা যে কিছুর প্রতি হিংসা-ক্রেশ থেকে পবিত্র থাকতে, তবে তাই কর। অতঃপর বললেন, বৎস্য হে! এটি হল আমার সুনত। যে ব্যক্তি আমার সুনতকে সঞ্জীবিত রাখল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসল, সে বেহেশতে আমার সঙ্গে থাকবে।^২

সুতরাং যে ব্যক্তি এই রূপ গুণাবলীর অধিকারী হবে, সে আল্লাহ ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের পূর্ণাঙ্গ দাবীদার হবে। আর যে ব্যক্তি এই গুণাবলীর বিরোধিতা করবে সে স্বীয় মহব্বতের দাবীতে অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। তবুও মহব্বতকারীদের নাম থেকে তার নাম বাদ পড়বেনা। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসুলের মহব্বতকারী থাকবে। যদিও তার ভালবাসা অপূর্ণাঙ্গ হবে। এর প্রমাণ হলো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই বর্ণনা যা তিনি ওই

^১ আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:৯।

^২ ক) সালেহী : সুবুলুল হদা ওয়ার রশাদ, বাবু ফী লুযুমী মুহাক্কাতীহি ওয়া সাওয়াবিহা, ১১:৪৩০।

খ) আবদুর রহমান সাদুন্নী : বাবুল মুহাক্কাত, ১:৫৩।

গ) ইয়যুদ্দীন : শরহ নাহজুল বালাগাহ, ৪:১০৫।

ব্যক্তি সম্পর্কে করেছেন, যার উপর মদ্যপানের অপরাধের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। আর তখন কোন কোনো সাহাবা তার উপর অভিশাপ দেয়া শুরু করে, তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تَلْعَنُوا فَإِنَّهُ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

-তার প্রতি অভিসম্পাত করো না, কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসে।^১

চতুর্থ নিদর্শন : নবী দর্শনের তীব্র বাসনা

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের নিদর্শনসমূহের এক নিদর্শন হলো অধিক পরিমানে তাঁকে স্মরণ করা। কথিত আছে, ذِكْرُهُ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرُهُ হলো অধিক পরিমানে তাঁকে স্মরণ করা। কথিত আছে, 'যে যাকে ভালবাসে সে তার স্মরণ বেশী বেশী করে থাকে। স্বীয় প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য উদ্যম হয়ে থাকে। আশ'আরীদের বর্ণনায় বর্ণিত, তাঁরা যখন মদীনাতে আসতো তখন এ কাসিদা পাঠ করতো-

غَدَا نَلْقَى الْأَجِبَةَ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ

কী আনন্দ! নূর নবী মুহাম্মদ ও তাঁর প্রেমিক-সাহাবাদের সাথে সাক্ষাত হবে। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ সম্পর্কিত অভিমত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ কথা হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শাহাদাতের পূর্বে বলেছেন। হযরত মা'আদান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে আমি যা বর্ণনা করেছি। তা এরূপ হয়েছে।

পঞ্চম নিদর্শন : অধিকহারে প্রেমাস্পদের আলোচনা করা

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের নিদর্শনসমূহের এক নিদর্শন হলো, অধিক পরিমাণে তাঁর আলোচনা করা। আর তাঁর সম্পর্কে আলোচনার সময় তাঁর প্রতি সম্মান বিনয় প্রকাশ করা। আর তাঁর মুবারক নাম শুনে সম্মান ও বিনয় প্রকাশ করাও তাঁর প্রতি ভালোবাসার এক অন্যতম নিদর্শন।

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ৬৭৮০।

খ) আবদুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, ৭:৩৮১।

সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ বিন আল হোমার একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁকে বার বার নেশাঘস্ত অবস্থায় ধৈর্যতার করে শাস্তি দেয়া হয়। একবার তাকে নেশাঘস্ত অবস্থায় ধৈর্যতার করে আনা হয়। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাঁর উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার উপর অভিসম্পাত করতে নিষেধ করেন। (বায়হাকী) সুতরাং বুখা গেল, কবির গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে কোনো মুসলমানকে অভিশাপ দেয়া জাযিয নাই।

হযরত ইসহাক নুজায়বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর সাহাবীগণ তাঁর মুবারক নাম শুনে সীমাহীন ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। আর তাঁদের শরীরের কেশ দাঁড়িয়ে যেতো। রাসূলের বিরহ-বেদনায় তাঁরা কান্নায় আবেগাপ্ত হয়ে যেতেন। অধিকাংশ তাবেই ও তাবে-তাবেদগণের এরূপ অবস্থা হতো।

ষষ্ঠ নিদর্শন : প্রেমাস্পদের প্রিয় ও পছন্দনীয়দের ভালবাসা

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের নিদর্শনসমূহের এটাও এক নিদর্শন যে, তাঁকে ভালোবাসার কারণে প্রিয় ও পছন্দনীয়দের তথা তাঁর পবিত্র আহলে বায়ত, তাঁর আনসার, মুহাজির সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসা। আর যে ওই সম্মানিত বরণ্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, গালি দেবে, সমালোচনা করবে, সাথেও শত্রুতা পোষণ করবে, তাঁদের ঘৃণা করবে। কারণ, -যে যাকে ভালোবাসে সে তাঁর প্রিয় ও পছন্দনীয়কেও ভালবাসে।

এ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত।

ক. হাসানাইনে কারীমাইনের ভালবাসা

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا.

-হে আল্লাহ! আমি তাঁদের উভয়কে ভালোবাসি। আপনিও তাদের ভালোবাসুন।^১

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأُحِبُّهُ وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ.

-হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি, তাই যে তাঁকে ভালোবাসে আপনি তাকেও ভালোবাসুন।^২

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মানাক্বিল হাসান ওয়াহু হুসাইন, ১২:৮৯, হাদিস নং : ৩৪৬৪।

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিল হাসান ওয়াহু হুসাইন, ১২:২৩৯, হাদিস নং : ৩৭০২।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুনসাদি আবী হুরাইরা, ১৯:৪২৬, হাদিস নং : ৯৩৮৩।

ঘ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিল কুরাইশ, পৃ. ৩৪৪, হাদিস নং : ৪১৫৬।

^২ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু সাখাতি লিস্ সিবিয়ান, ১৮:২৩৭, হাদিস নং : ৫৪৩৪।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي. وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ. وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ.

-যে তাঁদের উভয়কে ভালোবাসে, সে যেন আমাকে ভালোবাসে। যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন আল্লাহকে ভালোবাসে। আর যে তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, সে যেন আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে। আর যে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

খ. সাহাবায়ে কেরামের ভালবাসা

এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

-আমার সাহাবাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তাঁদেরকে তোমাদের সমালোচনার পাত্র বানিও না। তাঁদের সাথে ভালবাসা আমারই কারণে। তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ-বোধও হবে আমারই কারণে। অতএব, যে ব্যক্তি সাহাবাদের মনে কষ্ট দেবে, সে আমাকেই ব্যথা দেবে। আর যে ব্যক্তি আমাকে ব্যথা দেবে, সে আল্লাহকে ব্যথা দেবে। আর তিনি তাকে পাকড়াও করবেন।^১

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফাযায়িল হাসান ওয়াহু হুসাইন, ১২:১৫৮, হাদিস নং : ৪৪৪৫।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিল হাসান ওয়াহু হুসাইন, ১২:২৫৩, হাদিস নং : ৩৭১৬।

ঘ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফাযায়িল হাসান ওয়াহু হুসাইন, ১:১৬৩, হাদিস নং : ১৩৯।

ঙ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুনসাদি আবী হুরাইরা, ১৫:১৩২, হাদিস নং : ৭০৯১।

চ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিল কুরাইশ, পৃ. ৩৩৯, হাদিস নং : ৬১৩৩।

^১ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী মান সাক্বা আস্ সাহাবীন নবী, ১২:৩৬২, হাদিস নং : ৩৭৯৭।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী আবদুল্লাহ ইবনে মাগফাল মুযনী, ৪২:৪, হাদিস নং : ১৯৬৪১।

গ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিল কুরাইশ..., পৃ. ৩০৯, হাদিস নং : ৬০০৫।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي.

-ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা। যা তাঁর অপছন্দ ও ক্রোধের কারণ হয়, তা আমারও অপছন্দ ও ক্রোধের কারণ হয়।^১

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা বিন যায়িদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বলেন,

أَحِبِّي فَإِنِّي أَحِبُّهُ.

-তুমি উসামাকে ভালোবাসো, কারণ আমি তাকে ভালোবাসি।^২

(গ) আনসারদের প্রতি ভালবাসা

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ.

-ইমানের নিদর্শন হলো আনসারদের ভালোবাসা। আর তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা কপটতার নিদর্শন।^৩

সপ্তম নিদর্শন : আরবদের প্রতি ভালবাসা-বোধ

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় এসেছে,

مَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِغْضِي أَبْغَضَهُمْ.

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মানাক্বিবি ফাতিমা, ১২:১১৫, হাদিস নং : ৩৪৮৩।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফাওয়াযিলি ফাতিমা বিনতে নবী, ১২:২০২, হাদিস নং : ৪৪৮২।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী ফযলি ফাতিমা, ১২:৩৬৮, হাদিস নং : ৩৮০২।

ঘ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফযলিল ফাতিমা, ৬:১৪৬, হাদিস নং : ১৯৮৮।

ঙ) আহমদ ইবনে হামল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী আবিদ্বাহ ইবনে যুবাইর, ৩২:৩৪৯, হাদিস : ১৫৫৩০।

চ) তাবরিয়ী : মিশকাভুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি কুরাইশ, পৃ. ৩৩৮, হাদিস নং : ৬১৩০।

^২ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিবি আসামা ইবনে যায়েদ, ১২:৩০১, হাদিস নং : ৩৭৫৪।

খ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরিল আমরি বি মুহাক্বাতি আসামা, ২৯:১৫৩, হাদিস : ৭১৮৩।

গ) তাবরিয়ী : মিশকাভুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি কুরাইশ, পৃ. ৩৪৬, হাদিস নং : ৬১৬৭।

^৩ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু আলামাতিল ইমানি হক্কিল আনসার, ১:২৮, হাদিস নং : ১৬।

খ) আহমদ ইবনে হামল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আনাস ইবনে মালিক, ২৪:৪১৩, হাদিস : ১১৮৬৭।

গ) তাবরিয়ী : মিশকাভুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি কুরাইশ, পৃ. ৩৫৫, হাদিস নং : ৬২০৬।

ঘ) বায়হাকী : তা'আবুল ইমান, বাবু আয়াতিল ইমানি হক্কিল আনসার, ৪:৪০, হাদিস নং : ১৪৮২।

-যে ব্যক্তি আরবদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে, সে তা আমার ভালবাসার কারণেই করে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, সে তা আমার সাথে শত্রুতা ভাবাপন্ন হওয়ার কারণেই করে।^১

অষ্টম নিদর্শন : নবীপাকের পছন্দনীয় বস্তুগুলোর প্রতি ভালবাসা-বোধ

বস্তুত যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে সে ওই জিনিষকেও ভালোবাসে যা তার প্রেমিক ভালোবাসে। সলফে-সালেহীন ইমামদের অভ্যাস ছিলো এরকম। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা পছন্দ করতেন তাঁরাও তা পছন্দ করতেন। এমনকি ছোটখাটো মুবাহ বা জায়িয় কাজসমূহে তাঁরা নিজেদের জন্য তা পছন্দ করতেন এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, **حِينَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَصْعَةِ فَمَا زِلْتُ أَحِبُّ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمٍ مِّنْذُ** আমি দেখতে পেলাম যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে কদুর টুকরা খুঁজছিলেন। সে দিন থেকে আমি আমার খাবারের তালিকায় কদুকে প্রধান ভাবে সন্নিবেশ করে নেই।^২

একদিন হযরত হাসান বিন আলী, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও হযরত জা'ফর বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রমুখ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচারিকা হযরত সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা^৩ এর নিকট এসে তাঁকে বলেন যে, আমাদের জন্য ওই খাবার তৈরী করুন যে খাবার হযুর এর অতিশয় পছন্দের ছিলো।

হাদীসে পাকে এসেছে, **وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَلْبَسُ الثَّعَالَ السَّيِّئَةَ وَيَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ إِذْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ نَحْوَ ذَلِكَ** -হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সর্বদা বাসন্তি রঙের জুতো এবং হলদে রঙের পোশাক পরিধান করতেন। কারণ হল এ দুটো রঙ হযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় ছিল।^৪

^১ সুযুতী : মানাহিলুস সাফা, পৃষ্ঠা-৬৩।

^২ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, ১৮:১০৭।

^৩ হযরত সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবাদকৃত দাসী ও হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা^৪র ধাত্রী এবং হযরত ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহুর আয়া ছিলেন।

^৪ আহমদ : আল মুসনাদ, ২:৬৬।

নবম নিদর্শন : নবীপাকের দুশমনদের সাথে শত্রুতা-পোষণ

হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাবতের নিদর্শনের এক নিদর্শন হলো যারা হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘৃণা করে তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করা ও তাদের ঘৃণা করা। যারা হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনাতের বিরোধিতা করে, আর ধীনের মধ্যে এমন কিছু সম্পৃক্ত করে যা মূলত ফেৎনা সৃষ্টির কারণ হয় তাদের পরিত্যাগ করা। তাঁর প্রবর্তিত শরীয়তের বিরোধিতাকারীদের অপছন্দ করা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে—

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ

حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

—(হে হাবীব!) যারা আল্লাহ ও পরকাল দিবসে পূর্ণ আস্থা সহকারে ঈমান রাখে আপনি তাদেরকে এমন পাবেন না যে, তারা সে সব লোকের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের বিরোধিতা করে।^১

তাঁরা হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। যারা তাদের প্রিয়জনকে হত্যা করেছেন। আর হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্ভ্রান্তি লাভের জন্য স্বীয় পিতা ও পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। মুনাফিক সর্দার উবায়ের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় পিতার ব্যাপারে হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করেন যে, لَوْ شِئْتُ لَأَتَيْتُكَ بِرَأْسِهِ—যদি আপনি চান তাহলে আমি আমার পিতার মাথা কর্তন করে আপনার সামনে পেশ করে দেবো।

দশম নিদর্শন : পবিত্র কুরআন মাজিদকে ভালবাসা

কুরআন শরীফের প্রতি ভালবাসা-বোধও প্রকৃত প্রস্তাবে নবী-প্রীতিরই পরিচায়ক। কেননা, হেদায়ত-সমৃদ্ধ এই মহা কিতাবের হেদায়তের পাঠ দিয়েছেন হযরত পাক সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই। নবী পাকের নূরানী সত্তা মোবারক ছিল কুরআনী শিক্ষার বাস্তব নমুনা। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন—

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ.

—হযরত পাক সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র মোবারক ছিল কুরআনী শিক্ষার প্রায়োগিক ব্যাখ্যা এবং এরই বাস্তব প্রতিফলন।^২

^১ আল কুরআন : সূরা মুজাদালাহ, ৫৮:২২।

^২ ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী আয়শা, ৫০:১১৬, হাদিস নং : ২৩৪৬০।

গ্রন্থকার কুরআন প্রীতির মর্ম প্রসঙ্গে বলেন,

وَحُبُّهُ لِلْقُرْآنِ تِلَاوَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَتَفَهُمُهُ وَحُبُّ سُنَّتِهِ وَيَقِفُ عِنْدَ حُدُودِهَا.

—পবিত্র কুরআনের প্রতি ভালবাসা-বোধ মানে হচ্ছে, প্রত্যহ এর তেলাওয়াত করা। কুরআনের অর্থ বুঝে এর হুকুম-আহকাম অনুযায়ী আমল করা। কুরআন-কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্জন করা। এর তরীকাকে ভালবাসা আর এর সীমা অতিক্রম না করা।

হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসার নিদর্শন হলো কুরআনকে ভালবাসা। আর কুরআনকে ভালবাসার নিদর্শন হলো, হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসা। আর হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসার নিদর্শন হলো আখিরাতকে ভালবাসা। আর আখিরাতকে ভালবাসার নিদর্শন হলো দুনিয়ার প্রতি বিরাগভাজন হওয়া। আর দুনিয়ার প্রতি বিরাগভাজন হওয়ার নিদর্শন হলো, সম্পদ উপার্জন করতে হবে ততটুকু, যতটুকু দুনিয়ার জন্য একান্ত প্রয়োজন, আর তা যেন আখিরাতের কল্যাণ লাভে সহায়ক হয়।

হযরত ইবনে মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, لَا يَسْأَلُ أَحَدٌ عَنْ نَفْسِهِ إِلَّا الْقُرْآنَ فَإِنْ كَانَ يَجِبُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَجِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ—যদি কেউ নিজের ভালো মন্দ জানার ইচ্ছে করে তাহলে তার কর্তব্য হলো কুরআনের মধ্যে তা খোঁজ করা। যদি সে কুরআনকে ভালোবাসে তাহলে মনে করবে ওই ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।^৩

একাদশ নিদর্শন : নবীপাকের উম্মতদের মঙ্গল-কামনা

নবী-প্রেমের আর এক নিদর্শন হল, মুসলিম উম্মাহর প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা। ভাল ভাল বুলি দিয়ে তাঁদের স্মরণ করা, তাঁদের মঙ্গল কামনা করা এবং উপকারের মনোভাব রাখা। তাঁদের পরিশুদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা। তাঁদের প্রতি ঘৃণা, তুচ্ছ-বোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ইত্যাদি নবী-প্রেমের পরিপন্থী। মুসলিম উম্মাহর প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা-বোধ সুনতে নববীরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও মুসলিম উম্মাহর প্রতি অতিশয় সহানুভূতিশীল ও অনুগ্রহ-প্রবণ ছিলেন।

খ) তাবরানী : মু'জামুল কাবীর, বাবুল কিতাবাত মিনাল মাফকুহ, ২০:২৫৫।

ঘ) বায়হাকী : ৩'আবুল ইমান, বাবু কানা খুলুকুহ মিনাল কুরআন, ৩:৪৬৪, হাদিস নং : ১৪১০।

ক) ইবনে জু'আদ : আল মুসনাদ, ১:২৯০ হাদীস নং ১৯৫৬।

খ) বায়হাকী : ৩'আবুল ইমান, ৩:৩৯৪ হাদীস নং ১৮৬১।

গ) তাবরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ৯:১৪২।

দ্বাদশ নিদর্শন : বিস্তৃতির দরবেশী বেশ পরিগ্রহ করা

নবী-প্রেমের এক অন্যতম নিদর্শন হল, ভালবাসার দাবীদাররা এবাদত বন্দেগী করবে, পরহেযগারী বজায় রাখবে এবং বিস্তৃতির বেশ পরিগ্রহ করবে। অর্থাৎ সূফী ধরনের দরবেশী জীবন গ্রহণ করবে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলেন,

إِنَّ الْفَقْرَ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنْكُمْ أَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ عَلَى أَعْلَى الْوَادِي وَمِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهِ.

-যে ব্যক্তি আমার সাথে ভালবাসা রাখে, অভাব-অনটন ও গরীব অবস্থা তার দিকে এমনভাবে ধাবিত হয়, যেভাবে পানি ধাবিত হয়ে আসে পাহাড়ের ঢালু দিয়ে।^১

হযরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি হযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরণ্য করলেন, আমি আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি বলছ ভেবে দেখ। ব্যক্তিটি দু' দু'বার, তিন তিন বার একই কথা বললেন। অতঃপর, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِذْ لِلْفَقْرِ تَحْفَافًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ.

-যদি তুমি আমাকে ভালবাস, তবে গরীব অবস্থার জন্য প্রস্তুতি নাও। অতঃপর উক্ত কথাগুলো বললেন, যা তিনি আবু সাঈদ খুদরীকে উপরিউক্ত হাদীসে বর্ণনা করেছেন।^২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

فِي مَعْنَى الْمَحَبَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقِيقَتِهَا

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসার মর্মার্থ ও এর স্বরূপ প্রসঙ্গে

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বতের মর্মার্থ ও এর হাকীকত, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতের মর্মার্থ ও ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদগণের মতভেদ রয়েছে। তাঁদের বর্ণনায় যদিও বৈপরীত্য ও ভিন্নতা রয়েছে, কিন্তু হাকীকত হলো তাঁদের মর্মকথায় মতভেদ নেই। বরং অবস্থানভেদে মতভেদ রয়েছে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা ও তাঁর অনুসরণ করার উপমা যেন আল্লাহ তা'আলার এ বাণী-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿৩১﴾

-হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, হে মানবকুল! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকো তবে আমার অনুসারী হয়ে যাও, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।^১

কোনো কোনো আলেমের অভিমত হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের মর্মার্থ হলো, তাঁকে সাহায্য করার ইচ্ছা করা, তাঁর সুনাতের অনুসরণ করা, আর তাঁর বিরোধিতার ব্যাপারে ভীত থাকা।

কেউ কেউ বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বতের মর্মার্থ হলো, সদাসর্বদা তাঁকে স্মরণ করা।

অপর একদল আলেমের অভিমত হলো, প্রিয়তমকে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া।

অপর একদল আলেমের মতে মহাব্বত হলো, প্রেমাস্পদের প্রতি অনুরাগ ও আসক্তি।

অপর একদল আলেমের অভিমত, মহব্বতের মর্মার্থ হলো, নিজের হৃদয়কে আল্লাহ তা'আলার মর্জি মোতাবেক বানিয়ে নেয়া। আর আল্লাহ তা'আলা যা পছন্দ করেন তা পছন্দ করা। আর আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা।

^১. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবু সাঈদিনিখ খুদরী, ২২:৪৯৭, হাদিস : ১০৯৫২।

^২. তিরমিযী : আস সুনান, ৪:১৫৪ হাদীস নং ২৩৫০।

^১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১।

অন্য একদল আলেমের অভিমত অনুযায়ী মহব্বতের মর্মার্থ হলো, প্রিয়তমের ইচ্ছানুযায়ী নিজের স্বভাবকে ধাবিত করা।

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের দ্বারা মহব্বতের প্রতিদান ও প্রতিফলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহব্বতের হাকীকত বা প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি। মহব্বতের হাকীকত হলো, যা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হয়, তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। আর এই সাদৃশ্যতা হয়তো এজন্য হবে যে, তা পাবার পর তার স্বাদ উপভোগ করা হবে। যেমন আকর্ষণীয় চেহারার প্রতি আগ্রহের সাথে দৃষ্টিপাত করা, আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, সুস্বাদু পানাহারের স্বাদ গ্রহণ করা। উক্ত বস্তুসমূহ যে কোনো সুষ্ঠু বিবেকবান ব্যক্তি পছন্দ করে। কারণ ওইসব বস্তু মানবস্বভাবের কাছে আকর্ষণীয়। তাই মানুষের বুদ্ধি তার সূক্ষ্ম রহস্য অনুভব করতে সক্ষম হয়। যেমন সৎকর্মশীল ব্যক্তি, জ্ঞানী, সুখ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ও ওইসব লোক যাদের প্রতি স্বাভাবিকভাবে মানুষ আকৃষ্ট হয়। কেননা তাদের প্রশংসনীয় গুণাবলী মানুষের নিকট পছন্দনীয়। আর পছন্দের সীমা অতিক্রম করে প্রতিহিংসায় পরিণত হয়। এ কারণে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে শুরু করে। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের অনুসরণে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যার ফলে তারা মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। ইজ্জত-সম্মান ভুলুঠিত করে ও প্রাণসমূহকে ধ্বংস করে বসে। আবার কখনো আনুকূল্যপূর্ণ ভালবাসার কারণে অনুগ্রহ ও পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। কারণ এটা স্বাভাবিক যে, মানুষ তাকে ভালোবাসে যে তার প্রতি ইহসান করে। যেহেতু তোমাদের নিকট একথা স্পষ্ট হয়ে গেল সেহেতু তোমরা ওইসব বিষয়ের উপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবে। তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে, ভালবাসা সৃষ্টিকারী উক্ত তিন বস্তুই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে বিদ্যমান পাওয়া যায়। তাঁর বাহ্যিক আকৃতিগত সৌন্দর্য, তাঁর অভ্যন্তরীণ চারিত্রিক পূর্ণতা সম্পর্কে আমি ইতোপূর্বে আমার গ্রন্থের প্রথম অংশে আলোচনা করেছি। তার পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। আর উম্মাতের প্রতি তাঁর ইহসান ও প্রতিদানের বিষয়ও আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উম্মাতের প্রতি স্নেহপরায়ন, দয়া, অনুকম্পা, তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন ও জাহান্নাম থেকে পরিভ্রাণের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তিনি উম্মাতের প্রতি দয়া অনুকম্পা প্রদর্শনকারী ও বিশ্বজগতের জন্য মহান অনুগ্রহ, জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী, আল্লাহর শান্তির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনকারী, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি মানুষকে আহ্বানকারী, আলোকোজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ। তিনি মানুষের সামনে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ পাঠকারী। তিনি মানুষের অন্তর পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধকারী। মানুষকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দানকারী। মানুষকে হিদায়াতের পথে পরিচালনাকারী। তিনি

মু'মিনদের প্রতি মহান অনুগ্রহকারী, মুসলমানের জন্য তাঁর থেকে বড় উপকারী ও অনুগ্রহকারী আর কে হতে পারে? কারণ তাঁর হিদায়াতের কারণে বিশ্ববাসী জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তিনিই মানুষকে সফলতা ও কল্যাণের প্রতি আহ্বান করেছেন। তিনি আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সেতুবন্ধন হয়েছেন। তাদের জন্য শাফায়াতকারী, ও সাক্ষ্যদাতা এবং অনন্তকালীন ও চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভের মাধ্যম হয়েছেন।

এখন তোমাদের নিকট এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, ওইসব গুণাবলীর কারণে তিনি এ বিষয়ের যোগ্য হয়েছেন, মহব্বতের উপযুক্ত হয়েছেন এবং তাঁকে ভালবাসা অপরিহার্য হয়েছে। যেমনটি আমি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছি। আর মানুষের স্বভাবধর্ম্যানুযায়ী তিনি মহব্বতের যোগ্য। কারণ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ সকলের জন্য অব্যাহত ও উন্মুক্ত হয়েছে। যেখানে মানুষ দুনিয়াতে একবার দয়া করলে, কাউকে কোনো প্রকার ক্ষতির হাত থেকে বাঁচালে কিংবা সামান্য দুঃখ-কষ্ট থেকে অল্প সময়ের জন্য সাহায্য করলে, যা ক্ষণস্থায়ী- তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়, তাহলে আপনারাই বলুন যিনি চিরস্থায়ী নিয়ামত দানকারী, যা কখনো নিঃশেষ হওয়ার নয়, যিনি মানুষকে দোষের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দানকারী, তিনি মহব্বতের যোগ্য নন কী?

যখন কোনো রাজা-বাদশাহ স্বীয় প্রশংসনীয় গুণাবলীর কারণে কিংবা কোন বিচারক ন্যায়পরায়নতার খ্যাতির কারণে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, বা দূরবর্তী কোন বিচারক তার জ্ঞান ও মাহাত্ম্যের কারণে প্রসিদ্ধ হয়ে যান তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে সবার প্রিয় হয়ে যান। তাহলে যার মধ্যে উক্ত স্বভাবসমূহ পূর্ণমাত্রায় কেন্দ্রীভূত হয়, তবে বলুন! তিনি কি বেশী মহব্বতের যোগ্য হবেন না? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, مَنْ رَأَاهُ بِدِيَهَةٍ هَابَةٍ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ - যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করতো সে প্রভাবিত হয়ে পড়তো, আর যে তাঁর নিকটে আসতো সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসতে শুরু করতো।^১

আমি কোনো কোনো সাহাবায়ে কেয়াম সম্পর্কে উল্লেখ করেছি, তাঁরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বতের কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দৃষ্টির অন্তরাল সহ্য করতে পারতো না।

১. ক) ইবন শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৬/৩২৮ হাদীস নং ৩১৮০৫।

খ) ভিরমিযী : আস সুনান, বাবু মা জা'য়া ফি সিফাতিন নবী, ৬/৩৫ হাদীস নং ৩৬৩৮।

গ) বায়হাকী : ওয়াবুল ইমান, ৩/১৩ হাদীস নং ১৩৫০।

ঘ) বাগাতী : শরহু সুন্নাহ, ১৩/২২৬ হাদীস নং ৩৬৫০।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

فَتَوْجُوبِ مُنَاصَحَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুয়র 'র কল্যাণ কামনার আবশ্যিকতা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا

نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ^٤ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ^٥ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ

-আর না তাদের বিরুদ্ধে, যাদের ব্যয় করার সামর্থ্য নেই, যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের শুভাকাজী থাকবে। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে কোন পথ নেই এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।’

তাহসীবিদ আলেমগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণ কামনার মর্মার্থ হলো- প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যে মু'মিন হওয়া।

হযরত তামীম দারী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ** - নিশ্চয় কল্যাণকামীতাই ধীন। একথা তিনবার বললেন। সাহাবায়ে কেলাম আরয করেন, **قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ** - হে আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কল্যাণকামিতা কার জন্য? হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

قَالَ اللَّهُ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيُّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

-আল্লাহ তা'আলা, তাঁর কিতাব কুরআন মজিদ, তাঁর রাসূল সাব্বানাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও সাধারণ মুসলমানের জন্য।^২

১. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৯১।

২. ক) নামাঘী : আস্ সুনান, বাবু নসীহাতু গিল উমামি, ১৩:১০৫, হাদিস নং : ২১২৮।

খ) আবু দাউদ : আবু সুনান, বাবু ফীন্ নসীয়াতি, ১৩:১০৭, হাদিস নং : ৪২৯৩।

ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী তামিমুদ্ দারী, ৩৪:২৯৬, হাদিস নং : ১৬৩৩২।

আমাদের ইমামগণ বলেন,

النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

—কল্যাণকামিতা আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও সাধারণ মুসলমানের জন্য।’

আরববাসীরা বলে-

نَصَحْتُ الْعَسْلَ، إِذَا خَلَصْتَهُ مِنْ شَمْعِهِ.

—আমি মধুকে বিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন করে নিয়েছি। যখন মধু থেকে মোম পরিষ্কার হয় তখন এরূপ বলা হয়।

হযরত আবু বকর বিন আবু ইসহাক খোফাফ রাঈয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বলেছেন, النَّصَاحُ 'নুসহ' শব্দটি النَّاسِاحُ 'নাসাহ' শব্দ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

‘نَاصِحٌ’ এর অর্থ হলো- সুতা, যা দিয়ে সেলাই করা হয়।

হযরত আবু সুফিয়ান বুসতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নসীহত ওই উত্তম বাক্য, যার সম্পর্ক দ্বারা এসব কল্যাণকামিতা বুঝানো হয় যা কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত হয়।

হযরত আবু ইসহাক, যুজাজও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কল্যাণ কামনার অর্থ হলো- আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি বিশুদ্ধ আকীদা রাখা। আর তার সাথে ওই সিফাতের বিশ্বাস রাখা, তিনি যার যোগ্য। আর ওইরূপ সিফাত থেকে তাকে পবিত্র মনে করতে হবে, যা তাঁর মর্যাদার পরিপন্থি। তাঁর পছন্দনীয় কাজের প্রতি অনুরাগী হওয়া। আর তাঁর অসম্ভবির কাজ থেকে বিরত হওয়া। একাগ্রতা ও বিশুদ্ধতার সাথে তাঁর ইবাদতে মনোনিবেশ করা।

আল্লাহ তা'আলার কিতাব আল কুরআনের কল্যাণকামনা হলো, কুরআনের উপর আমল করা। উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কুরআন আবৃত্তি করা। কুরআনের প্রতি স্বেচ্ছায় অবনত হওয়া। কুরআন মজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। কুরআন মজিদ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, অনুধাবন করার চেষ্টা করা। আর মানুষের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও অবিশ্বাসীদের প্রতিহিংসাকে দূর করে দেয়া।

ⁱ. बुधारी : आसु महीह, बाबुद धीनिनु नमीशति मिद्याहि शुया मित्रासूनिह, १:७१।

আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্যাণকামনার অর্থ হলো, তাঁর নবুওয়াত স্বীকার করা, তাঁর আদেশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন ও তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা।

হযরত আবু বকর ইবনে ইসহাক রাঈয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্যাণকামনার অর্থ হলো- হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে অবস্থানকালে তাঁর সাহায্য সহযোগিতা ও ওফাতের পর তাঁর সুন্নাতসমূহ অনুসন্ধান করে তার উপর আমল করা। তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিহত করা। আর নিজের জীবনকে তাঁর পবিত্র স্বভাব বৈশিষ্ট্যের প্রতিভূ করা।

হযরত আবু ইবরাহীম ইসহাক নুজায়বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্যাণকামনার অর্থ হলো, তিনি যা নিয়ে আগমন করেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর পবিত্র সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। তাঁর আদর্শের ব্যাপক প্রচার করা, তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা। আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও তাঁর রাসূলের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা।

হযরত আহমদ বিন মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মানুষের আন্তরিক দায়িত্ব হলো, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্যাণকামনা, আর এর অর্থ হলো, তিনি যা নিয়ে আগমন করেছেন, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর পবিত্র সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, তাঁর আদর্শের ব্যাপক প্রচার করা, তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও তাঁর রাসূলের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা।

হযরত আহমদ বিন মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মানুষের আন্তরিক দায়িত্ব হলো, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্যাণকামনার আকীদা পোষণ করা।

হযরত আবু বকর আজরী ও অন্যান্য আলেমদের অভিমত হলো, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্যাণকামনা দু'প্রকার। প্রথমত: তাঁর পবিত্র হায়াতে তাঁর কল্যাণ কামনা করা। দ্বিতীয়ত: তাঁর ওফাতের পর তাঁর কল্যাণকামনা করা। তাঁর মুবারক হায়াতে তাঁর সাহায্যে কেরামের সাহায্য সহায়তা করার দ্বারা তাঁর কল্যাণ কামনা করা। তাঁর শত্রুদের প্রতিহত করা। তাঁর আদেশ নিষেধ শুনে যথাযথভাবে তা বাস্তবায়ন করা। তাঁর আদর্শের বাস্তবায়নে জান-মাল উৎসর্গ করা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী-

رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

-মুসলমানদের মধ্যে কিছু এমন পুরুষ রয়েছে, যারা সত্য প্রমাণিত করেছে যেই অঙ্গিকার তারা আল্লাহর সাথে করেছিলো। সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপন মান্নত পূর্ণ করেছে এবং কেউ কেউ অপেক্ষা করছে। আর তারা সামান্যটুকুও পরিবর্তিত হয়নি।^১

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে-

وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

-আর তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাহায্য করে তারাই সত্যবাদী।^২

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর প্রতি মুসলমানদের কল্যাণকামনা হলো, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা। তাঁর আহলে বায়ত ও তাঁর সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম রাঈয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে ভালবাসা। তাঁর অনুপম শিক্ষা ও সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর আহলে বায়ত ও সাহাবীদের ভালোবাসার গুণাবলী অর্জন করা। তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতাকারী দূশমনদেরকে ঘৃণা করা। তাঁর উম্মাতের প্রতি দয়া করা। তাঁর আখলাক সম্পর্কে অবগত হওয়া। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। সর্বোপরি তাঁর সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। মোদ্বাকথা তার কল্যাণকামিতা তখনই সম্ভব হবে যখন তাঁকে নিবেদিত প্রাণে ভালবাসবে। যেমনটি এ সম্পর্কে আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

হযরত ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী রাঈয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার বিন লাইস খোরাসানের খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ বাদশাহগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিলো জনগণের সেবক। তাঁর মৃত্যুর পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করে, আপনার মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কী ধরনের আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনার কোন আমলের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে

^১ আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:২৩।

^২ আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:৮।

ক্ষমা করে দিয়েছেন? আমরা বিন লাইস বললো, আমি একদিন পাহাড়ের উপর আরোহন করে পাহাড়ের পাদদেশে আমার বিশাল সুসজ্জিত বাহিনী দেখতে পাই। তখন আমি মনে মনে আক্ষেপ করি, আমি যদি এই সুসজ্জিত বিশাল বাহিনী নিয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো যুদ্ধে সাহায্য করতে পারতাম। আমার একথা আল্লাহ তা'আলার খুব পছন্দ হয়, আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দেন।

মুসলমানের ইমামগণের কল্যাণের অর্থ হলো- ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় তাদের সাহায্য সহায়তা করা। সৌজন্য, শিষ্টাচার ও বিনয়ের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করা। তাদেরকে পূণ্যার্জনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। তারা অমনোযোগী হলে তাদেরকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করিয়ে দিতে হবে। মুসলমানদের অধিকার পূরণে যারা অমনোযোগী তাদেরকে সজাগ করিয়ে দিতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা থেকে জনসাধারণকে বিরত রাখতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা চালানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণ কামনার অর্থ হলো, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, সকলকে কল্যাণের প্রতি পথ প্রদর্শন করা, দীন ও দুনিয়াবী বিষয়ে কথায় ও কাজে সাধারণ মুসলমানদের গুভাকাজী ও সাহায্যকারী হওয়া। উদাসীনদের সতর্ক করে দেয়া। অজ্ঞদেরকে আলোর পথ দেখাতে হবে। সহায় সম্বলহীনদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে হবে। মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি গোপন করতে হবে। সকলকে রক্ষা করতে হবে ক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে। সর্বদা জনকল্যাণে নিয়োজিত থাকতে হবে।

الْبَابُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

فِي تَعْظِيمِ أَمْرِهِ وَوُجُوبِ تَوْفِيرِهِ وَبَرِّهِ

হযর (ﷺ)র আদেশ ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ

—নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত প্রত্যক্ষকারী করে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে। যাতে হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো এবং রাসূলের মহত্ত্ব বর্ণনা ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো।^১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِرُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

—হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে বাড়াবে না।^২

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا
تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ
عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ
الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

^১. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:৮-৯।

^২. আল কুরআন : সূরা হজরাত, ৪৯:১।

—হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না ওই অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর। এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলোনা, যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করে, যেন কখনো তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায়, আর তোমাদের খবরই থাকবেনা। নিশ্চয় ওইসমস্ত লোক যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে আল্লাহর রাসূলের নিকট, তারা হচ্ছে ওইসব লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা খোদাভীরুতার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয় ওইসব লোক, যারা আপনাকে হুজরাসমূহের (প্রকোষ্ঠ) বাইরে থেকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ।^১

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

—রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করোনা যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।^২

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাযিম ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব ঘোষণা করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা উজ্জরুহু^৩র তাফসীরে বলেছেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো।

হযরত মাবরাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উজ্জরুহু এর মর্মার্থ হলো, تَبَالَّغُوا فِيهِ —তাঁর প্রতি অতিমাত্রায় সম্মান প্রদর্শন করো।

হযরত আখফাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উজ্জরুহু এর অর্থ হলো, تَنْصُرُوهُ —হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করো।

আল্লামা তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সাহায্য করা অর্থ করেছেন। অন্যান্য কিতাবসমূহে উজ্জরুহু এর সাথে উজ্জরুহু রয়েছে অর্থাৎ হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করো।

^১. আল কুরআন : সূরা হজরাত, ৪৯:২-৪।

^২. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৬৩।

হযরত ইবনে আব্বাস রাহিমাল্লাহু তা'আলা আনহুমা ও অন্যান্য অভিধানবেস্তা সা'লাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ বলেছেন, এখানে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগ্রগামী হতে নিষেধ করা হয়েছে এর মর্মার্থ হলো, তাঁর কথা বলার পূর্বে কোনো বিষয়ে কথা না বলা ও তাঁকে উপেক্ষা করে অথবর্তী হয়ে বেআদবী না করা।

হযরত সাহল বিন আব্দুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এর মর্মার্থ হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলার পূর্বে তোমরা নিজেরা কোনো কথা বলবে না। তিনি কথা বলা আরম্ভ করলে তোমরা পূর্ণ মনোযোগের সাথে তাঁর কথা শুনবে, মৌনতা অবলম্বন করবে, হযুর এর ফয়সালা করার পূর্বে কোনো বিষয় দ্রুত মীমাংসা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আরো নিষেধ করা হয়েছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে তাঁর আদেশ ব্যতীত অগ্রগামী হওয়া যাবে না। হযরত হাসান, মুজাহিদ, দ্বাহহাক, সুদী ও সুফিয়ান সাওরী রাহিমাল্লাহু তা'আলা আনহুমা প্রমুখ এ অভিমতের সমর্থক। আল্লাহ তা'আলা উপর্যুক্ত বিষয় লোকদের নিষেধ করেছেন। অপর দিকে তাঁর মহত্ত্ব ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর ইরশাদ হয়েছে—

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

—আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ শুনেন, জানেন।^১

হযরত মাওয়াদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, اتَّقُوا এর মর্মার্থ হলো, তাঁর অগ্রগামী হওয়া থেকে বিরত থাকা।

হযরত সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, اتَّقُوا এর অর্থ হলো তাঁর অধিকার আদায়ে অলসতা ও তাঁর সম্মান নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কথা শ্রবণকারী ও তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাঁর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করতে এবং সামনে একে অপরকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করতে নিষেধ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাকো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেভাবে ডাকতে পারবে না। অর্থাৎ নাম উল্লেখ করে ডাকতে পারবেনা।

^১. আল কুরআন : সূরা হুজরাত, ৪৯:১।

আবু মুহাম্মদ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, لَا تُسَابِقُوهُ بِالْكَلَامِ وَتُغْلِظُوا لَهُ بِالْخَطَابِ، وَلَا تُنَادُوهُ بِاسْمِهِ نِدَاءً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، وَلَكِنْ عَظُمُوهُ وَوَقِّرُوهُ وَنَادُوهُ بِأَشْرَفِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُنَادَى بِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ.

—কথা বলার সময় তাঁর অগ্রগামী হবে না। তাঁর নিকট আবেদন করতে হলে বিনয় ও নমনীয়তার সাথে অনুচ্চ কণ্ঠে কথা বলতে হবে। তোমরা একে অপরকে যেভাবে নাম ধরে ডাকো, তাঁকে সেভাবে ডাকতে পারবে না। বরং তাঁকে একান্ত বিনয়, নমনীয়তা, নম্রতা-ভদ্রতা, শ্রদ্ধা ও আদরের সাথে যেমন- ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া নবীয়াল্লাহ, ইত্যাদি বলে আহ্বান করবে। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে—

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

—রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করো না যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।^১

আর একদল আলেম বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কথা বুঝার জন্য তাঁকে সম্বোধন করা যাবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে এ বিষয়ে ভয় দেখিয়েছেন যে, যদি তোমরা একরূপ করো তাহলে তোমাদের নেক কাজসমূহ ধ্বংস করে দেয়া হবে। আরো বর্ণিত আছে,

نَزَلَتِ الْآيَةُ فِي وَفْدِ بَنِي نَعْمٍ وَقِيلَ: فِي غَيْرِهِمْ أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَوْهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ اخْرُجْ إِلَيْنَا. فَذَمَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْجَهْلِ، وَوَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

—উক্ত আয়াত বনী নামীম অথবা অন্য কোনো গোত্রের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে, হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মদ! বলে আহ্বান করে বলতো, আপনি বাইরে আসুন! তাই তাদের এ অজ্ঞতা ও অসুন্দর আচরণের নিন্দা করে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ।

^১. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৬৩।

কেউ কেউ বলেন, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বিতর্ক সম্পর্কে। একবার তাঁরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সামান্য উচ্চস্বরে বিতর্কে লিপ্ত হন।

আবার কেউ কেউ বলেন, উক্ত আয়াত হযরত সাবেত বিন কায়েস বিন শামমাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি বনী তামীমদের মুকাবিলায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে গর্ব করতেন। তিনি কানে কম শুনতেন, তাই উচ্চকণ্ঠে কথা বলতেন। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি নিজ বাড়িতে বসে পড়েন। আর তাঁর আশঙ্কা হয়ে যে, না জানি তার সব নেকী বিনষ্ট হয়ে যায়। হযুর এর দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলার আশঙ্কায়। কয়েক দিন পর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরম্ভ করে, হে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার ভয় হয় যে, আমি যেন ধ্বংস হয়ে না যাই। কারণ আল্লাহ তা'আলা আপনার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আমার কণ্ঠস্বর তো উচ্চ হয়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَيِّدًا، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟

-হে কায়েসের পুত্র সাবেত! তুমি কী এটা পছন্দ করো না যে, তুমি প্রশংসার সাথে জীবিত থাকবে, শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করে, জান্নাতে প্রবেশ করবে? সুতরাং হযরত সাবিত রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।^১

এক বর্ণনায় এসেছে যে, যখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরম্ভ করেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শপথ! এখন আমি আপনার পবিত্র দরবারে এমনভাবে কথা বলবো যেন কানাকানি করা হয়।

^১ ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ২:৭৩।

খ) আবদুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, ১১:২৩৯।

গ) আবু নাইম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস সাহাবা, বাবুস ছা'আ, ৪:১৯৬, হাদিস নং : ১২৪০।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতকালে ১২ হিজরীতে মিথ্যাবাদী মুসাইলামা নবুওয়্যাতের দাবী করে। তখন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উক্ত যুদ্ধে হযরত সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু শাহাদত বরণ করেন।

আর উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এমনভাবে কথা বলতেন, যেন কেউ গোপনে কানাকানি করছে। এমনকি কখনো কখনো তাঁর কথা বুঝতে হলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুনরায় জিজ্ঞেস করতে হতো। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়-

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٠﴾

-নিশ্চয় ওই সমস্ত লোক যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে আল্লাহর রাসূলের নিকট, তারা হচ্ছে ওইসব লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা খোদাভীরুতার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে।^১

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

-নিশ্চয় ওইসব লোক, যারা আপনাকে হুজুরাসমূহের বাইরে থেকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ।^২

উক্ত আয়াত বনী তামীম গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত সাফওয়ান বিন আসসাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন। উচ্চকণ্ঠস্বর বিশিষ্ট এক বেদুইন এসে এ বলে চিৎকার করে, হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকতে শুরু করে। আমি তাকে বললাম, নিম্নস্বরে কথা বলো; তোমাদেরকে উচ্চস্বরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا

-হে ঈমানদারগণ! 'রা-ইনা' বলো না।^৩

^১ আল কুরআন : সূরা হুজরাত, ৪৯:৩।

^২ আল কুরআন : সূরা হুজরাত, ৪৯:৪।

^৩ আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১০৪।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আনসারদের মধ্যে এ শব্দের প্রচলন ছিলো। এ শব্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ উক্ত শব্দ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার পরিপন্থী ছিলো। এর অর্থ হলো, যদি আপনি আমাদের প্রতি তাকান তাহলে আমরা আপনার প্রতি তাকাবো। এটা এক ধরনের শঠামি। বরং সর্বাবস্থায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, ইহুদীরা প্রকাশ্যে ও গোপনে এ শব্দ দ্বারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিন্দা করতো। কারণ তারা رَاعَى শব্দকে তাচ্ছিল্যকর অর্থে ব্যবহার করতো। তাই মুসলমানদেরকে চূড়ান্তভাবে এ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে আর ইহুদীরা তামাশা করার সুযোগ পাবেনা, আর তাদের সাথে সাদৃশ্যও হবে না। আবার কোনো কোনো তাফসীরবিদ অন্য অর্থও করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

فِي عَادَةِ الصَّحَابَةِ فِي تَعْظِيمِهِ وَتَوْقِيرِهِ وَإِجْلَالِهِ ۝

সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক হযুর ﷺ প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পদ্ধতি

হযরত আমর বিন আস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ.

-আমার নিকট হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সর্বাধিক প্রিয় ও অধিক সম্মানিত আর কেউ ছিলো না। তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি অপলকদৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা যেতো না। আমাকে তাঁর মহান বৈশিষ্ট্যবলি জিজ্ঞাসা করা হলে বলতে পারবো না, কারণ আমি পরিপূর্ণভাবে তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের দিকে তাকাতে পারতাম না।^১

ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

كَانَ يَخْرُجُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَا يَرْفَعُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَصْرَهُ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا.

-হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহাঙ্গনের বাইরে আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ব্যতীত অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম তাঁর প্রতি তাকাতে সাহস করতো না। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদুহেসে সকল সাহাবাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলে যেতেন।^২

^১ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু কাওনিল ইসলামি ইয়াহদাম ১:৩০৪, হাদিস নং : ১৭৩।

খ) আবু আওয়ানা : আল মুসতাখরিজ, বাবু ব্যানি রফ'ইল ইসমি ১:১৭৩, হাদিস নং : ১৫৬।

^২ তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী মানাক্বিবি আবী বকর, ১২:১২৭, হাদিস নং : ৩৬০১।

হযরত উসামা বিন ওরাইক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ.

-আমি একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে দেখি তাঁর সাহাবাগণ এমনভাবে বসে আছেন যেনো তাঁদের মাথার উপর পাখি বসে আছে, আর যেন একটু নড়াচড়া করলেই পাখি উড়ে যাবে।^১

উক্ত হাদীসে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম বৈশিষ্ট্যবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে,

إِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ.

-হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলতেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম মস্তক অবনত করে স্থির হয়ে বসে থাকতেন, মনে হতো যেনো তাঁদের মাথার উপর কোন বিহঙ্গ উপবিষ্ট রয়েছে।^২

হযরত উরওয়া বিন মাস'উদকে হৃদয়বিহার সন্ধির সময় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করে। সে তাঁর সহচরদের তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে দেখে যে, তাঁর অযুর ব্যবহৃত পানি সংগ্রহের জন্য সাহাবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। মনে হয় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত অযুর পানি সংগ্রহের জন্য যুদ্ধ শুরু করে দেবে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুশু ফেলতেন বা নাক পরিষ্কার করতেন, তাড়াতাড়ি তা হাতে নিয়ে নিজেদের দেহে ও মুখমণ্ডলে মেখে নিতেন। যখন তাঁর মুবারক দেহ থেকে একখানা পশম ঝরে পড়তে দেখতো, তখন তাঁরা তা উঠিয়ে নিতো। তিনি যা আদেশ করতেন তাঁরা তাৎক্ষণিক তা পালন করতেন। তিনি যখন কথা বলতেন সাহাবীগণ তখন নতশিরে মনোযোগের সাথে তা শুনতো। তাঁর প্রতি চোখ তুলে তাকানোর সাহস করতো না। আমি সম্মান প্রদর্শনের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন দেখি।

১. ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফীল মাস'আলাতি ফী কুবরী, ১২:৩৬৮, হাদিস নং : ৪১২৭।

খ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবু মিন ইসমিহি হুসাইন, ৮:১২২, হাদিস নং : ৩৬৩২।

গ) তায়ালুসী : আল মুসনাদ, বাবু আবদিল মু'মিনী ইয়া কানা ২:৩২৮, হাদিস নং : ৭৮২।

২. ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৬:৩০।

খ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যাতি, বাবু ইয়া আওয়া ইলা মানযিলিহি..., ১:২৬৯, হাদিস নং : ২৩৭।

গ) বায়হাকী : ও'আবুল ইমান, বাবু কানা রাসূল..., ৩:৪৬৭, হাদিস নং : ১৪১৩।

ঘ) আবু নঈম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস সাহাবা, ১৯:১৫৬, হাদিস নং : ৫৯৫৬।

আর দেখতে পেলাম নবুয়্যাতির অশ্রুত অপূর্ব প্রতাপ-প্রতিপত্তি। উরওয়া যখন কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّي جِئْتُ كِسْرَى فِي مُلْكِي، وَقَيْصَرَ فِي مُلْكِي، وَالتَّجَاشِي فِي مُلْكِي.. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكًا فِي قَوْمٍ قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ فِي أَصْحَابِهِ -হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি পারস্য সম্রাট কিসরা, রোম সম্রাট কায়সার, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর রাজদরবারে গিয়েছি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো মর্যাদা ও ক্ষমতাসম্পন্ন দেখিনি।^১

অপর এক বর্ণনায় এসেছে-

إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظَّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظَّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا وَلَقَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُسَلِّمُونَهُ لِشَيْءٍ أَبَدًا.

-কোনো সম্রাটকেই তাঁর অধীনস্তদের থেকে কখনো এ রকম সম্মান পেতে দেখিনি, যে রূপ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহচরবৃন্দ থেকে সম্মান লাভ করেন। আমি এমন এক সম্প্রদায়কে দেখেছি যারা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে চোখের আড়াল করতে প্রস্তুত নয়।^২

হযরত আনাস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلَّاقُ يَخْلُقُهُ وَأَطَافَ بِهِ

أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ.

-আমি ক্ষৌরকারকে দেখলাম যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুলমুগুন করছে, আর তাঁর সহচরবৃন্দ চতুর্পার্শ্বে ঘুরাঘুরি করছে, যেন তাঁর একটি মুবারক চুলও মাটিতে না পড়ে বরং কারো না কারো হাতে এসে যায়।^৩

১. আহমদ : আল মুসনাদ, ৪:৩২৩ হাদিস নং ১৮৯৩০।

২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুশ শুরতি ফীল জিহাদ, ৯:২৫৬, হাদিস নং : ২৫২৯।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩৮:৩৯১, হাদিস নং : ১৮১৬৬।

গ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৯:২১৯।

ঘ) বায়হাকী : ও'আবুল ইমান, বাবু ইয়ারমিকি আসহাবুন নবী, ৪:৫১, হাদিস নং : ১৪৯২।

৩. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু কুরবিন নবী, ১১:৩৬৯, হাদিস নং : ৪২৯২।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ২৪:৪৬১, হাদিস নং : ১১৯১৫।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হৃদয়বিয়ার সন্ধির সময় হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দূত হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করেন। আর কুরাইশরা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কাবাগৃহ তাওয়াফ করার অনুমতি দেয়। কিন্তু হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ বলে তাওয়াফ করতে অস্বীকার করেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি কক্ষিনকালেও কাবা গৃহের তাওয়াফ করবো না।

হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় এসেছে,

أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِأَعْرَابِيٍّ جَاهِلٍ: سَلْهُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ - وَكَانُوا يَهَابُونَهُ وَيَوْقُرُونَهُ. فَسَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. إِذْ طَلَعَ طَلْحَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ.

-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এক বেদুইনকে বললো, তুমি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট- عَمَّنْ قَضَى

এ আয়াতের মর্মার্থ জেনে নাও। কারণ সাহাবীগণ ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের আদব সম্মান প্রদর্শনকারী। সেহেতু তাঁরা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করার সাহস করতো না। বেদুইন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরম্ভ করে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি। ইত্যবসরে হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে উপস্থিত হন। তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই তালহা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত যারা আপন মান্নতকে পূর্ণ করেছে।^১

গ) বায়হাকী : শুনানুল কুবরা, ৭:৬৮।

ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ওয়া মিন সুরাতিল আহযাব, ১০:৪৯২, হাদিস নং : ৩১২৭।

খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফখলি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, ১:১৪১, হাদিস নং : ১২৩।

গ) আবু ইয়ালা : আল মুসনাদ, বাবু আইনাস্ সায়েল আম্ মান ক্বা, ২:১৪১, হাদিস নং : ৬৩৬।

পবিত্র কুরআন মজীদে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا** - মুসলমানদের মধ্যে কিছু এমন পুরুষ রয়েছে যারা সত্য প্রমাণিত করেছে, যেই অস্বীকার তারা আল্লাহর সাথে করেছিলো; সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপন মান্নত পূর্ণ করেছে এবং কেউ কেউ অপেক্ষা করেছে। (সূরা আহযাব-২৩)

হাদীস শরীফে বর্ণিত, হযরত ওসমান, হযরত সাদ্দ বিন যায়িদ, হযরত হামযা, হযরত মাস'আব বিন ওমায়ির ও হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম মান্নত করোছিলেন যে, দীন ইসলাম

কাইলা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন,

فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَشِعَ وَقَالَ مُوسَى الْمُتَخَشُّعَ فِي الْجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرْقِ وَذَلِكَ هَيْبَةٌ لَهُ وَتَعْظِيمًا.

-আমি একদিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষ ভঙ্গিতে উপবিষ্ট দেখতে পাই তখন ভয়ে আমার শরীর কাঁপতে শুরু করে। তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার কারণে এরূপ অবস্থা হতো।^১

হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় এসেছে,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَعُونَ بِيَابِهِ بِالْأُظْفَارِ.

-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ আদবের খাতিরে তাঁর দরজায় নখ দিয়ে টোকা দিতো।

হযরত বারা বিন আযিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

لَقَدْ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَمْرِ فَأَوْخَرُ سِنِينَ مِنْ هَيْبَتِهِ.

-আমি মনে মনে একটি প্রশ্ন এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও মুখে প্রকাশ করতে সাহস করিনি, তাঁর প্রতি আকুষ্ঠ সম্মান ও ভয়ে এরূপ হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক।

রক্ষার্থে জীবন উৎসর্গ করতেন। মাস'আব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম জীবনবাজি রেখে উহদের যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উহদের যুদ্ধে আঘাত পেয়ে আহত হন তখন হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিফায়তের উদ্দেশ্যে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ান এবং কাফিরদের নিক্ষিপ্ত তীর হাত ও শরীর দিয়ে প্রতিহত করেন। উহদের যুদ্ধে হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেহে আশির অধিক আঘাত লাগে। আঘাতের কারণে তাঁর হাত অবশ হয়ে যায়। উহদ যুদ্ধে হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মান্নত পূর্ণ করেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ রক্ষার্থে নিজের দেহ এগিয়ে দেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দশজনকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করেন তাদের মধ্যে হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুও একজন। ৩৬ হিজরীতে হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মীর যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফী জুলুসির রজুল, ১২:৪৭৯, হাদিস নং : ৪২০৭।

খ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৮:১৮৬।

গ) বায়হাকী : শুনানুল কুবরা, ৩:২৩৫।

ঘ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুস্ সালাম, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ২০, হাদিস নং : ৪৭১৪।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

فِي تَعْظِيمِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ

ওফাতের পর হযুর ﷺ এর প্রতি তা'যিম প্রসঙ্গে

স্মরণ রেখো জাহেরী হায়াতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমন সম্মান প্রদর্শন করা হতো, তেমনি তাঁর ইন্তিকালের পরও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। এ সম্মান প্রদর্শন তাঁর মহিমাম্বিত আলোচনা, তাঁর হাদীস ও সুন্নাত বর্ণনার সময়, তাঁর পবিত্র নাম গুনার সময়, তাঁর মহিমাম্বিত চারিত্রিক গুণাবলী, তাঁর আহলে বায়ত ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের আলোচনার সময় তাঁর সম্মানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

হযরত আবু ইবরাহীম তাজবী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য ওয়াজিব, যখন তাঁর মহিমাম্বিত গুণাবলী আলোচনা করবে বা তাঁর সামনে অন্য কেউ তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করে, তখন তাঁর প্রতি সম্মানার্থে নমনীয় ও শ্রদ্ধাবনত হয়ে নীরবে বসে থাকবে। কোনো প্রকার নড়াচড়া করা যাবে না। তাঁর জাহেরী জীবনে যেভাবে তাঁর সম্মানে অবনত মস্তকে বসে থাকা হতো, ঠিক সেভাবে তাঁর ওফাতের পরও তাঁর আলোচনা শুনতে হবে। মনে করতে হবে তিনি আমাদের সামনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সামনে নিজেকে অতি হীন ও তুচ্ছ মনে করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি যেকোনো আদব-সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর প্রতি সেরূপ আদব-সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

কাযী আবুল ফযল আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, আমাদের পূর্ববর্তী ইমাম ও সলফে-সালেহীন আলেমগণ তাঁর প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

ইবনে হুমায়দ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, একবার মসজিদে নববীতে খলীফা আবু জা'ফর মনসুরের সঙ্গে ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। হযরত ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! মসজিদে নববীতে উচ্চস্বরে কথা বলবেন না। কারণ আল্লাহ তা'আলা এক সম্প্রদায়কে এরূপ আদব শিক্ষা দিয়েছেন,

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ

كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

-হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না ওই অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর। আর তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না, যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো, যেন কখনো তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায়, আর তোমাদের খবরই থাকবেনা।^১

আল্লাহ তা'আলা একদলের প্রশংসা করে ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿১৬﴾

-নিশ্চয় ওই সমস্ত লোক, যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে আল্লাহর রাসূলের নিকট, তারা হচ্ছে ওইসব লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা খোদাভীরুতার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।^২

আল্লাহ তা'আলা অপর একদলের নিন্দা করে ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْقِلُونَ ﴿১৭﴾

-নিশ্চয় ওইসব লোক, যারা আপনাকে হুজুরাসমূহের বাইরে থেকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ।^৩

ওফাতের পূর্বে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব ছিলো, ওফাতের পরও তাঁর প্রতি সেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। একথা শুনে খলীফা মনসুর নিশ্চুপ হয়ে যায়। আর ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আমাকে বলুন! আমি কি দোয়া করার সময় কিবলামুখী হবো, না রাসূলমুখী হবো? ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন,

^১ আল কুরআন : সূরা হজরাত, ৪৯:২।

^২ আল কুরআন : সূরা হজরাত, ৪৯:৩।

^৩ আল কুরআন : সূরা হজরাত, ৪৯:৪।

وَلَمْ تَضِرْفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى
 اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ!! بَلْ اسْتَقْبَلَهُ وَاسْتَشْفَعَ بِهِ فَيُسَفِّعَهُ اللَّهُ.

-আপনি রাসূলমুখী হবেন না কেনো? কিয়ামতের দিনে তিনি আপনার এমনকি আপনার পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের জন্য ওসীলা হবেন। সুতরাং আপনি তাঁর রওজা পাকের নিকট গিয়ে তাঁর নিকট শাফায়াত প্রার্থনা করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা আপনার পক্ষে তাঁর শাফায়াত কবুল করবেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ
 لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

-আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে, তখন হে মাহবুব! তারা আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই পাবে আল্লাহকে অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবে।^১

হযরত ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে হযরত আবু আইয়ুব সখতিয়ানী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বললেন, আমি আজ পর্যন্ত যতো হাদীস বর্ণনাকারীর হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি, তাঁদের মধ্যে আইয়ুব ছিলেন সর্বোত্তম। আমি তাঁকে দু'বার হজ্জ পালন করতে দেখেছি। আর শুনেছি যখন তাঁর সামনে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হতো, তখন তিনি কান্না জুড়ে দিতেন। তাঁর কান্না দেখে আমার মনে তাঁর প্রতি দয়া এসে যেতো। আমি তাঁকে সম্মান করতাম এবং তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস লিপিবদ্ধ করতাম।

হযরত মাসআব বিন আবদুল্লাহ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখন ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সামনে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হতো তখন তাঁর দেহের রং পরিবর্তন হয়ে যেতো। তিনি আদব ও বিনয়ের কারণে ভীত-সম্বস্ত হয়ে যেতেন। এমন কি তাঁর এ কাজ তাঁর সাথীদের জন্য কষ্টের কারণে হয়ে যেতো। তাঁরা মনে

মনে ভীত হয়ে পড়তো যে, ইমাম সাহেবের এ কী অবস্থা হয়েছে? একদিন তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি যা দেখি তোমার যদি তা দেখতে তাহলে তোমরা আমার এরূপ করা অস্বীকার করতে না।

ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি কারীদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখেছি যে, যখন আমি তাঁকে কোনো হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম তখন তিনি এমন ভাবে কান্না জুড়ে দিতেন। তাঁর অবস্থা দেখে আমার মনে দয়া এসে যেতো।

তিনি বলেন, আমি হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাধিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছি যে, তিনি উত্তম স্বভাব আর হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তি ছিলেন। তবুও যখন তাঁর সামনে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হতো তখন তাঁর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে যেতো। আমি তাঁকে কখনো বিনা অযুতে হাদীস বর্ণনা করতে দেখিনি। আমি অনেকবার তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছি। আমি তাঁর মধ্যে তিনটি অভ্যাস দেখেছি। হয় তিনি নামায আদায় করছেন, অথবা নীরবে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন, অথবা তিনি কুরআন মজীদ তিলাওয়াতে তন্ময় হয়ে আছেন। তিনি মূলতঃ ঐসব আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সত্যিকার অর্থে খোদাভীরু ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান বিন কাসিম রাধিয়াল্লাহু আনহু যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলের প্রতি তাকানো যেতো না। মনে হতো তাঁর দেহের রক্ত শুকিয়ে গেছে। তাঁর জবান হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ভয়ে শুকিয়ে গেছে।

ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি হযরত আমের বিন আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করতাম। তাঁর অবস্থা এরূপ হতো যে, যখন তার সামনে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হতো, তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। এমনকি তার চোখের অশ্রু শুকিয়ে যেতো।

আমি হযরত ইমাম যুহরী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখেছি যে, তিনি ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্লচিত্তের অধিকারী। কিছু যখন তাঁর সামনে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হতো তখন তার অবস্থা এরূপ হতো যেনা তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। আর না তুমি তাকে দেখেছো। অর্থাৎ তিনি সবাইকে ভুলে যেতেন।

^১. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৬৪।

হযরত ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি হযরত সাফওয়ান বিন সালীম রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাথে সাক্ষাত করতাম। যখন তাঁর সামনে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হতো তখন তিনি কান্না জুড়ে দিতেন। আর লোকেরা তাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে তার নিকট থেকে চলে যেতো।

হযরত কাতাদা রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি যখন হাদীস শুনতেন তখন চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করতেন। যখন হাদীস শুনার জন্য ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মজলিশে বিপুল সংখ্যক লোকের সমাবেশ হতে শুরু করে তখন লোকেরা তাঁকে পরামর্শ দেয় যে, আপনি কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করুন। যিনি মুহাদিস থেকে হাদীস শুনে উচ্চ শব্দে লোকদের হাদীস শুনিয়ে দেবে। ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহ ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

-হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না ওই অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী এর কণ্ঠস্বরের উপর।^১

এই নিষিদ্ধতা তাঁর জাহেরী হায়াতের অনুরূপ এখনো কার্যকর রয়েছে।

মুহাম্মদ বিন সীরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অবস্থা এইরূপ ছিলো, তিনি সদা হাস্যোজ্জ্বল প্রফুল্ল থাকতেন। কিন্তু যখনই তাঁর সামনে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হতো তখন তিনি ভাবগম্ভীর, বিনয়ী ও মস্তক অবনতকারী হয়ে যেতেন।

হযরত আবদুর রহমান বিন মাহদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অবস্থা এরূপ ছিলো যে, যখন তিনি হাদীস শিক্ষাদান করতেন, তখন তিনি লোকদেরকে নীরবতা অবলম্বন করার নির্দেশ দান করে বলতেন- لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ তোমাদের কণ্ঠস্বর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু করোনা। তিনি আরও বলতেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনার সময় এমনভাবে অবস্থান করতে হবে যেন স্বয়ং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবলার সময় নীরবতা অবলম্বন করা অত্যাৱশ্যক ছিলো।

^১. আল কুরআন : সূরা হুজরাত, ৪৯:২।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

فِي سِيَرَةِ السَّلَفِ فِي تَعْظِيمِ رِوَايَةِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسُنَّتِهِ

হাদীস শরীফ বর্ণনায় পূর্ববর্তী আলেমদের শ্রদ্ধা ও শিষ্টাচার প্রসঙ্গে

হযরত আমর বিন মায়মুন রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে মাসউদ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিকট এক বছর যাবত যাতায়াত করতে থাকি। কিন্তু قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন' একথা বলতে শুনি নি। একদিন অসতর্কবশত তাঁর মুখ দিয়ে 'হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন' উচ্চরিত হয়। তিনি তা বুঝতে পেরে ভীষণ লজ্জিত ও দুঃখিত হন, তাঁর চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তিনি লজ্জায় ও ভয়ে ঘর্মসিক্ত হয়ে যান। অতঃপর বললেন, আল্লাহর ইচ্ছায় এরূপ হয়েছে বা এর চাইতে কম বেশী কিছু। অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত, তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেতো আর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতো। কান্নায় কণ্ঠনালীর শিরা-উপশিরা স্ফীত হয়ে যেতো।

মদীনার কাযী হযরত ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ রাহিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু হাযেম রাহিয়াল্লাহু আনহু নিকট গিয়ে দেখেন তিনি হাদীস বর্ণনা করছেন। ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি মজলিশে বসার জায়গা না পেয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে যাই। আর ওখানে অপেক্ষা করি নি। তিনি বলেন আমি ওখানে এমন কোনো জায়গা পাইনি, যেখানে বসে হাদীস শুনবো। আমি দাঁড়িয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শোনা পছন্দ করি না।

হযরত ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একবার এক ব্যক্তি হযরত সা'ঈদ ইবনে মুসারিয রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিকট এসে হাদীস জানতে চায়। তিনি তখন শুয়ে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করার পর উঠে বসেন। আর তাকে হাদীস শুনান। তখন ওই ব্যক্তি বললো, আপনি কষ্ট করে না ওঠে শুয়ে শুয়ে হাদীস বর্ণনা করতে পারতেন। তিনি বললেন, আমি এটা ভীষণ অপছন্দ করি যে, শুয়ে শুয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করবো।

হযরত মুহাম্মদ বিন সীরীন রাহিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি কখনো কখনো হাসতেন। কিন্তু যখন তাঁর সামনে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করা হতো, তখন তিনি অতিশয় মূহ্যমান ও বিনয়ী হয়ে যেতেন।

হযরত আবু মাস'আব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, হযরত ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাদীস বর্ণনার সময় সর্বদা অযু অবস্থায় থাকতেন। তিনি হাদীসের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনে একরূপ করতেন। হযরত ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কেও একরূপ বর্ণনা করেছেন।

হযরত মাস'আব বিন আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন—

كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَتَنَبَّأَ وَلَبَسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ يُحَدِّثُ.

—হযরত ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাদীস বর্ণনা করার পূর্বে অযু করতেন। তারপর উত্তম পোশাক পরিধান করতেন, অতঃপর হাদীস বর্ণনা করতেন।

তাকে একরূপ করার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন,

إِنَّهُ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—এটা আল্লাহর রাসূলের বাণী। (এটা কোনো সাধারণ কথা নয়। এটা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণী, কাজেই এই বাণীর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব।)

হযরত মুতাররিফ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমরা ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর গৃহে উপস্থিত হলে তাঁর দাসী বাইরে এসে জিজ্ঞেস করতো শাইখ জানতে চেয়েছেন, আপনারা কী হাদীস শুনতে এসেছেন, না মাসায়ালা জিজ্ঞেস করতে এসেছেন? যদি তারা বলতো আমরা মাসায়ালা জানার জন্য এসেছি, তখন ইমাম সাহেব বাইরে আসতেন। আর যদি বলা হতো, আমরা হাদীস শুনতে এসেছি, তাহলে তিনি গোসল করতেন, আতর লাগাতেন, নতুন পোশাক পরিধান করতেন। মাথায় পাগড়ী বাঁধতেন। চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে নিতেন। তারপর তাঁর জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করা হতো। তখন তিনি বাইরে এসে বিশেষ আসন গ্রহণ করতেন। লোবান বাতি জ্বালাতেন। ওই সময় তাঁকে অত্যন্ত গম্ভীর ও বিনয়ী দেখা যেতো। এভাবে তিনি হাদীস বর্ণনা করা সমাপ্ত করতেন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হাদীস বর্ণনা করার সময় তিনি বিশেষ আসনে বসতেন।

হযরত ইবনে আবু উয়াইস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এ বিষয় ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি অযু ব্যতীত হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করা মাকরুহ মনে করি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার কারণে আমি একরূপ করি।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাস্তায় কিংবা দাঁড়িয়ে অতি তাড়াতাড়ি হাদীস বর্ণনা করা মাকরুহ মনে করতেন। তিনি আরও বলেছেন, আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ধীরস্থিরভাবে বর্ণনা করা পছন্দ করি। যাতে লোকজন ভালোভাবে হাদীস শুনতে ও বুঝতে পারে। হযরত যিরার বিন মুররাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হাদীস বর্ণনাকারীগণ অযু ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করা মাকরুহ মনে করতেন। হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকেও অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত আছে।

হযরত আ'মাশ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি অযু করতে অপারগ হলে হাদীস বর্ণনার পূর্বে তায়াম্মুম করে হাদীস বর্ণনা করতেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে,

كُنْتُ عِنْدَ مَالِكٍ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا فَلَدَغَهُ عَقْرَبٌ سِتَّ عَشْرَةَ مَرَّةً وَهُوَ يَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ وَيَضْفَرُ، وَلَا يَقْطَعُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَجْلِسِ وَتَفَرَّقَ عَنْهُ النَّاسُ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ الْيَوْمَ عَجَبًا قَالَ: نَعَمْ إِنَّمَا صَبَرْتُ إِجْلَالًا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—একবার আমি ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট ছিলাম। এ সময় বিচ্ছু তাঁকে একে একে ষোলবার দংশন করে। বিষক্রিয়ায় তাঁর দেহ বিবর্ণ ও মুখমণ্ডল হলদে বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনা করেই চলেছেন। মজলিস শেষে সকলে চলে যাওয়ার পর আমি জিজ্ঞেস করি, হে আবু আবদুল্লাহ! আমি আজ এক অতি আশ্চর্যজনক বিষয় দেখেছি। বিচ্ছু আপনাকে দংশন করেছে অথচ আপনি হাদীস বর্ণনা করে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মহত্ব ও সম্মানে ধৈর্যধারণ করেছি।

হযরত ইবনে মাহদী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একদিন আমি ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাথে আকীক উপত্যকা অতিক্রম করছিলাম। তখন তাঁকে আমি এক হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, আপনি আমার দৃষ্টিতে অনেক মর্যাদাবান। অথচ আপনি আমার নিকট হাটাবস্থায় হাদীস শুনতে চান? অর্থাৎ আমি চাই না যে, এ অবস্থায় আমি হাদীসের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করি।

একবার জারীর বিন আবদুল হামিদ কাযী দাঁড়িয়ে ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিকট হাদীস শুনতে চান। ইমাম সাহেব তাকে থেফতার করার আদেশ দেন। উপস্থিত লোকজন বললো, তিনি এ শহরের কাযী। ইমাম সাহেব বললেন, এ বিষয়ের কাযী অধিকযোগ্য যে তাকে আদব শিক্ষা দেওয়া হোক।

এক বর্ণনায় বর্ণিত, একবার হিশাম বিন গাজী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিকট হাদীস শুনতে চান। তখন ইমাম সাহেব তাকে বিশবার বেত্রাঘাত করেন। কারণ সে হাদীসের অবমাননা করেছে। অতঃপর তার প্রতি অনুগ্রহ করে তাকে বিশটি হাদীস শুনিয়ে দেন। তখন হিশাম বললো, আমি চাই যে, আপনি আমাকে বেত্রাঘাত করুন আর আমি হাদীস শুনতে থাকি।

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালেহ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ইমাম মালেক ও আবুল লাইস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অযুহীন অবস্থায় হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ করতেন না। আর হযরত কাতাদা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অযু অবস্থায় হাদীস বর্ণনা করা মুস্তাহাব মনে করতেন। আর তিনি অযু অবস্থায় হাদীস বর্ণনা করতেন। হযরত আ'মাশ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন হাদীস বর্ণনার ইচ্ছা করতেন তখন অযুহীন থাকলে তায়াম্মুম করে হাদীস বর্ণনা করতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

وَفِي تَوْفِيرِهِ ﷺ وَبِرِّهِ بِرُّ آلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَزْوَاجِهِ

হযুর ও তাঁর পরিবারবর্গ, মু'মিন জননী তাঁর রমণীকুলের প্রতি সম্মান প্রসঙ্গে

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, তাঁর আহলে বায়ত ও মু'মিন জননী তাঁর স্ত্রীদেরও প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ সম্মান প্রদর্শনের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। পূর্ববর্তী আলেমগণ এর উপর আমল করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

—আল্লাহ তা'আলা তো এটাই চান যে, হে নবীর পরিবারবর্গ! তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।^১

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

وَأَزْوَاجَهُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ.

—আর তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।^২

হযরত যায়িদ বিন আকরাম রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন, আমি -أَشَدُّكُمْ لَإِهِ أَهْلِ بَيْتِي- আমার আহলে বায়ত সম্পর্কে তোমাদেরকে শপথ দিচ্ছি। আমরা হযরত যায়িদ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞেস করি—

وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُحَرِّمُونَ الصَّدَقَةَ، أَلْ عَيْلِي، وَأَلْ الْعَبَّاسِ،

وَأَلْ عَقِيلٍ، وَأَلْ جَعْفَرٍ.

—তাঁর আহলে বায়ত কারা? তিনি বলেন, তাঁরা হলেন, আলী, জা'ফর, আকীল ও আব্বাস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুদের বংশধরগণ প্রমুখ।^৩

^১ আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৩৩।

^২ আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৬।

^৩ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, হাদিস নং : ৩৭৮৬।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنِ اخَذْتُمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِزَّتِي أَهْلَ بَيْتِي
فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِيهِمَا.

-আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার কিতাব আর আমার আহলে বায়তদের রেখে যাচ্ছি। যতো দিন তোমরা তাঁদের সাথে মিলিত থাকবে ততদিন তোমরা কস্মিনকালেও পথভ্রষ্ট হবে না। এখন তোমরা ভেবে দেখো তোমাদের কাজ হলো যে, আমার পর তোমরা তাদের উভয়ের সাথে কিরূপ আচরণ করবে?

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَعْرِفَةُ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَحُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ جَوَازٌ
عَلَى الصَّرَاطِ وَالْوِلَايَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ أَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ.

-মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের মর্যাদার উপলব্ধি হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়, তাঁদের ভালবাসা পুলসিরাত অতিক্রমের সনদস্বরূপ। আর তাঁদের হৃদয়তা আল্লাহ তা'আলার শান্তি থেকে নিরাপত্তা লাভের উপলক্ষ স্বরূপ।^২

কোনো কোনো আলেম বলেন, আহলে বায়তকে মুহক্কাত করার অর্থ হলো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসা। সুতরাং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসার নিদর্শন হলো তাঁর আহলে বায়তকে ভালবাসা।

খ) হাকেম : আল মুসতাদরাক, ৩:১১৮।

গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৫:১১১।

১. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিবি আহলি বাইতি, ১২:২৫৮, হাদিস নং : ৩৭২০।

খ) নাসায়ী : সুনানুল কুবরা, ৫:৪৫।

গ) হাকেম : আল মুসতাদরাক, বাবু ওয়া মিন মানাক্বিবি আমিরিল মু'মিনীন, ১০:৩৭৭, হাদিস নং : ৪৫৫৩।

ঘ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৩:১১০।

ঙ) তাহাভী : মুশক্বিলুল আসার, বাবু মান কুনতা ওলীয়াহ ৪:৩১০, হাদিস নং : ১৫২১।

চ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি কুরাইশ ওয়া যিকরু ফাওয়ায়িল, পৃ. ৩৪১, হাদিস নং : ৬১৪৪।

২. বাহকুল ফাওয়ায়িদ : ১:৩০২।

হযরত আমর বিন আবী সালমা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়-

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

-আল্লাহ তা'আলা তো এটা চান যে, হে নবীর পরিবারবর্গ! তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।^১

উক্ত আয়াত হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয়তমা সহধর্মিনী হযরত উম্মে সালমা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার গৃহে অবতীর্ণ হয়। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান ও হুসাইন রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে ডেকে এনে তাঁদেরকে চাদরাবৃত করে নেন। আর হযরত আলী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে রাখেন। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেন,

اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا.

-হে আমার আল্লাহ! এরা আমার আহলে বায়ত! আপনি এদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দিন, আর তাঁদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র করে দিন।^২

হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, মুবাহলার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান, হযরত হুসাইন ও হযরত ফাতেমা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে ডেকে এন বললেন, -اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي. -হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বায়ত।^৩

১. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩/৩৩।

২. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিবি আহলি বাইতি, ১২:২৫৭, হাদিস নং : ৩৭১৯।

খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি কুরাইশ ওয়া যিকরু ফাওয়ায়িল, পৃ. ৩৩৭, হাদিস নং : ৬১২৬।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী উম্মে সালাম, ৫৩:৪৬২, হাদিস নং : ২৫৩০০।

ঘ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৩:৯০।

ঙ) তাহাভী : মুশক্বিলুল আসার, বাবু হা উলায়ি আহলি বাইতি, ২:২৬৮, হাদিস নং : ৬৫৪।

৩. ক) মুসলিম : আস্ সুনান, বাবু মিন ফাওয়ায়িল আলী ইবনে আবী তালেব, ১২:১২৯, হাদিস নং : ৪৪২০।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ رَأَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ.

-আমি যার মাওলা, আলীও তাঁর মাওলা। হে আমার আল্লাহ! যে আলীকে ভালোবাসে তুমি তাকে ভালোবাসো! আর যে তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করে তুমিও তার সাথে শত্রুতা পোষণ করো।^১

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন,

لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ.

-হে আলী! মু'মিনরাই তোমাকে ভালবাসবে। মুনাফিকরাই তোমার প্রতি ঘৃণা পরবশ হবে।^২

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা প্রতি লক্ষ্য করে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ إِلَّا يَمَانُ حَتَّى يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ آذَانِي فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنُّ أَبِيهِ.

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিবি আহলি বাইতি, ১২:১৮৭, হাদিস নং : ৩৬৫৮।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আবী ইসহাক, ৪:৩২, হাদিস নং : ১৫২২।

ঘ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৭:১৩৭।

ঙ) তাহাভী : মুশক্বিলু আসার, বাবু হা উলায়ি আহলি বাইতি, ২:২৫৮, হাদিস নং : ৬৪৪।

১. ক) তাবরানী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি কুরাইশ ওয়া কাবায়িলা, ৩:৩৩০, হাদিস নং : ৬০৯৪।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী বারা ইবনে আয়েব, ৩৭:৪৩৬, হাদিস : ১৭৭৪৯।

গ) নাসায়ী : সুনানুল কুবরা, ৫:১৩৪।

ঘ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৪:৪।

ঙ) আবু নঈম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস সাহাবা, বাবু মিন ইসমিহী য়ায়েদ, ৮:২৪১, হাদিস নং : ২৬০৫।

২. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিবি আলী ইবনে আবী তালেব, ১২:১৯৮, হাদিস নং : ৩৬৬৯।

খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু আলামাতিল ইমান, ১৫:২১৬, হাদিস নং : ৪৯৩২।

গ) নাসায়ী : সুনানুল কুবরা, ৫:১৩৭।

ঘ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবু মিন ইসমিহী 'মুহাম্মাদ', ৫:২০০, হাদিস নং : ২২৪৫।

ঙ) আবু ইয়াল্লা : আল মুসনাদ, বাবু লা ইউহস্বকা ইলা মু'মিনুন, ১:২৭৯, হাদিস নং : ২৭৫।

-ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। কোনো মানুষের হৃদয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে আপনাদের ভালবাসবে না। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি আমার চাচাকে কষ্ট দেবে সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। কেননা মানুষের চাচা তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়।^১

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, হে সম্মানিত পিতৃব্য! আপনি আগামী দিন আপনার সন্তানদের নিয়ে আমার নিকট আসুন। যখন হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা তাঁর সন্তানদের নিয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসেন তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র চাদর দিয়ে তাঁদের আবৃত করে দোয়া করেন,

يَا رَبِّ، هَذَا عَمِّي وَصِنُّو أَبِي، وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَاسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَسْتَرِي إِيَّاهُمْ بِمُلَائِي هَذِهِ، قَالَ: فَأَمَنْتُ أَشْكُفَّةَ الْبَابِ وَحَوَائِطُ الْبَيْتِ، فَقَالَتْ: آمِينَ آمِينَ آمِينَ.

-হে আল্লাহ! ইনি হলেন আমার চাচা, যিনি আমার পিতার সমতুল্য। আর এরা হলো আমার বংশধর। হে আল্লাহ! আপনি এদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে এভাবে নিরাপদ রাখুন যেভাবে আমি তাঁদের চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করে রেখেছি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়া করেন, তখন গৃহের প্রাচীর ও দরজার চৌকট আমীন! আমীন! আমীন! বলতে থাকে।^২

১. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিবি আব্বাস ইবনে আবদিল মুস্তালিব, ১২:২২৬, হাদিস নং : ৩৬৯১।

খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফযলি আব্বাস ইবনে আবদিল মুস্তালিব, ১:১৬০, হাদিস নং : ১৩৭।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী আব্বাস ইবনে আবদিল মুস্তালিব, ৪:২০৪, হাদিস নং : ১৬৭৭।

ঘ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৫:২১৯।

ঙ) হাকেম : মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন, ১২:৩৬২, হাদিস নং : ৫৪৪১।

চ) বায়হাকী : আব্বাস ইমান, বাবুল হামদি লিলাহিল লায়ী হাদানী, ৪:৩৩, হাদিস নং : ১৪৭৫।

২. ক) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবু মিন ইসমিহী আলী, ৯:২৭২, হাদিস নং : ৪২১৯।

খ) বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়্যাত, বাবু মা জা'আ ফী তা'মীনি..., ৬:২১৮, হাদিস নং : ২৩২২।

গ) আবু নঈম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস সাহাবা, ১২:৩৩৭, হাদিস নং : ৩৯৫১।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় হযরত উসামা বিন যায়িদ ও হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হাত ধরে বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَجِبْهُمَا.

-হে আল্লাহ! আমি তাঁদের উভয়কে ভালোবাসি! আপনিও তাঁদের ভালোবাসুন।^১

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে,

ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ.

-হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে তাঁর পরিবারবর্গকে ভালবাসো।^২

তিনি আরো বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي.

-ওই সন্তার শপথ! যার কুদরতী পাঞ্জায় আমার প্রাণ! হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীদের ভালবাসা আমার নিকটাত্মীয়দের ভালবাসা থেকে অধিক প্রিয়।^৩

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মানাক্বিল হাসান ওয়াহু হুসাইন, ১২:৮৯, হাদিস নং : ৩৪৬৪।
খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিল হাসান ওয়াহু হুসাইন, ১২:২৩৯, হাদিস নং : ৩৭০২।
গ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিল কুরাইশ ওয়া যিকরু কাবায়িল, পৃ. ৩৪৪, হাদিস নং : ৬১৫৬।
ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আবী হুরাইরা, ১৯:৪২৬, হাদিস নং : ৯৩৮৩।
ঙ) নাসায়ী : সুনানুল কুবরা, ৫:৫৩।
২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মানাক্বিল হাসান ওয়াহু হুসাইন, ১২:৯৩, হাদিস নং : ৩৪৬৮।
খ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসনাদ, ৭:৫০৭।
গ) বায়হাকী : শ'আবুল ইমান, বাবু ইরকাবু মুহাম্মদ ফী আহলে বাইতি, ৪:১১৯, হাদিস নং : ১৫৫৮।
৩. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মানাক্বিল কুরাবাতির রাসূল, ১২:৫০, হাদিস নং : ৩৪৩৫।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু কাওলিন নবী, ৯:২০৭, হাদিস নং : ৩৩০৪।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, মুসনাদে আবী বকর সিদ্দীক, ১:৫৫, হাদিস নং : ৫২।
ঘ) বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়াত, বাবু জিমাউ আবওয়াবি মারদ্বির রাসূল, ৮:৪৫৯, হাদিস নং : ৩২৭৬।
ঙ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবুল গনায়েম ওয়া কিসমাতুহা, ২০:১৬৫, হাদিস নং : ৪৯১৩।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَحَبُّ اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا.

-যারা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ভালোবাসে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন।^১

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَحَبُّ اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا. وَقَالَ أَيْضًا مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

-যে হাসান ও হুসাইনকে ভালোবাসে, আল্লাহও তাকে ভালবাসবেন। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, যারা আমাকে ও তাঁদের উভয়কে ভালোবাসে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রতি ইশারা করে ইরশাদ করেন, যারা এদের মাতা-পিতাকে ভালোবাসে তারা কিয়ামতের দিন আমার সাথে অবস্থান করবে।^২

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللَّهُ.

-যারা কুরাইশদের অবমাননা করে আল্লাহ তা'আলা তাদের লাঞ্চিত করবেন।^৩

১. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিল হাসানি ওয়াহু হুসাইনি, ১২:২৪৫, হাদিস নং : ৩৭০৮।
খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফখরিল হাসানি ওয়াহু হুসাইনি, ১:১৬৫, হাদিস নং : ১৪১।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী ইয়ালা ইবনে মুররাহ, ৩৫:৪৪০, হাদিস নং : ১৬৯০৩।
২. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিল আলী ইবনে আবী তালেব, ১২:১৯৫, হাদিস নং : ৩৬৬৬।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু ওয়া মিন মুসনাদি আলী ইবনে আবী তালেব, ২:৪৯, হাদিস নং : ৫৪৩।
৩. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি উসমান ইবনে আফ্ফান, ১:৪৩৫, হাদিস নং : ৪৩০।
খ) আবদুর রাযযাক : আল মুসনাদ, ১১:৫৯।
গ) হাকেম : মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু ফাযায়িল কাবায়িল, ১৬:২৬৬, হাদিস নং : ৭০৫৪।

হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

قَدِّمُوا قُرْبَانًا، وَلَا تُقَدِّمُوا هَا.

-তোমরা লেনদেনে কুরাইশদের অগ্রবর্তী করবে, তাঁদের অগ্রগামী হয়ো না।^১

হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালমা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন যে,

لَا تُؤْذِنِي فِي عَائِشَةَ.

-আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেবে না।^২

হযরত উকবা বিন হারেস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু বকর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখেছি, তিনি হযরত হাসান রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কোলে তুলে নিয়ে বলতেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। ইনি হযরত আলী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তুলনায় হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। একথা শুনে হযরত আলী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে মৃদু হাসতেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন হুসাইন রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কোন এক প্রয়োজনে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট গমন করি। তিনি আমাকে দেখে বললেন, إِذَا

আপনার -كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَأَرْسِلْ إِلَيَّ أَوْ اكْتُبْ فَإِنِّي أَسْتَجِيبُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَاكَ عَلَى بَابِي যখন কোনো প্রয়োজন হবে তখন আমাকে পত্র লিখবেন বা কাউকে আমার নিকট পাঠিয়ে দেবেন। আপনাকে আমার নিকট আসতে দেখে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমার লজ্জাবোধ হয় যে, আল্লাহ আপনাকে আমার দরজায় দেখবে।

হযরত শা'বী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, একবার হযরত যায়িদ বিন সাবেত রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর মায়ের জানাযার নামায পড়ান। তারপর তাঁর নিকট খচ্ছর আনা হয়। তিনি খচ্ছরের পিঠে আরোহণ করেন। ইত্যবসরে হযরত ইবনে আব্বাস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এসে খচ্ছরের লাগাম ধরেন। হযরত যায়িদ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার পুত্র! খচ্ছরের লাগাম ছেড়ে দিন। হযরত ইবনে আব্বাস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বললেন, আমি আলেমদের এভাবে সম্মান করি। তখন হযরত যায়িদ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ইবনে আব্বাস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হাত চুমু দিয়ে বললেন:

هَكَذَا أَمَرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا.

-আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, আমরা যেনো আহলে বায়তের প্রতি এভাবে সম্মান প্রদর্শন করি।

একদিন হযরত ইবনে উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা মুহাম্মদ বিন উসামা বিন যায়িদ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখে বললেন, হায়! যদি তিনি আমার গোলাম হতেন, আর তাঁকে বলা হলো যে, তিনি মুহাম্মদ বিন উসামা, তখন হযরত ইবনে উমর মস্তক অবনত করেন, আর নিজ হাতে যমীনে আঁচড়াতে শুরু করেন আর বলতে থাকেন যে, যদি হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতেন তাহলে ভালবাসতেন।

হযরত ইমাম আওয়ামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, একদা হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত উসামা বিন যায়িদ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কন্যা খলিফা হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট গমন করেন, তাঁর সাথে তাঁর আযাদকৃত এক ক্রীতদাস ছিলো, তিনি তাঁর হাত ধরে রাখেন। খলিফা হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে যান। আর নিজ হাতে কাপড় বেঁধে তাঁর হাত ধরে তাঁকে সামনে নিয়ে বসান। আর নিজে তাঁর সম্মুখে বসে পড়েন। এরপর তাঁর সকল প্রয়োজন পূর্ণ করেন। একান্ত তাকওয়া ও সতর্কতা অবলম্বনের কারণে খলিফা হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজ হাতে কাপড় জড়িয়ে হযরত উসামা বিন যায়িদ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কন্যার হাত ধরেন।

হযরত উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিলাফতকালে নিজ পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাসিক ভাতা তিন হাজার দিরহাম নির্ধারণ

ঘ) তাবরানী : মু'জামুল ক্ববীর, ১:৩১৫।

ঙ) ইবনে হিষ্মান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরিল ইহনাতিহা... ২৬:৭৬, হাদিস নং : ৬৩৭৫।

১. ক) বায়হাকী : ৩'আবুল ইমান, বাবু ওকা'আ মিন আবদিহা, ৪:১১৮, হাদিস নং : ১৫৫৭।

খ) শাফেয়ী : আল মুসনাদ, বাবু কুদ্দিমু কুরাইশান..., ৩:১৯৯, হাদিস নং : ১২৪২।

গ) বায়হাকী : মা'রিফাতুস সুনান ওয়ালা আসার, বাবু কুদ্দিমু কুরাইশান..., ১:৩৭, হাদিস নং : ৩১।

২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ফযলি আয়শা, ১২:১২৪, হাদিস নং : ৩৪৯১।

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মিন ফযলি আয়শা, ১২:৩৮২, হাদিস নং : ৩৮১৪।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু হুস্বির রজুল বা'দা নিসায়িহি..., ১২:২৯৯, হাদিস নং : ৩৮৮৭।

ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী উম্মে সালমা, ৫৩:৪৬৬, হাদিস নং : ২৫৩০৪।

ঙ) তাবরানী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি কুরাইশ ওয়া যিকরিল কাবায়িলি, পৃ. ৩৪৯, হাদিস নং : ৬১৮০।

করেন। আর হযরত উসামা বিন যায়িদ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ভাতা নির্ধারণ করেন সাড়ে তিন হাজার দিরহাম। তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললেন, আপনি আমার উপর হযরত ওসামা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কেন প্রাধান্য দিলেন? কোনো জিহাদেই তো তিনি আমার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন না। হযরত উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন যে, হযরত উসামা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পিতা তোমার পিতার চেয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতি প্রিয়পাত্র ছিলো। তাই আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়জনকে আমার প্রিয়ভাজনের উপর প্রাধান্য দিয়েছি।

হযরত কাবিস বিন রবী'য়া আকার-আকৃতিতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। একদিন কাবিসকে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর দরবারে আসতে দেখে নিজ আসন থেকে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। আর তাঁর দু'চোখের মাঝখানে চুম্বন করেন। আর তাঁকে মার'আব এলাকা দান করেন। কারণ তার আকৃতি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক আকৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলো।

বর্ণিত আছে যে, কোনো কারণে অসম্ভব হয়ে মদীনার গভর্নর জা'ফর বিন সুলায়মান হযরত ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বেত্রাঘাত করতে করতে জর্জরিত করে ফেলে। তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে যান। লোকেরা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। হযরত ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন—

أَشْهَدُكُمْ أَنِّي جَعَلْتُ ضَارِبِي فِي حِلٍّ فَسُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: خِفْتُ أَنْ
أَمُوتَ فَأَلْقَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَحْيِي مِنْهُ أَنْ يَدْخُلَ بَعْضُ آلِهِ
النَّارَ بِسَبَبِي.

—আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য করে বলছি যে, আমি আমার বেত্রাঘাতকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছি। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনার সাথে এরূপ নির্মম ব্যবহার করার পরও আপনি কেন তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন? হযরত ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার ভয় হচ্ছিল যে, আমি এই অবস্থায় হাশরের মাঠে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হবো যে, আমার কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের মধ্যে একজন দোষে

যাচ্ছে। এজন্য আমি ভীষণ লজ্জিত হয়েছি। তাই আমি জা'ফরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

কথিত আছে যে, মনসুর জাফরের নিকট থেকে ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে আঘাত করার প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছা করেন। তখন ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর শপথ! জা'ফর আমার উপর বেত উঠানোর পূর্বেই আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তার কারণে আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

হযরত আবু বকর বিন আইয়্যাশ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যদি আমার নিকট স্ব-স্ব প্রয়োজনে হযরত আবু বকর, উমর ও আলী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আসেন তাহলে আমি সর্বপ্রথম হযরত আলী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রয়োজন পূর্ণ করে দেবো। কারণ তিনি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়।

তিনি আরো বলেন, নিশ্চয় আমার নিকট আকাশ থেকে জমিনে পতিত হওয়া এর চেয়ে বেশী উত্তম হবে যে, আমি হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের উপর হযরত আলী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে প্রাধান্য দেবো।^১

হযরত ইবনে আব্বাস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমুক স্ত্রী ইহজগত ত্যাগ করেছেন। এ সংবাদ শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ সাজদায় পতিত হন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ সময় সাজদায় পতিত হলেন কেন? তখন তিনি বললেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا فَإِنَّ آيَةَ أَكْثَرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

^১ আমার এ অভিমতে কারো ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হওয়া ঠিক হবে না। কারণ আমি হযরত আলী রাধিয়াল্লাহু আনহুকে কখনো হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাধিয়াল্লাহু আনহুর উপর প্রাধান্য দেয়নি, যেহেতু হযরত আলী রাধিয়াল্লাহু আনহু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপনজন এ কারণে আমি সর্বাত্মক তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করার চেষ্টা করবো।

-যখন তোমরা আল্লাহর কোনো নিদর্শন দেখতে পাবে। তখন সাজদায় পতিত হবে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানীত স্ত্রীর ইহজগত ত্যাগ থেকে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে?'

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত দাসী হযরত উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সাহায্যে হযরত আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা সাক্ষাৎ করতেন, আর বলতেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে তাশরীফ নিতেন।^১

একবার হযরত হালিমা সা'দিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আগমন করেন, তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য চাদর বিছিয়ে দেন। আর সানন্দে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি হযরত আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা নিকট আগমন করেতেন তখন তাঁরা উভয়েই তাঁর প্রতি ওইরূপ সম্মান প্রদর্শন করতেন, যে রূপ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন।

১. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফযলি আযওয়াজুন নবী, ১২:৩৯৫, হাদিস নং : ৩৮২৬।

খ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু সুজুদি ইন্দাল আয়াত, ৩:৪৩১, হাদিস নং : ১০১২।

গ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু সালাতিল খুসুফ, ১:৩৩৫।

ঘ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৩:৩৪৩।

ঙ) বায়হাকী : মা'রিফতিস্ সুনান ওয়াল আসার, ৫:৪৬৩, হাদিস নং : ২০৫০।

২. উম্মে আইমানের নাম ছিলো বারকা বিনতে হাফসা। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত ক্রীতদাস হযরত যায়িদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন হযরত ওসামা বিন যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহুঁর মাতা। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় পাত্র। অধিকাংশ সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, আমার মায়ের পর তিনি আমার নিকট সম্মানের পাত্র। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাল্যকালে হযরত আমেনা রাদিয়াল্লাহু আনহা উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সাথে নিয়ে মদীনায়ে গমন করে। তিনি বনী নাজ্জার গোত্রে একমাস হযরত আমেনা রাদিয়াল্লাহু আনহা সাহায্যে মদীনাতে অবস্থান করেন। তিনি বলেন, বাল্যকালে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে মদীনায় ইহুদীরা অভিমত প্রকাশ করে যে, এই শিশু আল্লাহর নবী হবেন। তিনি তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনেন। হযরত আমেনা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবওয়া নামক স্থানে হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করেন সেখানে তাঁর ওফাত হয়। তখন হযরত উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু আনহা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর তাঁকে নিয়ে মক্কা ফিরে এসে তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন। (নাসীমুর রিয়ায : ৩/৪২০)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

فِي تَوْقِيرِهِ وَبِرِّهِ ۖ تَوْقِيرُ أَصْحَابِهِ وَبِرُّهُمْ

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান ও সদাচার প্রসঙ্গে

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সদাচার প্রসঙ্গে এটাও বলা হয়েছে যে, তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সদাচার করা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে অবগত হওয়া। তাঁদের উত্তম প্রশংসা করা, তাঁদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা, তাঁদের মাঝে যে মনোমালিন্য হয়েছে সে বিষয় নীরবতা অবলম্বন করা, তাঁদের শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। তাঁদের সম্পর্কে কোনোভাবে পক্ষপাতদুষ্টতাকে প্রশয় না দেয়া। ঐতিহাসিকদের মনগড়া অভিমত, হাদীস শরীফের নামে মিথ্যা বর্ণনা, পঞ্চদশ শিয়া ও বিদ'আতী- যারা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মিথ্যা অভিমত প্রকাশ করে অনার্বক ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে তাদের মতামতের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া। আর তাঁদের গুণাবলীর আলোচনা করা, তাঁদের বাণীগুলোর যথার্থ ব্যাখ্যা করা, তাঁদের সকলকেই সত্যানুসারী ও ন্যায়পরায়ণ জানা। কোনোক্রমেই তাদের দোষচর্চা না করা। তাঁদের গুণাবলী ও সঠিক মর্যাদাকে জনসম্মুখে তুলে ধরা। এছাড়া তাঁদের ব্যাপারে অন্যান্য বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা। তাঁদের সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا - তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমাদের আপন রসনাকে ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করো।' কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ

بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي

التَّوْرَةِ ۖ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَزَعٍ أُخْرِجَ شَطَطُهُ ۖ فَتَازَرَهُ

فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقَيْهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ فِيهِمُ

১. ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ২:১১৬।

খ) আবু নঈম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস সাহাবা, বাবু মিন ইসামিহি উবাইদ, ১৩:৩৬৬।

الْكَفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ

مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

-মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে, কাফিরদের উপর কঠোর এবং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিশীল। তুমি তাদেরকে দেখবে, রুকু'কারী, সাজদাহরত, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সম্ভ্রষ্ট কামনা করে, তাদের চিহ্ন তাদের চেহারায়ে রয়েছে সাজদার চিহ্ন থেকে, তাদের এ বৈশিষ্ট্য তাওরীতের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের (অনুরূপ) বৈশিষ্ট্য রয়েছে ইজিলে। যেমন একটা ক্ষেত, যা আপন চারা উৎপন্ন করেছে, অতঃপর সেটাকে শক্তিশালী করেছে, তারপর তা শক্ত হয়েছে, তারপর আপন কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দণ্ডায়মান হয়েছে, যা চাষীদেরকে আনন্দ দেয়, যাতে তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর (হিংসার আগুনে) জ্বলে। আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের অঙ্গিকার করেছেন তাদের সাথে, যারা তাদের মধ্যে ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ।^১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ

اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ ﴿١١﴾

-আর সবার মধ্যে অগ্রগামী প্রথম মুহাজির ও আনসার। আর যারা সৎকর্মের সাথে তাদের অনুসারী হয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সম্ভ্রষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সম্ভ্রষ্ট। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান। তারা সদা-সর্বদা সেগুলোর মধ্যে অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।^২

^১ আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২৯।

^২ আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১০০।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ

الشَّجَرَةِ

-নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্ভ্রষ্ট হয়েছেন বিশ্বাসীগণের প্রতি, যখন তাঁরা বৃক্ষের নীচে আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিলো।^১

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে-

رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

-মুসলমানদের মধ্যে কিছু এমন পুরুষ রয়েছে, যারা সত্য প্রমাণিত করেছে যে-ই অঙ্গীকার যা তারা আল্লাহর সাথে করেছিলো। সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপন মান্নত পূর্ণ করেছে, এবং কেউ কেউ অপেক্ষা করছে। আর তারা সামান্যটুকুও পরিবর্তিত হয় নি।^২

হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ.

-আমার পরে তোমরা আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অনুসরণ করবে।^৩

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.

^১ আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:১৮।

^২ আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:২৩।

^৩ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিবি আবু বকর ওয়া উমর, ১২:১২১, হাদিস নং : ৩৫৯৫।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী হুযাইফা ইবনে ইয়ামান, ৪৭:২৩০, হাদিস:

২২১৬১।

গ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৫:২১২।

ঘ) হাকেম : মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন, ১০:২৪৩, হাদিস নং : ৪৪২৫।

ঙ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৭:৪৬০।

-আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রসদৃশ। তোমরা তাঁদের যে-কোনো একজনকে অনুসরণ করলে হিদায়াত পেয়ে যাবে।^১

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَثَلُ أَصْحَابِي فِي أُمَّتِي كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، لَا يَضْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ.

-আমার সাহাবীদের উদাহরণ খাদ্যে লবণের মতো, লবণ ব্যতীত কোনো খাবারই ঠিক হয় না।^২

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اللَّهُ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِإِبْغِظِي. أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

-তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। আমার পর তোমরা তাঁদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল স্থির করো না। যারা তাঁদেরকে ভালোবাসবে তাঁরা আমার ভালোবাসার কারণেই তাঁদের ভালোবাসবে। আর যারা তাঁদের হিংসা করবে তাঁরা আমাকে হিংসা করে বলেই তাঁদের হিংসা করে। যারা তাঁদেরকে কষ্ট দেবে, তারা আমাকে কষ্ট দেবে, যারা আমাকে কষ্ট দেবে তারা আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দেবে, যারা আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দেবে, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদের পাকড়াও করবেন।^৩

১. ক) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি কুরাইশ ওয়া যিকরু কাবায়িল, পৃ. ৩১০, হাদিস নং : ৬০০৯।

খ) ইবনে বাত্তা : ইবানাতুল কুবরা, বাবু ইন্নামা আসহাবী কানু নুজুম, ২:২২০, হাদিস নং : ৭০৯।

গ) কুরতুবী : জামিউল বয়ানিল ইলমি ওয়া ফয়দালিহি, ২:৮৯৮, হাদিস নং : ১৬৮৪।

২. ক) আবু ইয়াল্লা : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আনাস ইবনে মালিক, ৫:১৫১, হাদিস নং : ২৭৬২।

খ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৭:২৬৮।

গ) ইবনে মুবারক : আয্ যুহদ, বাবু মা জা'আ ফীল ফকর, ১:২০১।

ঘ) বাগতী : শরহু সুন্নাহ, বাবু ফয়দলিস সাহাবা, ১৪:৭৩, হাদিস নং : ৩৮৬৪।

ঙ) বায্ য়ার : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হামযা, ১৩:২১৯, হাদিস নং : ৬৬৯৮।

৩. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী মান সাক্বা আস-হাবীন নবী, ১২:৩৬২, হাদিস নং : ৩৭৯৭।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী আবদিলাহ ইবনে মাগফাল, ৫:৫৪, হাদিস নং : ২০৫৬৮।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

-খবরদার! তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গাল-মন্দ করবে না। তোমাদের উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণদান তাঁদের একমুঠি যব দানের সমান হবে না।^১

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

-যে আমার সাহাবাদের গালি দেবে তার উপর আল্লাহ তা'আলা ও ফিরিশতাগণের অভিসম্পাত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার ফরয নফল কোনো ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।^২

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا.

-তোমরা আমার সাহাবাগণের আলোচনার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করবে, আর তাঁদের সম্পর্কে অমূলক ধারণা ও অভিমত প্রকাশ করবে না।^৩

গ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরিল যাজরি আতিন্ তিখায়, ১৬:২৪৪, হাদিস নং : ৭২৫৬।

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কাওলিন্ নবী, ১২:৫, হাদিস নং : ৩৩৯৭।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তাহরীমি সাক্বিস সাহাবা, ১২:৩৬৯, হাদিস নং : ৪৬১০।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী মান সাক্বা আসহাবীন নবী, ১২:৩৬১, হাদিস নং : ৩৭৯৬।

ঘ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফীন্ নাহী আন্ সাক্বা আসহাবীন নবী, ১২:২৬৪, হাদিস নং : ৪০৩৯।

ঙ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফয়দলি আহলি বদর, ১:১৮৯, হাদিস নং : ১৫৭।

২. ক) ইবনে হাম্বল : ফাযায়িলুস সাহাবা, বাবু ফাযায়িলি আবদিলাহ ইবনে আক্বাস, ১:৫২, হাদিস : ৮।

খ) তাবরানী : আদ-দোয়া, বাবু যিকরি মান লা'আনাহু রাসূলিল্লাহ, ১:৫৮১, হাদিস নং : ২১০৮।

গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, বাবু আবদিলাহ ইবনে আবীল হযাইল, ১২:১৪২, হাদিস নং : ১২৭০৯।

৩. ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ২:১১৬।

খ) আবু নঈম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস সাহাবা, বাবু মিন ইসমিহি উবাইদ, ১৩:৩৬৬।

إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِينَ، سِوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً، فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِي، وَفِي كُلِّ أَصْحَابِي خَيْرٌ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِي وَفِي أَصْحَابِي كُلُّهُمْ خَيْرٌ.

-নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নবী ও রাসূলগণের পরে আমার সাহাবাগণকে সমস্ত সৃষ্টিজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মধ্য থেকে চারজনকে আমার জন্য বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। তাঁরা হলেন- হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী রিদওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাইন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে আমার সমস্ত উম্মাতের মধ্যে উত্তম বানিয়েছেন। আর আমার সাহাবাগণ সকলেই কল্যাণের আধার।^১

হযরত সালাহুদ্দীন আল্লাহিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ أَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَ عُمَرَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي.

-যে ব্যক্তি উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল। আর যে ব্যক্তি উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে যেন আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল।^২

হযরত ইমাম মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, مَنْ أَبْغَضَ الصَّحَابَةَ -যে ব্যক্তি সাহাবাগণের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাঁদের গালমন্দ করে, মুসলমানদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তার কোন অংশ নেই। হযরত ইমাম মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও অন্যান্য আলেমগণ এই মাসায়ালা সূরা হাশরে বর্ণিত আয়াতের আলোকে বর্ণনা করেছেন-

^১ ক) খাসাবী : তারীখে বাগদাদ, ৩:১৬২।

খ) যাহাবী : আল মিয়ান, ৪:১২২।

গ) হাইছুমী : আল জামি', ১০:১৬।

^২ ক) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবু মিন ইসমিহি 'মুহাম্মাদ', ৭:১৮, হাদিস নং : ৬৭২৬।

খ) আকীলী : আদ-দোয়াফা, ৩:৫৬।

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ^১ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْيَانِ^২ مِنْكُمْ^৩ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^৪ وَاتَّقُوا اللَّهَ^৫ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

-আর আল্লাহ আপন রাসূলকে তাদের নিকট থেকে যে গণীমত প্রদান করিয়েছেন, অতঃপর তোমরা তে তাদের উপর না নিজেদের অশ্ব পরিচালনা করেছে এবং না উষ্ট্র। হ্যাঁ, আল্লাহ আপন রাসূলগণের আয়ত্ত্ব দিয়ে দেন যাকে চান। আর আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন। আল্লাহ আপন রাসূলকে নগরবাসীদের নিকট থেকে যে গণীমত প্রদান করিয়েছেন, তা আল্লাহ ও রাসূলের এবং নিকটাত্মীয়দের আর এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের, যাতে তা তোমাদের ধনীদের সম্পদ না হয়ে যায় এবং যা কিছু তোমাদেরকে রাসূল দান করেন তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহর শাস্তি কঠিন।^৬

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٨﴾

^১ আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:৬-৭।

-এবং ওইসব লোক যারা তাঁদের পরে এসেছে, তারা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের ভাইদেরকেও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না! হে আমাদের রব! নিশ্চয় তুমিই অতি দয়ালু, দয়াময়।^১

হযরত ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, مَنْ غَاظَهُ أَصْحَابُ مِنْ غَاظَهُ أَصْحَابُ -যে ব্যক্তি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের প্রতি রাগান্বিত হবে, সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন-

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ^২

-যাতে তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর ঈর্ষার আগুনে জ্বলে।^২

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, خَصَلَتَانِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ نَجَا، الصُّدُورُ، وَحُبُّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-যার মধ্যে দু'টি অভ্যাস বিদ্যমান থাকবে সে মুজ্জিলাভ করবে। এক. সত্যবাদিতা, দুই. হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচরদের ভালবাসা।

হযরত আইয়ুব সখতিয়ানী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, مَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ. وَمَنْ أَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ أَوْضَحَ السَّبِيلَ، وَمَنْ أَحَبَّ عُثْمَانَ فَقَدْ اسْتَضَاءَ بِنُورِ اللَّهِ، وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَخَذَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَمَنْ أَحْسَنَ الشَّعَاءَ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ بَرِيَ مِنَ النِّفَاقِ، وَمَنْ انْتَقَصَ أَحَدًا مِنْهُمْ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ

^১. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:১০।

^২. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২৯।

لِلسُّنَّةِ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ وَأَخَافُ أَنْ لَا يَضَعَدَ لَهُ عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى يُجِئَهُمْ جَمِيعًا وَيَكُونَنَّ قُلُوبُهُمْ سَلِيمًا.

-যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ভালোবাসলো, সে যেন দীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করলো। আর যে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ভালোবাসলো, সে নিজের রাস্তাকে আলোকোজ্জ্বল করে নিল। আর যে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ভালোবাসলো, সে যেন আল্লাহর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হলো। আর যে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ভালোবাসলো, সে যেন এক সুদৃঢ় রজ্জু ধারণ করলো। আর যে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের প্রশংসা করলো, সে কপটতা মুক্ত হয়ে গেল। যারা তাঁদের কোনো একজনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো, তারা বিদ'আতী, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী আলেমদের আদর্শের বিরোধী। আমার আশংকা হয় যে, এরূপ ব্যক্তিদের কোনো নেক আমলই আসমানে উঠবে না। যতক্ষণ না তারা সকল সাহাবায়ে কেলামকে ভালবাসবে। আর তাঁদের সম্পর্কে অন্তরকে নিষ্কলুষ ও বিদ্বেষমুক্ত করবে না।

হযরত খালিদ বিন সাঈদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي رَاضٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْرِفُوا ذَلِكَ لَهُ، أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي رَاضٍ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرِ، وَسَعْدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ رَاضٍ، فَأَعْرِفُوا ذَلِكَ لَهُمْ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لِأَهْلِ بَدْرِ وَالْحُدَيْبِيَّةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ احْفَظُونِي فِي أَخْتَانِي وَفِي أَصْهَارِي وَفِي أَصْحَابِي لَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَظْلَمَةٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَا تُؤْمَبُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ.

-হে লোক সকল! আমি আবু বকরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমরা একথা ভালোভাবে শুনে রেখো। হে লোক সকল! আমি উমর, উসমান, আলী,

তালহা, জোবায়ির, সাঈদ, সা'আদ, আবদুর রহমান, আউফ এবং অগ্রগামী মুহাজির তাঁদের সকলের প্রতি সম্বোধন করেছেন। তোমরাও তাঁদের ভালোভাবে চিনে রেখো।^১ হে লোক সকল! তোমরা আর স্মরণ রেখো! আল্লাহ তা'আলা বদর ও হুদাইবিয়া অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার খাতিরে আমার সাহাবী, আমার শত্রু ও আমার জামাতাদের ইচ্ছত-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখো। তোমাদের অবস্থা যেন এরূপ না হয় যে, কিয়ামতের দিনে তোমাদের নিকট থেকে তাঁদের উপর অত্যাচার করার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হয়। (যা তোমরা তোমাদের কথা ও কাজের দ্বারা করেছো) কারণ এটা যেন এক যুলুম, যা কিয়ামতের দিবসে ক্ষমা করা হবে না।^২

একবার এক ব্যক্তি মা'আফ বিন ইমরান রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললেন, উমর বিন আবদুল আযীয ও আমীরে মুয়াবিয়া রাধিয়াল্লাহু আনহুমা মধ্যকার মর্যাদা বেশি? তখন তিনি খুব রাগান্বিত হলেন, আর বললেন, لَا يُقَاسُ بِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ. مُعَاوِيَةُ صَاحِبُهُ وَصَهْرُهُ وَكَاتِبُهُ وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِ اللَّهِ - হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের অন্যদের উপর তুলনা করা যায় না। হযরত মুয়াবিয়া রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তাঁর শত্রু পক্ষের নিকটাত্মীয় (শ্যালক), ওহীর লেখক ও সংরক্ষক ছিলেন।

সুতরাং খলিফা উমর বিন আবদুল আযীয রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় গুণাবলী ও মর্যাদার কারণে কখনও তাঁর সমকক্ষ হবেন না। একবার হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক ব্যক্তির জানাঘা উপস্থিত করা হয়। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাঘার নামায না পড়ে ইরশাদ করেন,

كَانَ يَنْغُصُ عُثْمَانَ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ.

-এ ব্যক্তি ওসমান রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করতো, এ কারণে আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।^৩

^১ ক) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, ৫:৬৫।

খ) আবু নঈম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস সাহাবা, বাবু মিন ইসমিহি সা'ঈদ, ৯:২৪২, হাদিস নং : ২৯২৬।

^২ ক) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, ৬:১০৪।

খ) ইবনে আদী : আল কামেল, ৬:৫৯।

গ) হাইছুমী : আল জামে', ৯:১৫৭।

^৩ তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী মানাক্বিবি উসমান, ১২:১৭০, হাদিস নং : ৩৬৪২।

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

فَاعْفُوا عَنْ مُسِيئَتِهِمْ وَاقْبَلُوا مِنْ تَحْسِنِهِمْ.

-তোমরা তাঁদের ভুল-ত্রুটি এড়িয়ে চলো। তাঁদের উত্তম গুণাবলী গ্রহণ করো।^১

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، وَأَصْهَارِي، فَمَنْ حَفِظَنِي فِيهِمْ حَفِظَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْنِي فِيهِمْ تَخَلَّى اللَّهُ مِنْهُ، وَمَنْ تَخَلَّى اللَّهُ مِنْهُ أَوْشَكَ أَنْ يَأْخُذَهُ. مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِي كُنْتُ لَهُ حَافِظًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

-তোমরা আমার ইচ্ছত সম্মানের কারণে আমার সাহাবা, আমার শত্রু পক্ষের আত্মীয়দের ইচ্ছত ও সম্মান রক্ষা করবে। কারণ যে ব্যক্তি আমার মান-সম্মানের কারণে তাঁদের ইচ্ছত সম্মান রক্ষা করে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের নিরাপত্তা দানকারী হবেন। যারা তাঁদের সম্মান রক্ষা করবে না, তারা আল্লাহ তা'আলার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, যে আল্লাহর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে অচিরেই তাকে পাকড়াও করা হবে।^২

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِي وَرَدَّ عَلَيَّ حَوْضِي أَوْ مَنْ لَمْ يَحْفَظْنِي فِي أَصْحَابِي لَمْ يَرْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مِنْ بَعِيدٍ.

^১ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী ফদলিল আনসার, ১২:৪১০, হাদিস নং : ৩৮৩৯।

খ) তাবরানী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি কুরাইশ ওয়া যিকরিল কাবায়িল, পৃ. ৩৬২, হাদিস নং : ৬২৪০।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবি সা'ঈদ, ২৩:৪৫৯, হাদিস নং : ১১৪১৪।

ঘ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসনাদ, ৭:৫৪১।

ঙ) আবু ইয়াল্লা : আল মুসনাদ, ৩:৩৩, হাদিস নং : ৯৮৯।

^২ ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১২:৩৪৬।

খ) আবু নঈম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস সাহাবা, বাবু মিন ইসমিহি সা'ঈদ, ৯:২৪২, হাদিস নং : ২৯২৬।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : ফাওয়ায়িলুস সাহাবা, হাদিস নং : ১৭৩৩।

-যারা আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আমার মান-সম্মান রক্ষা করবে তারা হাউজে কাউসারে আমার নিকটবর্তী হবে, যারা তা রক্ষা করবেনা তারা আমাকে দূর থেকেই দেখবে।^১

হযরত ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

هَذَا النَّبِيُّ مُؤَدَّبُ الْخَلْقِ الَّذِي هَدَانَا اللَّهُ بِهِ وَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، يَخْرُجُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَيْعِ فَيَدْعُو لَهُمْ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كَالْمُودِّعِ لَهُمْ وَبِذَلِكَ أَمَرَهُ اللَّهُ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ بِحُبِّهِمْ وَمَوَالِيهِمْ، وَمُعَادَاةِ مَنْ عَادَاهُمْ.

-আমাদের এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টজীবকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারী। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হিদায়াত করেছেন। তাঁকে বিশ্বাসীর জন্য অনুকম্পাস্বরূপ করেছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের মধ্যভাগে জান্নাতুল বাকীর কবরস্থানে গমন করতেন। আর সেখানে সমাহিত সাহাবীগণের জন্য এভাবে দোয়া ও ইস্তিগফার করতেন, মনে হতো কেউ যেনো তাঁদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করছে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরাত সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসার ও হৃদয়তা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে বলেছেন।

হযরত কা'ব রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে,

لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَهُ شَفَاعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

-হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কোন সাহাবী নেই কিয়ামত দিবসে যার শাফায়াতের অধিকার থাকবেনা।

এজন্য হযরত কা'ব রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত মুগীরা বিন নাওফল রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট কিয়ামতের দিন তাঁর জন্য শাফায়াত করার আবেদন করেন।

১. ক) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, ১:৩০৫, হাদিস নং ; ১০২৫।

খ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১২:২৮৩।

গ) হাইছুমী : আল জামি', ৭:২২৩।

হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তাসতরী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

لَمْ يُؤْمِنْ بِالرَّسُولِ مَنْ لَمْ يُؤَقِّرْ أَصْحَابَهُ وَلَمْ يُعَزِّزْ أَوَامِرَهُ.

-কোন ব্যক্তি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসস্থাপনকারী হতে পারবে না যতক্ষণ না তাঁর সাহাবীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেনা এবং তাঁর নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

فِي إِغْزَازِ مَالِهِ مِنْ صَلَوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْكِنَةٍ وَمَشَاهِدِ

হযরত সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে
হযরত সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে এটাও
অন্তর্ভুক্ত যে, ওইসব বস্তু যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, সেগুলোর প্রতিও সম্মান প্রদর্শন
করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। যেমন- তাঁর বাসস্থান ও উপবিষ্ট হওয়ার স্থান,
পবিত্র মক্কা, মদীনা ও অন্যান্য স্থানসমূহ, যা তাঁর পবিত্র হাতের স্পর্শে ধন্য
হয়েছে বা যে স্থানসমূহ তাঁর স্পর্শে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যেমন
হেরাশুহা, সাওর পর্বত, ইত্যাদি স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যিক।

হযরত সুফিয়া বিনতে নাজদাহ রাহিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, হযরত আবু
মাহজুরা রাহিয়াল্লাহু আনহুর মাখার সামনের চুল অনেক লম্বা ছিলো, তিনি বসলে
তাঁর মাখার চুল মাটিতে পৌঁছে যেতো। এ সম্পর্কে লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে
যে, আপনি আপনার মাখার চুল মুগ্ধ করেন না কেন? তিনি বলেন,

لَمْ أَكُنْ بِالَّذِي أَخْلَقَهَا وَقَدْ مَسَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ.

-যে চুলগুলো হযরত সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতের
স্পর্শধন্য হয়েছে, তা আমি কাটতে পারবোনা।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর টুপির মধ্যে হযরত
সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি চুল মুবারক রক্ষিত ছিলো। কোনো
এক যুদ্ধে তাঁর ওই টুপি মাটিতে পড়ে যায়। তিনি ওই টুপি উঠানোর জন্য
পাগলের মতো দৌড়তে শুরু করেন। যেহেতু ওই যুদ্ধে অনেক মুজাহিদ শাহাদাত
বরণ করেন, এ কারণে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, সামান্য একটি টুপির জন্য এতো
দূরে দৌড়লেন কেন? তিনি বললেন,

لَمْ أَفْعَلْهَا بِسَبَبِ الْقَلَنْسُوءَةِ، بَلْ لِمَا تَضَمَّتْهُ مِنْ شَعْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِيَلَّا أُسَلَّبَ بِرَكَّتِهَا وَتَقَعَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ.

-আমি শুধু একটি টুপির জন্য এমনটি করিনি, বরং আমি এমনটি এ
কারণে করেছি যে, টুপির মধ্যে হযরত সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের
চুল মুবারক রক্ষিত ছিলো। তাই আমি শঙ্কিত ছিলাম যে, সেটার বরকত
আমার থেকে দূর হয়ে যাবে এবং তা কোন মুশরিকের হস্তগত হয়ে
যাবে।

ইবনে উমর রাহিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে বর্ণিত,

كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى مَقْعَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ

ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ.

-তিনি হযরত সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের মিন্বারে উপবিষ্ট হওয়ার
স্থানে নিজের হাত বুলিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলে মালিশ করে নিতেন।

এ কারণে হযরত ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পবিত্র মদীনায় কোনো
বাহনে আরোহন করতেন না। তিনি বলতেন,

أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَطَأُ تُرْبَةً فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَافِرِ
دَابَّتِهِ.

-এই ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি আমার লজ্জাবোধ হয়, যে পবিত্র ভূমিতে
আল্লাহর রাসূল সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম আরাম করছেন, সে ভূমি
আমি বাহনের উপর আরোহন করবো।

বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর অনেকগুলো ঘোড়া ইমাম শাফেঈ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা
আনহুকে দান করে দেন। তখন ইমাম শাফেঈ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
বললেন, আপনার ব্যবহারের জন্য অন্তত একটি ঘোড়া রেখেদিন। ঠিক তখনই
হযরত ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ উত্তর দেন।

হযরত আবু আবদুর রহমান আস সুলামী, আহমদ বিন ফাজলুবিয়া জাহেদ যিনি
গাজী তীরন্দাজ ছিলেন, তাঁর ব্যাপারে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

مَا مَسَسْتُ الْقَوْسَ بِيَدِي إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ مُنْذُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَخَذَ الْقَوْسَ بِيَدِهِ.

-যখন থেকে আমি জানতে পারি যে, আমার হাতের এই ধনুক হযরত
সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম হাত মুবারক দিয়ে স্পর্শ করেছেন, তখন
থেকে আমি বিনা অযুতে এ ধনুক হাত দিয়ে স্পর্শ করিনি।

فَمَنْ قَالَ: تُرْبَةُ الْمَدِينَةِ رَدِيَّةٌ. يُضْرَبُ ثَلَاثِينَ دِرَّةً وَأَمْرٌ بِحَبْسِهِ، وَكَانَ لَهُ
قَدْرٌ وَقَالَ: مَا أَخَوَجَهُ إِلَى ضَرْبِ عُنُقِهِ. تُرْبَةُ دُفِنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزَعُمُ أَنَّهَا.

-যে একথা বলেছিল, 'মদীনা শরীফের মাটি নিকৃষ্ট', তাকে যেন ত্রিশ
বেত্রাঘাত করা হয় এবং খেঁচতার করা হয়। অথচ সে একজন
খ্যাতিধর ব্যক্তি ছিলো। তিনি আরো বললেন, মূলতঃ লোকটি মৃত্যুদণ্ড
লাভের উপযুক্ত হয়ে গেছে। কারণ যে যমীনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাধিস্থ হয়েছেন, তার ধারণা এই ভূমি পবিত্র
নয়।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা তায়্যিবা সম্পর্কে
ইরশাদ করেন,

مَنْ أَخَذَتْ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

-যে ব্যক্তি মদীনাতে অশ্রীতিকর ঘটনা ঘটাবে বা কোনো দূর্ঘটনাকারীকে
আশ্রয় দেবে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফিরিশতাগণ তার উপর
অভিসম্পাত বর্ষণ করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা তার ফরয, নফল
কোনো ইবাদতই কবুল করবেন না।^১

বর্ণিত আছে যে,

أَخَذَ قَضِيبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَنَاولَهُ
لِيَكْسِرَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَأَخَذَتْهُ الْأَكِلَةُ فِي رُكْبَتَيْهِ فَقَطَعَهَا
وَمَاتَ قَبْلَ الْحَوْلِ

ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু হারামিল মদীনা, ৬:৪২০, হাদিস নং : ১৭৩৭।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফখলিল মদীনা, ৭:১০৩, হাদিস নং : ২৪২৯।
গ) নাসায়ী : সুনানুল কুবরা, ২:৪৮৬।
ঘ) আবু ইয়াল্লা : আল মুসনাদ, বাবুল মাদীনা হারামুন, ১:২৮৪, হাদিস নং : ২৮০।

-জাহজাহ আল-গিফারী একবার হযরত উসমান রাধিয়াল্লাহু তা'আলা
আনহুর নিকট থেকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র লাঠি
নিয়ে তা হাটুর উপর রেখে ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করে। তখন উপস্থিত
জনতা তাকে বারণ করে। সে লোকদের নিষেধ শুনে তার ওই ইচ্ছা
ত্যাগ করে, কিন্তু এর অল্পকিছু দিন পর তার হাটুতে এক ফোঁড়া দেখা
দেয়, তার পা কেটে ফেলতে হয়, আর অবশেষে একবছর পূর্ণ না হতেই
তার মৃত্যু হয়।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْتَرِي آتِيًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

-যে ব্যক্তি আমার এ মিম্বরে বসে মিথ্যা শপথ করবে, সে যেন তার
ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নিল।^২

কাযী আবুল ফযল আয়ায রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি জানতে
পেরেছি যে, আবুল ফযল জাহজাহী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন রওজা
মুবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা নগরীতে আগমন করেন, শহরের নিকট পৌঁছে
তিনি সাওয়ারী থেকে নীচে নেমে চিৎকার করতে করতে সামনে অগ্রসর হয়ে
নিম্নোক্ত কাসিদা পাঠ করতে শুরু করে।

وَلَمَّا رَأَيْنَا رُسْمَ مَنْ لَمْ يَدْعُ لَنَا فَوَادَا لِعِرْفَانِ الرَّسُولِ وَلَا لَبَّا

نَزَلْنَا عَنِ الْأَكْوَارِ نَمْشِي كَرَامَةً لِمَنْ بَانَ عَنْهُ أَنْ نُلِمَّ رُكْبًا

-আমি যখন ওই ব্যক্তির নিদর্শনাবলী ও জীর্ণ বাসস্থান দেখি, যিনি স্বীয়
ইশকে মগ্ন করে আমাদের অন্তর ও আকলকে এ নিদর্শনাবলী চেনার
যোগ্য রাখেনি, তাই আমরা সাওয়ারী থেকে নীচে নেমে পড়ি। আর
এরূপ মাহবুবের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যে এ দরবার থেকে পৃথক হয়ে গেছে।
(ওফাত লাভ করেছেন।) ওই কথা থেকে বাঁচার খাতিরে আমরা
আরোহণ করে যিয়ারত করবো। অথবা আদবের কারণে পায়ে হেঁটে
চলতে শুরু করবো।

ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফীল হাদিস, ৪:৪৯৫, হাদিস নং : ১২১৪।

খ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৭:৩৯৮।

গ) হাকেম : মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু মান হালাফা আলা মিম্বারী, ১৮: ১৭৬, হাদিস : ৭৯১৯।

ঘ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরি ইজাবি দুখুলিন্ নার, ১৮:২৩৭, হাদিস নং : ৪৪৪৫।

আশ-শিফা [২য় খণ্ড]
কোনো কোনো সত্যপন্থি প্রেমিকদের সম্পর্কে বর্ণিত, তারা যখন পবিত্র মদীনা নগরীর নিকটবর্তী পৌছতেন, তখন নিম্নোক্ত কাসিদা পাঠ করতেন।

رُفِعَ الْحِجَابُ لَنَا فَلَا حُ لَنَاظِرُ قَمَرُ تُقَطِّعُ دُونَهُ الْأَوْهَامُ

-আমাদের জন্য পর্দা উঠিয়ে দিন, দর্শনকারীদের সামনে এমন চাঁদ চমকে দিন, যেন আমরা তাঁর সামনে হাটু গেড়ে বসে যেতে পারি।

وَإِذَا الْمَطِيُّ بِنَا بَلَّغَنَّا مُحَمَّدًا فَظَهَرُوا مِنْ عَلَيِّ الرِّحَالِ حَرَامُ

-যখন আমাদের বাহনসমূহ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছে তখন তাদের পিঠে (কাসওয়া ও সাওয়ারীতে) আরোহন করা আমাদের জন্য হারাম হয়ে যায়।

قَرَّبْنَا مِنْ خَيْرٍ مِّنْ وَطِئِ الثَّرْيِ فَلَهَا عَلَيْنَا حُرْمَةٌ وَذِمَامُ

-ওই বাহনসমূহ আমাদেরকে ওই মহান সত্তার নিকটবর্তী করে দেয় যারা যমীনে বিচরণকারী সকল বস্তু থেকে উত্তম হয়। সুতরাং ওই বাহনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের উপর আবশ্যিক হয়ে যায়।

কোনো কোনো মাশায়েখ সম্পর্কে বর্ণিত, তারা পায়ে হেঁটে হজ্জ পালন করতেন। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো। তখন তাঁরা বলতেন,

الْعَبْدُ الْأَبْقَى يَأْتِي إِلَى بَيْتِ مَوْلَاهُ رَاكِبًا ! لَوْ قَدَرْتُ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى رَأْسِي مَا مَشَيْتُ عَلَى قَدَمَيَّ .

-পলাতক ভৃত্য কী তার মনিবের ঘরে বাহনে আরোহন করে আসতে পারে? যদি আমাদের মাথার উপর ভর করে আসা সম্ভব হতো, তাহলে আমরা কস্মিনকালেও পায়ে হেঁটে আসতাম না।

কাযী আযায রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যে যমীন ওহী নাজিল হওয়ার কারণে বরকতময় হয়েছে নিঃসন্দেহে সেই যমীন সম্মানের যোগ্য হয়েছে। ওই পবিত্র ভূমি যেখানে হযরত জিবরাঈল ও মিকাইল আলাইহিমাস সালাম অবতরণ করতেন, ওই পবিত্র ভূমি যেখান থেকে রুহুল আমীন ও অন্যান্য ফিরিশতাগণ উপরে আরোহন করতেন। ওই পবিত্র যমীন যেখানে সর্বদা তাসবীহ ও পবিত্রতা ঘোষণার আওয়াজ ধ্বনিত হয়। যে পবিত্র মাটিতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাম করছেন। আর এখনো বিদ্যমান আছেন। সেই পবিত্র স্থান যেখান থেকে আল্লাহ তা'আলার ঘীন ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সুনাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে স্থানের মসজিদসমূহে পবিত্র কুরআন মজীদ শিক্ষা দান করা হয়। যে স্থানে নামায সুসম্পন্ন হয়। যেই যমীন মু'জিয়া ও দলিলের প্রামাণ্য স্থান। যে স্থানে ঘীন ইসলাম ও হজ্জের নিদর্শনাবলী বিদ্যমান রয়েছে। যেই স্থানে সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করছেন। যেই যমীনকে তিনি নিজের আবাস স্থির করেছেন। যেই যমীন থেকে নবুওয়াতের জ্ঞানফোয়ারা প্রবাহিত হয়েছে। অসংখ্য অনুকম্পার (ফয়েয) ধারা প্রবাহিত হয়েছে। যেই যমীনের সাথে রিসালতের সম্বন্ধ জড়িয়ে আছে। এটা ওই ভূমি যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মবারকের সাথে সর্বপ্রথম মিলিত হয়েছে। এই যমীন পবিত্র ও সম্মানিত, যার প্রতিটি ধূলিকণা ইজ্জত সম্মানের যোগ্য হয়েছে। আর সেজন্য আমাদের উচিত হবে এ পবিত্র ভূমিকে সম্মান করা ও এর পবিত্র সৌরভে আমাদের অন্তরাত্মা সুবাসিত করা। তাঁর আবাসস্থলের প্রাচীরসমূহ চুম্বন করা।

يَا دَارَ خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ وَمَنْ بِهِ هُدًى الْأَنَامُ وَخَصَّ بِالْآيَاتِ

-হে সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্রাম গ্রহণের স্থান! আর এটা এমন পবিত্র স্থান যার কারণে মানুষ হিদায়াত পেয়েছে। আর মু'জিয়া প্রকাশ হয়েছে।

عِنْدِي لِأَجْلِكَ لَوْغَةٌ وَصَبَابَةٌ وَتُشْرِقُ مُتَوَقِّدُ الْجَمْرَاتِ

-আমার অন্তরে আপনার ইশকের বিরহের আগুন জ্বলছে, যার ফলে তা থেকে অগ্নি স্কুলিঙ্গ ফুটে উঠেছে।

وَعَلَى غَهْدٍ إِنَّ مَلَأَتْ مَحَاجِرِي مَنْ تَلَكَّمُ الْجَذْرَانِ وَالْعِرْصَاتِ

-আমি প্রতিজ্ঞা করে রেখেছি, আমি আমার দৃষ্টিশক্তি দিয়ে আপনার স্মৃতিময় প্রাচীর ও উদ্যানসমূহ প্রাণভরে দেখে নেবো।

لَأَغْفُونَ مَصُونٍ شَيْبِي بَيْنَهَا مِنْ كَثْرَةِ التَّقْيِيلِ وَالرَّشْفَاتِ

-তবুও আমি আমার কালো দাড়িকে এই যমীনের মাটি দিয়ে রঞ্জিত করে নেবো। আর এ যমীনের ইমারতসমূহকে বেশী বেশী করে চুম্বন করবো।

لَوْ لَا الْعَوَادِي وَالْأَعَادِي زُرْنَا أَبَدًا وَلَوْ سَخَبًا عَلَى الْوَجَنَاتِ

-যদি বাধা বিপত্তি ও দুশমনের ভয় না থাকতো, তাহলে আমি সর্বক্ষণ আপনার যিয়ারত করতাম, যদিও তাতে আমার চেহারা বিমর্ষ হয়ে পড়তো।

لَكِنْ شَأْهْدِي مِنْ حَفِيلٍ تَحْيِي لَقَطِيزٍ تِلْكَ الدَّارُ وَالْحُجَرَاتُ

-কিন্তু অনতিবিলম্বে আমি অসংখ্য দরুদ ও সালামের নজরানা হাদিয়া স্বরূপ এ ঘর ও হুজরায় অবস্থানকারীদের খেদমতে পাঠাবো।

أَزْكِي مِنَ الْمِسْكِ الْمُفْتَقِ نَفْحَةً تَغْشَاهُ بِالْأَصَالِ وَالْبُكْرَاتِ

-যা সন্দেহ থেকে পবিত্র হয় আর যার সুঘ্রাণ তাকে সকাল সন্ধ্যা আবৃত করে রাখবে।

وَتَخْصِيهِ بِزَوَاكِي الصَّلَوَاتِ وَنَوَائِمِ التَّسْلِيمِ وَالْبُرَكَاتِ

-আর তাঁকে পবিত্র দরুদ ও সালাম পাঠকারীদের সালাম ও বরকত দ্বারা সর্বদা বিশেষিত করে রাখবে।

أَلْبَابُ الرَّابِعِ

চতুর্থ অধ্যায়

فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيمِ وَفَرَضُ ذَلِكَ وَفَضِيلَتِهِ

সালাত ও সালামের বিধান, মাহাত্ম্য ও অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿১১৬﴾

-নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর অগণিত ফিরিশতাগণ দরুদ প্রেরণ করেন ঐ অদৃশ্যবস্তা (নবী)র প্রতি; হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ ও উত্তমরূপে সালাম প্রেরণ করো।^১

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, এর মর্মার্থ হলো,
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُبَارِكُونَ عَلَى النَّبِيِّ.

-আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফিরিশতাগণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বরকত অবতীর্ণ করেন।

কেউ কেউ বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করেন, আর তাঁর ফিরিশতাগণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দোয়া করেন।

হযরত মুবাররিদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, সালাত শব্দের আসল অর্থ হলো الثَّرْحُمُ - অনুগ্রহ করা। যদিও তা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে রহমত, আর ফিরিশতাদের ক্ষেত্রে কোমলতা আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে দোয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।

হাদীস শরীফে যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকে, তার প্রতি ফিরিশতাদের সালাত প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, তারা বলে,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. فَهَذَا دُعَاءُ،

-হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ! তার প্রতি অনুগ্রহ করো। এটাই হলো ফিরিশতাদের সালাত।^২

^১. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৫৬।

^২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু হাদিসি ফিল মসজিদ, ২:২৩০, হাদিস নং : ৪২৬।

হযরত আবু বকর কুশাইরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, সালাত শব্দটি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্যান্যদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার রহমত বা অনুগ্রহ, আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে বুজুর্গী ও মর্যাদা বৃদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

হযরত আবুল আলীয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, صَلَاةُ اللَّهِ تَأْوُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ, -আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত প্রেরণের মর্মার্থ হলো, তিনি তাঁর ফিরিশতাদের সামনে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করতে থাকেন। আর ফিরিশতাদের দরুদ হলো, তারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দোয়া করতে থাকেন।

কাযী আবুল ফযল আযায রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শিক্ষাদান করার সময় 'সালাত' আর 'বরকত' শব্দ পৃথক পৃথক উল্লেখ করতেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সালাত ও বরকত উভয়টি পৃথক পৃথক অর্থদ্যোতক। কিহ আল্লাহর তা'আলা বান্দাদের যে সালাম পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন সে সম্পর্কে কাযী আবু বকর বিন বুকাইর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এ আয়াত হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সঙ্গীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করো। অনুরূপভাবে তাঁদের পরবর্তীদের জন্যও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওয়া মুবারকের নিকট উপস্থিতির সময় এই নির্দেশ অপরিহার্য হয়েছে।

তাঁর প্রতি সালামের তিনটি দিক রয়েছে।

প্রথমত : হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণের জন্য কল্যাণ কামনা করা। আর সালাম শব্দটি মাসদার বা ধাতুমূল। যেমন-الَّذَاذُ শব্দদ্বয়।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফযলি সালাতিল জুমু'আহ, ৩:৪০৫, হাদিস নং : ১০৫৯।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফীল উকুদ, ২:৫২, হাদিস নং : ৩০২।

ঘ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু ইনতিযারিস্ সালাত, ২:২, হাদিস নং : ৩৪৪।

ঙ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফী ফযলি উকুদ, ২:৬০, হাদিস নং : ৩৯৬।

দ্বিতীয়ত : তাঁর সংরক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদারের উপর সালাম পেশ করা।
এখানে 'আস-সালাম' শব্দটি আল্লাহ তা'আলার নাম হবে।^১

তৃতীয়ত : সালাম শব্দটি আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন,
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَتُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥﴾

-সুতরাং হে মাহবুব! আপনার পালনকর্তার শপথ; তারা মুসলমান হবে না যতক্ষণ পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না। অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন, তাদের অন্তরসমূহে সে সম্পর্কে কোন সংশয় থাকবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে।^২

^১ মূলত : আল্লাহ তা'আলাই তাঁর হিফায়তকারী, তাঁর প্রতি অনুগ্রহকারী, তাঁর প্রিয় বন্ধু আর তাঁর জিম্মাদার।

^২ আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৬৫।

সালাম ও সালামের এই মর্মার্থ সব চাইতে বেশী পূর্ণাঙ্গ ব্যাপক অর্থবোধক হয়েছে। অর্থাৎ মুমিনের অন্তরে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে যে, তাঁর প্রতিটি নির্দেশ অবনত মস্তকে মেনে নেবে। আর মতভেদ দেখা দিলেও তাঁর ওই আদেশ পালন করতে হবে যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি সূনাত অলঙ্ঘনীয়ভাবে পালন করতে হবে। আর তাঁর অনুসরণে নিবেদিত প্রাণ হতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

হযুর ﷺ এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠের বিধান

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয। এটা কোনো সময়নির্ধারিত নয়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দরুদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। সম্মানিত ইমাম ও আলেমগণ এই আদেশটি ওয়াজিব অর্থে নির্ধারণ করেছেন। এর উপর আলেমদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত আবু জা'ফর তাবারী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার মতে উক্ত আয়াতের আমল মুস্তাহাব হবে। আর তিনি এ বিষয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার দাবী করেছেন। সম্ভবত! তিনি একবারের অধিক দরুদ পাঠ করা সম্পর্কে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। একবার দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব। যার ফলে দরুদ পাঠের সংকীর্ণতা দূর হয়ে যাবে। আর ফরয আদায় না করার কারণে যে গুনাহ হবে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।^১ এক বার দরুদ পাঠ করা ওইরূপ ফরয যেভাবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের ব্যাপারে একবার সাক্ষ্য দেয়া ফরয। এছাড়া অন্যান্য সময় দরুদ পাঠ করা মুস্তাহাব ও পছন্দনীয়। ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের নিদর্শনভূক্ত কাজ।

কাযী আবুল হাসান বিন কাস্‌সার রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমাদের সাহাবাগণের মধ্যে একথা সুপ্রসিদ্ধ যে, মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলা দরুদ পাঠ করা ফরয করেছেন। তিনি এ আদেশ কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করেননি। সেহেতু মানুষের কর্তব্য হলো সাধ্যানুযায়ী অধিকহারে দরুদ পাঠ করা। আর তা থেকে উদাসীন না হওয়া।

কাযী আবু মুহাম্মদ বিন নসর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব।

^১ জীবনে একবার দরুদ পাঠ করা ফরয। যদি কেউ জীবনে একবারও দরুদ পাঠ না করে তাহলে সে ভীষণ গুনাহগার হবে। বেশী পরিমাণে দরুদ পাঠ করা মুস্তাহাব। দরুদ পাঠে অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। অধিকহারে দরুদ পাঠের অসংখ্য ফযীলতের কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

কাযী আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন সাঈদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْضٌ بِالْجُمْلَةِ بِقَصْدِ الْإِيمَانِ، لَا يَتَعَيَّنُ فِي الصَّلَاةِ. وَأَنَّ مَنْ
صَلَّى عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ عُمُرِهِ سَقَطَ الْقَرْضُ عَنْهُ.

-ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও অন্যান্য আলেমগণের
অভিমত হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ইমানের
সাথে দরুদ পাঠ করা ফরয। তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ করা কেবল নামাযের
সাথেই নির্দিষ্ট নয়। যে ব্যক্তি জীবনে একবার দরুদ পাঠ করলো, তার
পক্ষ থেকে ওই ফরযটি আদায় হয়ে গেল।

ইমাম শাফিঈ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কতিপয় অনুসারী বলেন, আল্লাহ
তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর যে দরুদ শরীফ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন, তা হলো
নামাজে দরুদ পাঠ করা। তাঁরা এটাও বলেছেন, নামায ব্যতীত অন্য সময় দরুদ
শরীফ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব নয়। তবে নামাযের দরুদ পাঠ সম্পর্কে
ইমাম আবু জা'ফর তাবারী, ইমাম তাহাবী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা
অন্যান্যরা এই ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণের ইজমা বা ঐকমত্য
উদ্ধৃত করেন, নামাযের তাশাহুদে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি
দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব নয়।

ইমাম শাফিঈ রাযিয়াল্লাহু আনহু বিপরীত মত ব্যক্ত করে বলেছেন, যে ব্যক্তি
তাশাহুদের পর সালামের পূর্বে দরুদ পাঠ করবে না, তার নামায বাতিল হয়ে
যাবে। যদিও তাশাহুদের পূর্বে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ
পাঠ করা জাযিয় নয়। এটা ইমাম শাফিঈ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ব্যক্তিগত
অভিমত। তাঁর পূর্ববর্তী কোনো বুয়ুগ থেকে এরূপ অভিমত বর্ণিত হয়নি। এ
কারণে একদল আলেম তাঁর এ অভিমত অস্বীকার করে বলেছেন, এই অভিমত
পূর্ববর্তী আলেমদের মতামতের পরিপন্থী। আর এই অভিমত অস্বীকারকারীদের
মধ্যে আল্লামা তাবারী, কুশাইরী ও অপরাপর আলেমগণ রয়েছেন।

আবু বকর বিন মুনির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, মুস্তাহাব হলো প্রত্যেক
নামাযে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করা। আর কেউ
যদি দরুদ পাঠ করা ছেড়ে দেয়, তাহলে ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
মদীনাবাসী, সুফিয়ান সাওরী, কুফাবাসী, আসহাবে রায় প্রমুখের মতে নামায হয়ে
যাবে। প্রতিযশা জ্ঞানীগণ এ মতের সমর্থক।

ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সাওরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা অপর এক
অভিমত অনুযায়ী, তাশাহুদের পর দরুদ পাঠ করা মুস্তাহাব। আর তাশাহুদের
পর দরুদ পাঠ ত্যাগ করলে গুনাহগার হবে।

ইমাম শাফিঈ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বতন্ত্র এক অভিমত, তাশাহুদের পর
দরুদ পরিত্যাগকারীর জন্য পুনরায় নামায আদায় করা জরুরী।

আর ইসহাক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে দরুদ
পরিত্যাগকারীকে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে। আর যদি ভুলবশতঃ দরুদ
পাঠ না করে, তাহলে তার নামায হয়ে যাবে। তিনি পুনরায় নামায আদায় করতে
বলেন নি।

আবু মুহাম্মদ বিন আবু যায়িদ মুহাম্মদ বিন মাওয়্যায় রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
থেকে বর্ণনা করেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ
করা ফরয।

আবু মুহাম্মদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নামাযের দরুদ পাঠ করা ফরযের
অন্তর্ভুক্ত নয়। মুহাম্মদ বিন আবদুল হাকাম প্রমুখ এ মতের সমর্থক।

ইবনুল কাস্‌সার ও আবদুল ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ বিন মাওয়্যায়
রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও ইমাম শাফিঈ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মতো
নামাযে দরুদ পাঠ করা ফরয বলেছেন।

আবু ইয়া'লা আ'বদী মালেকী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দরুদ শরীফ পাঠ করা
সম্পর্কে মালেকী মাযহাবের তিনটি অভিমত উল্লেখ করেছেন।

১. ওয়াজিব
২. সুন্নাত এবং
৩. মুস্তাহাব।

হযরত ইমাম শাফিঈ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অনুসারী ইমাম খাস্তাবী
রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমুখ আলেমগণ এই মাসায়ালায় ইমাম শাফিঈ
রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অভিমতের বিরোধিতা করেছেন।

ইমাম খাস্তাবী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, নামাযে দরুদ শরীফ পাঠ করা
ওয়াজিব নয়। একদল ফকীহ এ অভিমতের সমর্থক। কিন্তু ইমাম শাফিঈ
রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ মতের বিরোধী। আমার ধারণা হলো, ইমাম শাফিঈ
রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পূর্বে কোনো ফকীহ নামাযে দরুদ শরীফ পাঠ করা

ফরয মর্মে মত প্রকাশ করেননি। আর পূর্ববর্তী আলেমগণ এর উপর আমল করেছেন এবং এই বিষয়ে তাঁদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর এটা হলো হযরত ইবনে মাস'উদ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর তাশাহহুদ, যা ইমাম শাফিঈ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গ্রহণ করেছেন। এটা ওই তাশাহহুদ যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দান করেছেন।

এই তাশাহহুদে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরুদ শরীফ পাঠের কথা উল্লেখ করেননি। অনুরূপ তাশাহহুদ হযরত আবু হুরায়রা, ইবনে আক্বাস, ইবনে উমর, আবু সাঈদ খুদরী, আবু মূসা আশ'আরী ও আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। ওইসব তাশাহহুদে তাঁরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠের কথা উল্লেখ করেননি।

হযরত ইবনে আক্বাস ও হযরত জাবির রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ .

—হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কুরআন মজীদে সূরাসমূহ যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবে আমাদের তাশাহহুদও শিক্ষা দিয়েছেন।

এরূপ বর্ণনা হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাহিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত আছে।

হযরত ইবনে উমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, হযরত আবু বকর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বরের উপর বসে লোকদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দান করতেন। যেভাবে শিশুদেরকে পাঠশালায় শিক্ষা দেয়া হয়। হযরত ওমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও অনুরূপ তাশাহহুদ শিক্ষাদান করতেন। আর যে হাদীসে বলা হয়েছে,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى .

—যে ব্যক্তি নামাযে আমার উপর দরুদ পাঠ করবে না তার নামায হবে না।^১

১. ক) দারে কুতনী : আস্ সুনান, বাবু যিকরি উজ্জুবিস্ সালাত, ৩:৪৮৫, হাদিস নং : ১৩৫৮।

এ হাদীস সম্পর্কে ইবনুল কাস্‌সার রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এর মর্মার্থ হলো, যে আমার উপর দরুদ পাঠ করবে না, তাঁর নামায পরিপূর্ণ হবে না। অথবা যে জীবনে একবারও আমার উপর দরুদ পাঠ করেনি, তার নামায হবে না। আলেমগণ এই হাদীসের বর্ণনাসূত্র দুর্বল বলেছেন।

হযরত আবু জা'ফর, হযরত ইবনে মাস'উদ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَلَا عَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ .

—যে ব্যক্তি নামায পড়েছে কিন্তু আমার ও আমার আহলে বাইতের উপর দরুদ পাঠ করেনি, তার নামায কবুল হবে না।^২

ইমাম দারে কুতনী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, সঠিক অভিমত হলো, যা আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাসান রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি আমি এমন কোন নামায পড়ি, যাতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতি দরুদ পাঠ করিনি, তাহলে আমার ধারণা হলো, আমার সে নামায পরিপূর্ণ হয়নি।

খ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ২:৩৭৯।

গ) হাকেম : মুসতাদ্‌রাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু আম্মা হাদিসী আবদির রহমান, ২:৪৯৯, হাদিস নং : ৯৪৩।

ঘ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৫:৩৯০।


ঙ) বায়হাকী : মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়ালা আসার, বাবু সালাতি আলান্ নবী, ৩:১১৮, হাদিস নং : ৯৪১।

চ) তাহাবী : মুশকিলুল আসার, বাবু আওয়াযু মাই ইউহাসিবু, ৬:৫২, হাদিস নং : ২১৪১।

২. দারে কুতনী : আস্ সুনান, বাবু যিকরি উজ্জুবিস্ সালাত, ৩:৪৮৭, হাদিস নং : ১৩৫৯।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

হযরত  এর প্রতি সালাত ও সালামের মুস্তাহাব সময় প্রসঙ্গে নামাযে তাশাহহুদের পর দরুদ শরীফ পাঠ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি, দরুদ শরীফ তাশাহহুদের পরেও দোয়ার পূর্বে পাঠ করতে হবে।

হযরত ফুযালা বিন উবায়দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনতে পান যে, এক ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় দোয়া করছিলো, কিন্তু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দরুদ পাঠ করেনি, তখন তিনি ইরশাদ করেন, عَجَلَ هَذَا -এ ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করছে। অতঃপর তাকে ও অন্যদের সম্বোধন করে বললেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالشَّاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَذْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ.

-যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, তখন সে যেন প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, তারপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করে, এরপর যা ইচ্ছা দোয়া করে।^১

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, بِتَمْجِيدِ اللَّهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার মহত্ব বর্ণনা করে দোয়া শুরু করবে, এটা অধিক বিস্তার।

ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী জা'মিউদ্ দাওয়াত, ১১:৩৮১, হাদিস নং : ৩৩৯৯।

খ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু দোয়া, ৪:২৮০, হাদিস নং : ১২৬৬।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি ফুৎলা ইবনে উবাইদ, ৪৮:৪৬৫, হাদিস : ২২৮১১।

ঘ) তাবরানী : মু'জামুল ক্বীর, ১৩:২৪২।

ঙ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ২:১৪৮।

চ) হাকেম : মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু আম্মা হাদিসী আনাস, ২:৩৫৭, হাদিস নং : ৮০৪।

আলোচ্য হাদীসে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করার শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। আর তা হলো নামাযের পর দোয়া করার সময় প্রথমে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা পাঠ করবে, তার পর দরুদ শরীফ পাঠ করে দোয়া করবে। এরূপ করার কারণ হলো আল্লাহ তা'আলা না তাঁর হামদ ছাড়া প্রত্যাখান করেন, আর না দরুদ শরীফ ফিরিয়ে দেন। তাই দরুদ শরীফের ওসীলায় দোয়া কবুল করেন। কারণ সম্মানিত লোকের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, তিনি কেবল ভালো জিনিসই গ্রহণ করবেন আর ক্রটিযুক্ত বস্তু দূরে ফেলে দেবেন। সুতরাং আমাদের দোয়াও হামদ-সানা ও দরুদ শরীফের সাথে কবুল হয়ে যাবে।

হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,
الدُّعَاءُ وَالصَّلَاةُ مُعَلَّقَتَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-দোয়া ও নামায আসমান ও যমীনের মধ্যখানে ঝুলন্ত থাকে। আর এর কিছুই ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌঁছে না, যতক্ষণ না হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করা হয়।^১

এ সম্পর্কিত বর্ণনা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করা হয়েছে, وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ অর্থাৎ যতক্ষণ না হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাথে তাঁর আহলে বাইতের উপরও দরুদ পাঠ করা হয়।^২

এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে,

الدُّعَاءُ مَحْجُوبٌ عَنِ اللَّهِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.

-দোয়া ওই পর্যন্ত আড়ালাবৃত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত দোয়াকারী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের প্রতি দরুদ পাঠ না করে।^৩

হযরত ইবনে মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالدِّحَةِ وَالشَّاءِ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَذْعُ بَعْدُ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يَنْجَحَ.

-যখন তোমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ তা'আলার নিকট কিছু প্রার্থনার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন সর্বপ্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, তিনি যেটার উপযুক্ত। তারপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে। এরপর প্রার্থনা করবে। কেননা এটা সফলতা লাভের ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ।^৪

১. আবু শায়খ ইম্পাহানী : আল উজ্জমা, কিসসাভু যিল কারনাইন, ৪:১৪৬৪।

২. বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু সালাতি আলান্ নবী, ১৯:৪৪১, হাদিস নং : ৫৮৮০।

৩. বায়হাকী : তা'আবুল ইমান, বাবু দোয়া মাহজুবুন আনিয়াহ, ৪:৯৭, হাদিস নং : ১৫৩৮।

৪. ক) তাবরানী : মু'জামুল ক্বীর, ৯:১৫৫, হাদিস নং : ৮৭৮০।

খ) বাগতী : শরহু সুন্নাহ, বাবু আদাবিদু দোয়া, ৫:২০৫।

হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّايِبِ، إِنَّ الرَّايِبَ يَمْلَأُ قَدَحَهُ مَاءً ثُمَّ يَضَعُهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ فِي مَعَالِيْقِهِ حَتَّى إِذَا فَرَّغَ جَاءَ إِلَى الْقَدَحِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الشَّرَابِ شَرِبَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الشَّرَابِ تَوَضَّأَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الْوُضُوءِ أَهْرَاقَهُ، وَلَكِنْ اجْعَلُونِي فِي أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَفِي آخِرِ الدُّعَاءِ.

তোমরা আমাকে সাওয়ারীর পাত্রের মতো বানিয়োনা। যে সাওয়ারী পাত্রে পানি ভর্তি করে রাখে। আর পাথের ও সরঞ্জামাদি বাহনের উপর উঠিয়ে নিয়ে যাত্রা করে। তারপর তৃষ্ণার্ত হলে পানি পান করে, বা অজু করে, কিংবা পানি ফেলে দেয়। (তোমরা আমার সাথে এ ধরনের আচরণ করবে না) বরং তোমাদের দোয়ার শুরু, মধ্য ও শেষভাগে আমাকে রাখবে। (অর্থাৎ তিনবার আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে)।^১

হযরত ইবনে আতা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, দোয়ার মূলনীতি, ডানা, উপকরণ, বিশেষ সময় রয়েছে। সুতরাং যদি দোয়া নীতিয়ানুগ হয়, তাহলে শক্তিশালী হয়। আর যদি ডানার দাবী অনুযায়ী হয় তাহলে দোয়া উৎসর্গকালে উদ্ভীন হয়, আর যদি সময়ের অনুকূলে হয় তাহলে সফলকাম হয়। আর যদি উপকরণ অনুযায়ী হয় তাহলে সাফল্যে পৌঁছে যায়।

দোয়ার মূলনীতি হলো, একাগ্রতা, নমনীয়তা, বিনয় ও স্থিরতা, অন্তরকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা ও পার্থিব বিষয় থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা। দোয়ার পালক হলো সততা। দোয়ার সময় হলো শেষরাত্রি। আর উপকরণ হলো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা।

দোয়ার মূলনীতি হলো, একাগ্রতা, নমনীয়তা, বিনয় ও স্থিরতা, অন্তরকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা ও পার্থিব বিষয় থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা। দোয়ার পালক হলো সততা। দোয়ার সময় হলো শেষরাত্রি। আর উপকরণ হলো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত, -الدُّعَاءُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لَا يُرَدُّ- দুই দরুদ শরীফের মধ্যবর্তী দোয়া রদ বা প্রত্যাখ্যাত হয় না।

গ) ইবনে রাশেদ : জামে' মা'আমার, বাবু দোয়া, ১০:৪৪১, হাদিস নং : ১৯৬৪২।

১. ক) আবদুর রায্বাক : আল মুসান্নাফ, ২:২১৬।

খ) বায়হাকী : শু'আবুল ইমান, বাবু লা তাজ্জ'আলুনী কা কাদহির রাকেব, ৪:৯৮, হাদিস নং : ১৫৩৯।

গ) আবদ ইবনে হমাইদ : আল মুসনাদ, বাবু লা তাজ্জ'আলুনী কা কাদহির রাকেব, ৩:২৫৩, হাদিস নং : ১১৩৪।

ঘ) কাছায়ী : মুসনাদুশ শিহাব, বাবু লা তাজ্জ'আলুনী কা কাদহির রাকেব, ৩:৪৪৩।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত كُلُّ دُعَاءٍ مَخْجُوبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - প্রত্যেক দোয়া আড়ালাবৃত (প্রতিবন্ধকতায়) থাকে, যতক্ষণ না হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি দরুদ পাঠ করা হয়।^১

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ওই দোয়া যা হানাশ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে বর্ণিত, যে হাদীসের শেষে রয়েছে, 'আমার দোয়া কবুল করো' এরপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ أَمِينٌ.

-হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আবেদন করছি যে, তুমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করো, যিনি তোমার বান্দা, নবী ও রাসূল- ওই দরুদসমূহ থেকে উত্তম দরুদ যা অদ্যাবধি সৃষ্ট জীবের মধ্যে কারো প্রতি তুমি প্রেরণ করেছো। আমীন।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠের অন্যতম সময় হলো- তাঁর মহিমাম্বিত আলোচনা, তাঁর মুবারক নাম শ্রবণ, লিখন ও আযানের প্রাক্কালে।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

-ওই ব্যক্তির নাক ধূলোয় মলিন হোক যার সম্মুখে আমার নাম উচ্চারণ করা হলো, কিন্তু সে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করলোনা।^২

১. ক) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবু মিন ইসমিহি আহমদ, ২:২৩১, হাদিস নং : ৭৩২।

খ) বায়হাকী : শু'আবুল ইমান, বাবু কুহু দুয়ায়িন মাহযুবুন আনিস সামায়ী, ৪:৯৬, হাদিস নং : ১৫৩৭।

গ) মুনিরী : আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, হাদিস নং : ২৫৮৯।

২. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু কাওলির রাসূল, ১১:৪৫৫, হাদিস নং : ৩৪৬৮।

খ) তাবরানী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু সালাতি আলান নবী, পৃ. ২০২, হাদিস নং : ৯২৭।

গ) আহমদ ইবনে হামল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৫:১৮০, হাদিস নং : ৭১৩৯।

ঘ) হাকেম : আল মুসতাদরাক আলাস্ সহাইন, বাবু ওয়া আম্মা হাদিসী রাফে' ইবনে বদীজ, ৫:৭২, হাদিস নং : ১৯৭৪।

ঙ) বায়হাকী : শু'আবুল ইমান, বাবু হাদিসী জুরাইজির আবেদ, ১৬:৩৯৭, হাদিস নং : ৭৬৪১।

ইবনে হাবীব যবেহের প্রাক্কালে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করা মাকরুহ বলেছেন।

আর সাহনুন আশ্চর্যান্বিত হওয়ার সময় দরুদ শরীফ পড়া মাকরুহ বলেছেন। তিনি আরো বলেন, শুধু সাওয়াবের উদ্দেশ্যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে।

আসবাগ, ইবনে কাসিম রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন, দুইটি স্থানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা যাবেনা- যবেহ ও হাঁচির সময়। ওই দু'সময় আল্লাহর যিকিরের পর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলা যাবে না। তবে কেউ যদি আল্লাহর যিকিরের পর 'সাল্লাল্লাহু আ'লা মুহাম্মাদিন' বলে তবে ওই 'মুহাম্মদ' নামটি আল্লাহ তা'আলার নামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না, বরং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা নৈকট্য লাভের নিয়্যতে হলে, তা মাকরুহ হবে না। আশহাব রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে আশহাব রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যবেহ করার সময়, হাঁচি দেওয়ার সময় সুন্নাত হিসেবে দরুদ শরীফ পাঠ করা সমীচীন নয়।

ইমাম নাসায়ী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আউস বিন আউস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেন, **اَكْثَرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ** - জুমার দিনে আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করবে।^১

সালাত ও সালাম পাঠের স্থানসমূহের মধ্যে মসজিদে প্রবেশের সময়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আবু ইসহাক বিন শা'বান রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতি দরুদ, সালাম, বরকত, অনুগ্রহ কামনা করবে, এরপর বলবে-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

-হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আর আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিন।^২

১) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবুল আদয়িয়াহ, ৪:৩০৬, হাদিস নং : ৯১০।

২) ক) ইবনে মাজাহ : আস সুনান, বাবু যিকরি ওফাতিহি, ১:৫২৪ হাদিস নং : ১৬৩৭।

খ) বায়হাকী : তা'য়াবুল ইমান, ফঙ্গুল জুম'আতি, ৪:৪৩৩ হাদিস নং : ২৭৬৯।

৩) ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ মা ইয়াকুলু ইন্না যুখলিল মসজিদ, ২:২৮, হাদিস নং : ২৮৯।

খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবুদ দোয়া ইন্না দুখলিল মসজিদ, ২:৪৮৮, হাদিস নং : ৭৬৩।

আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় অনুরূপ দোয়া করবে তবে তখন **رَحْمَتِكَ** শব্দের স্থলে **فَضْلِكَ** বলবে।

হযরত আমর বিন দীনার রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী-

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ

-অতঃপর তোমরা যখন কোনো গৃহে প্রবেশ করো, তখন তোমাদের আপন লোকদের প্রতি সালাম পেশ করো।^১

উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, যদি ঘরে কেউ না থাকে তাহলে বলতে হবে-

السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

হযরত ইবনে আব্বাস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, **الْمَرَادُ بِالْبُيُوتِ هُنَا** -এখানে ঘর দ্বারা মসজিদ উদ্দেশ্য।

নাখয়ী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যখন মসজিদে কেউ উপস্থিত না থাকে তখন বলবে- **السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ** -হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি সালাম। আর যখন ঘরে কেউ উপস্থিত থাকবে না তখন বলতে হবে- **السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى** **السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى** -আমাদের প্রতি ও সৎকর্মশীলদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হোক।

হযরত আলকামা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন মসজিদে প্রবেশ করি তখন বলি- **السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** -হে মহান নবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর অনুগ্রহ ও বরকত অবতীর্ণ হোক, মহান আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করছেন।

গ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল মসজিদ ওয়া মাওয়াযিউস সালাত, পৃ. ১৬১, হাদিস নং : ৭৩১।

২) আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৬১।

অনুরূপ বর্ণনা হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। কিন্তু তাঁর বর্ণনায়, মসজিদে প্রবেশ ও বাহিরের দোয়ার সাথে দরুদ পাঠের উল্লেখ নেই।

হযরত ইবনে শা'বান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে মত উল্লেখ করেছেন, তার প্রমাণ হলো, হযরত ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীস। যাতে উল্লেখ রয়েছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন এরূপ করতেন। অনুরূপ বর্ণনা আবু বকর বিন আমর বিন হাযম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তাতে সালাম ও রহমতের উল্লেখ করা হয়েছে। আমি ওই হাদীস এ অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করেছি। তবে তাতে শাব্দিক কিছু পার্থক্য রয়েছে।

দরুদ শরীফ পাঠের সময় ও স্থানের মধ্যে জানাযার সময় দরুদ শরীফ পাঠ করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হযরত আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, এরূপ করা সুন্নাত।

আর ওই স্থানসমূহ যেগুলোতে দীর্ঘদিন থেকে উম্মত কর্তৃক দরুদ শরীফ পাঠের আমল চলে আসছে আর কেউ তা অস্বীকার করেনি। যেমন- চিঠির মধ্যে বিসমিল্লাহ'র পর দরুদ শরীফ লিপিবদ্ধ করা হতো। মূলতঃ এ দরুদ শরীফ পূর্ববর্তী যুগে প্রচলিত ছিলো না। বরং বনী হাশেম (আব্বাসীয় খিলাফতকালে) শাসক হওয়ার পর প্রকাশ পেয়েছে। তারপর ইসলামী বিশ্বে এ আমল শুরু হয়েছে। আর কোনো কোনো সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তাদের লিখিত চিঠি দরুদ শরীফ লেখার মাধ্যমে শেষ করতেন। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ.

-যে ব্যক্তি কিতাবের মধ্যে আমার উপর দরুদ লিখবে যতদিন ওই কিতাবে আমার নাম লিপিবদ্ধ থাকবে, ততদিন ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।*

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করার সময়ের মধ্যে নামাযের তাশাহুদে পর দরুদ শরীফ পাঠ করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমরা নামায পড়বে তখন এভাবে তাশাহুদ পাঠ করবে-

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

যদি তোমরা এভাবে বলো, তাহলে আল্লাহ তা'আলার রহমত প্রত্যেক বান্দার নিকট পৌছবে, যারা আসমান ও যমীনে রয়েছে।

এটা সালামের স্থানসমূহের একটি স্থান। তবে সুন্নাত পদ্ধতি হলো, তাশাহুদ পূর্বে পড়বে। আর ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তা ওই সময় পড়তে হবে, যখন তাশাহুদ পাঠ শেষ করে সালাম ফেরানোর ইচ্ছা করবে। ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'মাবসূত' গ্রন্থে এরূপ করা মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ বাক্য সালাম ফেরানোর পূর্বে বলবে।

মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এর মর্মার্থ হলো, ওটা যা হযরত আয়েশা ও হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা উভয় সালাম ফেরানোর সামান্য পূর্বে পড়তেন-

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ.

প্রত্যেক মানুষ সালাম ফেরানোর পূর্বে আসমান যমীনের ফিরিশতা, জিন ও আদম সন্তানের সৎ বান্দাদের উদ্দেশ্যে এরূপ প্রার্থনা করা আলেমগণ মুস্তাহাব বলেছেন।

ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'মাজমুয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মুস্তাদির জন্য মুস্তাহাব হলো ইমাম যখন সালাম ফেরাবেন তখন তারা বলবে-

السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

*. তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবু মিন ইসমিহী আহমদ, ৪:৩৬৪, হাদিস নং : ১৯০৪।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

فِيكَفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيمِ

দরুদ-সালামের ধরণ ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে

হযরত আবু হুমাইদ সা'ঈদী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, সাহাবায়ে কেরামগণ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয় করেন, হে আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা আপনার উপর কীভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবো? তখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এভাবে বলবে-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.

-হে আল্লাহ! দরুদ প্রেরণ কর আমাদের আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার প্রতি, তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর বংশধরদের প্রতি, যেভাবে তুমি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পরিবারবর্গের প্রতি দরুদ প্রেরণ করেছ। আর বরকত অবতীর্ণ কর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার প্রতি এবং তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর বংশধরদের প্রতি, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি চরম প্রশংসিত ও সম্মানিত।^১

ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনায়, হযরত আবু মাস'উদ আনসারী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দরুদ শরীফ পড়ার আদেশ দিয়েছেন-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلَّمْتُمْ.

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা ওয়াসাল্লাম ইবরাহীমা খলীলা, ১১: ১৫৫, হাদিস নং : ৩১১৮।

খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু নুয়িল আখিল, ৫: ৭১, হাদিস নং : ১২৭৭।

গ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফীস্ সালাতি আলান নবী, ২: ২০, হাদিস নং : ৩৫৭।

ঘ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবুস্ সালাতি আলান নবী, ৩: ১৬২, হাদিস নং : ৮৩১।

ঙ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবুস্ সালাতি আলান নবী, ৩: ১৫২, হাদিস নং : ৮৯৫।

-হে আল্লাহ! দরুদ প্রেরণ কর আমাদের আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার প্রতি এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি, যেভাবে তুমি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পরিবারবর্গের প্রতি দরুদ প্রেরণ করেছ। আর বরকত অবতীর্ণ কর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার প্রতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, যেভাবে তুমি এ ধরায় বরকত নাযিল করেছ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি চরম প্রশংসিত ও সম্মানিত। আর সালাম পেশ করবে যেভাবে তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।^১

হযরত কা'ব বিন ওজরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ দরুদ শরীফ বর্ণিত আছে-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.

-হে আল্লাহ! দরুদ প্রেরণ কর আমাদের আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, যেভাবে তুমি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পরিবারবর্গের প্রতি দরুদ প্রেরণ করেছ। আর বরকত অবতীর্ণ কর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার প্রতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি চরম প্রশংসিত ও সম্মানিত।^২

হযরত ওকবা বিন আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ দরুদ শরীফ বর্ণিত আছে-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.

-হে আল্লাহ! দরুদ প্রেরণ কর আমাদের আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার প্রতি, যিনি নবী-ই উম্মী (নবীগণের মূল) এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।^৩

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুস্ সালাতি আলান নবী, ২: ৩৭৩, হাদিস নং : ৬১৩।

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ওয়া মিন সুরাতি আহযাব, ১১: ৯, হাদিস নং : ৩১৪৪।

গ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফীস্ সালাতি আলান নবী, ২: ২১, হাদিস নং : ৩৫৮।

২. ক) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু নুয়িল আখিল, ৫: ৬৩, হাদিস নং : ১২৭২।

খ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবুস্ সালাতি আলান নবী, ৩: ১৬১, হাদিস নং : ৮৩০।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী সা'ঈদ খুদরী, ২৩: ৫৪, হাদিস নং : ১১০০৯।

৩. ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবুস্ সালাতি আলান নবী, ৩: ১৬২, হাদিস নং : ৮৩১।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এই দরুদ শরীফ বর্ণিত আছে—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ.

—হে আল্লাহ! দরুদ প্রেরণ কর আমাদের মুনীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার প্রতি, যিনি তোমার বিশেষ বান্দাহ ও রাসূল।^১

হযরত আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যসমূহ আমার হাতে প্রদান করে বললেন,

عَدَّهْنِ فِي يَدَيَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ جِبْرِيلُ هَكَذَا أَنْزَلْتَ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعِزَّةِ.

—এ বাক্যসমূহ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আমার হাতে দিয়ে বললেন, এ বাক্যসমূহ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এভাবে অবতীর্ণ হয়েছে,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

—হে আল্লাহ! দরুদ প্রেরণ কর আমাদের আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, যেভাবে তুমি দরুদ প্রেরণ করেছ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি চরম প্রশংসিত ও সম্মানিত।

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

খ) দারে কুতনী : আস্ সুনান, বাবু যিকরি উজুবিস্ সালাত, ৩:৪৮৪, হাদিস নং : ১৩৫৪।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু বাকিয়াতি হাদিসী আবু মাসউদ, ৩৪:৪৪১, হাদিস নং : ১৪৪৫৫।

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুস্ সালাতি আলান্ নবী, ১৯:৪৪২, হাদিস নং : ৫৮৮১।

খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবুস্ সালাতি আলান্ নবী, ৩:১৫০, হাদিস নং : ৮৯৩।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী সাঈদ খুদরী, ২৩:৫৪, হাদিস নং : ১১০০৯।

—হে আল্লাহ! বরকত অবতীর্ণ কর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি চরম প্রশংসিত ও সম্মানিত।

اللَّهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

—হে আল্লাহ! অনুগ্রহ কর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, যেভাবে তুমি অনুগ্রহ করেছ, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি চরম প্রশংসিত ও সম্মানিত।

اللَّهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

—হে আল্লাহ! অনুগ্রহ কর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, যেভাবে তুমি অনুগ্রহ করেছ, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি চরম প্রশংসিত ও সম্মানিত।

اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

—হে আল্লাহ! শান্তি বর্ষণ করো হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, যেভাবে তুমি শান্তি বর্ষণ করেছ, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি চরম প্রশংসিত ও সম্মানিত।^২

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ.

—যে ব্যক্তি এ কথায় খুশি হয় যে, তাকে পরিপূর্ণ সাওয়াব প্রদান করা হবে, সে যেন আমার ও আমার আহলে বাইতের প্রতি এভাবে সালাম পেশ করে—

২. বায়হাকী : আবুল ইমান, বাবু আদদাহ্লা ফী ইয়াদী জিবরাঈল, ৪:১০৯, হাদিস নং : ১৫৪৯।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
وَدُرَّتِيهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.

-হে আল্লাহ! দরুদ প্রেরণ কর মহান নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার প্রতি,
মু'মিন জননী তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর সন্তান-সন্ততি ও তাঁর পরিবার বর্গের
প্রতি, যেভাবে তুমি দরুদ প্রেরণ করেছ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্
সালামের প্রতি এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পরিবারবর্গের
প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।

হযরত যায়িদ বিন খারিজা আনসারী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, আমি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরম্ভ করলাম
যে, আমি কীভাবে আপনার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবো? তখন হযুর সালাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করার
পর দোয়া করার চেষ্টা করবে। তারপর বলবে-

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مُجِيدٌ.

-হে আল্লাহ! বরকত অবতীর্ণ কর, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার প্রতি
এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। যেভাবে বরকত অবতীর্ণ করেছো
হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের প্রতি। নিশ্চয় তুমি চরম
প্রশংসিত ও সম্মানিত।^১

হযরত সালামাতুল কিন্দি রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
হযরত আলী রাধিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে এই দরুদ শরীফ শিক্ষা দান করেছেন,

اللَّهُمَّ دَاخِي الْمَذْخَوَاتِ، وَبَارِيءِ الْمُسْمُوكَاتِ، وَجَبَّارِ الْقُلُوبِ عَلَى
فِطْرَاتِهَا شَقِيَّهَا وَسَعِيدِهَا، اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ، وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ،
وَرَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، وَالْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْمُعْلِنِ حَقَّ بِالْحَقِّ، وَالْدَّامِعِ لِحَيْشَاتِ الْبَاطِلِ كَمَا تُحْمَلُ فَاضْطَلَعَ

بِأَمْرِكَ لِبَطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لَوَحْيِكَ، حَافِظًا لِعَهْدِكَ،
مَاضِيًا عَلَى نَفَازِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْزَى قَابِسًا لِقَابِسِ الْإِلَهِ تَصِلُ بِأَهْلِهِ أَسْبَابُهُ
بِهِ هُدَيْتِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ، وَأَبْهَجَ مَوْضِعَاتِ
الْأَغْلَامِ، وَنَائِرَاتِ الْأَحْكَامِ، وَمُنِيرَاتِ الْإِسْلَامِ، فَهُوَ أَمِينُكَ الْمُأْمُونُ،
وَحَازِنُ عِلْمِكَ الْمُخْزُونِ، وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ، وَمَبْعُوثُكَ نِعْمَةً،
وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً، اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي عَذْلِكَ وَاجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ
مِنْ فَضْلِكَ، مُهَيِّئَاتُ لَهُ غَيْرَ مُكَدَّرَاتٍ مِنْ فَوْزِ ثَوَابِكَ الْمُحْلُولِ وَجَزِيلِ
عَطَائِكَ الْمُغْلُولِ، اللَّهُمَّ أَغْلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَاقِينَ بِنَاءَهُ، وَأَكْرِمْ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ
وَنُزُلَهُ، وَأَتِمِّمْ لَهُ نُورَهُ وَاجْزِهِ مِنْ ابْتِعَائِكَ لَهُ، مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ وَمَرْضِيَّ
الْمَقَالَةِ، ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ، وَخُطَّةٍ فَضْلٍ، وَحُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ عَظِيمٍ.

-হে আল্লাহ! তুমি ভূপৃষ্ঠকে বিছানা স্বরূপ করেছো এবং উর্ধ্ব
আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছো এবং তুমি পাপ ও পুণ্যে অন্তরসমূহকে তার
স্বভাবেরই উপর সৃষ্টি করেছো, তোমার শ্রেষ্ঠতম দরুদসমূহ ও তোমার
পরিবর্ধনশীল বরকতসমূহ আর তোমার অনুগ্রহ ও তোমার মেহেরবানী
আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি
নাযিল করো, যিনি রুদ্ধদ্বারসমূহ উন্মোচনকারী, তোমার বান্দাহ ও
তোমার রাসূল যিনি পূর্ববর্তীগণের নবীগণের সর্বশেষ, যিনি ইসলামের
প্রকৃত সত্যপ্রকাশক, যিনি বাতিল মতবাদের সৈন্যদের (ধর্মদ্রোহী
কাফের) দমনকারী, যার প্রতি গুরু দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তোমার
নির্দেশ মোতাবেক তোমার ইবাদত যিনি যথাযথ পালন করেছেন, যিনি
তোমার সম্ভ্রষ্ট লাভে তৎপর, আর যিনি প্রত্যাদেশের অপেক্ষামান,
যিনি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, যিনি সর্বদা তোমার নির্দেশ
বাস্তবায়নে নিয়োজিত, অপরন্তু যিনি ইসলামের জ্যোতি দ্বারা আলো
অন্বেষণকারীদের অন্তরসমূহ আলোকিত করেছেন, যা আল্লাহ
তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামত, এই নূর অন্বেষণকারীদের নিমিত্ত, এমন

^১. নাসায়ী : আস্ সুনান, বারু নাওউন আখার, ৫:৬৭।

পন্থা(ওসীলা) লাভ করে যা দ্বারা অম্বরসমূহ হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়, কুফরী ফিতনা ও গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার পরও। আর যিনি ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশনাবলী ও ধর্মীয় উজ্জ্বল বিধানকে সুসজ্জিত করেছেন। আর যিনি সমুজ্জ্বল ইসলামের রুকনসমূহের প্রকাশকারী, যিনি তোমার সুরক্ষিত আমানত রক্ষাকারী, যিনি তোমার গুপ্ত জ্ঞানভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণকারী, যিনি তোমার কিয়ামত দিবসের সাক্ষী, যার আগমন তোমার পরিপূর্ণ অনুগ্রহস্বরূপ, যিনি তোমার রাসূল, সত্যই তিনি সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ। হে আল্লাহ! তোমার জান্নাতে তাঁর স্থান প্রশস্ত করে দাও, আর তাঁকে দ্বিগুণ পুরস্কারে পুরস্কৃত করো, তোমার কল্যাণ ও নির্মল নিয়ামত দানে, যা তাঁর জন্য মনোমুগ্ধকর, তোমার বিনিময় দ্বারা তাঁকে সফলতা দান করো এবং তোমার বৃহত্তম দান তাঁর প্রতি সর্বদা অব্যাহত রাখো। হে আল্লাহ! সকল জান্নাতবাসী মানুষের প্রাসাদ অপেক্ষা তাঁর প্রাসাদকে অধিক সুউচ্চ করো এবং তাঁর রওয়া মোবারককে তোমার নিকট সম্মানিত করো এবং তাঁর আতিথেয়তাকেও। তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করো এবং তাঁকে পুরস্কৃত করো যেহেতু তুমি তাঁকে আবিভূত করেছো। আর তাঁর সাক্ষী গ্রহণ করো, তাঁর বাক্যাবলীর প্রতি সম্ভ্রষ্ট থাকো, যে বাক্য আলোচনা সত্যে প্রতিষ্ঠিত আর তাঁর শান এই যে তিনি সত্য ও অসত্য প্রভেদকারী এবং তাঁর বৃহত্তম দলীল প্রমাণিত।^১

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এ দরুদ শরীফটিও বর্ণিত আছে-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ، صَلَوَاتُ اللَّهِ الْبَرِّ الرَّحِيمِ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَالنَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، عَلَى مُحَمَّدٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الشَّاهِدُ الْبَشِيرُ، الدَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ السَّرَاجُ الْمُنِيرُ، وَعَلَيْهِ السَّلَامُ.

^১ ভাকরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবু মিন ইসমিহী মুসাআদাহ, ৯:৪৩, হাদিস নং : ৯০৮৯।

-নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত পাঠ করেন, হে ঈমানদারগণ! তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ কর, যেভাবে প্রেরণ করা শোভা পায়। আমি হাজির! প্রভু হে, আমি হাজির! পরম দাতা দয়ালু আল্লাহর সালাত এবং তাঁর নৈকট্যভাজন ফেরেশতাগণ, নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণ এবং পূণ্যবানদের সালাত, আর যা কিছু আপনার কোন তাসবীহ পাঠ করেছে, হে জগতসমূহের প্রতিপালক! তাঁদের সালাত নিবেদিত হোক মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর প্রতি, যিনি নবীদের সমাপ্তিকা, রাসূলদের সরদার, খোদাভীরুদের পুরোধা এবং জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত প্রতিনিধি। তিনি প্রত্যক্ষকারী স্বাক্ষরী, তিনি সুসংবাদদাতা, আপনার অনুমোদনে আপনারই দিকে আহ্বানকারী উজ্জ্বল প্রদীপ, তাঁর প্রতি নিবেদিত হোক সালাম।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এ দরুদ শরীফ বর্ণিত আছে-

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتَكَ وَبَرَكَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغِيْطُهُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ.

-হে আল্লাহ! আপনার তাবৎ সালাত, বরকত ও রহমত যেন অবতীর্ণ হয় রাসূলগণের সরদারের প্রতি, যিনি আল্লাহভীরুদের দলপতি, নবীগণের সমাপ্তি, আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার উপর। যিনি তোমার বান্দা এবং রাসূল। যিনি কল্যাণকামীদের ইমাম ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের অগ্রণী ও রহমতের নবী। হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে প্রশংসিত আসনে অভিষিক্ত করুন। যার জন্য পূর্ব ও পরবর্তী সবাই ঈর্ষান্বিত।^২

^২ ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু কম মাররাতি ইউসালিমুর রজুল, ১৩:৩৯৭, হাদিস নং : ৪৫১১।

খ) আবদুর রায্যাক : আল মুসান্নাফ, ২:২১৩।

গ) নাসায়ী : সুনানুল কুবরা, ৬:৪৯।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

-হে আল্লাহ! দরুদ অবতীর্ণ কর, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার প্রতি
এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। যেভাবে দরুদ অবতীর্ণ করেছো
হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি। নিশ্চয় তুমি চরম
প্রশংসিত ও সম্মানিত। আর বরকত অবতীর্ণ কর, হযরত মুহাম্মদ
মুস্তাফার প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। যেভাবে বরকত
অবতীর্ণ করেছো হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর
পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি চরম প্রশংসিত, সম্মানিত।

হযরত হাসান বসরী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, যে ব্যক্তি হযুর
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করে
পরিতৃপ্তি লাভ করতে চায়, সে যেনো এ দরুদ শরীফ পাঠ করে-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ
بَيْتِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّهِ وَأُمَّتِهِ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ، يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

-হে আল্লাহ! দরুদ প্রেরণ কর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার উপর এবং
তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবীগণ, তাঁর সন্তান-সন্ততি, তাঁর পবিত্র
বিবিগণ, তাঁর (অধঃস্তন) সন্তানগণ, পরিবারবর্গ, শ্বশুর-
জামাতাগণ, তাঁর আনসার, তাঁর অনুসারীগণ, তাঁর আশিকগণ,
তাঁর উম্মতগণ, তাঁদের সাথে আমাদের সকলের উপর, আর
তুমিই সর্বাধিক দয়াময়।

হযরত তাউস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ইবনে আব্বাস রাধিয়াল্লাহু
তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ দরুদ শরীফ পাঠ করতেন-

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَأَنَّهُ سُؤْلُهُ فِي الْآخِرَةِ
وَالْأُولَى كَمَا أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.

-হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান
সুপারিশ কবুল করো এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদাকে আরো উচ্চতর করো এবং
ইহকাল ও পরকালে তাঁর প্রার্থনাকে এমনভাবে কবুল করো যেভাবে
হযরত ইবরাহীম ও মূসা আলাইহিমাস সালামের প্রার্থনাকে কবুল
করেছো।^১

হযরত ওয়াহীব ইবনুল ওয়ার্দ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
দোয়ায় এ দরুদ শরীফ পাঠ করতেন-

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدًا أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لِنَفْسِهِ، وَأَعْطِ مُحَمَّدًا أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لَهُ
أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ، وَأَعْطِ مُحَمَّدًا أَفْضَلَ مَا أَنْتَ مُسْتَوِلٌ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

-হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান
করো ঐ উৎকৃষ্ট দান যা তিনি প্রার্থনা করেছেন নিজের জন্য, আর তাঁকে
দান করো ঐ উৎকৃষ্ট দান যা তিনি প্রার্থনা করেছেন তোমার কোন সৃষ্টির
জন্য, আর তাঁকে দান করো ঐ উৎকৃষ্ট দান যা কিয়ামত অবধি প্রার্থিতা
আবেদন করবে।

হযরত ইবনে মাস'উদ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
যখন তোমরা দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তখন উত্তম দরুদ শরীফ পাঠ করবে।
তোমরা হয়তো জানো না যে, তোমাদের দরুদ শরীফ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করা হয়। তাই তোমরা এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে-

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ
وَحَاتِمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ
الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغِيْطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

^১ আবদুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, ২:২১১।

-হে আল্লাহ! তোমার উৎকৃষ্ট দরুদসমূহ, তোমার অনুগ্রহ, বরকতসমূহ, অবতীর্ণ করো রাসূলগণের সর্দারের প্রতি, যিনি আল্লাহর রূপের দলপতি, নবীগণের সমাপ্তি, আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার উপর। যিনি তোমার বান্দা এবং রাসূল যিনি কল্যাণকামীদের ইমাম ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের অগ্রণী ও রহমতের নবী। হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে প্রশংসিত আসনে অভিষিক্ত করুন। যার জন্য পূর্ব ও পরবর্তী সবাই ঈর্ষান্বিত। হে আল্লাহ! দরুদ প্রেরণ কর আমাদের আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, যেভাবে তুমি দরুদ প্রেরণ করেছ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের প্রতি। নিশ্চয় তুমি চরম প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! বরকত অবতীর্ণ কর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের প্রতি। নিশ্চয় তুমি চরম প্রশংসিত ও সম্মানিত।^১

আহলে বাইতে রাসূল উপর সুদীর্ঘ দরুদ ও অত্যাধিক প্রশংসায় হাদীস শরীফে অনেক বর্ণনা রয়েছে। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **وَالسَّلَامُ** -সালামের পদ্ধতি হলো যেভাবে তোমরা শিখেছো^২, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাশাহুদে পড়তে শিক্ষা দিয়েছেন-

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.

-হে নবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর ও পূন্যবান বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।^৩

^১ ক) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু সালাতি আলান নবী, ৩:১৫৩, হাদিস নং : ৮৯৬।

খ) আবদুর রায্যাক : আল মুসান্নাফ, ২:২১৩।

গ) বায়হাকী : ৩'আবুল ইমান, বাবু ইয়া সালাইতুম আলা রাসূলিল্লাহ, ৪:৭৬, হাদিস নং : ১৫১৭।

^২ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু সালাতি আলান নবী, ২:৩৭৩, হাদিস নং : ৬১৩।

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ওয়ামিন সূরাতিল আহযাব, ১১:৯, হাদিস নং : ৩১৪৪।

গ) ইমাম মালেক : আল-মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফীস্ সালাতি আলান নবী, ২:২১, হাদিস নং : ৩৫৮।

^৩ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু তাশাহুদি ফীল আখির, ৩:৩৩০, হাদিস নং : ৭৮৮।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তাশাহুদি ফীস্ সালাত, ২:৩৬৮, হাদিস নং : ৬০৯।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী তাশাহুদ, ১:৪৮৬, হাদিস নং : ২৬৬।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাশাহুদে এ সালাম পাঠ করতেন-

السَّلَامُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. مَنْ غَابَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَهِدَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَيْتِهِ، وَاغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَمَا وَلَدَا وَارْحَمَهُمَا. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.^১

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে উক্ত হাদীস- **الدُّعَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ** হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে উক্ত হাদীস- দরুদ শরীফের ধারাবাহিকতায় বর্ণিত এ হাদীস যা 'তাঁর জন্য রহমতের দোয়া করা' অধ্যায়ে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনো মারফু' সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এর উল্লেখ নেই।

আবু আমর ইবনে আবদুল বার ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রহমতের দোয়া করা যাবে না। বরং তাঁর উপর দরুদ ও তাঁর জন্য নির্ধারিত বরকতের প্রার্থনা করা যাবে। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্যান্য লোকদের জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া করা যাবে।^২

আবু মুহাম্মদ বিন আবি যায়িদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে যে দরুদ বর্ণিত হয়েছে, তা হলো-

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু তাশাহুদি ফীল আখির, ৩:৩৩০, হাদিস নং : ৭৮৮।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তাশাহুদি ফীস্ সালাত, ২:৩৬৮, হাদিস নং : ৬০৯।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী তাশাহুদ, ১:৪৮৬, হাদিস নং : ২৬৬।

^২ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তাগতভাবে বিশ্বজগতের জন্য রহমত। সুতরাং তাঁর জন্য রহমতের দোয়া কিভাবে করা যাবে? তাঁর জন্য রহমতের দোয়া করা হলো এরূপ যে, যেমন কোনো লোক সমুদ্রের জন্য দোয়া করে যে, হে আল্লাহ এই সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি করে দাও। তবে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বরকতের দোয়া করা যাবে। হে আল্লাহ! তুমি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে রহমত অবতীর্ণ করেছো, তাতে বরকত দান করো। আর তা আমাদের নিকট পৌছিয়ে দাও।

اللَّهُمَّ ارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ.

-হে আল্লাহ! দয়া করো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর যেভাবে তুমি দয়া করেছো হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

কিন্তু এ কথা কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। আর সালাম সম্পর্কে তাঁর দলিল হলো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী-

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

-হে মহান নবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক।^১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

فِي فَضِيلَةِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءُ لَهُ

দরুদ-সালামের ফযিলত প্রসঙ্গে

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণের ফযিলত ও বরকত অসীম। এর মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রভূত কল্যাণ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَبْغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَزْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

-যখন তোমরা মুয়াযযিনের আযান শুনবে তখন তোমরা অনুরূপ বাক্যে এর জবাব দেবে এবং আমার উপর দরুদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত অবতীর্ণ করেন। এরপর আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করো। কারণ ওসীলা জান্নাতের ওই স্থানের নাম যেখানে আল্লাহ তা'আলা সব বান্দাদের মধ্যে শুধু একজনকেই ওই স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন। আশা করা যায়, আমিই সেই মহিমাম্বিত স্থানে অধিষ্ঠিত হবো। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলার দোয়া করবে, সে আমার শাফায়াতের উপযুক্ত হবে।^২

হযরত আনাস বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. صَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرٌ. خَطِيئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ.

^১ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ইসতাজ্জাবাল কাওলি মিসলা কাওলিল মুয়াজ্জিন, ২:৩২৭, হাদিস নং: ৬৭৭।

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী ফযলিন্ নবী, ১২:৬০, হাদিস নং: ৩৫৪৭।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুস সালাতি আলা নবী, ৩:৬৯, হাদিস নং: ৬৭১।

^২ বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু তাশাহুদ ফীল আখির, ৩:৩৩০, হাদিস নং: ৭৮৮।

-যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন, তার দশটি পাপ মোচন করবেন এবং তার দশটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।^১

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে,

وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.

-তার জন্য দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে।^২

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنَّ جِبْرِيلَ نَادَانِي فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَاةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَرَفَعَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ.

-একদা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আমাকে আহ্বান করলেন, আর বললেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করবেন, আর তার দশটি পদমর্যাদা সমুন্নত করে দেবেন।

হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَقِيتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ لِي: إِنِّي أَبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.

-হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, আর তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দিয়েছেন, যে

^১ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ইসতাজ্জাবাল কাওলি মিসলা কাওলিল মুয়াজ্জিন, ২:৩২৭, হাদিস নং: ৫৭৭।

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী ফদলিস্ সালাত, ২:৩০৫, হাদিস নং : ৪৪৬।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুস্ সালাতি আলান্ নবী, ৩:৬৯, হাদিস নং : ৬৭১।

ঘ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুস্ সালাতি আলান্ নবী, পৃ. ২০১, হাদিস নং : ৯২২।

ঙ) ইবনে আবি শায়বা : আল মুসান্নাফ, ২/২০৩, হাদিস : ৮৭০৩।

চ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩/১০২, হাদিস : ১২০১৭।

ছ) বায্‌যার : আল মুসনাদ, ৯/২৯৫, হাদিস : ৩৭৯৯।

জ) ইবনে হিষ্মান : আস্ সহীহ, ৩/১৮৫, হাদিস : ৯০৪।

^২ আবু ইয়াল্লা : আল মুসনাদ, বাবু সিজাদাতু তকরান লী রব্বি, ২:৩৩২, হাদিস নং : ৮২৪।

ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আমিও তার প্রতি সালাম প্রেরণ করবো। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরুদ প্রেরণ করবে, আমিও তার প্রতি রহমত অবতীর্ণ করবো।^১

অনুরূপ বর্ণনা হযরত আবু হুরায়রা, হযরত মালেক বিন আউস বিন হাদসান, হযরত ওবায়দ উল্লাহ বিন আবী তালহা, হযরত যায়িদ বিন আল হাক্বাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي.

-যে ব্যক্তি আমার উপর এই দরুদ শরীফ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে।^২

হযরত ইবনে মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَوَّلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ.

-কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হবে, যে আমার উপর বেশী বেশী দরুদ শরীফ পাঠ করবে।^৩

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا بَقِيَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ.

^১ ক) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ২:৩৭১।

খ) হাকেম : মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু ওয়া আম্মা হাদিসী আবদিল ওয়াহাব, ২:৩২২, হাদিস নং : ৭৭০।

^২ ক) আহমদ : আল মুসনাদ, ৪:১০৮ হাদিস নং ১৭০৩২।

খ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, মিন ইসমিহি বকর, ৩:৩২১ হাদিস নং ৩২৮৫।

^৩ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী ফদলিস্ সালাত, ২:৩০৫, হাদিস নং : ৪৪৬।

খ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুস্ সালাতি আলান্ নবী, পৃ. ২০২, হাদিস নং : ৯২৩।

গ) বায়হাকী : তা'আবুল ইমান, বাবু আওলান্ নাসী বি ইয়াওমাল কিয়ামাহ, ৪:৮৫, হাদিস নং : ১৫২৬।

ঘ) ইবনে হিষ্মান : আস্ সহীহ, বাবুল আদয়িয়াহ, ৪:৩১২, হাদিস নং : ৯১৩।

-যে ব্যক্তি কোন গ্রন্থে আমার উপর দরুদ শরীফ লিপিবদ্ধ করবে যতদিন ওই গ্রন্থে আমার নাম লিপিবদ্ধ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।^১

হযরত আমের বিন রাবী'য়াহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ فَلْيَقِلْ مِنْ ذَلِكَ عَبْدٌ أَوْ لِيُكْثِرْ.

-যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে ফিরিশতারা তার প্রতি দরুদ পাঠ করেন। এখন এটা তার ইচ্ছাধীন যে, সে কি আমার উপর অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করবে, নাকি কম সংখ্যক পাঠ করবে।

হযরত উবাই বিন কা'ব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ رِبْعَ اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ. جَاءَتِ الرَّاحِفَةُ. تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ. جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ.

-রাতের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ইরশাদ করতেন, হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করো। মৃত্যুর ফিতনা সন্নিকটে এসেছে, এরই পেছনে কিয়ামতের নির্দশনও প্রকাশ হতে চলেছে। মৃত্যু নিকটবর্তী হয়ে যাচ্ছে।^২

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি নিবেদন করলাম,

إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرَّبْعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ

^১ ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, বাবুল কিত্যাতি মিনাল মাফকুত, ১৯:১৮১।

খ) ইবনে জাওয়যী : আল মাওযুয়াত।

গ) মুনজারী : আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, পৃ. ১৫৭।

^২ ক) হাকেম : মুসতাদরাক আল্লাস্ সহীহাইন, বাবু তাফসীরি সুরাতিল আহযাব, ৮:২৪০, হাদিস : ৩৫৩৭।

খ) বায়হাকী : শু'আবুল ইমান, বাবু ইয়াযাহাবা রবিয়াল লাইলি..., ৪:৩১, হাদিস নং : ১৪৭৩।

গ) আবদু ইবনে হমাইদ : আল মুসনাদ, বাবু কুরুব্বাহা., ১:১৮৩, হাদিস নং : ১৭২।

زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ فَالتَّلْثِينَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذَا تَكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ.

-হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি অধিকহারে আপনার উপর দরুদ পাঠ করি। অতএব আমি আপনার উপর কত সংখ্যক দরুদ প্রেরণ করবো? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে পরিমাণ তুমি ইচ্ছা কর। আমি আবেদন করলাম, আমি আমার দোয়ার এক চতুর্থাংশ আপনার উপর দরুদ পাঠের জন্য নির্ধারণ করে রাখব। তিনি এরশাদ করলেন, তুমি যত চাও, যদি তাতে বৃদ্ধি কর তবে এটা তোমার জন্য উত্তম। আমি আবেদন করলাম, (হে আল্লাহর রাসূল!) অর্ধাংশ নির্ধারণ করে রাখবো কি? তিনি এরশাদ করলেন, তুমি যত চাও। যদি তুমি তাতে বৃদ্ধি কর তবে তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি আবেদন করলাম, (হে আল্লাহর রাসূল!) কি দুই-তৃতীয়াংশে যথেষ্ট হবে? তিনি এরশাদ করলেন, তুমি যত চাও, যদি তুমি তাতে পরিমাণ বৃদ্ধি কর তবে তোমার জন্য উত্তম। আমি আরও করলাম, (হে আল্লাহর রাসূল!) আমি আমার প্রার্থনার সবটুকু সময়ই আপনার উপর দরুদ পাঠের জন্য নির্ধারণ করে রাখবো। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাহলে এ সমুদয় দরুদই তোমার যাবতীয় পেরেশানী ও উদ্বেগতা (দূর করা)র জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এবং (এর মাধ্যমে) তোমার যাবতীয় পাপ মার্জনা করে দেয়া হবে। এ হাদিস আহমদ, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।^৩

হযরত আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দচিন্তে ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ আনেন। এর পূর্বে কখনো তাঁকে এরূপ প্রফুল্লচিত্ত দেখিনি। সাহাবায়ে কেরাম বললেন,

^১ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, কিতাবু সিকাতিল ক্রিয়ামাতি ওয়াহু রাফায়িক, ৪/৬৩৬, হাদিস : ২৪৫৭।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৫/১৩৬, হাদিস : ২১২৮।

গ) হাকেম : আল মুসতাদরাক, ২/৪৫৭, হাদিস : ৩৫৭৮।

ঘ) আবদু ইবনে হমাইদ : আল মুসনাদ, ১/৮৯, হাদিস : ১৭০।

ঙ) বায়হাকী : শু'আবুল ইমান, ২/১৮৭, হাদিস : ১৪৯৯।

চ) মাকদাসী : আল আহাদীসিল মুখতার, ৩/৩৮৯, হাদিস : ১১৮৫।

ছ) তাবরানী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু সালাতি আলান নবী, পৃ. ২০৩, হাদিস নং : ৯২৯।

জ) হাকেম : মুসতাদরাক আল্লাস্ সহীহাইন, বাবু তাফসীরি সুরাতিল আহযাব, ৮:২৪০, হাদিস : ৩৫৩৭।

وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ خَرَجَ جَرِيرٌ أَنْفًا فَأَتَانِي بِبِشَارَةٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَنِي إِلَيْكَ أَبَشْرُكَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ يُصَلِّي عَلَيْكَ إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ بِهَا عَشْرًا.

-হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আজ আপনি এতো আনন্দিত কেন? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এইমাত্র হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আমাকে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দিয়েছেন, আপনার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তিই আপনার প্রতি একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ ও তদীয় ফেরেশতাগণ তার প্রতি দশবার দরুদ শরীফ প্রেরণ করবেন।^১

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الثَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

-যে ব্যক্তি আযানের পর এই দোয়া اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الثَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ পাঠ করবে। কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত করা স্বীকৃত হবে।^২

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আযান শুনার পর এই দোয়া পাঠ করবে, তার পাপরাশি মোচন করে দেয়া হবে দোয়াটি হচ্ছে-

^১ তবরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ৫:১০০ হাদীস নং ৪৭১৯।

^২ ক) বুখারী : আস্ সুহীহ, বাবুদ দোয়া ইন্দান নিদা, ২:৪৮১, হাদিস নং : ৫৭৯।

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মিনহু আখির, ১:৩৫৭, হাদিস নং : ১৯৫।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুদ দোয়া ইন্দাল আযান, ৩:৭২, হাদিস নং : ৬৭৩।

ঘ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফীদ দোয়া ইন্দাল আযান, ২:১২৭, হাদিস নং : ৪৪৫।

ঙ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু মা ইয়াকুল ইয়া আযানালা মুয়াজ্জিন, ২:৪২২, হাদিস নং : ৭১৪।

وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا.

-আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিশেষ বান্দাহ ও রাসূল। আমি মহান আল্লাহকে প্রভু, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল ও ইসলামকে দীনরূপে পেয়ে সন্তুষ্ট হলাম।^১

হযরত ইবনে ওহুহাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ عَشْرًا فَكَأَنَّمَا أَغْتَقَ رَقَبَةً.

-যে ব্যক্তি আমার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করলো, সে যেনো একজন ক্রীতদাস আযাদ করলো।

কোনো কোনো হাদীসে ও সাহাবীদের অভিমতে বর্ণিত, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ مَا أَعْرِفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ صَلَاتِهِمْ عَلَيَّ.

-কিয়ামতের দিনে এমন অনেক লোক আমার নিকট আসবে যাদেরকে আমি অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠের কারণেই চিনতে পারবো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ أَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً.

-তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি কিয়ামত দিবসের বিভীষিকা ও সম্ভ্রান্ততা থেকে সবচেয়ে বেশী নিরাপত্তা লাভ করবে, যে আমার প্রতি বেশী দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

^১ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা ইয়াকুল রজ্জুলু ইয়া আযানা, ১:৩৫৫, হাদিস নং : ১৯৪।

খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুদ দোয়া ইন্দাল আযান, ৩:৭১, হাদিস নং : ৬৭২।

গ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফীদ দোয়া ইন্দাল আযান, ২:১২১, হাদিস নং : ৪৪১।

ঘ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু মা ইয়াকুল ইয়া আযানালা মুয়াজ্জিন, ২:৪২১, হাদিস নং : ৭১৩।


হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْحَقُ لِلذُّنُوبِ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلنَّارِ،
السَّلَامُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرَّقَابِ .

-হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা আগুন নির্বাপিত করার চেয়েও অধিক পাপ মোচনকারী। তাঁর প্রতি সালাম পেশ করা ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়েও অধিক উত্তম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

فِي ذَمِّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَآثِمِهِ

হযুর  এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ না করার নিন্দা ও পরিণতি
হযরত আবু হুরায়রা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ
رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَذْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكَبِيرَ
فَلَمْ يَدْخُلَاهُ الْجَنَّةَ.

-ওই ব্যক্তির নাক ধূলায় মলিন হোক! যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হলো, কিন্তু সে আমার উপর দরুদ পাঠ করলো না। ওই ব্যক্তির নাসিকা ধূলায় মলিন হোক! যার নিকট রমযান মাস আসলো, আর চলে গেল, অথচ সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হলো না। ওই ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূসরিত হোক, যার মাতা-পিতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেলো কিন্তু সে তাদের সেবা করে জান্নাত লাভ করতে পারলো না। বর্ণনাকারী আবদুর রহমান রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, সম্ভবত! হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা কিংবা পিতা তাদের কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল এরূপ বলেছেন।^১

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত, একদিন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের এক সিঁড়িতে আরোহন করেন আর 'আমীন' বলেন। অতঃপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে আরোহন করেন আর 'আমীন' বললেন। অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে আরোহন করেন। আর 'আমীন' বললেন। হযরত মু'আয রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ সম্পর্কে আরয করলে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. مَنْ سُمِّيَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ
فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ: آمِينَ فَقُلْتُ: آمِينَ وَقَالَ فِيمَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ

১. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু কাওলির রাসূল, ১১:৪৫৫, হাদিস নং : ৩৪৬৮।

খ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুস সালাত আলান নবী, পৃ. ২০২, হাদিস নং : ৯২৭।

গ) আহমদ ইবনে হামল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৫:১৮০, হাদিস নং : ৭১৩৯।

فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَمَاتَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَرَهُمَا
فَمَاتَ مِثْلَهُ.

-এইমাত্র হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যার সামনে আপনার নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে আপনার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করলো না, এরপর তার মৃত্যু হলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, আর তাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। আপনি এই কথাটির উপর আমীন বলুন, আমি মিসরে বসে আমীন বলি। আর যে ব্যক্তি রমযানের মাস পেলো অথচ নিজে পাপ মুক্ত হতে পারেনি। সে রহমত থেকে বঞ্চিত হলো; তখন আমি আমীন বলি। তারপর যে আপন মাতা-পিতাকে জীবিত পেয়েছে, তাদের সেবা করে পূণ্য অর্জন করে তাদের সম্ভ্রষ্ট না করে ওই অবস্থায় মারা গেছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করুক। তাই আমি পুনরায় আমীন বলি।^১

হযরত আলী রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الْبَخِيلُ الَّذِي ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

-প্রকৃত কৃপণ ওই ব্যক্তি যার নিকট আমার নাম ও আলোচনা হলো, কিন্তু সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করলো না।^২

হযরত ইমাম জা'ফর বিন মুহাম্মদ রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সম্মানিত পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ أَخْطِيءُ بِهِ طَرِيقُ الْجَنَّةِ.

- যার নিকট আমার নাম উচ্চারণিত হলো কিন্তু সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করলো না, সে যেন জান্নাতের পথ ভুলে গেল।

^১ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু কাওলির রাসূল, হাদিস নং : ৩৫৪৫।

খ) বায়হাকী : ত'আবুল ইমান, বাবু মা আদরাকা আবওয়াইহি, ৮:১৩৪, হাদিস নং : ৩৪৬৯।

গ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবুল আদয়িয়াহ, ৪:৩০৪, হাদিস নং : ৯০৯।

^২ ক) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু সালাতি আলান নবী, পৃ. ২০৪, হাদিস নং : ৯৩৩।

খ) বায়হাকী : ত'আবুল ইমান, বাবুল বুখলি আল্লাযী যুকিরতু, ৪:৮৭, হাদিস নং : ১৫২৮।

হযরত আলী রাডিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْبَخِيلَ كُلَّ الْبَخِيلِ مَنْ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

-নিশ্চয় সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি হলো সেই, যার নিকট আমার নাম উচ্চারণিত হলো, অথচ আমার উপর দরুদ পাঠ করলো না।^১

হযরত আবু হুরায়রা রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَيُّا قَوْمٍ جُلُسُوا ثُمَّ تَفَرَّقُوا قَبْلَ أَنْ يَذْكُرُوا اللَّهَ وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ إِنْ شَاءَ عَذَابُهُمْ وَإِنْ شَاءَ غُفِرَ لَهُمْ.

-যে মজলিসে কোন সম্প্রদায় আল্লাহর যিক্র ও তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ না করে পরস্পর পৃথক হয়ে যায় (মজলিস সমাপ্ত করে) তাহলে এই বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিবেন কিংবা ক্ষমা করবেন।^২

হযরত আবু হুরায়রা রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ نَسِيَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ.

-যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে যেন জান্নাতের পথ ভুলে গেল।^৩

হযরত কাতাদা রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

^১ বায়হাকী : ত'আবুল ইমান, ৩:১৩০ হাদিস নং ১৪৬৪।

^২ ক) নাসায়ী : সুনানুল কুবরা, ৬:১০৭।

খ) হাকেম : আল মুসতাদারাক, কিতাবুদ দোয়া, ৪:৩৫৭, হাদিস নং : ১৭৬৪।

গ) বায়হাকী : ত'আবুল ইমান, আইয়ু মা কাওয়া জুলুস..., ৪:৯০, হাদিস নং : ১৫৩১।

^৩ ক) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ১:২৯৪ হাদিস নং ৯০৮।

খ) বায়হাকী : ত'আবুল ইমান, ৩:১৩৫ হাদিস নং ১৪৭৩।

গ) তবরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ১২:১৮০ হাদিস নং ১২৮১৯।

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَلَى غَيْرِ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تَفَرَّقُوا عَلَى أَتْنَنْ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ.

-যে মজলিসে কোন সম্প্রদায় একত্রিত হলো, অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ না করে পরস্পর পৃথক হয়ে গেল (মজলিস সমাপ্ত করল), তারা যেন জাহ্নমের দুর্গন্ধের কারণে মজলিস ত্যাগ করলো।^১

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَجْلِسُ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَا يُصَلُّونَ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لَمَّا يَرَوْنَ مِنَ الثَّوَابِ.

-যদি কোন সম্প্রদায় কোন একটি মজলিসে একত্রিত হয় আর তাতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ না করে, তবে তা তাদের জন্য আক্ষেপ ও অনুশোচনার কারণ হবে, জান্নাতে প্রবেশ করলেও তারা পূণ্যের স্বল্পতা দেখতে পাবে।^২

ইমাম তিরমিযি রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোনো কোনো জ্ঞানীদের অভিমত উল্লেখ করে বলেন, যদি কোনো মজলিসে কোন এক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে, তবে তা মজলিসে উপস্থিত সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।

^১ ক) নাসায়ী : সুনানুল কুবরা, ৬:১০৯।

খ) হাকেম : আল মুসতাদরাক, কিতাবুদ দোয়া, ৪:৩৫৭, হাদিস নং : ১৭৬৪।

^২ বায়হাকী : শু'আবুল ইমান, বাবু লাহু ইয়াজলিসু কাওমুন মজলিসান, ৪:৯২, হাদিস নং : ১৫৩৩।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

فِي تَخْصِيصِهِ ﷺ بِتَبْلِيغِ صَلَاةٍ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَوْ سَلَّمَ مِنَ الْأَنَامِ

দরুদ-সালাম পাঠকারীদের সাথে হযুর ﷺ এর বিশেষ সম্বন্ধ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

-যখন কেউ আমার নিকট সালাম প্রেরণ করে, তখন আমার রুহ আমার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়, আর আমি তার দরুদ ও সালামের জবাব দিই।^১

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَتْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا بُلَّغْتُهُ.

-যে ব্যক্তি আমার রওযা মুবারকের নিকট দাঁড়িয়ে আমার উপর দরুদ পাঠ করে, আমি তা শুনতে পাই। আর যে দূর থেকে আমার উপর দরুদ পাঠ করে, তা আমার নিকট পৌছানো হয়।^২

হযরত ইবনে মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ.

-নিশ্চয় ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার বিচরণশীল একদল ফিরিশতা রয়েছে, যারা আমার উম্মাতের দরুদ ও সালাম আমার নিকট পৌছে দেয়।^৩

^১ ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু যিয়ারাতিল কুবর, ৫:৪১৭, হাদিস নং : ১৭৪৫।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আবী হুরাইরা, ২১:৪৩৯, হাদিস নং : ১০৩৯৫।

গ) তাবরিরী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু সালাতি আলান নবী, পৃ. ২০২, হাদিস নং : ৯২৫।

[এখানে রুহ ফিরিয়ে দেওয়ার মর্মার্থ হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জামত করা হয়। জীবিত করা অর্থ নয়। কারণ এ বিষয়ের উপর উম্মাতের একমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাওযা মুবারকে স্ব-শরীয়ে জীবিত আছেন। যারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হারাতুন নবী স্বীকার করে না, তারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাকীকত সম্পর্কে অন্ধ।]

^২ ক) তাবরিরী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু সালাতি আলান নবী, পৃ. ২০৪, হাদিস নং : ৯৩৪।

খ) বায়হাকী : শু'আবুল ইমান, বাবু মান সালাতী আল্লা ইন্না কুবরী, ৪:১০৩, হাদিস নং : ১৫৪৪।

^৩ ক) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু সালাম আলান নবী, ৫:৫১, হাদিস নং : ১২৬৫।

হযরত আবু হুরায়রা ও ইবনে উমর রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত,
 أَكْثَرُوا مِنَ السَّلَامِ عَلَى نَبِيِّكُمْ كُلِّ جُمُعَةٍ فَإِنَّهُ يُؤْتَى بِهِ مِنْكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

-তোমরা প্রত্যেক জুম'আর দিবসে তোমাদের নবীর প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের পক্ষ থেকে প্রত্যেক জুম'আর দিনে তা আমার নিকট পেশ করা হয়।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে,

فَإِنَّ أَحَدًا لَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ صَلَاتُهُ عَلَيَّ حِينَ يَفْرُغُ مِنْهَا.

-কেননা যে ব্যক্তিই আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে, তা তৎক্ষণাৎ আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।

হযরত হাসান বিন আলী রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

حِينَ كُنتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي.

-তোমরা যেখানেই থাকো আমার নিকট দরুদ শরীফ প্রেরণ করো, কেননা তোমাদের দরুদ ও সালাম আমার নিকট পৌঁছানো হয়।^১

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَيُصَلِّيُ عَلَيْهِ إِلَّا بُلِّغَهُ.

-উম্মাতে মুহাম্মদীর যে ব্যক্তিই তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করবে, তা তাঁর নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

অনেকে এটাও বলেছেন, যখন বান্দা নবী কারীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করে, তখন তা পাঠকারীর নামসহ তাঁর নিকট পেশ করা হয়।

খ) তাবরীখী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু সালাতি আলান নবী, পৃ. ২০২, হাদিস নং : ৯২৪।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, মুসনাদি আবদিয়াহ ইবনে মাসুদ, ৯:১২৮, হাদিস নং : ৪০৯৩।

১ ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৭:৪৯১, হাদিস নং : ৮৪৪৯।

খ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৩:১৪০।

গ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবু মিন ইসমিহি আহমদ, ১:৩৭১, হাদিস নং : ৩৭২।

হযরত হাসান বিন আলী রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন মহান নবীর প্রতি সালাম পেশ করবে, কেননা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تَتَّخِذُوا بَيْتِي عِيدًا وَلَا تَتَّخِذُوا بَيُوتَكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ كُنتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ.

-তোমরা আমার গৃহকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। আর তোমাদের নিজের ঘরকে কবরে পরিণত করো না। তোমরা যেখানেই থাকো আমার প্রতি দরুদ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছানো হয় তোমরা যেখানেই থাকো।^১

হযরত আনাস রাঃদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত,

أَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.

-তোমরা জুম'আর দিন আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরুদ শরীফ আমার নিকট পেশ করা হয়।

হযরত সুলায়মান বিন সুহাইম রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْتُونَكَ فَيَسَلُّمُونَ عَلَيْكَ أَتَفْقَهُ سَلَامَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ.

-একদা আমি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখে আরব করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যারা আপনার খেদমতে হাযির হয়ে আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করে, আপনি তাদের সালাত ও সালাম শুনতে পান কী? হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হ্যাঁ। বরং আমি তাদের সালাত ও সালামের জবাব দিই।

১ ক) আব্দুর রায্বাক : আল মুসনাদ, ৩:৭১ হাদিস নং ৪৮৩৯।

খ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসনাদ, ২:১৫০ হাদিস নং ৭৫৪২।

গ) আহমদ : আল মুসনাদ, ২:৩৬৭ হাদিস নং ৮৭৯০।

ঘ) আবু দাউদ : আস সুনান, বাবু যিয়ারাতিল কুবর, ২:২১৮ হাদিস নং ২০৪২।

ঙ) তাবরানী : আল মু'জামুল আওসাত, ১:১১৭ হাদিস নং ৩৬৫।

চ) বাযযার : আল মুসনাদ, ১:১০৮।

হযরত ইবনে শিহাব হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى فِي اللَّيْلَةِ الزَّهْرَاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ فَإِنَّهَا يُؤَدِّبَانِ عَنْكُمْ
وَأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَأْكُلُ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَى إِلَّا حَمَلَهَا
مَلَكٌ حَتَّى يُؤَدِّبَهَا إِلَيَّ وَيُسَمِّيهِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ كَذَا وَكَذَا.

-তোমরা অত্যুজ্জ্বল রাত ও অত্যুজ্জ্বল দিবসে বেশী বেশী করে দরুদ পাঠ করো। কেননা তোমাদের ওই দুই সময়ের দরুদ আমার নিকট তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে যায়। আর নিশ্চয় ভূপৃষ্ঠে সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস সালামের দেহ মোবারক ডক্ষণ করে না। যে মুসলমানই আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করে, তবে একজন ফেরেশতা ওই দরুদ বহন করে আমার নিকট পেশ করে এবং দরুদ পাঠকারীর নাম আমাকে বলে দেয়। আর বলে, অমুক ব্যক্তি আপনার উপর এমন এমন এই দরুদ পাঠ করেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

فِي الْاِخْتِلَافِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ

নবী ও রাসূল ব্যতীত অন্যদের প্রতি দরুদ পাঠে মতবৈতন্য প্রসঙ্গে

কাযী আয়ায রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, (আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সামর্থ্য দান করুক) বলেন, আলেমগণ এ বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো প্রতি দরুদ পাঠ করা জাযিয। আর হযরত ইবনে আক্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি দরুদ পাঠ করা জাযিয নেই।

হযরত ইবনে আক্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আযিয়া আলাইহিমুস সালাম ব্যতীত অন্য কারো প্রতি দরুদ পাঠ করা জাযিয নেই।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নবী ব্যতীত অন্যদের প্রতি দরুদ পাঠ করা মাকরুহ। তিনি বলেন, আমি কোনো একটি পত্রের মাধ্যমে ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ অভিমত জানতে পারি যে, নবী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি দরুদ পাঠ করা বৈধ নয়। তবে এটা ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রসিদ্ধ অভিমত নয়। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর 'মাবসূত' গ্রন্থে ইয়াহইয়া বিন ইসহাক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

أَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ. وَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَدَّى مَا أَمَرَنَا بِهِ.

-আমি মনে করি সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস সালাম ব্যতীত অন্য কারো প্রতি দরুদ পাঠ করা মাকরুহ। তিনি আরও বলেন, আদিষ্ট বিষয়ে আমাদের সীমালঙ্ঘনের অধিকার নেই।

হযরত ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এই অভিমতের উপর আমল করা যাবে না। কারণ আমাদের ধারণা হলো যে,

وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ.

-অন্যান্য নবীগণ ও অন্যান্যদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করাতে কোন অসুবিধা নেই।

তিনি দলিল হিসেবে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস পেশ করেন, যাতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার পদ্ধতি শিক্ষা দান করেছেন। আর তাতে এই শব্দসমূহ রয়েছে- وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ -তাঁর রমনীকূল ও পরিবারবর্গের প্রতি।

আবু ইমরান আল কাবিসী রাছিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যে বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস রাছিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে,

كَرَاهَةَ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَبِهِ نَقُولُ. وَلَمْ يَكُنْ يُسْتَعْمَلُ فِيهَا مَضَى.

-নবী ব্যতীত অন্যদের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা মাকরুহ। পূর্ববর্তী লোকদের এরূপ আমল ছিলো।

হযরত আবদুর রায়যাক হযরত আবু হুরায়রা রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي.

-তোমরা পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের প্রতি দরুদ পাঠ করো। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকেও আমার মতো প্রেরণ করেছেন।'

আলেমগণ বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত এই হাদীস দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আরবী ভাষায়- ‘আস্ সালাত’ শব্দ রহমত ও দোয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এ শব্দ মুতলক (সাধারণ অর্থজ্ঞাপক) হয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন-

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

النُّورُ^٤ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

-তিনিই হন, যিনি দরুদ প্রেরণ করেন তোমাদের উপর এবং তাঁর ফিরিশতাগণ, যেন তিনি তোমাদেরকে অন্ধকাররাশি থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর তিনি মু'মিনদের উপর দয়ালু।'

ક) આવદૂત્ર ત્રાય્યાક : આલ મ્માન્નાય, ૨:૨૧૭।

খ) বায়তুলী : ও'আবুল ইমান, বাবু সাহু আলা আফিয়া..., ১:১৪২, হাদিস নং : ১২৩।

.....
অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

-হে মাহবুব! তাদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করবেন এবং তাদের জন্য মঙ্গলের দোয়া করুন। নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের অন্তরসমূহের প্রশান্তি। এবং আল্লাহ মহান শ্রোতা, জ্ঞাতা।^২

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ ﴿٥٧﴾

—এসব লোক হচ্ছে তারাই, যাদের উপর তাদের পালনকর্তার দরদসমূহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর এসব লোকই সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।^৩

হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

-হে আল্লাহ! আপনি আবু আওফার বংশধরদের উপর রহমত (সালাত) অবতীর্ণ করুন।^৪

^১. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৪৩।

^২. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১০৩।

০. আল কুরআন : সূরা বাকারাহ, ২:১৫৭।

^৪. ক) বুখারী : আস সহীহ, বাবু সালাতিল ইমাম ওয়া দোয়ায়িহী, ৫:৩৫৮, হাদিস নং : ১৪০২।

খ) মুসলিম : আস সহীহ, বাবদ দোয়ায়ি লি মান আতা বিসদকা, ৫:৩৩২, হাদিস নং : ১৭৯১।

ग) नासायी : आस सनातन बाब साजातिल इमाम आणा साहिविस् सदका, ८:१८९, हादिस नं : २४१७।

হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম এর মুজিয়াসমূহের মধ্যে এক মুজিয়া ছিলো যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অতি মোহনীয় সূর দান করেছেন। যখন তিনি মোহনীয় সূরে জাবুর কিতাব পাঠ করতেন, তখন তাঁর চতুর্দিকে বিজয়কুল সমবেত হয়ে যেতো। সুতরাং একথায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কুরআন তিলাওয়াত শুনে তাঁর সম্পর্কে বললেন, তাকে আলে দাউদের সূরের মতো সূর দান করা হয়েছে। এখানে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলে দাউদ শব্দের উল্লেখ করার মাধ্যমে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম এর সন্তাকে বুঝিয়েছেন। এর

আর যখন কোনো সম্প্রদায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাদকার মাল নিয়ে আসতেন তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন,
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ.

-হে আল্লাহ! অমুকের বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন।

দরুদের হাদীসে বর্ণিত আছে-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ.

-হে আল্লাহ! দরুদ প্রেরণ করো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর স্ত্রীগণ ও বংশধরদের প্রতি।^১

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে-

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.

-হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের প্রতি।

কোনো কোনো আলেমগণ বলেন যে, أَبْنَاءُ শব্দের মর্মার্থ হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীগণ। অপর একদল আলেমের মতে, آلُ يَسَى বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ। আবার কেউ কেউ বলেন, أُمَّة তাঁর উম্মাতগণ।

অপর একদলের অভিমতে الرُّفُطُ وَالْعَشِيرَةُ শব্দের অর্থ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী, গোত্র ও পরিবারবর্গ। অপর একদলের অভিমত হলো, পুরুষের বংশধর হলো সন্তানরা। অপর অভিমত অনুযায়ী, গোত্রীয় লোকজন। এটাও বলা হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের মধ্যে ওইসব লোক যাদের জন্য যাকাত হারাম করা হয়েছে।

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় এসেছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয় করা হয় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আ-ল বলে কাদের বুঝানো হয়েছে? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, كُلُّ نَفْسٍ -সকল খোদাভীরূ ব্যক্তিদের।^২

দ্বারা হযরত হাসান বসরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমাণ করেন, আলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্মার্থ হলো- হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সন্তা।]

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুস সালাত আলান নবী, ২:৩৭৫, হাদিস নং : ৬১৫।

খ) আবু আওয়ানা : আল মুসতাখরাজ, বাবু বয়ানি হাতরিজ তাযফীক, ৪:৩৬৮, হাদিস নং : ১৬১৪।

গ) তাহাবী : মুশকিলুল আসার, বাবু কুলু আলাহুমা সাল্লি আলা, ৫:২২৫, হাদিস নং : ১৮৬৩।

২. ক) বায়হাকী : মুনানুল কুবরা, ২:১৫২।

হযরত হাসান বসরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল-ই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন, স্বয়ং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন-

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ - يُرِيدُ نَفْسَهُ.

-হে আল্লাহ! তোমার রহমত ও বরকত নাযিল করো আলে মুহাম্মাদের উপর- তিনি এর দ্বারা তাঁর নিজের সন্তাকে উদ্দেশ্য করেছেন।

কারণ তিনি ফরয ত্যাগ করে নফল আদায় করতেন না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা যে কাজের আদেশ দিয়েছেন তা ফরয। কারণ তিনি নিজেই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন। আর তা স্বয়ং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

এটা ওই উক্তির মতো, একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কুরআন তিলাওয়াত শুনে বললেন,
لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُودَ - يُرِيدُ مِنْ مَزَامِيرِ دَاوُدَ.

-তাকে দাউদ আলাইহিস সালাতের মতো সূরের লহরী দান করা হয়েছে।^১ এখানে آلِ دَاوُود দ্বারা স্বয়ং হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবু হুমাইদ সা'য়িদী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত সালাত সম্পর্কিত হাদীসে রয়েছে, হযুর এরূপ দরুদ শরীফ পড়তেন-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ.

-হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পুত্র-পবিত্র রমণী ও তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত নাযিল করুন।

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দোয়া করেন।

খ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবু মিন ইসমিহী আ'ফর, ৭:৪৪৪, হাদিস নং : ৩৪৬১।

গ) তাবরানী : মু'জামুস সগীর, বাবু মিন আলী মুহাম্মদ, ১:৩৪৯, হাদিস নং : ৩১৯।

১. হযরত আবু আওহাব নাম ছিলো আলকাম বিন খালিদ বিন হারিস আসলামী কুফার অবস্থানকারী সাহাবীদের মধ্যে সব শেষ ৮৭ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। তাঁর পুত্র ও সাহাবী ছিলেন। বায়াতে রিদওয়ানে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। তিনি যাকাত নিয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দোয়া করেন।

তা'আলা আনহুমা উপর দরুদ পেশ করতেন। হযরত ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে উক্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত বর্ণনা হযরত ইয়াহইয়া আন্দুলুসী থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর অন্যান্য বর্ণনাকারীর বিজ্ঞ বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ইবনে উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবু বকর ও উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা জন্য দোয়া করতেন।

হযরত ইবনে ওহাব রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আনাস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, আমরা আমাদের সঙ্গীদের অনুপস্থিতিতে এভাবে দোয়া করতাম,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مِنْكَ عَلَى فُلَانٍ صَلَوَاتِ قَوْمِ أَتْرَارٍ، الَّذِينَ يَقُومُونَ بِاللَّيْلِ وَيَصُومُونَ بِالنَّهَارِ.

-হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে অমুকের উপর ওই পূণ্যবানদের সালাত প্রেরণ করুন, যারা রাতে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে, আর দিনে রোযা রাখে।

কাযী আযায রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এ বিষয়ে সত্যানুসারী আলেমগণ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আমার অভিমতও অনুরূপ। ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সুফিয়ান সাওরী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ইবনে আক্বাস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হয়েছে। অনেক ফকীহ ও কলামশাস্ত্রবিদ এ অভিমতের উপর ঐক্যমত পোষণ করেন, সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস সালাম ব্যতীত অন্য কারো উপর দরুদ পেশ করা যাবে না। কারণ তা শুধু সম্মানিত নবীগণের জন্য নির্ধারিত। এটা শুধু তাঁদের তা'যীম ও সম্মানের কারণে, যেমন- আল্লাহ তা'আলার যিকিরের সময় তাঁর পবিত্রতা আলোচনা করা, যাতে তিনি ব্যতীত অন্যরা সম্পৃক্ত না হয়।

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

-তাঁর প্রতি দরুদ ও উত্তমরূপে সালাম প্রেরণ করো।^১

সম্মানিত নবীগণ ব্যতীত অন্য ইমামদের সাথে মাগফিরাত আর রিদওয়ান উল্লেখ করতে হবে।

^১. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৫৬।

যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

-তারা আরব করে, 'হে আমাদের পালনকর্তা। আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের ভাইদেরকেও যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে।'

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ

اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنِ رِضَى اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

-আর সবার মধ্যে অগ্রগামী প্রথম মুহাজির ও আনসার আর যারা সৎকর্মের সাথে তাদের অনুসারী হয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।^২

একথাও বর্ণিত আছে, এ আদেশ অর্থাৎ সম্মানিত নবীগণ ব্যতীত অন্যদের সম্পর্কে দরুদ পাঠ করার রীতি ইসলামের প্রথম যুগে প্রচলিত ছিলো না। যেমন আবু ইমরান বলেন, রাফেজী ও শিয়া মতাবলম্বীরা তাদের কতিপয় ইমামকেও দরুদ শরীফে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এক্ষেত্রে তারা দরুদের মধ্যে ইমামগণকেও হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একীভূত করে দিয়েছে।

আর এ কথাও বিদিত, বিদ'আতীদের সাথে সাদৃশ্য নিষিদ্ধ। এখন তাদের বিরোধিতা করা আবশ্যিক, কারণ তারা এক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করেছে। তবে যেখানে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বংশধর ও পবিত্রাত্মা সহধর্মীনিগণের উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করা হয়, তা এজন্য যথার্থ হবে যে, এখানে দরুদ ও সালাম হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, যা শুধু তাঁর বংশধর ও সহধর্মীনিগণের প্রতি সম্পর্কিত নয়।

আলেমগণ বলেন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করেছেন ওই দরুদ দোয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। আর এ বিষয়টি ইঙ্গিত করে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের দৃষ্টিতে তাদের প্রতি মনযোগী

^১. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:১০।

^২. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১০০।

হয়েছেন। এখানে শ্রদ্ধা ও সম্মান উদ্দেশ্য নয়। আর আলেমগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী-

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا^১

-রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করোনা যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।^২

অতএব, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্বোধন ও প্রার্থনা অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রম হওয়াটা আবশ্যিক। এটি আমাদের মতানুসারী ইমাম আবুল মুজাফফর ইসপারায়িনীর অভিমত, ইবন আব্দুল বারও এ অভিমতের সমর্থক

নবম পরিচ্ছেদ

فِي حُكْمِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ ﷺ وَفَضِيلَةِ مَنْ زَارَهُ وَكَيْفَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ

রওযা মুবারক যিয়ারতের বিধান, ফযীলত ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে

মুসলিম উম্মাহর জন্য হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারক যিয়ারত করা সুন্নাত। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন। আর সকলে এর ফযীলতের সমর্থক হয়েছে। তাই সকলে রওযা মুবারক যিয়ারতের প্রতি উৎসাহ দান করেছেন।

হযরত ইবনে উমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي.

-যে ব্যক্তি আমার রওযা মুবারক যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।^৩

হযরত আনাস বিন মালেক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ زَارَنِي فِي الْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ فِي جَوَارِي، وَكُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

-যে ব্যক্তি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে পবিত্র মদীনা নগরীতে এসে আমার রওযা মুবারক যিয়ারত করবে, সে আমার আশ্রয়ে থাকবে। কিয়ামত দিবসে আমি তার জন্য শাফায়াতকারী হবো।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي.

-যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার রওযা মুবারক যিয়ারত করলো, সে যেন জাহেরী জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো।^৪

^১ ক) দারে কুতনী : আস্ সুনান, বাবুল মাওয়াক্কীত, ৬:৪৭৪, হাদিস নং : ২৭২৭।

খ) বায়হাকী : তা'আবুল ইমান, বাবু মান জারা কবরী, ৯:১৯২, হাদিস নং : ৪০০০।

^২ ক) দারে কুতনী : আস্ সুনান, বাবুল মাওয়াক্কীত, ৬:৪৭৩, হাদিস নং : ২৭২৬।

খ) বায়হাকী : তা'আবুল ইমান, বাবু মান জারানী বা'দা মাওতী, ৯:১৮৫, হাদিস নং : ৩৯৯৩।

^৩ আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৬৩।

‘হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত করেছি’ - একথা বলা ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু মাকরুহ বলেছেন। ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু এই অভিমতের মর্মার্থ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, ‘যিয়ারত’ শব্দটি দোষযুক্ত। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ - আল্লাহ তা‘আলা কবর যিয়ারতকারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। কিন্তু এ বিধানটি স্বয়ং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহিত করে দিয়ে ইরশাদ করেন,

نُهِيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُوزُهَا.

-আমি তোমাদেরকে পূর্বে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, আর এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো।’

আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, مَنْ زَارَ قَبْرِي - ‘যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করলো’ এই হাদীসে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ‘যিয়ারত’ শব্দ উল্লেখ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, ‘যিয়ারত’ শব্দ বলা এ কারণে মাকরুহ যে যিয়ারতকারী মায়ূর বা যার যিয়ারত করা হয় তার চেয়ে উত্তম হয়। কিন্তু এ অভিমতটি অর্থহীন। কারণ প্রত্যেক যিয়ারতকারী এই গুণাবলীর ধারক হয় না। আর না স্বাভাবিকভাবে সকল যিয়ারতকারীর ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হয়। আর হাদীস শরীফে বেহেশতবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা স্বীয় পালনকর্তার যিয়ারত করবে। এখানে দেখা যায় ‘যিয়ারত’ শব্দ আল্লাহ তা‘আলার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে।

আবু ইমরান রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বলেন, হযরত ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু ‘তাওয়াক্ফে যিয়ারত’ ও রওয়া মুবারকের জন্য ‘যিয়ারত’ শব্দ ব্যবহার করা এ কারণে মাকরুহ বলেন, এই শব্দটি লোকেরা সাধারণতঃ একে অপরের জন্যও ব্যবহার করে থাকে। সাধারণ লোকের জন্য স্বাভাবিকভাবে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়, ঐ শব্দ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে ব্যবহার করা ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু মাকরুহ বলেছেন। বরং তাঁর মতে এরূপ বলা মুস্তাহাব যে, سَلَّمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ‘আমরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম নিবেদন করেছি।’^২

^১ মুসলিম : আস্ সহীহ, পৃ. ৯৭৭।

^২ মূলতঃ ইমাম মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, এ কথা বলা যে, আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত করেছি, এটাকে মাকরুহ বলেছেন। এজন্যই যে, ইবনে রুশদ

আর এ কথাও বিদিত আছে, লোকদের মাঝে ‘যিয়ারত’ শব্দের ব্যবহার অনুমোদিত (মুবাহ)। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওয়াদিকে সাওয়ারীসমূহ নিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। এখানে ওয়াজিব দ্বারা ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু মুস্তাহাব, এর প্রতি উৎসাহ, গুরুত্ব বুঝিয়েছেন, ফরয উদ্দেশ্য করেননি।

আমার (লেখক) মতে, ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু ‘যিয়ারত’ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা বা মাকরুহ বলার কারণ হলো যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওয়াদ সাথে সম্পৃক্ততা। তাই যদি কেউ বলে, ‘আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করেছি’ তাহলে ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু এটাকে মাকরুহ বলেননি। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَّا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

-হে আল্লাহ! আপনি আমার কবরকে প্রতিমালয় বানাবেন না যে, আমার পরে এর উপাসনা করা হবে। আল্লাহ তা‘আলার তীব্র ক্রোধ রয়েছে ওই সম্প্রদায়ের প্রতি যারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছে।’

সুতরাং ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু যিয়ারত শব্দকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওয়া মুবারকের সাথে সম্পৃক্ত করে অন্য লোকদের সাথে সাদৃশ্যের ধারণা দূর করে দেন। আর চিরদিনের জন্য ওই দ্বার রুদ্ধ করে দেন। আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এর মতে ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কবর যিয়ারতকে সম্পৃক্ত করা পছন্দ করেন নি। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়া মুবারকে স্বশরীরে জীবিত আছেন। আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে তাঁর ওফাত হয়েছে আর তাঁর রুহ মুবারক দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একথা কীভাবে সম্ভব যে, ওই শহীদগণ যারা আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলের নামে শাহাদত বরণ করেছেন তাঁরা জীবিত থাকবেন ও আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের মৃত বলতে নিষেধ করেছেন, আর যাদের নামে তাঁরা শাহাদাত বরণ করে অমরত্ব লাভ করেছেন স্বয়ং তিনি মৃত থাকবেন? তা কোনভাবে হতে পারে না। তাহলে কী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা মুসলিম উম্মাহর শহীদগণের থেকে কম হবে? এ কারণে এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক।

ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু জামিউস্ সালাত, ২:৪১, হাদিস নং : ৩৭৬।

খ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়ারিউস্ সালাত, ১:১৬৫, হাদিস নং : ৭৫০।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৫:৯৫, হাদিস নং : ৭০৫৪।

ফকীহ ইসহাক ইবনে ইবরাহীম রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হজ্জ করার পর মদীনা শরীফে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকে হাজিরী দেয়ার এ ধারা দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত আছে যে, মসজিদে নববীতে নামায আদায় করা, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারক যিয়ারত করা, মিম্বর মুবারক, রওযা মুবারক, তাঁর উপবিষ্ট হওয়ার পবিত্র স্থান, আর যে স্থানে তাঁর পবিত্র হাতের ছোয়া লেগেছে, যে স্থানসমূহে তাঁর পবিত্র পদচারণ হয়েছে, যে খুঁটিতে তিনি হেলান দিয়ে বসতেন, যেখানে তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, আর যাদের পদচারণায় ওইস্থান গুরুত্ববহ হয়েছে অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম, মুজতাহিদ ইমামগণের মাযারসমূহ যিয়ারত করে দৃষ্টিকে শীতল করবে এবং ওই স্থানসমূহের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বরকত লাভ করা হবে।

হযরত ইবনে আবী ফুদাইক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, কোনো কোনো আলেম যাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁদেরকে আমি বলতে শুনেছি, তাঁরা বলেন, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকের পাশে দাঁড়িয়ে এই আয়াত পাঠ করবে—

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

—নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ দরুদ প্রেরণ করেন ওই অদৃশ্য বক্তা নবীর প্রতি, হে ইমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ ও উত্তমরূপে সালাম প্রেরণ করো।^১

অতঃপর সত্তর বার 'সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ' (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ) পড়বে। তখন একজন ফিরিশতা তাকে ডেকে বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি রহমত অবতীর্ণ করেছেন। আর তার কোন প্রয়োজন কখনো অপূর্ণ থাকবে না। অর্থাৎ তার সব প্রয়োজন পূর্ণ হবে।^২

^১ আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৫৬।

^২ সহীহ অন্নিয়াত হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যেভাবে- হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বলে আহ্বান করা জাযিয় ছিলো না তেমনি তাঁর ওফাতের পরও তাঁকে সেভাবে আহ্বান করা যাবে না। তাঁর নাম ধরে আহ্বান করা ভীষণ বেয়াদবী ও চরম ধৃষ্টতা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا.

—রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করোনা যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো। [সূরা নূর, ২৪:৬৩]

হযরত ইয়াযীদ বিন আবী সাঈদ মাহরী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খলিফা হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাথে সাক্ষাৎ করি। আমি তাঁর নিকট থেকে বিদায় হয়ে আসার সময় তিনি আমাকে বললেন, আপনাকে দিয়ে আমার একটি জরুরী কাজ আছে, তারপর বললেন,

إِذَا أَتَيْتَ الْمَدِينَةَ سَرَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ.

—আপনি যখন মদীনা মুনাওয়ারা যাবেন, হযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজিরী দিয়ে আমার পক্ষ থেকে (নবী-পাকের খেদমতে তোহফা ও নজরানা স্বরূপ) সালাম পেশ করে দেবেন।^১

অপর এক রেওয়াজতে রয়েছে, হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয রাধিয়াল্লাহু আনহু নিয়ম ছিল, তিনি নবী-মোস্তফার দরবারে নিজের পক্ষ থেকে সালাত ও সালামের হাদিয়া পেশ করার জন্য সিরিয়া থেকে একজন দূত পাঠিয়ে দিতেন।^২

কোনো কোনো আলেম বর্ণনা করেছেন, তারা বলেন, আমি হযরত আনাস বিন মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে রওযায়ে-আকদসে আগমন করতে দেখলাম। তিনি (তথ্য এসে) নীরবে অবস্থান করলেন। হাত দু'খানা তুললেন, এমনকি আমি মনে করলাম, তিনি নামায পড়তে আরম্ভ করেছেন। অতঃপর তিনি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সালাম আরম্ভ করলেন। তারপর ফিলে এলেন।^৩

একথাও লক্ষণীয় যে, মানুষ যেমন পিতা বা ওস্তাদকে নাম ধরে ডাকে না, এটা আদবের পরিপন্থি আর কারো পিতা বা ওস্তাদ একথা পছন্দ করেন না যে, তাকে নাম ধরে ডাকা হোক, আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার জন্য আমাদের মাতা-পিতা উৎসর্গিত, তাঁর মর্যাদা কী পিতা বা ওস্তাদ থেকে কম? যে (নাউযবিল্লাহ) আমরা তাঁকে নাম ধরে ডাকবো? সুতরাং ইবনে আলী ফোদাইকের অভিমত সঠিক নয়। রওযা মুবারকের নিকট উপস্থিত হয়ে 'ইয়া রাসূলুল্লাহ' বলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম প্রেরণ করতে হবে। বর্তমান সময়ে যেভাবে ইমারত, ক্যালেভার, প্রচারপত্রে ইয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখা হয়, এরূপ বলাও জাযিয় নয়।

^১ ক) বায়হাকী : ৩'আবুল ইমান, ৩:৪৯২, হাদিস : ৪১৬৬, ৪১৬৭।

খ) মুকরীযী : ইমতাউল আসমা'আ, ১৪:৬১৮।

গ) ইবনে হাজ : আল মাদখাল, ১:২৬১।

ঘ) কুতালানী : আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়াহ, ৪:৫৭৩।

ঙ) ইবনে হাজর মকী : আল জাওয়াহিরুল মানসুম, পৃ. ২৭।

^২ ক) বায়হাকী : ৩'আবুল ইমান, ৩:৪৯, ৪৯২, হাদিস : ৪১৬৬।

খ) ইবনে হাজ : আল মাদখাল, ১:২৬১।

^৩ ক) বায়হাকী : ৩'আবুল ইমান, ৩:৪৯১, হাদিস : ৪১৬৪।

খ) মুকরীযী : ইমতাউল আসমা, ১৪:৬১৮।

হযরত ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইবনে ওহাব রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনা অনুযায়ী বলেন,

إِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا، يَقِفُ وَوَجْهَهُ إِلَى الْقَبْرِ لَا إِلَى الْقَبْلَةِ، وَيَذْنُو وَيُسَلِّمُ وَلَا يَمَسُّ الْقَبْرَ بِيَدِهِ.

-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করবে। আর দোয়া করার সময় রওয়া শরীফ অভিমুখী হয়ে দাঁড়াবে, কিবলাভিমুখী নয়। রওয়া শরীফের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করবে, হাত দিয়ে রওয়া শরীফ স্পর্শ করবে না।^১

হযরত ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'মাবসূত' গ্রন্থে লিখেছেন,
لَا أَرَى أَنْ يَقِفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو، وَلَكِنْ يُسَلِّمُ وَيَمْضِي.

-আমি রওয়া মুবারকের নিকট দাঁড়িয়ে দোয়া করা পছন্দ করি না। বরং আমার নিকট উত্তম হলো সালাম পেশ করে চলে আসা।^২
ইবনে আবি মালীকা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন,
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُومَ وَجَاهَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَجْعَلِ الْقِنْدِيلُ الَّذِي فِي الْقَبْلَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ مِنْ رَأْسِهِ.

-যার নিকট এটা পছন্দনীয়, সে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওয়া মুবারকের সামনে দণ্ডায়মান হবে, সে যেন বাতির নীচে শিরানুকূলে ও কিবলাভিমুখে কবর শরীফের নিকটবর্তী দাঁড়ায়।

হযরত নাফে' রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি হযরত ইবনে উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখেছি, তিনি রওয়া মুবারকের নিকট সালাম পাঠ করছেন। আমি তাঁকে শতবার বরং তার চেয়ে বেশীবার সালাম পাঠ করতে দেখেছি। তিনি রওয়া পাকের নিকট আসতেন আর বলতেন-

^১. আদব ও সম্মানের কারণে রওয়া মুবারক হাত দ্বারা স্পর্শ করা যাবে না। কারণ আমাদের অপক্লি হাত রওয়া মুবারক স্পর্শ করার যোগ্য নয়। যেখানে হযরত জুনায়েদ ও বায়েজীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার ন্যায় মহান ওলীগণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে উপস্থিত হতেন, সেখানে আমাদের তো কোনো কথাই নেই।

^২. রওয়া শরীফের নিকট বেশী সময় অপেক্ষা করলে মানুষের ভীড় বেড়ে যাবে। তাই প্রত্যেক বিদ্বানসকল হাজির হয়ে সালাম পাঠ ও আবেদন নিবেদনের সুযোগ পাওয়া চাই।

السَّلَامُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَى أَبِي السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-হে আল্লাহর (প্রিয়) নবী! আপনার উপর সালাম নিবেদিত হোক। আবু বকরের উপরও সালাম নিবেদিত হোক। আমার আব্বাজানের উপরও সালাম নিবেদিত হোক। এরপর তিনি ফিরে আসতেন।^১

আমি এটাও দেখেছি, হযরত ইবনে উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বরের যে স্থানে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসতেন, সে স্থানে নিজের হাত বুলিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলে মালিশ করতেন।

হযরত ইবনে কুসাইত ও উতবী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,
كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَا الْمَسْجِدَ جَسُّوا رُمَانَةَ الْمُنْتَرِ النَّبِيِّ تَلِي الْقَبْرَ بِمِيَامِنِهِمْ ثُمَّ اسْتَقْبَلُوا الْقَبْلَةَ يَدْعُونَ.

-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম যখন রওয়া মুবারকের নিকট আসতেন, তখন তাঁরা রওয়া মুবারকের নিকটবর্তী আনার গাছের মতো যে বেঁটনী আছে, তা ডান হাতে ধরে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করতেন।

'মুয়াত্তা' গ্রন্থে ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া লাইসী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর ও উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুদের প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করতেন। কিন্তু ইবনে কাসিম ও কা'নাবী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুদের বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু বকর ও উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুদের জন্যও দোয়া করতেন।

হযরত ইবনে ওহাব রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, সালাম পাঠকারী বলবে-

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

-হে মহান নবী! আপনার প্রতি সালাম ও আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক।

^১. ক) আব্দুর রায়যাক : আল মুসান্নাফ, ৩:৫৭৫ হাদীস নং ৬৭২৪।

খ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৩:২৮।

গ) বায়হাকী : আস সুনানুল কুবরা, ৫:২৪৫।

আর 'মাবসূত' গ্রন্থে বর্ণিত, **يُسَلِّمُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ** -হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রতিও সালাম পাঠ করবে।

কাযী আবুল ওয়ালীদ আল বাজী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার বক্তব্য হলো, আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সালাত শব্দের দ্বারা দোয়া করবো, অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমার জন্যও দোয়া করবো।

হযরত ইবনে হাবীব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবে তখন বলবে-

بِسْمِ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا وَصَلَّى اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ
عَلَى مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَجَنَّتِكَ،
وَاحْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

-আল্লাহর নামে আরম্ভ আর তদীয় রাসূলের প্রতি সালাম, আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি বর্ষিত হোক শান্তি। আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে দরুদ অবতীর্ণ হোক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও। আমার জন্য উনুস্ত করে দাও তোমার রহমত ও জান্নাতের দ্বারগুলো। আর আমাকে বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে রাখো।

এরপর স্বর্গীয় উদ্যান যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বর ও রওয়া পাকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত- সেদিকে এগিয়ে যাবে। ওখানে দুই রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহ তা'আলার গুণকীর্তন ও প্রশংসা করবে। এরপর তার সকল মনোবাসনা ব্যক্ত করবে এবং সেগুলো পূরণে সাহায্য প্রার্থনা করবে।

তিনি আরো বলেন, যদি রওয়া মুবারকের নিকট নামায আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে মসজিদে নববীর যে-কোনো স্থানে নামায আদায় করা যথেষ্ট হবে। তবে 'রিয়াযুল জান্নাতে' আদায় করা অতি উত্তম। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ.

-আমার গৃহ ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। আর আমার মিম্বর জান্নাতের নহরগুলোর একটি নহরের (কাওহারের তীরের) উপর স্থাপিত।

এরপর একান্ত শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে রওয়া মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে। এরপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করে যথাযোগ্য প্রশংসা করবে, অতঃপর হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রতি সালাম পেশ করে দোয়া করবে। দিবা-রাত্রির বেশিরভাগ সময় মসজিদে নববীতে দরুদ শরীফ পাঠ করবে। মসজিদে কুবা ও শহীদগণের মাযার যিয়ারত পরিত্যাগ করবেনা।

হযরত ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'মুহাম্মদ' কিতাবে উল্লেখ করেন,
وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ وَخَرَجَ.

-মদীনা নগরীতে প্রবেশ ও বহির্গমনের প্রাক্কালে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করবে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন,

وَإِذَا خَرَجَ جَعَلَ آخِرَ عَهْدِهِ الْوُقُوفَ بِالْقَبْرِ وَكَذَلِكَ مَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا.

-যখন মদীনা নগরী থেকে বাইরে যাত্রা করবে, তখন সবশেষে রওয়া মুবারকে হাযির হয়ে সালাম পেশ করবে। অনুরূপ মদীনার স্থায়ী বাসিন্দারাও বাইরে কোথায় সফরে গেলে এরূপ করবে।

হযরত ইবনে ওহাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণনা করেন,

إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

ক) বুখারী : আস্ সূহীহ, বাবু মা যাকারান নবী, ২২:৩১৫, হাদিস নং : ৬৭৯০।

খ) মুসলিম : আস্ সূহীহ, বাবু মা বাইনালা কবরী ওয়া মিম্বারী..., ৭:১৪৪, হাদিস নং : ২৪৬৩।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনা, বাবু মা জা'আ ফী ফযলিল মদীনা, ১২:৪২৪, হাদিস নং : ৩৮৫১; ৯:২৬১, হাদিস নং : ৩১০৬।

ঘ) নাসায়ী : আস্ সুনা, বাবু ফযলিল মসজিদিন নবী, ৩:৯৯, হাদিস নং : ৬৮৮।

ঙ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী মসজিদিন নবী, ২:১০৫, হাদিস নং : ৪১৫।

-যখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করবে, আর বলবে رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي -হে আল্লাহ! আমার পাপরাশি মার্জনা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করে দাও।^১

وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

-আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করবে, আর বলবে - اللَّهُمَّ إِنِّي -হে আল্লাহ আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।^২

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এরপর বলবে- اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -হে আল্লাহ! আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপত্তা দান করো।^৩

মুহাম্মদ বিন সীরিন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, লোকেরা মসজিদে প্রবেশের পূর্বে পড়তো-

صَلَّى اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.. بِاسْمِ اللَّهِ دَخَلْنَا وَبِاسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا.

-আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়েন, হে মহান নবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক, আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম, আল্লাহর নামে বের হলাম, আল্লাহর প্রতি নির্ভর করলাম।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়ও অনুরূপ দোয়া পাঠ করতো।

^১ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী কাওলি ইন্দা দুখুলিল মসজিদ, ২:২৮, হাদিস নং : ২৮৯।
খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু দোয়া ইন্দা দুখুলিল মসজিদ, ২:৪৮৮, হাদিস নং : ৭৬৩।
গ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াযিউন্ সালাত, পৃ. ১৬১, হাদিস নং : ৭৩১।
ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু আহাদিসে ফাতিমা, ৫৩:৩৭১, হাদিস নং : ২৫২১২।
^২ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী কাওলি ইন্দা দুখুলিল মসজিদ, ২:২৮, হাদিস নং : ২৮৯।
খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু দোয়া ইন্দা দুখুলিল মসজিদ, ২:৪৮৮, হাদিস নং : ৭৬৩।
গ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াযিউন্ সালাত, পৃ. ১৬১, হাদিস নং : ৭৩১।
ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু আহাদিসে ফাতিমা, ৫৩:৩৭১, হাদিস নং : ২৫২১২।
^৩ ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৭:১২৪।

হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করার সময় পড়তেন-

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ.

-হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ প্রেরণ করো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

حَمْدُ اللَّهِ وَسَمَى وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা পাঠ করতেন। আর তাতে আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করতেন। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করতেন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন-

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ.

-আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, আল্লাহর রাসূলের প্রতি সালাম নিবেদিত হোক।^১

অপর এক বর্ণনাকারীর বর্ণনায় এসেছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশের সময় পড়তেন-

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَبْوَابَ رِزْقِكَ.

-হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দাও এবং আমার জন্য জীবিকার দ্বারে পৌঁছা সহজ করে দাও।^২

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي.

^১ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী কাওলি ইন্দা দুখুলিল মসজিদ, ২:২৮, হাদিস নং : ২৮৯।
খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু দোয়া ইন্দা দুখুলিল মসজিদ, ২:৪৮৮, হাদিস নং : ৭৬৩।
গ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াযিউন্ সালাত, পৃ. ১৬১, হাদিস নং : ৭৩১।
ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু আহাদিসে ফাতিমা, ৫৩:৩৭১, হাদিস নং : ২৫২১২।
^২ আবু শায়বা : আল মুসান্নাফ, ১:৩৭৩।

-যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তারপর বলবে-‘আল্লাহুমা ইফতাহ লি’ (اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي)।

হযরত ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু ‘মাবসূত’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মদীনাবাসীদের জন্য মসজিদ নববীতে প্রবেশের সময় বা মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় রওয়া মুবারকের সামনে দাঁড়ানো জরুরী নয়। এটা বহিরাগতদের জন্য জরুরী।

আর তিনি উক্ত গ্রন্থে এটাও বলেন, যে ব্যক্তি সফরে যাবে, বা সফর থেকে মদীনা নগরীতে ফিরে আসবে তার জন্য রওয়া মুবারকের নিকট দাঁড়িয়ে দরুদ শরীফ পাঠ করাতে কোন অসুবিধা নেই। আর হযরত আবু বকর ও উমর রাহিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমা জন্য দোয়া করবে। ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুকে বলা হলো, মদীনার বাসিন্দাগণ তো সফর থেকে আসেনা। আর না তাঁরা অন্যত্র সফরে বের হয়, কিন্তু তাঁরা প্রত্যহ এক বা একাধিক বার, অধিকাংশ জুমার দিন এক বা একাধিক বার রওয়া মুবারকের নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করে এবং দোয়া করে থাকে।

এই কথা শুনে ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু কিছুক্ষণ নীরবতা অবলম্বন করে বললেন, আমি এই শহরের কোনো ফিকহবিদগণের নিকট একথা শুনিনি। আমার মতে, এরূপ না করা উত্তম। যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মাতের পূর্ববর্তী লোকেরা সংশোধিত হবে না, ততক্ষণ পরবর্তীদের সংশোধিত হওয়া অসম্ভব। আমি পূর্ববর্তী লোকদের ব্যাপারে একথা শুনিনি যে, তারা এরূপ করেছেন। বরং এটা ওই ব্যক্তির জন্য যথার্থ হবে, যে সফর থেকে মদীনাতে আসে, বা মদীনা থেকে বাইরে সফরে যাবে, তখন দরবারে রিসালতে হাযিরী দেবে।

ইবনে কাসিম রাহিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বলেন, আমি মদীনাবাসীদের দেখেছি, তারা যখন মদীনা নগরীতে প্রবেশ করতো, তখন রওয়া মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করতো। তিনি বলেন, ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু অভিমতসমূহের মধ্যে এটাও একটি অভিমত।

বাজী রাহিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বলেন, ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু মদীনাবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেছেন যে, বহিরাগতরা তো রওয়া মুবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা নগরীতে আসে, আর মদীনাবাসীরা

১. হাকিম : আল মুত্তাআদরাক, ১:৩২৫ হাদীস নং ৭৪৭।

তো মদীনা নগরীতেই বসবাস করে, আর তারা তো রওয়া মুবারক যিয়ারত বা সালাম পেশ করার জন্য বসবাস করে না।

হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. وَقَالَ «لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا».

-হে আল্লাহ! আপনি আমার কবরকে প্রতিমালয় বানাবেন না যে, আমার পরে এর উপাসনা করা হবে। আল্লাহ তা‘আলার তীব্র ক্রোধ রয়েছে, ওই সম্প্রদায়ের প্রতি যারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছে। তিনি আরো বলেন, তোমরা আমার কবরকে উৎসবস্থলে পরিণত করবে না।

আহমদ বিন সাঈদ হিন্দির কিতাবে বর্ণিত, রওয়া মুবারকের নিকট জালী মুবারক ঘেঁষে দাঁড়াবেনা, তা আঁকড়ে ধরবেনা এবং সেখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেনা।

‘উতবিয়া’ গ্রন্থে রয়েছে, মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে সালাম পেশ করার পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। নফল নামায পড়ার সর্ব উত্তম স্থান হলো খুঁটি সংলগ্ন হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের স্থান। আর ফরয নামায আদায়ের উত্তম স্থান হলো প্রথম সারিসমূহে দাঁড়িয়ে নামায পড়া। আর বহিরাগতদের জন্য উত্তম হলো নফল নামায ঘরে না পড়ে মসজিদে নববীতে আদায় করা।

১. ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, আবু জামিউস সালাত, ২:৪১, হাদীস নং : ৩৭৬।

খ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, আবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াযিউস সালাত, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং : ৭৫০।

দশম পরিচ্ছেদ

آدَابُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ وَفَضْلُهُ

মসজিদে নববীতে প্রবেশের আদব ও ফযিলত

এ অধ্যায়ে মসজিদে নববী, মিম্বর শরীফ, রওয়া মুবারকে উপস্থিতি এবং মক্কা ও মদীনা শরীফের অধিবাসীদের ফযিলত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ

-নিশ্চয় ওই মসজিদ যার ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই খোদাভীরুতার উপর রাখা হয়েছে, তা এরই উপযুক্ত যে, আপনি তাতে দাঁড়াবেন।^১

বর্ণিত আছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ مَسْجِدٍ هُوَ؟ قَالَ: مَسْجِدِي هَذَا.

-হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করা হয় যে, উক্ত আয়াতে কোন মসজিদের কথা বলা হয়েছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার এ মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নববীর কথা বলা হয়েছে। এ বর্ণনা হযরত ইবনুল মুসায়্যিব, যায়িদ ইবনে সাবিত, ইবনে উমর ও মালিক বিন আনাস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে।^২

হযরত ইবনে আব্বাস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা অভিমত হলো যে, أَلَهُ -এর দ্বারা মসজিদে কুবাকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تُسَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

^১ আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১০৮।

^২ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ওয়া মিন সুরাতিহু তাওবা, ১০:৩৬৫, হাদিস নং : ৩০২৪।

খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু যিকরিল মসজিদী, ৩:১০২, হাদিস নং : ৬৯০।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী সা'ঈদ, ২৩:৪৬২, হাদিস নং : ১১৪১৭।

-মসজিদে-হারাম, মসজিদে-নববী এবং মসজিদে-আকসা- এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত তোমরা (অন্য) কোনো মসজিদের দিকে (অধিক সওয়াব লাভের প্রত্যাশায়) সফর করিও না।^১

আর মসজিদে প্রবেশের সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশের সময় পড়তেন-

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

-মহান আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি মহামহিম সত্তা ও অনন্ত রাজত্বের অধিকারী।^২

হযরত ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, একবার হযরত উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক ব্যক্তিকে মসজিদে নববীতে জোরে চিৎকার করতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন গোত্রের অধিবাসী? সে বললো, আমি বনী সাকীফ গোত্রের অধিবাসী। তখন হযরত উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যদি তুমি মক্কা বা মদীনার স্থায়ী অধিবাসী হতে, তাহলে এর জন্য অবশ্যই আমি তোমাকে শাস্তি দিতাম, কারণ আমাদের মসজিদসমূহে কঠোর উচ্চ করা যায় না।

মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ইচ্ছাকৃত মসজিদে নববীতে আওয়াজ উচ্চ করা কারো জন্য উচিত নয়, কোনো কষ্টদায়ক বস্তু সাথে নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করাও অনুচিত। আর অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, ১:৩৯৮, কিতাবুহু তাভাতুহু, হাদিস : ১১৩২।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, ২:১০১৪, কিতাবুল হজ্জ, হাদিস : ১৩৯৭।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, ২:২৯, ৩০, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদিস : ৭০০।

ঘ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ২:১৭৩, কিতাবুল মানাসিক, হাদিস : ২০৩৩।

ঙ) তিরমিযী : আস্ সুনান, ১:৩৫৮, আবওয়াবুস সালাত, হাদিস : ৩২৬।

চ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ২:১৮৮, কিতাবু ইকামাতিস সালাহ ওয়াস সুন্নাহ, হাদিস : ১৪০৯।

^২ ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফী মা ইয়াকুলুর রজুল, ২:৫৬, হাদিস নং : ৩৯৪।

খ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াযিউস সালাত, পৃ. ১৬৫, হাদিস : ৩৯৪।

কাযী আয়ায রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এইসব কথা কাযী ইসমাইল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর রচিত 'মাবসূত' গ্রন্থে মসজিদে নববীর ফযিলত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আর মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, মসজিদে নববী ব্যতীত অন্যান্য মসজিদসমূহও এই বিধানের আওতাভুক্ত হবে অর্থাৎ মসজিদে উচ্চ শব্দে শোরগোল করা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না।

কাযী ইসমাইল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, মসজিদে নববীতে উচ্চ আওয়াজ করে নামাযে বিঘ্নতা সৃষ্টি করা মাকরুহ। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য মসজিদের কোন পার্থক্য নেই। বরং জামাত অনুষ্ঠিত হয় এমন সকল মসজিদই তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে উচ্চ আওয়াজ করা মাকরুহ বা অপছন্দনীয়। তবে মসজিদে হারাম ও মসজিদে মীনা ব্যতীত।

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

-আমার এই মসজিদে নামায আদায় করা, অন্যান্য মসজিদের তুলনায় হাজারগুণ উত্তম, তবে মসজিদে হারাম ব্যতীত।

কাযী আয়ায রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এরূপ মর্মার্থের আলোচনায় মতভেদ দেখা যায় যে, ফযিলতের বিষয়ে মক্কা মুকাররামা উত্তম, নাকি মদীনা মুনাওয়ারা উত্তম।

ইমাম মালিক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর এক বর্ণনা- যা আশহাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেন, হাদীসের মর্মার্থ হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে নামায পড়া অন্যান্য সকল মসজিদে নামায আদায় করা থেকে উত্তম, মসজিদে হারাম ব্যতীত। কারণ মসজিদে হারামে নামায আদায় করা মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের চেয়ে অধিক উত্তম, আর এর দলিল হলো হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, -مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ- মসজিদে হারামে নামায আদায় করা অন্যান্য মসজিদে নামায আদায় করার তুলনায় একশ' গুণ

ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ফযলিস্ সালাত ফী মক্কা ওয়া মদীনা, ৪:৩৭৭, হাদিস নং : ১১১৬।

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ আইতুল মাসাজিদ আফযলু, ২:৪৭, হাদিস নং : ২৯৯।

গ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী মসজিদিন নবী, ২:১০৪, হাদিস নং : ৪১৪।

বেশী ফযিলতময়।' এই সূত্রে মসজিদে হারামের চেয়েও মসজিদে নববীতে নামায আদায় করা নয়শ'গুণ উত্তম। আর অন্যান্য মসজিদের মুকাবিলায় হাজার বারাকাত নামাযের সমান হয়। এ বর্ণনার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, মদীনা নগরী মক্কা নগরী থেকে উত্তম। এ সম্পর্কে আমি পূর্বে আলোকপাত করেছি। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইমাম মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও অধিকাংশ মদীনাবাসী এই অভিমতের সমর্থক।

মক্কা ও কুফাবাসীগণ মক্কা নগরী মর্যাদাপূর্ণ হওয়া অভিমতের সমর্থক। হযরত আতা, ইবনে ওহাব ও ইবনে হাবিব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রমুখ এই অভিমতের সমর্থক। তাঁরা সকলে ইমাম মালিক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শিষ্য। আর হযরত বাজী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ইমাম শাফিঈ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ওই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। আর উক্ত হাদীসকে এর বাহ্যিক অর্থে নির্ধারণ করেন, وَأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ, হারামে নামায পড়া সবচেয়ে উত্তম।' আর তাঁর দলিল হিসেবে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাযির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস পেশ করেন, যা হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনানুরূপ,

وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِثْلِ صَلَاةٍ.

-মসজিদে হারামে নামায পড়া আমার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে একশ' গুণ উত্তম।

হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত আছে। সুতরাং মসজিদে হারামে নামায পড়া এই বুনয়াদের উপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে একলক্ষ গুণ বেশী উত্তম। আর এ বিষয় কোনো মতভেদ নেই যে, وَلَا خِلَافَ أَنْ مَوْضِعَ قَبْرِهِ أَفْضَلُ بِقَاعِ الْأَرْضِ, -হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর শরীফের স্থান জমীনের মধ্যে সর্বোত্তম স্থান।

১. আবদুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, ৫:১২১।

২. ক) আহমদ : আল মুসনাদ, ৩:৩৪৩ হাদীস নং ১৪৭৩৫।

খ) ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১:৪৫১ হাদীস নং ১৪০৬।

গ) তবরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ১৩:১১০ হাদীস নং ২৬৮।

৩. আল্লামা সুবকী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীনের যে স্থানে আরাম গ্রহণ করেছেন তা পবিত্র কাবা, আরশ ও আসমানসমূহ থেকেও উত্তম। কারণ যমীনের যে অংশে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাম করছেন, যিনি আল্লাহ তা'আলার পর সমস্ত সৃষ্টি জীবের মধ্যে সর্বোত্তম। মোট কথা হলো কুরআন মজীদকে কাপড় দিয়ে আবৃত করার কারণে উক্ত কাপড় মর্যাদার

কাযী আবুল ওয়ালিদ বাজী বলেন, উক্ত হাদীসের মর্মার্থ হলো মসজিদে হারামকে সকল মসজিদের তুলনায় উত্তম ঘোষণা করা। এর দ্বারা মসজিদে নববীর হুকুম জানা যায় না।

হযরত ইমাম তাহাবী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার ধারণা হলো যে, এরূপ মর্যাদা ফরয নামাযের ক্ষেত্রে গণ্য হবে। আমাদের আলেমদের মধ্যে মুতাররিফ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অভিমত হলো, এরূপ মর্যাদা নফল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

তিনি একথাও বলেন, সেখানকার জুমার নামায অন্যান্য স্থানের জুমার নামায থেকে এবং রমযানের রোযা অন্যান্য স্থানের রমজানের রোযার চেয়েও উত্তম। হযরত আবদুর রাযযাক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, মদীনায় রমযানের রোযা উত্তম। আবদুর রাযযাক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদীনার রোজার ফযীলত প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

-আমার ঘর আর মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহেরই একটি বাগান।^১

অনুরূপ বর্ণনা হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আবু সাঈদ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তারা আরো উল্লেখ করেছেন,

وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

-আমার মিম্বর আমার হাউজের উপর অবস্থিত।^২

অধিকারী হয়ে যায়। আর আমরা তাতে চুম্বন করি, অনুরূপভাবে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহ সুবায়কের স্পর্শে সে জমিন সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ হয়ে গেছে। (নামীমুর রিয়াজ, ৩: ১৫৩)

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ফফলু মা বাইনাল কবরি ওয়া মিম্বার, ৪:৩৮৫, হাদিস নং : ১১২০।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু মা বাইনাল কবরি ওয়া মিম্বারী..., ৭:১৪৪, হাদিস নং : ২৪৬৩।
গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী ফফলিল মদীনা, ১২:৪২৩, হাদিস নং : ৩৮৫০।
ঘ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু ফফলিল মসজিদিন্ নববী, ৩:৯৯, হাদিস নং : ৬৮৮।
ঙ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী মসজিদিন্ নববী, ২:১০৫, হাদিস নং : ৪১৫।
২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ফফলু মা বাইনাল কবরি ওয়া মিম্বার, ৪:৩৮৬, হাদিস নং : ১১২১।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু মা বাইনাল কবরি ওয়া মিম্বারী..., ৭:১৪৬, হাদিস নং : ২৪৬৫।
গ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী মসজিদিন্ নববী, ২:১০৫, হাদিস নং : ৪১৫।

অপর হাদীসে রয়েছে,

مَنْبَرِي عَلَى تَرْعَةٍ مِنْ تَرْعِ الْجَنَّةِ.

-আমার এই মিম্বরটি জান্নাতের প্রশ্রবণসমূহের মধ্য থেকে একটি প্রশ্রবণের উপর স্থাপিত।

আল্লামা তাবারী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এ কথার দু'টি অর্থ হতে পারে, প্রথমত, এখানে গৃহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রওযা শরীফ। এটি যাব্বিদ বিন আসলামের বর্ণনাকৃত হাদীসে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে وَمَنْبَرِي وَتَرْعِي-আমার রওযা এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী।

আল্লামা তাবারী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তাঁর রওযা সুবারক যেহেতু তাঁর ঘরে অবস্থিত এই কারণে বর্ণনাসমূহের মধ্যে সমন্বয় হয়ে গেছে। আর বর্ণনা সমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট নেই। কারণ তাঁর রওযা সুবারক তাঁর হজরতে অবস্থিত, ওটাই তাঁর ঘর ছিলো। আর তাঁর এ উক্তি, وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي-আমার মিম্বর আমার হাউজের উপর অবস্থিত। কোনো কোনো আলেম বলেন, এ বিষয়ের অবকাশ রয়েছে যে, তাঁর ওই মিম্বরই (হাশরের দিনে) থাকবে বা দুনিয়াতে ছিলো। আর একথা অতি স্পষ্ট।

দ্বিতীয় মর্মার্থ হলো, ওইস্থানেই তাঁর জন্য মিম্বর স্থাপিত হবে।

তৃতীয় মর্মার্থ হলো, মিম্বর দর্শনের ইচ্ছা করা, সেখানে উপস্থিত হয়ে পূণ্যময় আমল করা, যা তাকে হাউজে কাউসারের নিকট নিয়ে যাবে অর্থাৎ ওই হাউজ থেকে পানি পান করাকে অবধারিত করে দেবে। এটা বাজী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অভিমত।

আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ ইরশাদ করেন, رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ-ওটা বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান।^১ এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক হলো ওইস্থানে দোয়া, নামায ও ইবাদত করা বেহেশত অভ্যন্তরে ইবাদতের সমতুল্য। যেমন- বলা হয়েছে,

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ফফলু মা বাইনাল কবরি ওয়া মিম্বার, ৪:৩৮৫, হাদিস নং : ১১২০।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু মা বাইনাল কবরি ওয়া মিম্বারী..., ৭:১৪৪, হাদিস নং : ২৪৬৩।
গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী ফফলিল মদীনা, ১২:৪২৩, হাদিস নং : ৩৮৫০।
ঘ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু ফফলিল মসজিদিন্ নববী, ৩:৯৯, হাদিস নং : ৬৮৮।
ঙ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী মসজিদিন্ নববী, ২:১০৫, হাদিস নং : ৪১৫।

-জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত।^১

আর দ্বিতীয় অর্থ এটা হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে ওই স্থানকে জান্নাতে স্থানান্তরিত করবেন। আর ওই স্থানই প্রকৃত বেহেশতে হবে। হযরত দাউদী রাহিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু এ অভিমতের সমর্থক।

হযরত ইবনে উমর রাহিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুমা ও আর একদল সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা নগরী সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأَوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

-যেই ব্যক্তি দুঃখ-দুর্দশা ও বালা-মুসিবতের দিনগুলোতে মদীনা মুনাওয়ারায় ধৈর্যধারণ করবে, কেয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে সাক্ষ্য দেব। এবং তার পক্ষে সুপারিশ তথা শাফা'আত করব।^২

তার সম্পর্কে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

-পরিত্যাগকারীরা যদি জানত, তবে মদীনাই তাদের জন্য ভাল ছিল।^৩

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبْرِ تَنْفِي خَبَثِهَا وَتَنْصَعُ طَبِئُهَا.

- ^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল জান্নাতি তাহতা বারিকাতুস্ সুযুফ, ৯:৩৯৮, হাদিস নং : ২৬০৭।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু সুবুতিল জান্নাতি লিশ্ শহীদ, ১০:১, হাদিস নং : ৩৫২১।
গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা যাকারা আন্না আবওয়াবাল জান্নাতা..., ৬:২২১, হাদিস নং : ১৫৮৬।
^২ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, ২:১০০৪, কিতাবুল হজ্জ, হাদিস : ১৩৭৭।
খ) মালেক : আল মুয়াত্তা, ২:৮৮৫, হাদিস : ১৫৬৯।
গ) আহমদ ইবনে হামল : আল মুসনাদ, ২:১১৩।
ঘ) হুমাঈদী : আল মুসনাদ, ২:৪৯২, হাদিস : ১১৬৭।
ঙ) বায়হাকী : তা'আবুল ইমান, ৭:১২৪, হাদিস : ৯৭৬১।
^৩ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মান রগিবা আনিল মদীনা, ৬:৪২৯, হাদিস নং : ১৭৪২।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফযলিল মদীনা, ৭:১০০, হাদিস নং : ২৪২৬।
গ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী সুকনিল মদীনা, ৫:৩৪৬, হাদিস নং : ১৩৮০।

-মদীনাও সেই ভাটীরই ন্যায়, যা ময়লাগুলো বের করে দূরে ফেলে দেয় এবং ঝাঁটি জিনিসটিকে অক্ষত রাখে।^১

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبَدَهَا اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ.

-যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়ে মদীনা নগরী ত্যাগ করে চলে যায় আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে উত্তম লোকদের মদীনা নগরীতে নিয়ে আসবেন।^২

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ.

-যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরা সম্পাদনকালে উভয় হেরমের কোন একটিতে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিনে এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, তার কোনো হিসাব নেওয়া হবে না এবং তাকে কোন শাস্তিও দেওয়া হবে না।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে,

بُعِثَ مِنَ الْأَمِينِ يَوْمَ الْقِيَامِ.

-তাকে কিয়ামতের দিন নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের (ইমানদারদের) সাথে উঠানো হবে।^৩

- ^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, ২:৬৬৬, আবওয়াবু ফাযায়িলিল মদীনা, হাদিস : ১৭৮৪।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, ২:১০০৬, কিতাবুল হজ্জ, হাদিস : ১৩৮৩।
গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, ৫:৭২০, হাদিস : ৩৯২০।
ঘ) আহমদ ইবনে হামল : আল মুসনাদ, ৩:৩০৬, ৩০৭।
ঙ) মালেক : আল মুয়াত্তা, ২:৮৮৬, হাদিস : ১৫৭০।
চ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ৯:৫০, হাদিস : ৩৭৩২।
ছ) ডায়ালুসী : আল মুসনাদ, ১:২৩৭, হাদিস : ১৭১৪।
জ) হুমাঈদী : আল মুসনাদ, পৃ. ৫২১, হাদিস : ১২৪১।
ঝ) আবু ইয়াল্লা : আল মুসনাদ, ৪:২০, হাদিস : ২০২৩।
^২ ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী সুকনিল মদীনা, ৫:৩৪৫, হাদিস নং : ১৩৭৯।
খ) আবদুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, ৯:২৬৫, হাদিস নং : ১৩৭৯।
^৩ ক) দারে কুতনী : আস্ সুনান, বাবুল মাওয়াফিক, ৬:৪৭৩, হাদিস নং : ২৭২৬।

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে মারফু সূত্রে এক বর্ণনায় বর্ণিত, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ اسْتَصَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيْمَتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا.

-কারো দ্বারা সম্ভব হলে সে যেন মদীনায় মৃত্যু পায়, এই কারণেই যে, যার মৃত্যু মদীনায় হবে, আমি তার পক্ষে শাফা'আত করব।^১

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا

-নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর, যা মানবজাতির ইবাদতের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই, যা মক্কায় অবস্থিত, বরকতময় এবং সমগ্র জাহানের পথপ্রদর্শক। সেটার মধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি রয়েছে- ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর স্থান, আর যে ব্যক্তি সেটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তার মধ্যে থাকে।^২

উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা বলেন, الثَّابِتُ مِنَّا -সে নরকাগ্নি থেকে নিরাপদ থাকবে। কেউ কেউ বলেন, জাহেলীযুগে যদি কোনো অপরাধী শাস্তির যোগ্য হয়ে হারাম শরীফে এসে যেতো, তাহলে সে নিরাপদ হয়ে যেতো। নিম্নোক্ত আয়াতে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا

-আর স্মরণ করুন, যখন আমি এ ঘরকে মানবজাতির জন্য আশ্রয়স্থল ও নিরাপদ স্থান করেছি।^৩

খ) আবদুল রায্যাক : আল মুসান্নাফ, ৯:২৬৭, হাদিস নং : ১৩৮১।

গ) বায়হাকী : শু'আবুল ইমান, বাবু মান যারা বা'দা মাওতী, ৯:১৮৫, হাদিস নং : ৩৯৯৩।

১. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, ৫:৭১৯, আবওয়াবুল মানাফিব, হাদিস : ৩৯১৭।

খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ২:১০৩৯, কিতাবুল মানাসিক, হাদিস : ৩১১২।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ২:১০৪।

ঘ) ইবনে হিষ্মান : আস্ সহীহ, ৯:৫৭, হাদিস : ৩৭৪১।

ঙ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৬:৪০৫, হাদিস : ৩২৪২১।

২. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৯৬-৯৭।

৩. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১২৫।

কথিত আছে, কতিপয় লোক মুনতাসীরে সা'দুন খাওলানীর নিকট এসে বলে, বনী কুতামাহ'র লোকেরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করে দীর্ঘরাত অবধি তার মৃতদেহ আগুনে পোড়ায়। কিন্তু আগুন তাঁর দেহ পুড়েনি। মৃতদেহ অক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকে। সা'দুন বলেন, সম্ভবতঃ লোকটি তিনবার হজ্জ করেছে। তাঁরা বললো, হ্যাঁ। সা'দুন বললো আমি হাদীস শুনেছি, যে ব্যক্তি একবার হজ্জ আদায় করে, সে ফরয আদায় করে। যে ব্যক্তি দু'বার হজ্জ করে, সে আল্লাহ তা'আলাকে কর্ত্ত দেয়। আর যে ব্যক্তি তিনবার হজ্জ করে, আল্লাহ তা'আলা তার দেহের প্রতিটি পশমকে আগুনের জন্য হারাম করে দেন।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কা'বা শরীফের দিকে তাকাতেন তখন বলতেন,

مَرْحَبًا بِكَ مِنْ بَيْتِ مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ.

-অভিনন্দন তোমায়! হে বায়তুল্লাহ! তুমি কতইনা মহান! তোমার মর্যাদা কতইনা পরিব্যাপ্ত।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْمِزَابِ.

-তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রুকনে আসওয়াদের নিকট দাঁড়িয়ে দোয়া করবে আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করবেন। অনুরূপভাবে মীযাবের নিকটও।^১

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَحُسِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَمِينِ.

-যে ব্যক্তি মাকামে ইব্রাহীমে দাঁড়িয়ে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করবে তার পূর্বাপর সকল গুনাহ মার্জনা করে দেওয়া হবে। কিয়ামতের দিনে তাকে নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের সাথে উঠানো হবে।

১. কাবা গৃহের ছাদের পানি নামার পক্ষে মীযাবে রহমত বলা হয়। এর মুখ হাতিমের দিকে। এ স্থানে নফল নামায আদায় করে দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সে দোয়া কবুল করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি,

مَا دَعَا أَحَدٌ بَشِيءٍ فِي هَذَا الْمَلْتَزَمِ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ.

-যে ব্যক্তি এ 'মুলতায়িম' নামক স্থানে কোন দোয়া করবে, তার সে দোয়া কবুল করা হবে।'

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন,

وَأَنَا دَعَوْتُ اللَّهَ بِشَيْءٍ فِي هَذَا الْمَلْتَزَمِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اسْتُجِيبَ لِي

-আমি যখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথা শুনেছি এরপর যখন আমি মুলতায়িমে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছি, আল্লাহ তা'আলা আমার সেই দোয়া কবুল করেছেন।

হযরত আমর বিন দিনার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি যখন হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে একথা শুনেছি, এরপর থেকে আমি যখনই মুলতায়িম নামক স্থানে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছি, আল্লাহ তা'আলা আমার সেই দোয়া কবুল করেছেন।

সুফিয়ান সাওরী বলেন, আমি যখন আমর বিন দিনার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে একথা শুনেছি, এরপর থেকে আমি যখনই মুলতায়িম নামক স্থানে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছি, আল্লাহ তা'আলা আমার সেই দোয়া কবুল করেছেন। চতুর্থ কারণ

হযরত হুমাইদী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, আমি যখন সুফিয়ান সাওরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট শুনেছি, মুলতায়িম নামক স্থানে দোয়া কবুল হয় তখন থেকে আমি মুলতায়িম নামক স্থানে যতো দোয়া করেছি, আমার সব দোয়া কবুল হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ বিন ইদরীস শাফি'ঈ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি যখন হুমাইদী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট শুনেছি যে, মুলতায়িম নামক স্থানে দোয়া কবুল হয় তখন থেকে আমি মুলতায়িম নামক স্থানে যতো দোয়া করেছি, আমার সব দোয়া কবুল হয়েছে।

১. পবিত্র কাবা গৃহের দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী অংশকে মুলতায়িম বলা হয়। উক্ত দেয়াল সংলগ্ন স্থানে দোয়া করলে সেই দোয়া নিশ্চিত কবুল হয়। এটা হাজারো সাহাবায়ে কেরাম ও আন্বাহর ওলীদের দ্বারা পরীক্ষিত।

হযরত আবুল হাসান মুহাম্মদ আল-হাসান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি যখন মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট শুনেছি যে, মুলতায়িমে দোয়া কবুল হয় তখন থেকে আমি মুলতায়িম নামক স্থানে যতো দোয়া করেছি আল্লাহ তা'আলা আমার সব দোয়া কবুল করেছেন।

হযরত আবু ওসামা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার স্মরণ নেই হযরত হাসান বিন রাশীক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ বিষয়ে কিছু বলেছেন কিনা? তবে সম্ভবতঃ তাঁর নিকট থেকে এটাই শুনেছি যে, আমি মুলতায়িম নামক স্থানে দুনিয়াবী বিষয় যতো দোয়া করেছি, সব দোয়াই কবুল হয়েছে। আশা রাখি আখিরাতের বিষয়েও যতো দোয়া করবো, সব দোয়া কবুল হবে।

হযরত আজরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি যখন হযরত আবু ওসামা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট শুনেছি যে, মুলতায়িম নামক স্থানে দোয়া কবুল হয় তখন থেকে আমি মুলতায়িম নামক স্থানে যতো দোয়া করেছি সব দোয়া কবুল হয়েছে।

হযরত আবু আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি মুলতায়িম নামক স্থানে অনেক দোয়া করেছি। তন্মধ্যে আমার অধিকাংশ দোয়া কবুল হয়েছে। আমি আশা করি আখিরাত সম্পর্কিত দোয়াসমূহও কবুল হবে।

কাযী আবুল ফযল আয়ায রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু (লেখক) বলেন, আমি এ বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। যদিও তা উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কারণ এটা প্রথম অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত। তবুও আমি উপকৃত হওয়ার আশায় এ বিষয় আলোচনা করেছি। আল্লাহ তা'আলাই নেক কাজের তাওফীকদাতা।

তৃতীয় পর্ব

فِي مَا يَجِبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَمَا يَسْتَحِيلُ فِي حَقِّهِ أَوْ
يَجُوزُ عَلَيْهِ وَمَا يَمْتَنِعُ أَوْ يَصِحُّ مِنَ الْأَحْوَالِ
الْبَشَرِيَّةِ أَوْ يُضَافُ إِلَيْهِ

ওইসব বিষয় যা হযুর ﷺ এর পবিত্র সন্তান
জন্য অপরিহার্য এবং যা অসম্ভব, অথবা যা তাঁর
প্রতি সম্পৃক্ত করা বৈধ এবং যা বৈধ নয়, কিংবা
তাঁর প্রতি মানবীয় গুণাবলী সম্পৃক্ততার
উপযুক্ততা ও অনুপোযুক্ততা প্রসঙ্গে

مُقَدِّمَةُ الْقِسْمِ الثَّالِثِ

তৃতীয় পর্বের প্রারম্ভিকা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَلَا يَنْفَكُ مَاتَ
أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ
يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٠٠﴾

-আর মুহাম্মদ তো একজন রাসূল। তাঁর পূর্বে আরো রাসূল অতিক্রান্ত
হয়েছেন। সুতরাং যদি তিনি ইন্তিকাল করেন কিংবা শহীদ হন, তবে কি
তোমরা পশ্চাদোপদ হয়ে ফিরে যাবে, আর কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে, সে
আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা এবং অনতিবিলম্বে আল্লাহ
কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কার দেবেন।^১

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۚ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ أَنْظِرْ كَيْفَ
نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿١٠١﴾

-মরিয়ম-তনয় মসীহ নয়, কিন্তু একজন রাসূল। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল
অতিক্রান্ত হয়েছেন এবং তাঁর মাতা 'সিদ্দীকাহ' (সত্যনিষ্ঠা)। তাঁরা
উভয়ে খাদ্যাহার করতো। দেখো তো! আমি কেমন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ
তাদের জন্য বর্ণনা করছি, অতঃপর দেখো তারা কিভাবে কুঁজো হয়ে চলে
যাচ্ছে।^২

^১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৪৪।

^২. আল কুরআন : সূরা মায়দা, ৫:৭৫।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে—

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ * وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ
فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ * وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

—আর আমি আপনার পূর্বে যতো রাসূল প্রেরণ করেছি সবাইতো এমনই ছিলো- আহার করতো, হাট-বাজারে চলাফেরা করতো এবং আমি তোমাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। আর হে মানবকুল! তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? হে মাহবুব! আপনার প্রতিপালক সবকিছু দেখছেন।^১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ *
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿٢١﴾

—আপনি বলুন, প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে তো আমি তোমাদের মতো, আমার নিকট ওহী আসে যে, তোমাদের প্রভু একমাত্র প্রভুই। সুতরাং যার আপন রবের সাথে সাক্ষাত করার আশা আছে, তার উচিত যেন সে সৎকর্ম করে এবং আপন রবের ইবাদতে অন্য কাউকেও অংশীদার না করে।^২

অতএব হযুর সালাহুদ্দীন আল্লাহিহি ওয়াসাল্লাম ও সকল নবীগণ মানবীয় ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁরা মানুষের প্রতিই প্রেরিত হয়েছেন। যদি তাঁরা এরূপ না হতেন, তাহলে লোকজন না তাঁদের অনুসরণ করতো, না তাঁদের কথা শুনতো, আর না তাঁদের সান্নিধ্যগ্রহণ করতো।

যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ করা হয়েছে—

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا.

^১. আল কুরআন : সূরা ফেরকান, ২৫:২০।

^২. আল কুরআন : সূরা কাহাফ, ১৮:১১০।

—আর যদি আমি নবীকে ফিরিশতা করতাম তবুও তাঁকে পুরুষই করতাম।^১

অর্থাৎ তাঁরাও মানবীয় আকৃতি বিশিষ্ট হতেন, তোমরা তাঁদের সাথে কথা বলতে। তাঁদের সান্নিধ্য গ্রহণ করতে। তোমাদের তো ফিরিশতাদের সাথে মেলামেশা করার ক্ষমতা নেই। আর না তোমরা তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলতে পারতে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا
عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٢٢﴾

—আপনি বলুন, যদি পৃথিবীতে ফিরিশতাগণ থাকতো, প্রশান্তচিত্তে বিচরণ করতো, তাহলে তাদের নিকট আমি আসমান থেকে ফিরিশতারূপী রসূল অবতারণ করতাম।^২

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সুল্লাত হলো, যে জাতির প্রতি তিনি রাসূল প্রেরণ করতেন, ওই জাতির মধ্য থেকেই করতেন। অথবা তার মধ্যে এমন ক্ষমতা দিয়ে প্রেরণ করতেন, যা দ্বারা তিনি ওই জাতির সকল দাবি ও চাহিদাপূরণে সক্ষম হতেন। যেমন- হযরাত সম্মানীত নবী ও রসূলগণ, যারা আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র হতেন। আর তাঁরা সৃষ্টজীবের নিকট আল্লাহ তা'আলার বিধান পৌছাতেন। আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ডয় দেখাতেন। তারা যা জানতো না, তা তাঁদের শিক্ষা দিতেন। অর্থাৎ তাঁর বিধি-বিধান, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, রাজত্ব তদানুরূপ বিষয়সমূহ যে পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান পৌছতে অক্ষম। সম্মানিত নবীগণ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আকার-আকৃতিতে মানবীয়রূপ বিশিষ্ট ও মানবীয় আচার-আচরণের জন্য যা প্রযোজ্য তা তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতো। যথা আকস্মিক বিপদে পতিত হওয়া, অসুস্থ হওয়া, মৃত্যুবরণ করা, ইহলোক ত্যাগ করা, ইত্যাদিসহ অন্যান্য মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী হওয়া। কিন্তু তাদের আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনেক সমুন্নত ও মানবীয় গুণাবলীর অনেক উর্ধ্বে। তাঁরা মালায়িল আ'লা বা উর্ধ্ব জগতের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আর তাঁদের মধ্যে নবী হওয়ার দিক থেকে এমন অনেক মহিমামণ্ডিত গুণাবলী পাওয়া যেতো যেগুলো ফিরিশতাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তারা পরিবর্তন ও বিপদ থেকে মুক্ত থাকতেন।

^১. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৯।

^২. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:৯৫।

মানবীয় দুর্বলতা ও অক্ষমতা তাঁদেরকে স্পর্শ করতেন। কারণ তাঁদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যদি বাহ্যিক অবস্থার মতো একান্ত মানবীয় হতো, তবে তাঁরা সন্দেহাতীতভাবে ফিরিশতাদের নিকট থেকে আহকাম গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখতেন না, আর না তাঁদের দেখতে পেতেন, আর ফিরিশতাদের সাথে সাক্ষাত করার ক্ষমতাও রাখতেন না, তাদের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারতেন না। যদি তাঁদের বাহ্যিক আকৃতি ও দৈহিক অবস্থা ফিরিশতা সদৃশ হতো এবং যদি তাঁরা মানবীয় গুণাবলীর ধারক বাহক না হতেন তাঁদের সাথে না কোন মানুষ সাক্ষাত করতে পারতো আর না তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারতো। যেমনটি আল্লাহ তা'আলার বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোদাক্কা হলো, নবীগণ দৈহিক ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মানুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, আর আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে ফিরিশতাসুলভ গুণের অধিকারী। এ কারণে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَأَتَّخِذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أَخُوهُ
الِاسْلَامَ لَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ.

-আমি যদি আমার উম্মাতের মধ্যে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে অবশ্যই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু তিনি আমার ইসলামী ভাই আর তোমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার খলীল (বন্ধু)।^১

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

-আমার আঁখিগুণল নিদ্রিত হয়, কিন্তু অন্তঃকরণ সজাগ থাকে।^২

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

- ^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কাওলিন্ নবী, ১১:৪৯১, হাদিস নং : ৩৩৮৩।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু নাহী আন বানায়িল মসজিদ, ৩:১২৭, হাদিস নং : ৮২৭।
গ) বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়াত, বাবু জিমায়া আবওয়াবি মারযি রাসূল, ৮:২৬৩, হাদিস নং : ৩১০১।
^২ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী যিকরি ইবনে সাযীদ, ৮:২০২, হাদিস নং : ২১৭৪।
খ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফী ওয়ূয়ি মিনান্ নাওম, ১:২৫৭, হাদিস নং : ১৭৪।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু বিদায়াতী মুসনাদি আবদিয়াহ ইবনে আব্বাস, ৪:৩৪৪, হাদিস নং : ১৮১২।

إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظْلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيَنِي.

-আমি তোমাদের মতো নই। নিশ্চয়ই আমি এমন অবস্থায় দিনাতিপাত করি যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান।^১

অতএব বুঝা গেল, তাঁদের অভ্যন্তরীণ দিক বিপদ ও শঙ্কামুক্ত এবং ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। আর এটা এমন সংক্ষেপ বক্তব্য যা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য যথেষ্ট নয়, অনুসন্ধিৎসু পাঠকবৃন্দ পরবর্তী অধ্যায় পাঠে বিস্তারিত জানতে পারবে।

এ বিষয়ে দু'টি অধ্যায়ে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যক্রমে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তিনি আমার জন্য যথেষ্ট ও উত্তম অভিভাবক।

- ^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল ভিসাল ওয়া মান কুলা লাইসা..., ৭:৬৮, হাদিস নং : ১৮২৭।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু নাহী আনিল ভিসাল ফীস সাওম, ৫:৩৯৮, হাদিস নং : ১৮৪৪।
গ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু নাহী আনিল ভিসাল ফীস সাওম, ২:৩৯০, হাদিস নং : ৫৯১।
ঘ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফীল ভিসাল, ৬:৩১৩, হাদিস নং : ২০১৩।

الْبَابُ الْأَوَّلُ

প্রথম অধ্যায়

نَبِيًّا يَخْتَصُّ بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالْكَلَامُ فِي عِصْمَةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

দ্বীনি বিষয়ে হযুর ﷺ এর বিশেষত্ব এবং তাঁর ও সকল নবীগণের

নিষ্পাপ হওয়া প্রসঙ্গে

কাযী আবুল ফযল আয়ায রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, স্মরণ রেখো! মানুষের উপর যে সংকট ও বিপর্যয় অবতারণিত হয়, তা অনিচ্ছাকৃত তার দেহ ও অনুভূতিতে নাড়া দেয়। যেমন, রোগ-ব্যাধি ও এর দ্বারা সাধিত পরিবর্তন তার ইচ্ছা ও অনুভূতিতে আসে। কিন্তু এসব পরিবর্তন মূলতঃ আমল ও কর্মে হয়ে থাকে। কিন্তু সম্মানিত মাশায়েখগণ এগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) অন্তরের দৃঢ়তা (২) মৌখিক ভাষ্য (৩) দৈহিক আমল।

মানুষের উপর যেসব বিপদ-আপদ, পরিবর্তন-পরিবর্ধন, চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃত, তা এ তিনভাবে মানুষের নিকট প্রকাশ পায়। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবাকৃতির ছিলেন এবং তার সত্তায় ওইসব পরিবর্তন যা সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য ছিল তা হওয়াটা জায়য ও সম্ভবপর ছিলো। কিন্তু এ বিষয়ের উপর অকাট্য ও চূড়ান্ত প্রমাণ ও উম্মাতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন না। তাঁর পবিত্র সত্তা ওইসব বিপদ ও ক্রটি থেকে মুক্ত ছিল, যা মানুষের ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সংঘটিত হয়ে থাকে। আমি (লেখক) এ বিষয় আল্লাহর ইচ্ছায় সামনে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

فِي حُكْمِ عَقْدِ قَلْبِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَقْتِ نُبُوَّتِهِ

হযুর ﷺ এর নবুওয়াতকালীন দৃঢ়চিত্ততা প্রসঙ্গে

স্মর্তব্য যে, আল্লাহ তা'আলা নেক কাজের সামর্থ্যদাতা। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক কালবে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, তাঁর মহিমাম্বিত গুণাবলী ও তাঁর সত্তার উপর সুদৃঢ় ঈমান ছিলো। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা দ্বারা তাঁর সর্বোচ্চ স্তরের পরিচিতি, ব্রহ্মজ্ঞান, ও দৃঢ়বিশ্বাস অর্জিত হয়েছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান ও বিশ্বাসে না কোনো প্রকার অজ্ঞতা ছিলো, আর না কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয় ছিলো। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওইসব বিষয় থেকে নিষ্কলুষ ছিলেন, যা ওই পরিচিতি ও বিশ্বাসের বিপরীত ছিলো। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ'র ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর তা অত্যাঙ্কুল দলিল প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছে। আন্তরিক বিশ্বাসে অন্যান্য সম্মানিত নবীগণের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়।^১

এই বিশ্বাসের বক্তব্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের এ বক্তব্য পেশ করা যাবে না। যেমন, তিনি বলেছেন-^২

قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي.

-নিশ্চিত বিশ্বাস কেন থাকবে না! কিন্তু আমি চাই যে, আমার অন্তরে প্রশান্তি এসে যাক।^৩

^১ অর্থাৎ তাঁদের আকীদাহ পাকাপোক্ত আর ইয়াকীন কামেল ছিলো। আর তাঁরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা থেকে পবিত্র ছিলেন।

^২ একবার হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তা'আলা নিকট আরব করেন যে, হে আল্লাহ! আপনি মৃতকে কীভাবে জীবিত করেন? তা আমাকে দেখিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, তোমার কী এ বিষয় বিশ্বাস নেই? হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম বললেন, বিশ্বাস তো আছে। তবে আমি আন্তরিক প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে তা প্রত্যক্ষ দেখতে চাই। এরপর আল্লাহ তা'আলা পাখি জীবিত করার যে ঘটনা পবিত্র কুরআন মজীদে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এখানে ঐ ঘটনা আর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছে, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এতে যে মতভেদ দেখা দিয়েছে তার প্রতি উত্তরে দিয়ে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

^৩ আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:২৬০।

আল্লাহ তা'আলা মৃতকে জীবিত করেন এ বিষয় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিলো না। তবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আন্তরিক প্রশান্তি লাভের জন্য এ আবেদন করেছেন যে, হে আল্লাহ তা'আলা! আমাকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিন যে, আপনি মৃতকে কীভাবে জীবিত করেন? হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তা স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছেন। যদি এ বিষয় কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করে তাহলে তিনি যেনো বলতে পারেন যে, এভাবে মৃতকে জীবিত করা হয়। মূলতঃ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম মৃতকে জীবিত করার বিষয়ে পূর্ব থেকে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করেন, এর ব্যাপক জ্ঞান ও ধরন যেন স্বচক্ষে দর্শনের মাধ্যমে লাভ হয়।

দ্বিতীয় কারণ এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম কেমন মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তিনি তা জানতে চেয়েছেন। অথবা এর দ্বারা তাঁর দোয়া কবুলের বিষয়টি অবগত হতে চেয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জবাবে বলেন, **أَوَلَمْ تُؤْمِن** তুমি কি এ ব্যাপারে বিশ্বাস রাখো না? এরূপ বলার মর্মার্থ হলো যে, তোমার নিজের মর্যাদা ও আমার সাথে বন্ধুত্ব, আর আমি যে তোমাকে মনোনীত করেছি সে বিষয়ে তোমার কী দৃঢ় বিশ্বাস নেই?

তৃতীয় কারণ এটাও হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর নিজের সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আন্তরিক প্রশান্তিকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে এরূপ প্রশ্ন করেছেন। যদিও পূর্বে এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ও সংশয় ছিলোনা। তবুও প্রত্যক্ষ ও জরুরী জ্ঞান যা স্বীয় বিশ্বাসের ক্ষমতা ও সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করে। যদিও জরুরী জ্ঞানে সন্দেহ দেখা দেওয়া অসম্ভব। তবুও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা ইলমুল ইয়াকীন (পরোক্ষ জ্ঞান) এর স্তর থেকে আইনুল ইয়াকীন (চাক্ষুষ জ্ঞান) পর্যন্ত পৌঁছার ইচ্ছা করেছেন। কারণ খবর কখনো চাক্ষুষ দর্শনের মতো হয় না।

এ কারণে হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ রাযিরাল্লাহ তা'আলা আনহু বলেছেন, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম বাহ্যিক আড়াল অপসারণ করার আবেদন জানান, যাতে ইয়াকীনের জ্যোতিতে আপন মর্যাদায় পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারেন।

চতুর্থ কারণ এটাও হতে পারে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম মুশরিকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, আমার প্রভু জীবিত করেন ও মৃত্যু দেন। তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর প্রভুর নিকট আবেদন করেন, আপনি সেই প্রমাণ আমাকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিন, যাতে আমার চ্যালেঞ্জ দৃঢ়তর হয়।

পঞ্চম কারণ এটাও হতে পারে যে, কোনো কোনো আলেমের অভিমত হলো, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম একান্ত আদবের কারণে এমন আবেদন করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমাকে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা দান করুন। তাঁর উক্তি হলো **لِيُطَمِّنَ قَلْبِي** আর এর অর্থ হবে, যাতে আমার অন্তরের লালিত আশা পূর্ণ হয়।^১

ষষ্ঠ কারণ এটাও হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম নিজের সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তা কোনো সন্দেহই ছিলো না। কিন্তু এরূপ সন্দেহ প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিলো যে, আল্লাহর দরবারে তাঁর নৈকট্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উক্তি **نَحْنُ أَحَقُّ بِالشُّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ** 'সন্দেহ পোষণ করার ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের অপেক্ষা আমরা অধিক হকদার ছিলাম'^২ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, "হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের সন্দেহকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করা।" দুর্বলচিত্তের যেসব লোক ধারণা করে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে সন্দেহ ছিলো এক্ষেত্রে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর মর্মার্থ হলো, আমি মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা'আলা মৃতকে জীবিত করবেন এ বিষয়েও পূর্ণ আস্থাশীল। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও যদি এক্ষেত্রে কোনো কারণে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম সন্দেহ পোষণ করেন, তাহলে আমি এ বিষয় তাঁর থেকে অধিক সন্দেহ পোষণের উপযুক্ততা রাখি। অথবা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয় ও উদারতা প্রকাশার্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন কিংবা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতের ওইসব লোকদের বুঝাতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, যারা এ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে। এ অর্থ ওই অবস্থায় হবে যখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর এ ঘটনাকে নিজের অবস্থা পরীক্ষা করা অথবা স্বীয় বিশ্বাসের দৃঢ়তা জানার উদ্দেশ্যে ধর্তব্য হবে। যদি এ বিষয় তোমাদের এরূপ ধারণা হয় তাহলে এই আয়াতের কী অর্থ হবে।

^১ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তা'আলার নিকট মৃতকে জীবিত করার মুজিয়া প্রার্থনা করেন যে, আমি যেনো মৃতকে জীবিত করতে পারি আমাকে সেই ক্ষমতা দান করুন। কিন্তু আদবের বাস্তবে তিনি সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় তা বলেন নি। বরং আন্তরিক প্রশান্তি লাভের কথা বলার বরাত দিয়েছেন। আর আমি তো এরূপ মুজিয়ার অধিকারী।

^২ ক) বুখারী : আস সহীহ, ৬:৩১ হাদীস নং ৪৫৩৭।

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٥﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا

بَيِّنَاتٍ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٦﴾

-আর হে শ্রোতা! যদি তোমার কোনো সন্দেহ থাকে তাতে, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, যারা আপনার পূর্বে কিতাব পাঠকারী রয়েছে। নিশ্চয় তোমার কাছে তোমার রবের নিকট থেকে সত্য এসেছে। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। এবং অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা আল্লাহর নিদর্শনাদিকে অস্বীকার করেছে, যাতে তুমিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।^১

এখানে এরূপ অভিমত প্রকাশ করাকে ভয় করো। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয় তোমাদের অন্তরকে সুদৃঢ় রাখুক। আর যেন তোমাদের অন্তরে ঐ ধরনের সন্দেহের উদ্রেক না হয়। যা কোনো কোনো তাফসীরবেস্তা ও হযরত ইবনে আব্বাস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। যাতে এটা প্রমাণ করেন, ওহী সম্পর্কে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্দেহ ছিলো। এ জন্যই যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাশারও ছিলেন। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা কোনো ক্রমেই জাযিব হবে না। বরং হযরত ইবনে আব্বাস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এ বিষয় কখনো হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করেন নি। আর না তিনি এ বিষয় কখনো কাউকে জিজ্ঞেস করেছেন। অনুরূপ বর্ণনা হযরত জুবায়ির ও হযরত হাসান বসরী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর হযরত কাতাদাহ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'مَا أَشْكُ وَلَا أَسْأَلُ' - 'আমি না কখনো সন্দেহ করেছি, আর না প্রশ্ন করেছি'। অধিকাংশ তাফসীরবেস্তা এই অভিমত প্রকাশ

খ) মুসলিম : আস সহীহ, ১:১৩৩ হাদীস নং ১৫১।

গ) ইবনে মাজাহ : আস সুনা, ২:১৩৩৫ হাদীস নং ৪০২৬।

ঘ) ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ১৪:৮৮ হাদীস নং ৬২০৮।

১. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০:৯৪।

করেছেন। তবে আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় তাদের মতভেদ রয়েছে। আর কেউ কেউ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন, হে মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের বলুন, যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব পাঠকারীদের জিজ্ঞেস করে দেখো। তারা আরো বলেছেন, নিম্নোক্ত আয়াতও উক্ত ব্যাখ্যার যথার্থতা প্রমাণ করে -

قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنَكُمْ ۚ

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾

-আপনি বলুন, হে মানবকূল! যদি তোমরা আমার দ্বীনের দিক দিয়ে কোনো সংশয়ের মধ্যে থাকো, তবে আমি তো ওইগুলোর ইবাদত করবো না, আল্লাহ ব্যতীত যেগুলোর তোমরা উপাসনা করছো। হ্যাঁ, আমি ওই আল্লাহর ইবাদত করি, যিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন। আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হই।^১

উক্ত আয়াতে আরববাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ

عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨﴾

-আর নিশ্চয় আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, হে শ্রোতা! যদি তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করো, তবে অবশ্যই তোমার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতির মধ্যে থাকবে।^২

উক্ত আয়াতে যদিও হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা অন্যান্য লোকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ ۚ

১. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০:১০৪।

২. আল কুরআন : সূরা যুমার, ৩৯:৬৫।

-সুতরাং হে শ্রোতা! ধোঁকায় পড়োনা তা দ্বারা, এ কাফিরগণ যেগুলোর পূজা করছে।^১

উক্ত আয়াতে দেখা যায় যদিও বাহ্যিকভাবে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু তিনি ব্যতীত অন্যান্য লোকদের বুঝানো হয়েছে। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

হযরত বকর বিন আ'লা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তোমরা কি দেখছেন না যে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করেছেন-

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِبَايَةِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ

الْخٰسِرِينَ ﴿٢﴾

-এবং অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা যারা আল্লাহর নিদর্শনাদিকে অস্বীকার করেছে, যাতে তুমিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।^২

অথচ অবস্থা হলো, তিনি লোকদেরকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করছেন। আর লোকজন তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করছে। তারপর বলুন এটা কীভাবে হতে পারে যে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন (নাউযবিলাহ)। উক্ত আয়াতসমূহের মর্মার্থ হলো যে, যদিও বাহ্যিক ভাবে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অন্য লোকদেরকে।

অনুরূপ অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

الرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِمِ خَيْرٍۙ

-তিনি বড়ই দয়ালু, সুতরাং কোনো অবগতজনকে তাঁর প্রশংসা জিজ্ঞাসা করো।^৩

যদিও উক্ত আয়াতে বাহ্যিকভাবে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, তবুও প্রকৃতঅর্থে তিনি ব্যতীত অন্যদের সম্বোধন করা হয়েছে। আর তাদের বলা হয়েছে যে, তোমার দয়ালু সন্তার গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত ও তাঁর

^১. আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১:১০৯।

^২. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০:৯৫।

^৩. আল কুরআন : সূরা ফোরকান, ২৫:৫৯।

গুণাবলীর পরিচয়সম্পন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং প্রশ্ন করেন নি। আর এ সন্দেহ যার সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ পোষণকারীদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো তাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব পাঠকারীদের (কিতাবধারী) নিকট জিজ্ঞেস করো। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঘটনা প্রসঙ্গে যা প্রচার করেছেন তা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কিতাবের অনুসারীদের নিকট জিজ্ঞেস করার আদেশ দিয়েছেন, একত্ববাদ আর শরীয়াত সম্পর্কে নয়। অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٢٠﴾

-আর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, যাদেরকে আমি আপনার পূর্বে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, আমি কি দয়াময় (আল্লাহ) ব্যতীত অন্য কোন প্রভু স্থির করেছি, যেগুলোর উপাসনা করা যায়?^১

উক্ত আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই অংশীবাদী লোক যারা শিরকে লিপ্ত হয়েছে। অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি এ ব্যাপারে লোকদের জিজ্ঞেস করুন। এটা হযরত উতবী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অভিমত।

কোনো কোনো আলেমগণ বলেন, উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওই নবীগণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, যাদেরকে আমি তাঁর পূর্বে প্রেরণ করেছি। এ স্থানে যের দানকারী (عَن) কে দূর করে বাক্য পূর্ণ করা হয়েছে। এরপর বাক্য এভাবে শুরু করা হয়েছে-

أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ

-আমি কি পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ স্থির করেছি।^২

এখানে এটা অস্বীকৃতিবোধক বাক্য হয়েছে। অর্থাৎ مَا خَلَقْنَا -আমি স্থির করিনি। এটা মকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।

^১. আল কুরআন : সূরা যুখরুফ, ৪৩:৪৫।

^২. আল কুরআন : সূরা যুখরুফ, ৪৩/৪৫।

আর অন্যান্য বর্ণনায় বর্ণিত, মিরাজ রজনীতে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি পূর্ববর্তী আশিয়া কেরাম থেকে (আল্লাহ তা'আলার শান আর তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করে জেনে নিন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা ও তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাকাপোক্ত ও প্রচণ্ডতম বিশ্বাস ছিলো যে, তাঁর এ বিষয়ে জিজ্ঞেসের প্রয়োজন ছিলো না।

কোনো কোনো বর্ণনায় বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেছেন- **لَا أَسْأَلُ قَدْرًا كَفَيْتُ** - আমি জিজ্ঞেস করবো না, আমার যথেষ্ট আস্থা ও বিশ্বাস আছে। এ অভিমত হযরত ইবনে যায়িদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

কেউ কেউ বলেন, উক্ত আয়াতে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি আপনার পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকদের জিজ্ঞেস করুন যে, তারা কী তাওহীদের আকীদায় অবিশ্বাসী ছিলো? এ অভিমত হযরত মুজাহিদ, সুদী, দাহহাক ও কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের।

আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্পষ্ট করে দেওয়া যে, আপনিও পূর্ববর্তী প্রেরিত নবীগণের অনুরূপ দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন।

আর আল্লাহ তা'আলা কাউকে তাঁর ব্যতীত অন্য কারো ইবাদতের অনুমতি দেননি। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মক্কার মুশরিক ও পৌত্তলিকদের এ দাবীর খণ্ডন করেছেন, যারা বলে, **إِنَّمَا نَعْبُدُهُمْ لِئَقْرَبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى** - আমরা তো এ প্রতিমা সমূহের এ জন্য ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে এনে দেবে।^১

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

**وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ**

-এবং যাদেরকে আমরা কিতাব প্রদান করেছি তারা জানে যে, এটা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে সত্যই অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং হে শ্রোতা! তুমি কখনো সন্দেহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।^২

^১ আল কুরআন : আল যুমার, ৩৯:৩।

^২ আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:১১৪।

অর্থাৎ- তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সত্য নবী, যদিও তারা একথা মুখে স্বীকার না করে। উক্ত আয়াতেও সন্দেহ পোষণ করা এভাবে বলা হয়েছে, যেভাবে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে এ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও পূর্বের অনুরূপ মর্মার্থ হবে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কুরআন মজীদে প্রতি সন্দেহ পোষণকারীদের বলে দিন যে, তোমরা সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আয়াতের প্রথমার্শই এর দলিল, যাতে ইরশাদ হয়েছে,

**أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ
مُفَصَّلًا**

-তবে কী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো মীমাংসা চাইবো? তিনি তো সে সত্তা, যিনি তোমাদের প্রতি বিশদভাবে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।^১

এখানেও এর দ্বারা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্যদের সম্বোধন করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এ আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ

-তুমি কি লোকজনকে বলেছিলে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দু' খোদা রূপে গ্রহণ করো।^২

অথচ আল্লাহ তা'আলা ভালো করে জানেন যে, হযরত ইসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে এরূপ কোনো আদেশ করেননি।^৩

কোনো কোনো আলেমগণ বলেন, উল্লেখিত আয়াতে সন্দেহের যে সম্পর্ক ইসা আলাইহিস্ সালামের সাথে করা হয়েছে এর মর্মার্থ হলো, তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও সংশয় ছিলোনা। কেবল তাঁর আত্মিক প্রশান্তি, জ্ঞান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ওই লোকদের সম্পর্কে তাঁকে বলা হয়েছে।

কোনো কোনো আলেম বলেন, উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হলো, মর্যাদা ও সম্মান যা আপনাকে প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কে যদি সন্দেহ হয় তাহলে আপনি

^১ আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:১১৪।

^২ আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫:১১৬।

^৩ কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসা আলাইহিস্ সালামকে এ প্রশ্ন করবেন।

তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আপনার মর্যাদা কিভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু উবায়দা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এর দ্বারা পূর্ববর্তী যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ উদ্দেশ্য।^১

আর যদি অভিমত পেশ করা হয় যে এ আয়াতের মর্মার্থ কী হবে?

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا.

-অবশেষে যখন রাসূলগণের নিকট প্রকাশ্য কোনো উপায়-উপকরণের আশা রইলো না এবং লোকেরা ভাবলো যে, রাসূলগণ তাদেরকে ভুল বলেছিলো।^২

সহজ ভাষায় বলছি, এর মর্মার্থ হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, (আল্লাহর পানাহ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতেন না। বরং এর মর্মার্থ হলো, যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নৈরাশ হয়ে পড়তেন তখন এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, মান্যকারীগণ তাকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছিলো তারা তাদের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করেছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন।

এক অর্থ এটাও হতে পারে যে, ظَنُّوا (তারা ধারণা করেছে) এর খবর সম্মানিত নবীগণের অনুসারী ও উম্মাতদের প্রতি সম্পৃক্ত হয়েছে। এ অবস্থায় এর মর্মার্থ হবে, সম্মানিত নবীগণ এরূপ ধারণা করেননি। বরং তাদের অনুসারী কিংবা কতিপয় উম্মাত এ ধারণা করেছে। এটা হযরত ইবনে আব্বাস, নাখয়ী ও ইবনে জোবায়ির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমসহ একদল আলেমের অভিমত। এ কারণে হযরত মুজাহিদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু كَذَّبُوا এর স্থলে كَذَّبُوا যবর সহযোগে পাঠ করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত হলো এ প্রসিদ্ধ তাফসীর ত্যাগ করে অপ্রসিদ্ধ আলেমদের ব্যাখ্যার প্রতি মনোযোগী না হওয়া। যা আলেমদের পদবীর

^১ উক্ত আয়াতে একথা জানা সত্ত্বেও হযরত ইসা আলাইহিস্ সালাম এরূপ কথা বলেন নি। আল্লাহ তা'আলা তার প্রশ্ন এইজন্য বর্ণনা করেন, যাতে হযরত ইসা আলাইহিস্ সালাম। মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বয়ং হযরত ইসা আলাইহিস্ সালাম এর একথা ভীষণ অপছন্দনীয় ছিলো যে, তাঁকেও তাঁর জননীকে উপাস্য বানানো হোক। এখানে সন্দেহকে অন্যের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্কিত করা হয়নি।

^২ আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:১১০।

জন্য প্রযোজ্য নয়। তাহলে বলুন! সেটা হযরত আযিয়া কেরামদের পদবীর জন্য কীভাবে প্রযোজ্য হতে পারে।^১

অনুরূপ এ বিষয়টিও, যা সীরাতের হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নিকট বলেন, لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي -আমি নিজের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি।^২ এর মর্মার্থ কখনো এরূপ হতে পারে না যে, ফিরিশতার সাথে সাক্ষাত লাভ করার পর ওহী সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে কোনো সন্দেহ ছিলো। বরং এর মর্মার্থ হলো, সম্ভবত হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আশঙ্কা করেন যে, তিনি আল্লাহর বার্তাবাহী ফিরিশতাদের সম্মুখীন হতে পারবেননা, অন্তর তা ধারণে সক্ষম হবে না কিংবা তাঁর প্রাণ চলে যাবে।

এটা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একথা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিশতার সাথে সাক্ষাত করার পর বর্ণনা করেছেন অথবা ফিরিশতার সাথে সাক্ষাত লাভের পূর্বে বলেছেন। যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট নবুওয়্যাত প্রকাশের সুসংবাদ দেন অথবা যখন তাকে সর্বপ্রথম বিস্ময়কর বিষয়াদি দেখানো হয়, যেমন- পাথর ও বৃক্ষরাজী তাঁকে সালাম করতে শুরু করে। যখন তিনি উত্তম স্বপ্ন দেখতে ও আশ্চর্যজনক সুসংবাদ শুনতে পান, তখন তিনি ঐ সব কথা ইরশাদ করেছেন। যেমন, কোনো কোনো বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, أَن ذَٰلِكَ كَانَ أَوَّلَ فَيٍّ -প্রথমদিকে যা স্বপ্নে দেখতেন, জাযত হওয়ার পর সেগুলো বাস্তবরূপে দেখানো হত। তাঁর সাথে এরূপ এ কারণে হতে থাকে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরঙ্গ হয়ে যান, যাতে যখন ফিরিশতার সাথে সাক্ষাত লাভ হবে আর তিনি হাকীকতের দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করতে পারেন। তাতে তাঁর মানবীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর অন্তরে ভয়-ভীতি সঞ্চার না হয়।

সহীহ হাদীসে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত,

^১ জলিলুল কদর আলেমগণের মধ্যেও একান্ত নৈরশ্যজনক অবস্থায়ও কখনো এরূপ ধারণার উদ্বেক হয়নি যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাহলে বলুন, হযরত আযিয়া কেরাম কীভাবে এরূপ ধারণা পোষণ করতে পারেন? হযরত আযিয়া কেরাম আলেমগণ থেকে শত সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ। তাঁরা কীভাবে এরূপ ধারণা করতে পারেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

^২ বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু বদয়িউল ওহী, ১:৫, হাদিস নং : ৩।

أَوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ
فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ
وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ.

-প্রথম প্রথম হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যস্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। আর তিনি রাতে যা স্বপ্নে দেখতেন তা সকালে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও বাস্তব দেখতে পেতেন। এরপর তিনি নির্জন বাস পছন্দ করেন। হেরা গুহায় নির্জন বাস শুরু করেন। আর এভাবে একদিন তাঁর নিকট সত্য এসে যায়।^১

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً يَسْمَعُ الصَّوْتِ،
وَيَرَى الضُّوءَ سَبْعَ سِنِينَ، وَلَا يَرَى شَيْئًا وَثَمَانِي سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ.

-হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পনের বছর মক্কাতে অবস্থান করেন। ঐ সময় তিনি অদৃশ্য আওয়াজ শুনতেন। তিনি সাত বছর পর্যন্ত উজ্জ্বল জ্যোতি ব্যতীত আর কিছু দেখতে পেতেন না। আট বছর পর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওহী অবতীর্ণ করা হয়।^২

হযরত ইবনে ইসহাক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোনো কোনো বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা পর্বতের কথা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন,

فَجَاءَنِي وَأَنَا نَائِمٌ فَقَالَ اقْرَأْ.

-একদা আমার নিকট ফিরিশতা আগমন করল, এমতাস্থায় আমি শুয়ে ছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, পাঠ করুন। আমি বললাম, আমি তো পাঠক নই।^৩

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু বদয়িল অহি, ১:৫, হাদিস নং : ৩।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু বদয়িল অহি ইলার রসূল, ১:৩৮১, হাদিস নং : ২৩১।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবুল মুসনাদিস সাবেক, ৫২:৪২৫, হাদিস নং : ২৪৭৬৮।

^২ মুসলিম : আস্ সহীহ, ৪:১৮২৭ হাদিস নং ২৩৫৩।

^৩ বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়াত, বাবু ফা জা'আ ওয়া আনা নাযিমুন, ২:১৪, হাদিস নং : ৪৫১।

অতঃপর হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন, যে ফিরিশতা এসে চেপে ধরে বললেন, ... اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ... (পড়ুন! আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন...) পাঠ করুন।

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অতঃপর ফিরিশতা আমার নিকট থেকে চলে যায়। আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পড়ি। আমার মনে হয় যে, ঐ সূরার নকশা আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়ে গেছে, অধিকন্তু কবিতা ও উন্বাদনা আমার নিকট ঘৃণ্য ছিল। আমি মনে মনে ধারণা করতে শুরু করি, (আল্লাহ না করুক) কুরাইশরা যদি আমাকে কবি ও উন্বাদ বলে আখ্যায়িত করে তাহলে আমি নিজে পাহাড়ের উঁচু টিলা থেকে নীচে পতিত হয়ে আত্মবিসর্জন করবো।

আমার মনে হচ্ছিল আমাকে এক আহ্বানকারী আহ্বান করলো যে, হে আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি জিবরাঈল। তিনি তখন মানব আকৃতিতে ছিলেন। এরপর বর্ণনাকারী পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। একথাও বর্ণিত আছে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে নিঃশেষ করার যে ইচ্ছা করেছিলেন, তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবুওয়াত প্রকাশের সংবাদ ও হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের সাক্ষাতের পূর্বে করেছেন।

অনুরূপ হযরত আমর বিন শুরাহবীল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনায় বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে ইরশাদ করেন,

إِنِّي إِذَا خَلَوْتُ وَخِدِّي سَمِعْتُ نِدَاءً، وَقَدْ خَشِيتُ وَاللَّهِ أَنْ يَكُونَ هَذَا لِأَمْرٍ.

-আমি যখন একাকী হই, তখন আমি আওয়াজ শুনতে পাই। আল্লাহর শপথ! তখন আমি ভীত হয়ে পড়ি যে, কোনো ভীতিকর ঘটনা ঘটে যাবে।^২

হযরত হাম্মাদ বিন সালাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনায় বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে ইরশাদ করেন,

إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتًا، وَأَرَى ضَوْأً، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِي جُنُونٌ.

^১ আল কুরআন : সূরা আলাক, ৯৬:১।

^২ বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়াত, বাবু ফা জা'আ ওয়া আনা নাযিমুন, ২:২৭, হাদিস নং : ৪৬৩।

-আমি আওয়াজ শুনতে পাই। আর আলো দেখতে পাই। আমি আশঙ্কা করি যে আমাকে উন্মাদনায় পেয়ে বসবে।^১

উল্লেখিত হাদীসসমূহে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব বাণী উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এ কথা প্রতিভাত হয়েছে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবি বা উন্মাদনা প্রকাশের শঙ্কা ছিলো। যদি একথা সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে যে, এসব আশঙ্কার ধারণা ফিরিশতার সাথে তাঁর সাক্ষাত লাভের পূর্বে ও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবুওয়াত প্রকাশের সুসংবাদ আসার পূর্বে হয়েছে। আর এমনটিও হয়েছে যে, উল্লেখিত হাদীসসমূহের কোনো কোনো সূত্র সহীহ নয় (অর্থাৎ দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে)। তবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াত প্রকাশের সুসংবাদ দান করা হয়েছে এবং ফিরিশতার সাথে সাক্ষাত হয়েছে, এরপর অবতরিত ওহী এবং হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করা বৈধ নয়।

হযরত ইবনে ইসহাক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর শিক্ষাগুরুদের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় ছিলেন, তখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বদনজরের প্রভাব পড়েছিল, তাছাড়া কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার পরও তাঁর উপর বদনজরের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তখন হযরত খাদিজা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আরম্ভ করেন, আমি কি আপনাকে কোন ঝাঁড়ফুককারীর নিকট নিয়ে যাব? হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না, এখন নিতে হবে না। (যেহেতু কুরআন মজীদে সকল প্রকার ব্যাধির নিরাময় রয়েছে)

এ বিষয়টি হযরত খাদিজা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, যাতে তিনি মাখার আচ্ছাদন উঠিয়ে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে পরীক্ষা করেছেন। হযরত খাদিজা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নিজ ইচ্ছানুযায়ী হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে এ কাজ করেছেন। তিনি জানতে চান যে, সত্যই হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিশতার আগমন করেন, না অন্য কেউ? এভাবে তিনি নিজের সন্দেহকে নিজের উপর থেকে দূরে করে দেন। হযরত খাদিজা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাব কতলি কা'ব ইবনে আশরাফ, ৯:২৮৮, হাদিস নং : ৩৩৫৯।
খ) নাসায়ী : সুনাউল কুবরা, ৫:১৯২।
গ) হমাইদী : আল মুসনাদ, মুসনাদি জাবির ইবনে আবদিল্লাহ, ৩:৯১, হাদিস নং : ১৩০৬।

বর্ণনায় এসেছে, ওরাকা বিন নওফল হযরত খাদিজা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে এভাবে মাখার চুল খুলে পরীক্ষা করার কথা বলেছেন।

হযরত ইসমাইল বিন আবু হাকিম রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনায় এসেছে, হযরত খাদিজা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরম্ভ করেন, হে আমার চাচাতো ভাই! যখন আপনার সাথী হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আপনার নিকট আগমন করেন, তখন আপনি তা আমাকে জানাবেন কী? হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হ্যাঁ! সুতরাং যখন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আগমন করেন। তখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদিজা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বলেদেন। হযরত খাদিজা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আরম্ভ করেন, এখন আপনি আমার পাশে বসে পড়ুন, এরপর তিনি মাখা খোলা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেন। আর ওই বর্ণনায় বর্ণিত, হযরত খাদিজা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন যে, তিনি শয়তান নয়, হে আমার চাচাতো ভাই! তিনি তো ফিরিশতা। সুতরাং আপনি সুদৃঢ়, প্রশান্ত ও উৎফুল্ল থাকুন।

উক্ত বর্ণনায় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত খাদিজা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা যা কিছু করেছেন তা তিনি নিজের আত্মিক প্রশান্তি ও ঈমানের দৃঢ়তার জন্য করেছেন। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মিক প্রশান্তির জন্য নয়।^১

আর ওহীর ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে হযরত মুয়াম্মার রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ বর্ণনা যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতো বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েন যে, অনেকবার তিনি নিজেকে উঁচু পাহাড়ের টিলা থেকে পতিত হয়ে আত্মবিসর্জন করতে চান।

অভিমতটি আমার মতকে দুর্বল করে না, কারণ মুয়াম্মারের বর্ণনা আমার নিকট পৌঁছেছে, কিন্তু এতে না সনদ উল্লেখ আছে, না বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ আছে।

১. স্বী লোকের মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের গোড়ালী ব্যতীত পুরো দেহ সতরের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তা অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে উন্মুক্ত করা জাযিব নেই। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে এ পরিচয়ে জানা যেতো ও যে গৃহে স্বীলোক মাখার চুল খুলে বসে থাকে। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম সে গৃহে প্রবেশ করেন না। সুতরাং এটা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগন্তুক সত্যই জিবরাঈল ফিরিশতা কিনা। একদিন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম গৃহে প্রবেশ করেছেন। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদিজা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বলেদেন, তখন তিনি নিজ মাখার কাপড় ফেলে দেন। এ অবস্থা দেখে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম তাত্ক্ষণিক ভাবে গৃহ ত্যাগ করে চলে যান।

আর না তিনি একথা বলেছেন যে, অমুক ব্যক্তি তাঁর নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, না তিনি এ কথা বলেছেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বর্ণনা করেছেন। এসব কারণে এ বর্ণনা দুর্বল হয়েছে এবং এটার বর্ণনাসূত্র হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেনি।

এ ধরনের বর্ণনাসমূহ যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো নবুওয়াতের প্রাথমিক কালের হিসেবে ধর্তব্য হবে। অথবা একথা বলা যাবে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য এরূপ ইচ্ছা করেছেন, যেহেতু লোকজন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَلَعَلَّكَ بَخِيعُ نَفْسِكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا

الْحَدِيثُ أَسْفَا

-তবে সস্তবতঃ আপনি আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন, তাদের পেছনে যদি তারা এ বাণীর উপর ঈমান না আনে, আক্ষেপে।'

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুর বর্ণনাও এ মর্মার্থের সমর্থন করে, যাতে বর্ণিত হয়েছে, যখন মক্কার মুশরিকরা দারুন নাদওয়াতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। তারা সকলে সর্বসম্মতিক্রমে ঐকমত্যে উপনীত হয় যে, তাঁকে যাদুকর বলে প্রসিদ্ধ করা হোক। একথা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ভীষণ কষ্টদায়ক হিসেবে অনুভূত হয়। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তিত হওয়ার কারণে বস্ত্রাবৃত হয়ে পড়েন, তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত জিবরাইল আলাইহিস্ সালাম আগমন করে বললেন-

يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ، يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ.

-হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি।^২ হে চাঁদর আবৃতকারী।^৩

হয়ুর সান্নাধ্যাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভীত হওয়ার মর্মার্থ এটাও হতে পারে, হয়তো তিনি ধারণা করেন যে, তাঁর কোনো আমলের কারণে ওহী আসা বন্ধ হয়ে

^১. আল কুরআন : সূরা কাহাফ, ১৮:৬।

². আল কুরআন : সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩:১।

১০. আল কুরআন : সূরা মুদ্দাস্‌সির, ৭৪:১।

হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর দেশান্তরিত হওয়াও অনুরূপ ছিলো। তিনি স্বীয় সম্প্রদায় কর্তৃক মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে অন্যত্র চলে যান। কারণ তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আযাব আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।’

হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর মর্মার্থ-

فَظَنُّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ.

১. হযরত ইউনুস বিন মাস্তা আলাইহিস্ সালামকে নিনুয়া অঞ্চলে নবীরূপে প্রেরণ করা হয়। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানান। যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করে তখন হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে বললেন, তিন দিনের মধ্যে তোমাদের উপর আযাব এসে যাবে। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা একথা জানানোর পর দুঃখপোষ্য শিশুদের মা থেকে পৃথক করে ফেলে এবং তাদের পাত্ত পাল সাথে নিয়ে খোলা মাঠে সমবেত হয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করে তাওবা করতে শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবা কবুল করেন। শান্তি আসছেনা দেখে হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম এর ধারণা হয় যে, আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যাবাদী বলে উপহাস করবে। তাই তিনি এ আশঙ্কায় স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবার জন্য নৌকায় আরোহন করেন। নৌকা মাঝ নদীতে পৌঁছার পর ভীষণ ঝড়ের কবলে পতিত হয়। মনে হয় এখানেই পানিতে ডুবে যাবে। হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞেস করেন, এ অবস্থা কেনো হলো? মাঝি বললো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে আমার মনে হয়, কোনো গোলাম তাঁর মালিকের নিকট থেকে পলায়ন করে চলে যাচ্ছে। সুতরাং যদি তোমরা তাকে নৌকা থেকে পানিতে ফেলে না দাও তাহলে নৌকা ডুবে যাবে। নৌকার যাত্রীরা বললো, কে সেই গোলাম? হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম বললেন, আমি সেই গোলাম, তারা তিন তিন বার লটারী দেয় তিনবারই লটারীতে হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর নাম উঠে। তাঁকে নৌকা থেকে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়, মাছ তাঁকে ভক্ষণ করে। কোনো বর্ণনায় এসেছে, চল্লিশ দিন আর কোনো বর্ণনায় এসেছে ত্রিশ দিন, কোনো বর্ণনায় এসেছে সাত দিন যাবত হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম মাছের পেটে অবস্থান করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোযোগী হয়ে দোয়া পাঠ করেন— اِنَّ لِّاِلٰهِ الْاٰلٰ

أَلَمْ يَكُنْ مِنْ الظَّالِمِينَ - আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, পক্ষিতা আপনারই জন্য, নিশ্চয় আমার দ্বারা অশোভন কাজ সম্পাদিত হয়েছে। (সূরা: আঘিয়া-৮৭)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর তাওবা কবুল করেন। আর মাছের উদর থেকে তাঁকে জীবিতাঙ্গায় নদীর তীরে বের করে দেন। হযরত ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ বর্ণনা বর্ণিত আছে। (নাসীমুর রিয়াজ, ৪/৮৩)

-তখন মনে করে ছিলো যে, আমি তাঁর উপর বিপদ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবো না।^১

এটা হলো হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর ধারণা যে, তাঁর প্রতি কঠোরতা আরোপ করা হবে না।

আল্লাহ্ মা মক্কী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে একরূপ ধারণা করেন, যেহেতু তিনি ঘর ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছেন। তাই তাঁর প্রতি কঠোরতা আরোপ করা হবে না।

কেউ কেউ বলছেন যে, তিনি স্বীয় প্রভু সম্পর্কে উত্তম ধারণা করছেন যে, তিনি তাঁর উপর কখনো কঠোরতা আরোপ করবেন না।

কেউ কেউ উক্ত আয়াতের এ অর্থ করেন, আমি তাঁর জন্য যা নির্ধারণ করেছি তাঁকে সেই অবস্থায় পৌছতেই হবে। এ অবস্থায় نَفِيرٌ শব্দকে তাশদীদ যোগে পাঠ করতে হবে।

কেউ কেউ আয়াতের মর্মার্থে বলেন, আমি হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামকে তাঁর অসম্ভব হয়ে চলে যাবার কারণে জবাবদিহী করবো।

হযরত ইবনে যায়িদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এর মর্মার্থ হলো যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম কী একরূপ ধারণা করেন, আমি তাঁকে কাবু করতে পারবো না। (কিন্তু এ অভিমত সঠিক নয়)। কারণ কোনো নবী সম্পর্কে একরূপ ধারণা করা যায় না যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী সম্পর্কে অবগত থাকবেন না।

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার বাণী-

إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا.

-যখন চললো ক্রোধভরে।^২

উক্ত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হলো এই যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম তাঁর সম্প্রদায়ের কুফরির উপর অসম্ভব হয়ে নিশুওয়া ছেড়ে চলে যান। হযরত ইবনে আব্বাস, দ্বাহয্যক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও অন্যান্য তাফসীরবিদ এ অভিমতের সমর্থক। তবে এর অর্থ এই নয় যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম

^১. আল কুরআন : সূরা আযিয়া, ২১:৮৭।

^২. আল কুরআন : সূরা আযিয়া, ২১:৮৭।

আল্লাহ তা'আলার উপর অসম্ভব হয়ে নিশুওয়া ছেড়ে চলে যান। কারণ আল্লাহ তা'আলার উপর অসম্ভব হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে শত্রুতা পোষণ করা। আর আল্লাহর সাথে শত্রুতাপোষণ করা কুফরী, যা কোনো মু'মিনের শান নয়, তাহলে বলুন! নবীর পক্ষে তা কী করে সম্ভব হবে।

কেউ কেউ বলেন, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সম্প্রদায়ের উপর অসম্ভব হয়ে চলে যান যে লোকেরা তাকে মিথ্যাবাদী বলবে, অথবা তাকে হত্যা করে ফেলবে। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম তাঁর সমকালীন বাদশাহর উপর অসম্ভব ছিলেন। কারণ সে তাঁকে এমন কাজের আদেশ করেছে যা আল্লাহ তা'আলা অন্য নবীকে আদেশ করেছেন। বাদশাহর এমন নির্দেশ হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামের অপছন্দ হয়। তাই তিনি বললেন যে, আমি ব্যতীত অন্য কেউ এ কাজের অধিক উপযুক্ত হতে পারে যে, আমাকে কারো আনুগত্য করার হুকুম করতে পারে। এই জন্য বাদশাহ হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামকে শপথ দেয়। আর তিনি অসম্ভব হয়ে চলে যান।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম নবুওয়াত ও রিসালাত তখন লাভ করেন, যখন মাছ তাঁকে তার পেট থেকে বের করে দেয়। তার দলিল এ আয়াত-

فَتَبَدَّلْنَاهُ بِأَلْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ

يَقْطِطِينَ ﴿٢٧﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿٢٨﴾

-অতঃপর আমি তাঁকে তৃণহীন প্রান্তরে নিষ্কেপ করলাম এবং সে ছিলো অসুস্থ এবং আমি তাঁর উপর লাউগাছ উদগত করেছি। এবং তাকে লক্ষ মানুষের প্রতি প্রেরণ করেছি, বরং আরো অধিক।^১

এ আয়াতকেও দলিল হিসাবে পেশ করা যায়-

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ

مَكْظُومٌ ﴿٢٩﴾

^১. আল কুরআন : সূরা সাফাত, ৩৭:১৪৫-১৪৭।

-অতএব আপনি আপন রবের নির্দেশের অপেক্ষা করুন! এবং ওই মৎস্যের পেটে অবস্থানকারীর মতো হবেন না, যখন এমতাবস্থায় আহ্বান করেছিল যে, তাঁর অন্তর (আপন সম্প্রদায়ের উপর দুঃখবোধ ও ক্রোধের কারণে) সঙ্কুচিত হচ্ছিলো।^১

এখানে রাসূল শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করে ইরশাদ করেন-

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٠﴾

-অতঃপর তাকে তার পালনকর্তা মনোনীত করে নিলেন এবং আপন খাস নৈকট্যের উপযোগীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।^২

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অসম্ভব হয়ে চলে যাওয়া আর মাছের পেটে প্রবেশ করার ঘটনা হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে।

যদি এ বিষয় দ্বিমত পোষণ করা হয় যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّهُ لَيَغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ.

-আমার অন্তর পর্দা আবৃত হয়ে যায়, তাই আমি প্রতিদিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে একশ' বার ইস্তিগফার করি।^৩

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে,

فِي الْيَوْمِ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً.

-আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট সত্তরবারের অধিক ইস্তিগফার করি।^৪

^১ আল কুরআন : সূরা ক্বলাম, ৬৮:৪৮।

^২ আল কুরআন : সূরা ক্বলাম, ৬৮:৫০।

^৩ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ২৭০২।

খ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফীল ইসতিগফার, ৪:৩১১, হাদিস নং : ১২৯৪।

গ) তাবরী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু সালাম, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৭২, হাদিস নং : ৪৯৪৪।

^৪ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ইসতিগফারিন্ নবী, ১৯:৩৬৫, হাদিস নং : ৫৮৩২।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৬:২, হাদিস নং : ৭৪৬১।

গ) তাবরী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ইসতিগফার ওয়াত্ তাওবা, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৩, হাদিস : ২৩।

সাবধান! এ বিষয়ে এই ধারণা করা যাবে না যে, আল্লাহ না করুন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ক্বালবে সন্দেহ-সংশয় ও কুমন্ত্রণার উদ্বেক হতো। বরং এখানে পর্দাবৃত হওয়ার অর্থ হলো, ওই অবস্থা যা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ক্বালবের উপর আকস্মিকভাবে ছড়িয়ে পড়তো। ফলে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হৃদয়কে পর্দাবৃত করে ফেলতো।

হযরত আবু উবায়দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে বলেন, এ পর্দা الْفَيْنُ মূলতঃ মেঘমালার মতো ছিলো। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বলেছেন, (الْفَيْنُ) যা ক্বলবকে আবৃতকারী পর্দাকে বলা হয়। কিন্তু এটা পবিত্র হৃদয়কে পূর্ণাঙ্গরূপে আবৃত করতে পারতো না। যেমন হালকা মেঘ যা বাতাসে ভাসতে থাকে। কিন্তু সূর্যের আলোকে বাধা দিতে পারে না। আর হাদীস দ্বারা এ কথা বুঝে আসে না যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হৃদয়কে দৈনিক একশ' বা সত্তরের অধিক বার পর্দা এসে যেতো। কারণ হাদীসের শব্দ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়নি। আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে একশ' বার ইস্তিগফার পাঠ করার কথা বলেছেন, তা পর্দা আবৃত হওয়ার কারণে নয়। এখানে পর্দা আবৃত হওয়ার অর্থ হলো ওই উদাসীনতা যা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, মুবারক ক্বলবে সৃষ্টি হতো। অনুরূপভাবে নফস কখনো কখনো অলস হয়ে পড়তো। মাঝে মাঝে সত্য প্রত্যক্ষ করতে আর আল্লাহর স্মরণে ভুল হয়ে যেতো। কারণ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো মানবীয় কষ্ট প্রত্যক্ষ করতেন। তাঁকে উম্মাতের ভালো-মন্দ দেখাশুনা করতে হতো। পরিবার পরিজনের খোঁজখবর নিতে হতো। বন্ধু আর শত্রুর সাথে মেলামেশা করা মানবীয় আত্মার চাহিদা, আর রিসালাতের দায়িত্ব বহন করা, আমানতের দায়িত্ব পালন করা, এ সব কাজ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এভাবে তিনি সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তবুও যেহেতু তিনি মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন আর মারিফাতের দিক থেকে তিনি ছিলেন কামিল। সেহেতু যখন তাঁর মুবারক হৃদয় সকল প্রকার ধ্যান-ধারণা স্বীয় রবের প্রতি নিবদ্ধ হতো। আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সববিষয় আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন হতেন তখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ অবস্থার মুকাবিলায় অনেক সম্মুত হতো। যখন তিনি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের সাথে স্বীয় নবুওয়াত আর রিসালাতের ফরয দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতায় ব্যাপ্ত হতেন, ওই সময় যখন তিনি স্বীয় অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি মনোযোগী হতেন তখন দেখলে মনে হতো যে, তিনি যেনো উঁচু স্থান থেকে

সামান্য নীচে অবতরণ করে আসছেন। এ কারণে হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিগফার পাঠ করতেন। হাদীসের এ অর্থ আমি উল্লেখ করেছি তা অন্যান্য অর্থ থেকে উত্তম ও অত্যধিক প্রসিদ্ধ হয়েছে অধিকাংশ আলেমগণ এ অর্থের সমর্থক। তবে অনেকই তুলনামূলক উত্তম অর্থের চতুষ্পার্শ্বে পরিক্রম করে, আর আমরা ওই সূক্ষ্ম অর্থের নিকট পৌঁছে গেছি। উপকারার্থে মৌলিক অর্থের স্বরূপ উন্মোচন করেছি, আর তাদের সেই অর্থের ভিত্তি ওই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, তাবলীগ আর শরীয়াতের আহকাম বর্ণনা ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় ক্লান্তি, অবসাদ ও বিস্মরণ সম্ভবপর ও জায়িয়। যার বিশদ বর্ণনা অচিরেই করা হবে।

সত্যপন্থী আলেম, সুফিসাধকের বক্তব্য হলো যে, হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওইসব বিষয় থেকে পবিত্র ছিলেন যে, তাঁর উপর অলসতা অবতারণিত হতো, তাঁর ভুল-ভ্রান্তি হতো, উম্মাতের চিন্তা তাঁকে গ্রাস করতো এমনটি নয়, বরং উম্মাতের প্রতি দয়াদ্রু হয়ে ইস্তিগফার পাঠ করতেন।

কেউ কেউ বলেন, পর্দার মর্মার্থ হলো এই যে, আন্তরিক প্রশান্তি, যা সর্বদা হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আচ্ছাদিত করে রাখতো। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ .

-আর আল্লাহ তা'আলা আপন প্রশান্তি স্বীয় রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন।^১

প্রশান্তি অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন বান্দাসুলভ মুখাপেক্ষিতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ইস্তিগফার পাঠ করতেন।

হযরত ইবনে আতা রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতকে শিক্ষাদানের জন্য ইস্তিগফার পাঠ করতেন। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিলো যাতে উম্মাতও এভাবে ইস্তিগফার পাঠ করে।

অপর একদল আলেমের অভিমত হলো, হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিগফার পাঠ করতেন, যাতে একথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ রাসূল হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ তা'আলাকে বেশী ভয় করছেন। আর তিনি নিজেকে নির্ভীক ও নিরাপদ মনে করছেন না।

^১ আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৪০।

এটাও হতে পারে যে, তাঁর মুবারক কালবের উপর যে পর্দা আসতো তা আল্লাহ তা'আলার ভীতি ও তাঁর আয়মতের পর্দা ছিলো। যা তাঁর পবিত্র হৃদয়কে আচ্ছাদিত করে নিতো। আর তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। আর স্বীয় বান্দাসুলভ বিনয় প্রকাশ করতেন। যেমন- তিনি ইরশাদ করেন,

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

-আমি কী আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবো না?^২

ঐ হাদীস এই অর্থে ধর্তব্য হবে, যা অন্য সূত্রে হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'আমার অন্তর দৈনিক সত্তর বারের অধিক পর্দায় আচ্ছাদিত হয়ে যায়। আর আমি আল্লাহ তা'আলার দরবার ইস্তিগফার করি।' যদি এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, তাহলে এ আয়াতের অর্থ কী হবে?

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

-আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে হিদায়াতের উপর একত্রিত করতেন। সুতরাং, হে শ্রোতা! তুমি কখনো মূর্খ হয়ো না।^৩

আর আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামকে একথা ইরশাদ করা যে-

فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ

الْجَاهِلِينَ .

-তুমি আমার নিকট ঐ কথা বলোনা, যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যেনো অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।^৪

স্মরণ রাখুন! যে, ওইসব লোকদের কথায় মনযোগী হওয়া চলবেনা যারা হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে উক্ত আয়াতের ধারাবাহিকতায় বলে যে, আপনি ঐ সমস্ত লোকদের মতো হবেন না যারা মূর্খ হয়েছে যে, যদি আল্লাহ

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কিয়ামুন নবী, ৪:২৯২, হাদিস নং : ১০৬২।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ইকসারিল আমল ওয়াল ইজতিহাদ, ১৩:৪৪০, হাদিস নং : ৫০৪৪।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফীল ইজতিহাদ, ২:১৮৭, হাদিস নং : ৩৭৭।

^২ আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৩৫।

^৩ আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১:৪৬।

তা'আলা ইচ্ছা করেন তাহলে তাদেরকে হিদায়াতের উপর সমবেত করবেন। আর হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার এরূপ ইরশাদ করা যে, আপনি ঐ সমস্ত লোকদের মতো হবেন না। যারা এ সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েছেন।

وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ

-আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সঠিক।^১

কারণ এর দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হবে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহের মধ্যে এক সিফাত জ্ঞানতেন না। হযরত আদীয়া কেরামের সম্পর্কে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা করা না জাযিয়। উক্ত আয়াতসমূহের উদ্দেশ্যে হলো, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামকে উপদেশ দেওয়া যে, “...পনারা আপনাদের কাজে কস্মিনকালেও ওইসব জাহিলদের রীতিনীতির অনুসারী হবেন না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, اِنِّيْ اَعْطٰكَ” “আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি।”^২ আর উক্ত আয়াতসমূহে একবার বেনো প্রমাণ নেই যে, ওই মহান নবীগণের মধ্যে ওইগুণ (মুর্খতা) ছিল, যার কারণে তাঁদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। আর এটা কীভাবে হতে পারে। কারণ নূহ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে-

فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ .

-তুমি আমার নিকট ঐ কথা বলোনা যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই।^৩

সুতরাং এ অবস্থায় উত্তম হলো যে, আয়াতের পূর্ববর্তী অংশকে পরবর্তী অংশের জন্য ধর্তব্য করে নেয়া। কারণ এরূপ অবস্থাসমূহে অনুমতি জরুরী।

আর প্রথমে এ বিষয় প্রশ্ন করা জাযিয় হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যে বিষয় অদৃশ্য রাখার ইচ্ছা করেছেন; যেমন, হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তা'আলার নিকট এ বিষয়ে আবেদন করেছেন তখন তাঁকে নিষেধ করে দেওয়া হয়, এ কারণে তাঁর পুত্র ধ্বংস হয়েছে।^৪ এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামকে তা জানিয়ে ইরশাদ করেছেন-

^১ আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১:৪৫।

^২ আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১:৪৬।

^৩ আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১:৪৬।

^৪ মূলত হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর পুত্র কাম্বির ছিলো। সে তার কুফুরী অন্তরে লুকিয়ে রাখে। তার কুফুরী কথা হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম জানতেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা জ্ঞাত

اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .

-হে নূহ! সে তোমার পরিবারভূক্ত নয়। নিঃসন্দেহে তার কর্ম বড়ই অনুপযুক্ত।^১

হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর উপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করে দেন। আল্লামা মক্কী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

অনুরূপ আমাদের নবী হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যান্য আয়াতে তাঁর সম্প্রদায়ের বৈরীতার কারণে ধৈর্যধারণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে যে, তাদের বিরোধিতার কারণে আপনি অধৈর্য হবেন না। কারণ যদি আপনি এরূপ করেন তাহলে হতাশার কারণে আপনার অবস্থা অজ্ঞ লোকদের অবস্থার মতো হয়ে যাবে। হযরত আবু বকর ইবনে ফাওরাক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কোনো কোনো আলেম বলেন, আল্লাহর তা'আলার উক্তি “মুর্খদের অন্তর্ভুক্ত হইলোনা”- এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীকে সম্বোধন করা হয়েছে। আবু মুহাম্মদ মক্কী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এই অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেছেন, পবিত্র কুরআন মজীদে এরূপ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে, যাতে সম্বোধন করা হয়েছে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে মুসলিম উম্মাহকে।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সম্মানিত নবীগণের ফযীলত আলোচনার পর একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সম্মানিত নবীগণ আলাইহিস্ সালাম নবুওয়াত লাভের পর মা'সূম বা নিষ্পাপ ছিলেন।

যদি তোমরা আপত্তি উত্থাপন করো যে, যখন একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সম্মানিত নবীগণ নিষ্পাপ ছিলেন, আর তাঁদের দ্বারা অপছন্দনীয় কোনো কথা প্রকাশিত হতে পারে না, তাহলে কিভাবে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তির কথা শুনিয়েছেন? আর তাঁকে কেনো একথা বলা হয়েছে যে, যদি আপনি এরূপ কাজ করেন বা অমুক কাজ

ছিলেন। এ কারণে হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম বারবার তার পুত্রকে নৌকায় আরোহন করতে বলার পরও সে নৌকায় আরোহন করেনি। আল্লাহ তা'আলা জানতেন সে ভুবে মরবে। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর ধারণা ছিলো যে আমার পুত্র মুমিন। তাই তিনি তার নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন করেন। আল্লাহ তাকে আবেদন করতে নিষেধ করেন।

^১ আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১:৪৬।

থেকে নিজকে বিরত না রাখেন, তাহলে অবস্থা এমন হবে? যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ .

-হে শ্রোতা! যদি তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করো, তবে অবশ্যই তোমার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতির মধ্যে থাকবে।^১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَاً مِنَ الظَّالِمِينَ .

-আর আল্লাহ ব্যতীত সেটার বন্দেগী করোনা, যা না তোমার উপকার করতে পারে, না অপকার। অতঃপর, যদি এমন করো তখন তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।^২

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ تَرَكْنَا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٠﴾
إِذَا لَادَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ

عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧١﴾

-আর যদি আমি আপনাকে অবিচলিত না রাখতাম, তবে এ কথা নিকটবর্তী ছিল যে, আপনি তাদের প্রতি সামান্য কিছু ঝুঁকে পড়তেন। আর এমন হলে আমি আপনাকে দ্বিগুণ বয়স এবং দ্বিগুণ মৃত্যু এর স্বাদ প্রদান করতাম। অতঃপর আপনি আমার বিরুদ্ধে আপন কোন সাহায্যকারী পেতেন না।^৩

অপর এক আয়াতের ইরশাদ করা হয়েছে-

لَا خِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٧٢﴾

^১. আল কুরআন : সূরা যুমার, ৩৯:৬৫।
^২. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০:১০৬।
^৩. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৭৪-৭৫।

আশ-শিফা [২য় খণ্ড]

(২৩৩)

-তবে অবশ্যই আমি তাঁর নিকট থেকে সজোরে বদলা নিতাম।^১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .

-এবং হে শ্রোতা! দুনিয়ার মধ্যে অধিকাংশ লোক এমনই রয়েছে যে, যদি আপনি তাদের কথা মতো চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে।^২

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ .

-আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনার উপর আপন রহমত ও হিফাযতের মোহরাঙ্কন করে দিতেন।^৩

অপর এক আয়াতের ইরশাদ করা হয়েছে-

وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ .

-আর যদি এমন না হয় তবে আপনি তাঁর কোন সংবাদই পৌছান নি।^৪

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

أَتَى اللَّهَ وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .

-আল্লাহর এভাবেই ভয় রাখুন! এবং কাফির ও মুনাফিকদের কথা শুনবেন না।^৫

আপত্তিসমূহের জবাব

স্মরণ করুন! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ও আমাদেরকে বুঝার সামর্থ্য দান করুন যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এটা কন্মিনকালেও সম্ভব হতে পারে না যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালাত প্রচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত করেছেন, কিংবা তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত

^১. আল কুরআন : সূরা হাক্কাহ, ৬৯:৪৫।
^২. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:১১৬।
^৩. আল কুরআন : সূরা শূরা, ৪২:২৪।
^৪. আল কুরআন : সূরা মায়দা, ৫:৬৭।
^৫. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:১।

করেছেন, এমন কথা বলেছেন যা আল্লাহর শানের উপযুক্ত নয় কিংবা, মানহানিকর, কিংবা নিজে পথভ্রষ্ট হয়েছেন, কিংবা কাফেরদের অনুসরণ করেছেন, কিংবা আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তরে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন- এর কোনটিই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তায় প্রযোজ্য হতে পারেনা। উক্ত আয়াতসমূহে এ ধরনের যা কিছু বলা হয়েছে এর উদ্দেশ্য হলো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন প্রচারের কাজ সহজতর করে দেওয়া যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীন প্রচারের যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তিনি তা তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী গ্রহণ করেননি। বরং এটাও আল্লাহ তা'আলার আদেশের আওতাধীন। সুতরাং আপনি যদি আল্লাহ তায়ালা অনুসৃত পদ্ধতি গ্রহণ না করেন, তাহলে এর মর্মার্থ হবে যে, যেন আপনি রিসালাতের প্রচারই করেননি। এ কারণে আল্লাহ তা'আলার আপনার অন্তরকে খুশি করে এ কথা ইরশাদ করে শক্তি বৃদ্ধি করেছেন-

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .

-আর আল্লাহ আপনাকে লোকজনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন।^১

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমুস সালামকে ইরশাদ করেছেন-

لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا .

-তোমরা উভয় ভীত হয়োনা, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে রয়েছি।^২

এরূপ বলার উদ্দেশ্য হলো যে, এতে আল্লাহ তা'আলার দীন প্রচারে তাঁদের অন্তর শক্তিশালী হবে এবং তাদের অন্তর থেকে শত্রুর ভয়ভীতি দূর হয়ে যাবে, যা নফসকে দুর্বল করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿١﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ

﴿٢﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٣﴾

-আর যদি তিনি আমার নামে একটা কথাও বানিয়ে বলতেন, তবে অবশ্যই আমি তাঁর নিকট থেকে সজোরে বদলা নিতাম, অতঃপর তাঁর হৃদয়-শিরা কেটে দিতাম।^৩

^১ আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫:৬৭।

^২ আল কুরআন : সূরা ছোয়া-হা, ২০:৪৬।

আল্লাহ তা'আলার বাণী-

إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ .

-এবং এমনই হলে আমি আপনাকে দ্বিগুণ বয়স এবং দ্বিগুণ মৃত্যু এর স্বাদ প্রদান করতাম।^১

উক্ত আয়াতসমূহের ভাবার্থ হলো, এ ধরনের শাস্তি ওইসব লোকদের দেওয়া হবে, যারা এরূপ কাজ করবে। যদি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ওইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতেন তাহলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাই করা হতো। কিন্তু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কস্মিনকালেও এরূপ করতেন না। উক্ত আয়াতসমূহের অর্থ হলো এটাই। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .

-যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকদের কথা মান্য করেন, তাহলে ওইসব লোক আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে।^২

উক্ত আয়াতে যদিও বাহ্যিকভাবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, তবুও এর অর্থ হলো তিনি ছাড়া অন্যরা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا

خَسِرِينَ .

-যদি তোমরা কাফেরদের কথা মতো চলো, তবে তারা তোমাদেরকে উল্টো পায়ে ফিরিয়ে দেবে, অতঃপর (তোমরা) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবে।^৩ অপর এক আয়াতে কারীমা-

فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخَيِّمَ عَلَىٰ قَلْبِكَ .

^১ আল কুরআন : সূরা হাক্বাহ, ৬৯:৪৪-৪৬।

^২ আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৭৫।

^৩ আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:১১৬।

^৪ আল কুরআন : সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৪৯।

-যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে আপনার (হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে দিতেন।^১

আরো ইরশাদ করেন,

لَيْنَ أَشْرَكَتَ لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ .

-আর যদি তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করো, তবে অবশ্যই তোমার কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে।^২

এখানেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্যান্য লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে শিরকের ধারণা করাও বৈধ নয়। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী-

أَتَقِي اللَّهَ وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ .

-আল্লাহকে ভয় করুন, আর কাফিরদের আনুগত্য করবেন না।^৩

এর উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কাফিরদের আনুগত্য করেছেন। উক্ত আয়াতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যা নিষেধ করা হচ্ছে তাহা আল্লাহ তা'আলার হুকুম যে, অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যা ইচ্ছা নির্দেশ দেন, যা থেকে ইচ্ছা বারণ করেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

وَجْهَهُ^৪ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ

عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

-এবং বিতাড়িত করবে না তাদেরকে, যারা আপন প্রভুকে ডাকে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায়, তাঁর সম্ভ্রটি চায়। আপনার উপর তাদের হিসাব-নিকাশের কিছুই নেই এবং তাদের উপরও আপনার হিসাবের কিছুই নেই। অতঃপর তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করলে এই কাজ ন্যায়-বিচার বহির্ভূত হবে।^৪

^১. আল কুরআন : সূরা সূরা, ৪২:২৪।

^২. আল কুরআন : আল যুমার, ৩৯:৬৫।

^৩. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:১।

^৪. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৫২।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভরসনা করতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনিকালে না কাউকে ভরসনা করেছেন, আর না তিনি ন্যায়-বিচার বহির্ভূত কোন আচরণ করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

فِي عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ

নবুওয়াতের পূর্বে সম্মানিত নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া প্রসঙ্গে

সম্মানিত নবীগণ নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেও নিষ্পাপ ছিলেন। তবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আর বিগত অভিমত হলো, সম্মানিত নবীগণ তাঁদের নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার সন্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতা বা সন্দেহ পোষণ করা থেকে পবিত্র ছিলেন, এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা বিদ্যমান পাওয়া যায়। যাতে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁরা জন্ম থেকে ওইসব দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁদের লালন-পালন হয়েছে ঈমান ও তাওহীদের গণ্ডিতে। বরং যদি একথা বলা হয়, তাও অতিরঞ্জিত হবে না যে, তাঁদের লালন পালন আল্লাহ তা'আলার মারিফাতের জ্যোতি ও সৌভাগ্যের হাতছানিতে হয়েছে। আমি এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাঠে এ বিষয় উল্লেখ করেছি যে, কোনো হাদীসবিশারদ এরূপ কোনো বর্ণনা করেননি যে, যিনি নবী হয়েছেন কিংবা আল্লাহ তা'আলা যাকে মনোনীত করেছেন, তিনি কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়েছেন। এমন বক্তব্যের ভিত্তি তো নকল দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর কোনো কোনো সত্যপন্থি আলেমগণ আকলী এ দলিল পেশ করেন, যে লোকের সম্পর্কে কুফরী ও শিরক প্রমাণিত হয়, তার সম্পর্কে মানুষের অন্তরে ঘৃণাবোধ জন্মায়। তাহলে বলুন, সম্মানিত নবীগণের দ্বারা কুফর ও শিরক কীভাবে প্রকাশ পেতে পারে?

এ বিষয়ে আমার (লেখক) অভিমত হলো, মক্কার কুরাইশরা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসংখ্য অপবাদ দিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে উত্থাপন করেছে, কাফিররা স্ব-স্ব যুগে নবীদেরকে তাদের সাধ্যমতো কষ্ট দিয়েছে, মিথ্যা অভিযোগ অভিযুক্ত করেছে। ওইসব বিষয় আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন কিংবা বর্ণনাকারীদের পরম্পরায় আমরা পেয়েছি। আমরা ওই অভিযোগ কোথায় পেয়েছি যে, কাফেরদের অভিযোগের কারণে তাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে দিয়েছে, আর না তাঁদের ব্যাপারে এমন অভিযোগ করেছে যে, তাঁরা ঐ কথা (শিরক-কুফর) ছেড়ে দিয়েছে, যার উপর পূর্বে সকলের সাথে একমত ছিলো। যদি এরূপ অবস্থা হতো (যে, তাঁরা কখনো কুফর ও শিরক করেছেন) তাহলে তারা কখনো এ কথা বলতে ভুল করতো না যে, তাঁরা প্রতিমাগুলোকে মেনে নিয়েছিল, এক্ষেত্রে তাদের অভিযোগের দলিল প্রমাণ আরো জোরালো হতো। আর দলিল আরো বেশী কার্যকর হতো এ কথার তুলনায় যে তোমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিমাসমূহের বিরুদ্ধে কথা বলছো যাদের দীর্ঘদিন থেকে তারা ইবাদত করে আসছে। যদি তারা (কাফির মুশরিকরা)

এরূপ না করে। তাহলে এর মর্মার্থ হবে এই যে, তারা এ কথা বলার অবকাশ পায়নি। যদি তারা এরূপ কথা বলতো তাহলে অবশ্যই কোনো না কোনো স্থানে তাদের এই ধরনের আপত্তি উল্লেখ করা হতো। আর তারা কখনো এভাবে নীরবতা অবলম্বন করতো না। কারণ কিবলা পরিবর্তনের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তারা চুপ করে বসে থাকেনি বরং তারা বলে ফেলেছে যে,

مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا

-কে ফিরিয়ে দিয়েছে মুসলমানদেরকে তাদের সেই কিবলা থেকে, যার উপর তাঁরা ছিলো।^১ যেমনটি আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন।

সম্মানিত নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে কাযী কুশাইরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আল্লাহ তা'আলার এ বাণীকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। যাতে ইরশাদ হয়েছে -

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٧﴾

-এবং হে মাহবুব! স্মরণ করুন, যখন আমি নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি এবং আপনার নিকট থেকে আর নূহ, ইবরাহীম, মুসা ও মরিয়ম-তনয় ঈসার নিকট থেকে। আমি তাঁদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি।^২

আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ

وَحِكْمَةٍ تَرْتَأَمُونَ عَلَيْكُمْ رُسُلًا مُّصَدِّقِينَ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ

وَلَتَنْصُرُنَّهُ

-এবং স্মরণ! যখন আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে তাঁদের অঙ্গীকার নিয়ে ছিলেন, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো,

^১ আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৪২।

^২ আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৭।

অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট সম্মানিত রাসূল, যিনি তোমাদের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁকে সাহায্য করবে।^১

কাযী কুশাইরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই অঙ্গীকার গ্রহণ করার মাধ্যমে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র করেছেন। এ কথা বলা ভুল হবে না যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। অতঃপর তাঁর জন্মের বহু দিন পূর্বে তাঁর উপর ঈমান আনার ও তাঁকে সাহায্য করার বিষয় সম্মানিত নবীগণের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা শিরক ও অন্য কোনো গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়েছে এমন কথা বলা নাস্তিক ব্যতীত অন্য কেউ বৈধ মনে করে না।^২

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এটা জাযিয় হতেই পারে না। কারণ এ কথা বিস্তুত সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাল্যকালেই আগমন করে তাঁর বক্ষবিদীর্ণ করেছেন এবং তা থেকে এক খণ্ড মাংসপিণ্ড বের করে বললেন, এটা শয়তানের অংশ আপনার দেহ মোবারকে ছিলো। তাঁর পবিত্র কুলবকে ধৌত করে তা ঈমান ও হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন, যেমনটি পূর্বের হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

^১. আল কুরআন : সূরা আলে-ইমরান, ৩:৮১।

^২. কাযী কুশাইরী রাযিয়াল্লাহু আনহু দলিলের সারমর্ম হলো এই যে, একথা পবিত্র কুরআন মজীদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত নবীগণের নিকট থেকে রূহের জগতে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। তাঁরা যখন দুনিয়াতে আগমন করবেন তখন তাওহীদের এই দৃষ্টান্ত স্ব-স্ব উম্মাতের সামনে পেশ করবেন। এটা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে পূর্ণতা পাবে। তার পর তাঁরা তাদের ওফাতের পূর্বে স্ব-স্ব উত্তরাধিকারীদের ওসীয়াত করেন, যদি তোমাদের সময় খাতামুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়, তাহলে তোমরা তাঁর সত্যায়ন করবে, তাঁকে সাহায্য করবে। সকল নবীগণ আলাইহিমুস সালাম থেকে আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। অতঃপর তারা যখন তাদের নির্ধারিত সময়ে পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন তারা সকলে স্ব-স্ব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। এর দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবীগণ আলাইহিমুস সালাম গুনাহ থেকে নিষ্পাপ ও শিরক থেকে পবিত্র ছিলেন। কারণ এ কথা আদৌ সম্ভব নয় যে, সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস সালাম থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার পর তাঁরা শিরক বা গুনাহের কাজে লিপ্ত হবেন। একথা যদি অসম্ভব হয় তাহলে যার সত্যায়ন ও সাহায্যের জন্য রূহের জগতে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) তিনি কীভাবে শিরকে লিপ্ত বা গুনাহের কাজ করতে পারেন? সুতরাং সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস সালাম ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরক ও গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়েছেন, এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি একমাত্র নাস্তিক ও পথভ্রষ্ট লোকদের পক্ষে বলা সম্ভব, অন্যথায় অন্য কোনো লোকের পক্ষে এ ধরনের উক্তি করা আদৌ সম্ভব নয়।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর চাঁদ, সূর্য ও নক্ষত্রকে “هَذَا رَبِّي” এটা আমার রব”^১ বলার ঘটনা দ্বারা সম্মানিত নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ না করা চাই। কারণ ওই ঘটনা তাঁর বাল্যকালে সংঘটিত হয়েছে, এখানে তাঁর বাল্যকালীন অবস্থার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ওই বয়সে শরীয়াতের অনুবর্তী হননি। (তাই এ কাজকে তাঁর সাথে কী করে সম্পৃক্ত করা যায়?)

খ্যাতনামা তাফসীরবেস্তা ও আলেমগণ বলেন, “হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম চন্দ্র ও সূর্যকে যে, প্রভু বলে অভিহিত করেছেন, তা তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে হতবাক করার উদ্দেশ্যে বলেছেন, তাদের উপর দলিল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বলেছেন। এর অর্থ এমন হবে না যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম স্বয়ং এরূপ বিশ্বাস করেছেন।

কোনো কোনো আলেম বলেন, এর মর্মার্থ হলো বিস্ময় প্রকাশ করে নিজের উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যে, অন্তর্মিত হয়ে যাওয়া আসমানী নিদর্শনাবলী কী আমার প্রভু হতে পারে? (তা অসম্ভব)

হযরত যুজাজ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর উক্তি “هَذَا رَبِّي”-এই আমার প্রভু বলা।^২ এটা তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরই বক্তব্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, “أَيْنَ شُرَكَائِي”-কোথায় আমার অংশীদাররা।^৩ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফেররা এমনটি বলবে।

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তিনি কখনো অন্য কারো ইবাদত করেননি এবং এক মুহূর্তের জন্য শিরকে লিপ্ত হননি। তাঁর ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যা তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٦٧﴾

-যখন সে আপন পিতা ও আপন সম্প্রদায়কে বললো, তোমরা কিসের উপাসনা করছো?^৪

^১. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬/৭৬।

^২. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬/৭৬।

^৩. আল কুরআন : সূরা আন নাহল, ১৬/২৭।

^৪. আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ২৬/৭০।

এরপর ইরশাদ করেছেন-

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٦﴾ أَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ

الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٧﴾ فَلَيْسَ لَهُمْ عُدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٨﴾

-বললেন, তোমরা কি দেখছো এগুলোকে, যেগুলোর উপাসনা করছো- তোমরা ও তোমাদের পূর্বকার পিতৃপুরুষেরা, নিশ্চয় তারা সবই আমার শত্রু, জগতসমূহের প্রভু ব্যতীত।^১

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٧٩﴾

-যখন আপন প্রভুর নিকট উপস্থিত হলো অন্যান্যদের থেকে মুক্ত হৃদয় নিয়ে।^২ অর্থাৎ- তাঁর অন্তর শিরক থেকে মুক্ত ছিলো।

অপর এক আয়াতের ইরশাদ করা হয়েছে-

وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٨٠﴾

-এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে প্রতিমাসমূহের পূজা থেকে দূরে রাখো।^৩

যদি কেউ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের এ কথায় দ্বিমত প্রকাশ করে, তাহলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের একথার অর্থ কী হবে?

لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٨١﴾

-যদি না আমাকে আমার রব সৎপথ প্রদর্শন করতেন, তবে আমিও সেই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।^৪

উহার উত্তর হলো এই যে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে সাহায্য না করতেন, তাহলে আমিও তোমাদের মতো পথভ্রষ্টতা ও প্রতিমা পূজায় ব্যাপৃত থাকতাম। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন ও

^১. আল কুরআন : সূরা ৩'আরা, ২৬:৭৫-৭৭।

^২. আল কুরআন : সূরা সাফাত, ৩৭:৮৪।

^৩. আল কুরআন : সূরা ইব্রাহীম, ১৪:৩৫।

^৪. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৭৭।

আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন করে একথা বলেছেন। নচেৎ তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে পথভ্রষ্টতা মুক্ত ও নিষ্পাপ ছিলেন।^১

যদি কেউ বলে যে, তাহলে এ আয়াতের অর্থ কী হবে?

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ ﴿٨٢﴾

-এবং কাফিরগণ তাদের রাসূলগণকে বললো, আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবো। অথবা তোমরা আমাদের দ্বীনের প্রতি ফিরে এসো।^২

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের এ অভিমত নকল করেছেন-

قَدْ أَفْرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا

اللَّهُ مِنْهَا ۚ ﴿٨٣﴾

-অবশ্যই আমরা তো আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবো যদি তোমাদের দ্বীনে এসে যাই এরপর যে, আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।^৩

উক্ত আয়াতে বর্ণিত প্রত্যাবর্তন শব্দের সন্দেহপূর্ণ অর্থ গ্রহণ না করা চাই। কারণ উক্ত আয়াতে বাহ্যিকভাবে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আশিয়ায়ে কেরাম অন্যান্যদের মতো স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের আদর্শভূক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে তা নয়। কারণ الْفُؤُদ শব্দটি প্রত্যাবর্তন করা ছাড়াও ভিন্নার্থে ব্যবহারের রীতি আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। এর অর্থ হলো- ঐ অবস্থার প্রতি ফিরে আসা যা পূর্বে ছিলো না। যথা হাদীস শরীফে জাহান্নামিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, عَادُوا حُمَا -তারা

^১. কুরআন মজীদে ঐ আয়াত সমূহের দ্বারা প্রমাণ হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর কালব শিরকের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ছিলো। আর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর বংশধর যারা নবুওয়াত লাভ করেছেন। তাঁদের সবাইকে শিরকের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রেখেছেন।

^২. আল কুরআন : সূরা ইব্রাহীম, ১৪:১৩।

^৩. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:৮৯।

অঙ্গার হওয়ার অবস্থায় ফিরে যাবে। অথচ তারা জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে অঙ্গার ছিলো না। জনৈক কবি তাঁর কবিতায় বলেছেন,

نَلَكَ الْمَكَارِمَ لَا قُعْبَانُ مِنْ لَبَنٍ شَيْبًا بِهَاءٍ فَعَادًا بَعْدُ أَبْوَالًا.

-আপনার উত্তম চরিত্র দুধের ঐ পাত্র সদৃশ নয় যাতে পানি ভর্তি করা হয়েছে, আর তা পেশাবে পরিণত হয়ে গেছে।

উক্ত কবিতায় (الْفَوْدُ) প্রত্যাভর্তন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ দুধ প্রথমে পেশাব ছিলো না।

যদি তোমার এ আয়াত উল্লেখ করে বলা-

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

-এবং আপনাকে ضَالًّا (স্বীয় প্রেমে আত্মহারা) পেয়েছেন। তখন নিজের দিকে পথ দেখিয়েছেন।^১

উক্ত আয়াতে ضَالًّا এর অর্থ কী হবে?

এর জবাব হলো যে, উক্ত আয়াতে বর্ণিত ضَالًّا এর অর্থ ওই পথভ্রষ্টতা নয়, যা কুফর। কোনো কোনো আলেমের মতে এর অর্থ হলো, হযুর সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওই পথ দেখিয়ে দেন। এটা আল্লামাতাবারী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ অভিমত।

কোনো কোনো আলেম বলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পথভ্রষ্ট গোষ্ঠীর মাঝে পেয়েছেন অতঃপর সেখান থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন, আর ঈমান ও সত্যপথের দিশাদান করেছেন। হযরত সুদী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমুখ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কোনো কোনো আলেম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শরীয়াতের আহকাম সম্পর্কে অনবিহিত পেয়েছেন। অতঃপর তাঁকে শরীয়াতের বিধান সম্পর্কে অবিহিত করেন।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত ضَالًّا শব্দটি কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণে হযুর সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় ঐ বস্ত্র লাভের প্রত্যাশী ছিলেন যেটা তাঁর প্রভুর দিকে তাঁকে পথ প্রদর্শন করবে, আর তিনি শরীয়াতের বিধান পালনকারী হয়ে যাবেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইসলামের দিশা দান করেন। ইমাম কুশাইরী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ অভিমত বর্ণনা করেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, তিনি তখন পর্যন্ত সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেননি, যে সত্য নিয়ে তাঁকে প্রেরণ করা হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের দিকে পথ দেখিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ.

-আর আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু আপনি জানতেন না।^১ হযরত আলী বিন ঈসা রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ অভিমতের সমর্থক।

হযরত ইবনে আব্বাস রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, ضَالًّا مَغْصِيَّةٌ, হযরত ইবনে আব্বাস রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, এটা হযুর সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গুনাহের দ্বালালত ছিলো না।

কোনো কোনো আলেম বলেন, উক্ত আয়াতে বর্ণিত هَدَىٰ (পথ দেখিয়েছেন) এর মর্মার্থ হলো- আল্লাহ তা'আলা দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে হযুর সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে দেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, স্থায়ী বাসস্থান নির্ধারণে মক্কা ও মদীনা নগরী নিয়ে তিনি দ্বিধায় ছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পবিত্র মদীনা নগরীর দিকে পথ নির্দেশ করেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ উক্ত আয়াতের এ অর্থ করেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পেয়েছেন, অতঃপর আপনার মাধ্যমে পথভ্রষ্টদের হেদায়ত দান করেছেন।

হযরত জা'ফর বিন মুহাম্মদ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, وَوَجَدَكَ ضَالًّا আয়াতটির অর্থ হলো, অনাদিকাল থেকে আপনার প্রতি আমার ভালবাসা যা আপনার জানা ছিলনা, তা আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি।

^১. আল কুরআন : সূরা যোয়া-হা, ৯৩:৭।

^১. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১১৩।

হযরত হাসান বিন আলী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى এর অর্থ হলো এরকম যে, আপনার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট লোকেরা হেদায়ত লাভ করেছে।

হযরত ইবনে আতা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, وَوَجَدَكَ ضَالًّا এর মর্মার্থ হলো যে, আপনি আমার ভালবাসায় বিভোর ছিলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পথ দেখিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ.

-আল্লাহর শপথ! আপনি আপনার ঐ পুরানো পুত্রস্নেহের মধ্যে বিভোর রয়েছেন।^১

উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'ضَالًّا' অর্থ এ নয় যে, তিনি দীন সম্পর্কে পথভ্রষ্ট ছিলেন। কারণ যদি কোন শ্রেণি নবীর ব্যাপারে এরূপ বলে যে, তিনি কুফরীর গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলেন, তবে তারা কাকের হয়ে যাবে।

অনুরূপ এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّا لَنَرَنَّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .

-নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখেছি।^২ অর্থাৎ সুগভীর ভালবাসায়।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'ضَالًّا' এর অর্থ 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা' অর্থাৎ যে ওহী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে, তা বর্ণনা করার ব্যাপারে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বর্ণনা করার পথ নির্দেশ করেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

^১. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:৯৫।

^২. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:৬০।

-হে মাহবুব! আমি আপনার প্রতি এ 'স্মৃতি' অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি লোকদের নিকট বর্ণনা করেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।^১

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন-ضَالًّا শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এমন অবস্থায় পেয়েছেন যে, কেউ আপনার নবুওয়াত সম্পর্কে জানতো না তখন আল্লাহ তা'আলা সে বিষয় প্রকাশ করে দেন। আর আপনার মাধ্যমে সৌভাগ্যবান লোকদের হেদায়ত দান করেন। কাযী আয়াজ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু (লেখক) বলেন,

وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ مِنَ الْمُفْسِّرِينَ فِيهَا: ضَالًّا عَنِ الْإِيمَانِ.

-আমি কোনো তাফসীরকারককে 'ضَالًّا' এর অর্থ 'ইমান থেকে বিচ্যুত ছিলেন' এমন করতে দেখিনি।^২

অনুরূপ হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ

-আমি ঐ কাজ করেছি, যখন আমার নিকট পথের (পরিণামের) খবর ছিলো না।^৩

এখানে الضَّالِّينَ এর অর্থ হলো, অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল সংঘটিতকারী। হযরত ইবনে আরাফা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

আল্লামা আযহারী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, الضَّالِّينَ এর অর্থ হলো বিশ্বতদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ অর্থ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى আয়াতেও প্রযোজ্য হবে যে 'ضَالًّا' অর্থ বিশ্বত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করিয়ে দেন।^৪ -অনুরূপ এই আয়াতেও তাই বলা হয়েছে-

^১. আল কুরআন : সূরা নাহল, ১৬/৪৪।

^২. বাল্যকালে একবার আবু তালিব হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জোরপূর্বক তাঁর সাথে মেলায় নিয়ে যায়। এরপর আর কোনো দিন তিনি মুশরিকদের মেলায় যোগদান করেননি।

^৩. আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ২৬/২০।

^৪. উক্ত বর্ণনায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, বাল্যকালেই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিমার প্রতি ঘৃণা ছিলো।

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ .

-যেন একজন ভুলে গেলে সে অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।^১
এমন হলে তবে এ আয়াতের অর্থ কী হবে?

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا
الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ .

-আর আমি আপন নির্দেশে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, এক প্রাণ
সম্ভারক বস্তু। এরপূর্বে না আপনি কিতাব জানতেন, না শরীয়াতের
বিধানাবলীর বিস্তারিত বিবরণ।^২

আল্লামা সমরকন্দি রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযুর সালাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে জানতেন না যে, তিনি
কুরআন পাঠ করবেন। আর এটাও জানতেন না যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টজীবকে
আল্লাহ তা'আলার প্রতি কিভাবে আহ্বান করবেন।

কাযী আবু বকর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এটা ঈমান বিষয়ক তথ্য
ফরযসমূহ আর শরীয়াতের বিধানবলী সম্পর্কিত নয়। হযুর সালাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাওহীদে বিশ্বাসী মু'মিন ছিলেন। এরপর ঐ ফরযসমূহ অবতীর্ণ
হয় যা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বে জানতেন না, এটা অবতীর্ণ
হওয়ার পর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান ও ফরজের দায়বদ্ধ হন।
এটা সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

যদি তোমরা বলো যে, তাহলে নিচের আয়াতের মর্মার্থ কী হবে?

وَإِنْ كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ .

-যদিও নিশ্চয় ইতোপূর্বে আপনার নিকট খবর ছিলোনা।^৩

স্মরণ রেখো! উক্ত আয়াতে বিমুখ হয়ে থাকা লোকদের কথা বলা হয়েছে। যেমন,
এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ .

^১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/২৮২।

^২. আল কুরআন : সূরা শূরা, ৪২/৫২।

^৩. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:৩।

-আর ঐসব লোক যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে বিমুখ রয়েছে।^১ এর
অর্থ এটা নয়।

বরং আবু আবদুল্লাহ হারবী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এর অর্থ হলো
হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর ঘটনা
সম্পর্কে বে-খবর ছিলেন। কারণ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনা
ওহীর মাধ্যমে অবগত হন।

অনুরূপ হযরত ওসমান বিন আবু সায়েব রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত
জাবির রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম (নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে) মুশরিকদের বৈঠকে যোগদান করতেন। ঐ
সময় তিনি শুনতে পান যে, তাঁর পিছনে দুই ফিরিশতা কথা বলছে। একজন
অপরজনকে বলছে যে, তুমি সামনে অগ্নিস্রব হয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে যাও।
দ্বিতীয়জন বললেন, আমি তাঁর পিছনে দাঁড়াবো কীভাবে? তিনি তো এখন
প্রতিমাদের দিকে যাচ্ছেন। ফেরেশতাদের এমন আলাপচারিতা শ্রবণে হযুর
সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মজলিসে অংশগ্রহণ করেননি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ বর্ণনাকে কঠোরভাবে
অস্বীকার করছেন। আর বলেন, এটি জালহাদীস কিংবা জালহাদীসের সাথে
সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাদীসবিশারদ ইমাম দারেকুতনী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হাদীসটি
বর্ণনার ক্ষেত্রে ওসমানের সন্দেহ রয়েছে, আর সর্বসম্মতিক্রমে এ হাদীস অগ্রাহ্য
হয়েছে, হাদীসের সূত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং এ হাদীস গ্রহণযোগ্য
হতে পারে না। এ ছাড়া অন্যান্য প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা হাদীসসমূহ সম্পূর্ণ এর
বিপরীত। কারণ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

بَغِضْتُ إِلَيَّ الْأَضْنَامُ .

-আমার স্বভাবে প্রতিমার প্রতি ঘৃণাবোধ ছিলো।

অপর এক বর্ণনা যা হযরত আয়মান রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,
হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পিতৃব্য আবু তালিব ও পিতৃব্য
ভ্রাতাগণ একবার মেলায় যোগদানের জন্য বলে ছিলেন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম মেলায় যোগদান করতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তখন তারা তাকে

^১. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০:৭।

মেলায় যোগদানের জন্য জোরারোপ করে। তাই তিনি তাদের সাথে মেলায় যোগদান করেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে তিনি ভীত হয়ে ফিরে আসেন। আর বলেন,
 كُلَّمَا دَنَوْتُ مِنْهَا مِنْ صَنَمٍ تَمَثَّلَ لِي شَخْصٌ أَيْضُ طَوِيلٌ يَصْبِيحُ بِي وَرَاءَكَ
 لَا تَمَسُّهُ. فَمَا شَهِدَ بَعْدُ لَهُمْ عَيْدًا.

-আমি যখনই কোনো প্রতিমার নিকটবর্তী হতাম তখন এক দীর্ঘদেহী সাদা পোশাকধারী ব্যক্তি আমার সামনে এসে চিৎকার করে বলতো, সাবধান! পেছনে সরে যাও, এটাকে স্পর্শ করবে না। এরপর হুয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কখনো মুশরিকদের কোনো উৎসবে যোগদান করেননি।

অনুরূপ বুহাইরা পাদ্রীর ঘটনায় বর্ণিত, হুয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাল্যকালে যখন তাঁর পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে সিরিয়া সফরে যান, তখন তাঁর মধ্যে নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী বিদ্যমান পাওয়া যায়। তাই বুহাইরা তাঁকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে লাত-মানত-উজ্জা প্রতিমার শপথ দিয়ে তাঁর নিকট থেকে কতিপয় কথা জ্ঞানার ইচ্ছে করে। তখন হুয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تَسْأَلْنِي بِهِمَا فَوَاللَّهِ مَا أَبْغَضْتُ شَيْئًا قَطُّ بُغْضُهَا فَقَالَ لَهُ بِحَيْرٍ: فَبِاللَّهِ إِلَّا
 مَا أَخْبَرْتَنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ فَقَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ.

-আপনি আমাকে লাত-উজ্জার শপথ দিয়ে কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ আল্লাহর শপথ, আমার নিকট এ দুটির চেয়ে বড় ঘণ্য আর কিছু নেই। এরপর বুহাইরা হুয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ তা'আলার শপথ দিয়ে বলছি, তখন হুয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এবার আপনার যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন।

এভাবে হুয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ও আল্লাহ প্রদত্ত সামর্থ্যে এ কথা তখন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, তিনি নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে যখন হজ্জে যেতেন, মুশরিকদের প্রবর্তিত হজ্জ বিধান মুয়দালিফাতে অবস্থানের বিরোধিতা করতেন, তখন তিনি আরাফার মাঠে অবস্থানের রীতি প্রচলন করেন। কারণ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আরাফাহর মাঠে অবস্থান করেছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ فِي عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ بِأُمُورِ الدُّنْيَا

পার্শ্ব বিষয়ে আশিয়া আলাইহিমুস সালামের নিষ্পাপ হওয়া প্রসঙ্গে কাযী আবুল ফযল আয়ায রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু (আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাফল্যমণ্ডিত করুন) বলেন, ইতোপূর্বে আমি যা আলোচনা করেছি তাতে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরাত আশিয়ায়ে কেরাম তাওহীদ, ঈমান ও ওহীর বিষয়ে সুদৃঢ় ছিলেন। আর তাঁরা নিষ্পাপও ছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারেও আশিয়ায়ে কেরামের অন্তর ইলম ও ইয়াকীনে পরিপূর্ণ ছিলো। আর জ্ঞান ও প্রত্যয় ছাড়াও ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ের ধারাবাহিকতায় এমন কোনো জিনিস ছিলোনা যা তাঁদের জানা ছিলোনা। আর যে ব্যক্তি হাদীস ও ঐতিহাসিক বিষয় গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করবে সে আমার একথা হাদীসের ভাণ্ডারে পাবে। আমি এ সম্পর্কে এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তবে একথা বলা যায় যে, ওই ইলম ও মারিফতের ধারাবাহিকতায় আশিয়া আলাইহিমুস সালাম এর অবস্থা স্বতন্ত্র ছিলো।

যেসব কাজ দুনিয়াবী বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সে সব কাজে আশিয়ায়ে কেরামের নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়। কারণ তন্মধ্যে কোনো কোনো কাজ এরূপ হতে পারে যেগুলোর আশিয়ায়ে কেরামের খবর হতো না। অথবা তাঁদের বিশ্বাস ওইগুলোর বিপরীত হতো। আর তা দোষণীয় ছিলো না। কারণ তাঁদের মনযোগ সর্বদা আখিরাতের কাজ, পরকালীন অবস্থা ও শরয়ী বিষয়ের প্রতি ব্যাপ্ত থাকতো। তারা জানে চোখের সামনে يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ আশিয়ায়ে পার্শ্ব জীবনকে এবং তারা আখিরাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত।^১ আশিয়ায়ে কেরাম এমন ছিলেন না।

যেমনটি অচিরেই আমি এ বিষয়টি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করবো, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু এটা বলা যাবে না যে, তাঁরা দুনিয়ার কোনো কাজই জানতেন না। কারণ এটা অলসতা ও অজ্ঞতা, যা থেকে হযরাত আশিয়ায়ে কেরাম মুক্ত ছিলেন। হযরাত আশিয়ায়ে কেরামকে তো দুনিয়াবাসীদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে তাদের পার্শ্ব ও দ্বীনি কর্ম সংশোধনের উদ্দেশ্যে। আর প্রকাশ থাকে যে, উক্ত বিষয়সমূহ দুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া অবস্থায় পরিপূর্ণ হতে পারে না। কারণ জরুরী হলো

^১. আল কুরআন : আর রুম, ৩০/৭।

যে, ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হতো। এ বিষয় সন্দেহ পোষণ করার কোনো অবকাশ নেই। এ বিষয় আমি পূর্বেও আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয়ত কথা হলো এই যে, এ ধরনের অজ্ঞতা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, এরপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে ইয়াকিন লাভ হতে পারেন। এখন অবশিষ্ট রইলো ওইসব কাজ যার সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই ঐসব বিষয় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদ করেন। আর সত্যপন্থি আলেমদের মতে ঐ ধরনের ইজতিহাদ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে প্রমাণিত হয়েছে। হযরত উম্মে সালমা রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার হাদীসে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “যেসব বিষয় আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়নি সে সব বিষয় আমি নিজ অভিমতের আলোকে মিমাংসা করি।” এর সত্যতা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনায় প্রমাণ হয়েছে। যথা, বদর যুদ্ধের বন্দীদের বিষয় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিমাংসা করা যে, তাদের মুক্তি পনের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া। আর যুদ্ধে যোগদানে বিরত লোকদের বিষয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিমাংসা বরা।^১

কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজতিহাদ সঠিক নির্ভুল হতো। যেসব লোক মনে করে যে তাঁর ইজতিহাদে ভুল হতে পারে, তাদের কথায় মনযোগ দেওয়া ঠিক হবে না। আর না ঐ সব লোকদের প্রতি মনযোগী হওয়া যাবে, যারা বলে যে, প্রত্যেক ইজতিহাদকারীর ইজতিহাদ অবশ্যই নির্ভুল হয়। যারা বলে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজতিহাদ সহীহ হতো। আর তাতে ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা ছিলো, কারণ শরীয়াতের বিষয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজতিহাদ ভুল থেকে মুক্ত ছিলো। তবে শরীয়াতের কোনো বিষয় প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মুজতাহিদগণের ইজতিহাদে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিন্তা ও ইজতিহাদ তো ঐসব বিষয় হতো যেসব বিষয় তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়নি। আর না. এর ধারাবাহিকতায় শরীয়াতের কোনো হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে। এটাতো এই অবস্থায় হতো যখন কোনো বিষয় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক কালবে বদ্ধমূল হয়ে যেতো। কিন্তু ঐ তাশরীহী আহকাম যা পূর্বে থেকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

^১. তাবুক যুদ্ধের সময় কিছু সংখ্যক লোক হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যুদ্ধে যোগদানে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর অপেক্ষা না করে তাদেরকে মর্দানাতে অবস্থানের অনুমতি দান করেন।

ওয়াসাল্লামের মুবারক কালবে বদ্ধমূল ছিলো না আর না হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বে এ সম্পর্কে কিছু জানতেন; এমনকি আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানিয়ে দিতেন। আর সংক্ষিপ্তাকারে অথবা আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে, অথবা আল্লাহ তা'আলার আদেশে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জ্ঞাত হতেন। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো হুকুম জারী করতেন। (তাহলে ঐ আহকাম চূড়ান্ত ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।) বরং এর অবস্থাও আল্লাহ তা'আলার ওহীর অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ বিষয় মিমাংসা করার পূর্বে ওহীর অপেক্ষা করতেন। আর ঐ পর্যন্ত হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ ও সব আহকাম সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলম অকাট্য আর নিশ্চিত না হয়েছে এবং তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ ও সংশয় বাকী না থাকে। এভাবে সকলপ্রকার অজ্ঞতাকে নেতিবাচক করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কথা হলো এই যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শরীয়াতের প্রতি আহ্বান করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়াতের বিস্তারিত ইলম ছিলো। আর এ সম্পর্কিত ক্ষুদ্র বিষয়েও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনবগত ছিলেন না। যদি তাই না হতো তবে এটা সঠিক হতো না যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন, যার জ্ঞান হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিলো না।

তবে ঐসব বিষয় যা আসমান-যমীনের রাজত্ব ও সেগুলোর সৃষ্টি সংক্রান্ত। আর আল্লাহ তা'আলার আসমায়ি হুসনা বা সুন্দরতম নামসমূহ বা তাঁর বড় বড় নিদর্শনাবলী, আখিরাতের বিষয়, কিয়ামতের নিদর্শনাবলী, সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান লোকদের অবস্থার ইলম আর এ বিষয়সমূহের ইলম যা সংঘটিত হয়েছে অথবা সংঘটিত হবে। ঐ সব বিষয়ের জ্ঞান হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে জেনেছেন যা ইতোপূর্বে আমি আলোচনা করেছি। এসব বিষয়েও তিনি ভুল থেকে নিষ্পাপ ছিলেন। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐসব বিষয়ে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাও সকল প্রকার সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে বরং ঐ ইলম তো নিশ্চয়তার চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়েছে। কিন্তু ঐ বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জরুরী ছিলো না। যদিও ঐ সব বিষয় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যা জ্ঞান

ছিলো তা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিজীব লাভ করতে পারেনি। এ কারণে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'إِنِّي لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي رَبِّي' - 'আমি তা জানি যা আমার প্রভু আমাকে শিক্ষা দান করেছেন'।

আর এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.

-এমন অনেক অসংখ্য বিষয় রয়েছে যা আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ কল্পনাও করতে পারে নি, আর কোনো মানুষ তা জানতেও পারেনি। চোখের ঐ শীতলতা যা তাঁর প্রভু তাঁর জন্য গোপন করে রেখেছেন।^১

আর হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম হযরত খিযির আলাইহিস্ সালামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

هَلْ أَتَبِعَكَ عَلَى أَنْ تَعْلَمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا.

-আমি কি আপনার সাথে থাকবো এ শর্তে যে, আপনি আমাকে শিক্ষা দেবেন ভাল কথা যা আপনাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।^২

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করতেন,

أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.

-হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার ঐ নামসমূহের ওসীলা দিয়ে দোয়া করছি যেগুলো আমি জানি। আর ঐ নামসমূহের ওসীলা দিয়ে যে নামসমূহ আমার জানা নেই।^৩

অপর এক হাদীসে আছে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

^১ বুখারী : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ৩২৪৪, ৪৭৭৯, ৪৭৮০; মুসলিম : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ২৮২৪। আল-কুরআন : সূরা আস্-সিজদা, ৩২:১৭।

^২ আল কুরআন : সূরা কাহাফ, ১৮:৬৬।

^৩ ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা ইউমারু বিহি মিনাত্ তা'উয, ৬:১৯, হাদিস নং : ১৪৯৯।

খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ইসমিলাহিল আ'যম, ১১:৩১৮, হাদিস নং : ৩৮৪৯।

গ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ইসতি'আযাহ, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫৭, হাদিস নং : ২৪৭৯।

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ عَلِمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ.

-আমি ঐ নামসমূহের ওসীলা দিয়ে দোয়া করছি যেগুলো আপনি আপনার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। আমাকে ওই নামগুলো জানিয়ে দিন আর ঐ নামসমূহের মাধ্যমেও যেগুলো আপনি কাউকে বলেন নি। বরং ঐনামগুলো আপনার গায়েরী ধন-ভাণ্ডারে গোপন করে রেখেছেন। আর সেগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন।^১

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ.

-এবং প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর একজন অধিক জ্ঞানী আছেন।^২

হযরত যায়িদ বিন আসলাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমুখ বর্ণনা করেন, এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে, এমনকি আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌছে সমাপ্ত হয়ে যায়। এটা এমনি এক বিষয় যাতে কোনো গোপনীয়তা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান কোনো মানুষ বেষ্টন করতে পারে না। আর না তার কোনো সমাপ্তি রয়েছে। এ আদেশ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওহীদ, শরীয়াত, ইলম, মারিফাত ও দ্বীনের কাজের সম্পর্কে হয়েছে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। এ কারণে উল্লেখিত ঐ বিষয়সমূহে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে জ্ঞান লাভ হয়েছে তিনি তা ওহীর মাধ্যমে লাভ করেছেন। তাতে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ ছিলো না।

^১ ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবদিদ্বাহ ইবনে মাস'উদ, ৮:৬৩, হাদিস নং : ৩৫২৮।

খ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু দাওয়াত ফীল আওকাত, পৃ. ৫১, হাদিস নং : ২৪৫২।

গ) হাকেম : মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু কিতাবুদ দোয়া, ৪:৪২৩, হাদিস নং : ১৮৩০।

^২ আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:৭৬।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

فِي إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عِصْمَةُ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الشَّيْطَانِ

শয়তানের প্রভাব থেকে হযুর ﷺ সুরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের

ঐকমত্য প্রসঙ্গে

জেনে রাখুন। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিলেন। আর তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট ছিলেন। শয়তান না হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছে, আর না হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুবারক কালবে কুমন্ত্রণা দিয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর জয়যুক্ত হতে পেরেছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَكُلٌّ بِهِ قَرِينٌ مِنَ الْجِنِّ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. قَالُوا:

وَلَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلِيَّائِي وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ.

-তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার দু'জন সাথীর মধ্যে একজন জ্বীন শয়তান ও একজন ফিরিশতা নিযুক্ত নেই। সাহাবায়ে কেরাম আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার সাথেও রয়েছে? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, হ্যাঁ আমারও দু'জন সাথী রয়েছে। কিন্তু তাদের মুকাবিলায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে সাহায্য করেছেন। তারা উভয় মুসলমান হয়ে গেছে।^১

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ.

-তারা আমাকে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু নির্দেশ দেয় না।^২

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তাহরিৎশ শায়াতিন, ১৩:৪২৮, হাদিস নং : ৫০৩৪।

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী কিরহাতিদু দুখুল, ৪:৪০৫, হাদিস নং : ১০৯২।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুল গাইরাহ, ১২:৩১১, হাদিস নং : ৩৮৯৮।

২. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তাহরিৎশ শায়াতিন, ১৩:৪২৮, হাদিস নং : ৫০৩৪।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবদিল্লাহ ইবনে মাস'উদ, ৮:১৪৬, হাদিস নং : ৩৬১১।

গ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ওয়াসুওয়াস, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৫, হাদিস নং : ৬৭।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা فَاَسْلَمَ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, فَاَسْلَمَ أَيْ -আর আমি তাদের থেকে নিরাপদ রয়েছি।^১

কোনো কোনো আলেম এ হাদীস সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

فَاَسْلَمَ يَعْنِي الْقَرِيبِينَ أَنَّهُ انْتَقَلَ عَنْ حَالٍ كُفْرِهِ إِلَى الْإِسْلَامِ فَصَارَ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ كَالْمَلَكِ.

-তারা উভয় ইসলাম গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ আমার সাথী শয়তান কুফুরীর অবস্থা থেকে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর তারা আমাকে ফেরেশতার ন্যায় নেক কাজ ব্যতীত অন্য কোনো কাজের আদেশ করে না।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে- فَاَسْلَمَ অর্থাৎ তারা আমার অনুগত হয়ে গেছে। কাযী আবুল ফযল আয়ায রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই শয়তান, যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী হয়েছে তার অবস্থা যদি এই হয় যে, তবে ওই শয়তানের অবস্থা কী হবে যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে দূরে রয়েছে এবং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যকে আবশ্যক করে নেয়নি কিংবা তার নিকটে আসতে সক্ষম হয়নি?। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, শয়তান কয়েকবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের জ্যোতিকে নিভিয়ে দিয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষতি করার পদক্ষেপ নিয়েছিল এছাড়া শয়তান কয়েকবার তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য তাঁর পিছু নিয়েছিল কিন্তু সে সর্বাবস্থায় প্রতারণিত করা থেকে নিরাশ হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সর্বদা ব্যর্থ হয়েছে। যেমন একবার নামাযরত অবস্থায় শয়তান হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনযোগ সরানো চেষ্টা করেছিলো আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পাকড়াও করে বন্দী করে রাখেন।

বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي.

-শয়তান আমার সামনে হাজির হয়।^২

১. তাকরানী : মু'জামুল কবীর, ৯:৬৯।

২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু শিফাতিল ইবলিশ ওয়া জুদুদুহ, ১১:৬২, হাদিস নং : ৩০৪২।

আবদুর রাজ্জাক রাধিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় এসেছে, হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

فِي صُورَةِ هِرٍّ فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَأَمَكَّنِي اللَّهُ مِنْهُ فَدَعْتُهُ وَلَقَدْ
هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي
سُلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا الْآيَةَ قَرَدَهُ اللَّهُ خَاسِمًا.

-শয়তান বিড়ালের আকৃতি ধারণ করে আমাকে উদ্ভিগ্ন করতে উদ্যত হয়, যাতে আমি নামায ভঙ্গ করি। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করেন। আমি তাঁকে বন্দী করে ফেলি আর ইচ্ছা করি যে, তাকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি। যাতে তোমরা সকালে তাকে দেখতে পাও। কিন্তু পরে আমার ভ্রাতা হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম-এর কথা স্মরণ হওয়ায় আমি তাকে ছেড়ে দিই। কারণ তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেছেন- 'হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করো। আর আমাকে এমন রাজ্যদান করো, আমার পর কারো জন্য উপযোগী না হয়।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে ব্যর্থ ও নিরাশ করে তাড়িয়ে দেয়।

হযরত আবু দারদা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَنِي بِشَهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِِي وَالنَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ. وَذَكَرَ تَعَوُّدَهُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَلَعَنَهُ لَهُ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ
أَخْذَهُ.

-আল্লাহর শত্রু ইবলিস আমার নিকট আগুনের উষ্ণা নিয়ে আসে। যাতে সে তা আমার মুখের উপর রাখতে পারে। নবী করীম সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামাযরত ছিলেন। যখন আউযুবিল্লাহ পাঠ করত তার

খ) আবদুর রাজ্জাক : আল মুসান্নফ, ১১:৪৬৯।

গ) দারে কুতনী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী ই'রাদিশ্ শয়তান, ৪:২৫, হাদিস নং : ১৩৯২।

১. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:৩৫।

কেননা হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! আমার মতো রাজত্ব তুমি অন্য কাউকে দান করো না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করেন। তাঁকে সমস্ত সৃষ্ট জীবের উপর রাজত্ব করার ক্ষমতা দান করেন। এ কারণে হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামেরূপ করা পছন্দ করেন নি। কারণ তাঁর রাজত্বে জ্বিনেরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এজন্য হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানকে ছেড়ে দেন।

প্রতি অভিসম্পাত করেন। আর ইরশাদ করেন, অতঃপর আমি তাকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করি। এরপর হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী বর্ণনার মতো বর্ণনা উল্লেখ করেন। আরো ইরশাদ করেন,
لَأُصْبِحَ مُؤْتَقًا بِتَلَاَعِبٍ بِهِ وَلَدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

-আমার মন চেয়েছে তাকে বন্দী করি যাতে মদীনার শিশুরা সকালে তাকে নিয়ে খেলা করতে পারে।

অনুরূপ কথা মিরাজের হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, এক জ্বীন হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নিক্ষেপে করার জন্য আগুনের উষ্ণা খুঁজতে ছিলো। তখন হযরত জিবরাইল আলাইহিস্ সালাম হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আউযুবিল্লাহ (আশ্রয়ের দোয়া) শিক্ষা দান করেন।^২ যার মাধ্যমে হযুর সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করেন। উক্ত বর্ণনা ইমাম মালেক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু জাওয়াজি লায়িনাশ্ শয়তান..., ৩:১৪৮, হাদিস নং : ৪৪৩।

খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু লায়িনাশ্ ইবলিশ..., ৪:৪৫৯, হাদিস নং : ১২০০।

গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু দোয়া বি আ'রাফাহ, ৯:১১১, হাদিস নং : ৩০০৪।

২. যেমন আবুত তাইয়াহ থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, আমি আব্দুর রহমান বিন জানবাহ তামীমীকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেই রাতে আল্লাহর রসূল সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানদের সাথে কীরূপ আচরণ করেছিলেন, যে রাতে তারা তাঁর সাথে প্রতারণা করতে চেয়েছিল? তখন তিনি বললেন, সেই রাতে পর্বত, উপত্যকা ইত্যাদি থেকে শয়তানরা আসে এবং তারা তাঁকে খুঁজতে থাকে। তাদের মধ্য থেকে এক শয়তানের হাতে ছিল আগুনের মশাল, যা দিয়ে সে আল্লাহর রসূল সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারককে পুড়ে দেবার ইচ্ছা করেছিল। সে মুহূর্তে তাঁর নিকট আগমন করলেন হযরত জিবরাইল আলাইহিস্ সালাম। বললেন, হে প্রিয় রসূল! আপনি বলুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কী বলবো? তিনি বললেন, এ দোয়া- وَكْرًا وَبَرًّا ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا - আল্লাহর পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কালেমাতের উসিলায় আমি পানাহ চাই, তিনি যা যা সৃষ্টি করেছেন সেই সবার অনিষ্টতা থেকে, আর সে সবার অনিষ্টতা থেকে যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়। সেই সবার অনিষ্টতা থেকে যা আসমানের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়, আর পানাহ চাই দিন ও রাতের কিতনার অনিষ্টতা থেকে, আশ্রয় চাই রাতের বেলায় আগত অনিষ্টতা থেকে, তা থেকে নয় যা রাতে আগত হয় মঙ্গলরূপে। হে পরম দয়াময়! সাথে সাথে শয়তানদের আগুন নিভে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেন। (আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩:৪১৯/ ইবনু আবদিল বর : আত তামহীদ, ২৪:১১৩-১১৪/ মুনিরী : আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২:৩০৩)

যখন শয়তান নিজে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি তখন সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষতি করার জন্য হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুদেরকে মাধ্যম বা উপকরণ বানিয়েছে।

আর এটা প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, যখন মক্কার কাফিররা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে বাঁধাধস্ত করতে অপারগ হয়ে দারুন নদওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরামর্শ সভার আয়োজন করে, তখন তাদের ওই কর্মসূচী বাস্তবায়নে সভায় অভিশপ্ত শয়তানও শায়খে নজদীর আকৃতিতে উপস্থিত হয়ে হত্যার পরামর্শ দেয়।

আরেকবার শয়তান বদর যুদ্ধে সুরাকা বিন মালিকের আকৃতি ধারণ করে কুরাইশ বাহিনীর সাথে অংশগ্রহণ করে।^১ বিষয়টি পবিত্র কুরআন এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ

مِنَ النَّاسِ.

-আর যখন শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিলো আর বলেছিল, 'আজ তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হওয়ার মতো নেই।'^২

এরপর আরেকবার আকাবার শপথের সময় সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরাইশদেরকে ভীত করার চেষ্টা করেছে।^৩

ওই ঘটনাসমূহে আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শয়তানের ক্ষতি ও অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেছেন।

^১. বদর যুদ্ধে ইবলিশ সুরাকা বিন মালিকের আকৃতি ধারণ করে তার দলবল নিয়ে আরবের কাফিরদের নিকট আসলো। আর বললো, তোমরা নিশ্চিত থাকো বনী কিনানা তোমাদের কোন ক্ষতি করবেনা। আমি ও আমার এ গোটা দল তোমাদের সাথেই আছি। যখন যুদ্ধ শুরু হলো, তখন তার হাত হারিস ইবন হিশামের হাতে ছিল। ওই দিকৃত ইবলিশ যখন ফিরিশতারা অবতরণ করতে দেখলো, তখন তার হাত হারিসের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যেত লাগলো। হারিস ডেকে বললো, কোথায় যাচ্ছে? সে বললো, আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তোমার তা দেখছেন। অর্থাৎ রণাঙ্গণে দলেদলে ফিরিশতা অবতরণ করছে।

^২. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮/৪৮।

^৩. মদীনার আনসারগণ তিন বার হজ্জের সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে বায়াত গ্রহণ করে। তৃতীয় বছর আনসারগণ যখন বায়াত গ্রহণ করে তখন ইবলিশ হতাশ হয়ে মক্কায় গিয়ে চিৎকার করে বলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক যুবককে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সমবেত করছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই শয়তানের সেই চিৎকার শুনে বললেন, এটা শয়তানের চিৎকারের শব্দ।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كُفِّي مِنْ لُصِّهِ، فَجَاءَ لِيَطْعَنَ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِهِ حِينَ وُلِدَ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ.

-হযরত ইসা আলাইহিস্ সালামকে শয়তানের হাতের স্পর্শ থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন তখন ইবলিশ আসে। আর সে তাঁর বাহু স্পর্শ করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পর্দা ঢেলে দেয়া হয় আর ইবলিশ ওই পর্দা স্পর্শ করে।^১ সুতরাং তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি।

আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোগাক্রান্ত হন, তাঁকে ঔষধ দেওয়া হয়। সাহাবায়ে কেরাম আরয করেন যে, আমাদের ডয় হয়, না জানি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُسَلِّطَهُ عَلَيَّ.

-এ রোগ শয়তানের কু-প্রভাবের কারণে হয়, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর শয়তানকে জয়যুক্ত করবে না।^২

যদি তোমরা এই বিষয়ে প্রশ্ন করো, তাহলে বলো এ আয়াতের কী অর্থ হবে?

وَمَا يَزْعَمُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

-আর হে শ্রোতা! যদি শয়তান আপনাকে কোনো খোঁচা দেয়; তবে আল্লাহর আশ্রয় চাইবে। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।^৩

এর জবাবে কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এ আদেশ ওই বর্ণনার আলোকে হবে-

^১. বুখারী : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ৩২৮৬; মুসলিম : আস্ সহীহ, ২৩৬৬।

^২. ক) আবদুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, হাদিস নং : ৯৭৫৪।

খ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ৬৫৮৭।

গ) হাকেম : মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন, ৪:২২৫।

ঘ) তাবারী : ফী তারিখে তাবারী, ২:২৩০।

^৩. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:২০০।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٠﴾

-হে মাহবুব! ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন এবং মুর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।^১

এর মর্মার্থ হলো যে, মুর্খদের অশোভনীয় আচরণের পর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের ক্ষমা করে দিতে হবে। কিন্তু যদি ক্রোধ এসে যায় আর ক্ষমা প্রদর্শনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে ওই অবস্থায় হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করবেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এখানে وَإِنَّمَا يَنْزَغُكَ এর অর্থ হলো- ফ্যাসাদ।

যেমন ইরশাদ হয়েছে-

مِنْ بَعْدِ أَنْ تَرْغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ

-এরপর যে, শয়তান আমার মধ্যে এবং আমার ভাইদের মধ্যে ভাতৃত্ব সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছিলো।^২

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন- يَنْزَغُكَ শব্দের অর্থ হলো, উত্তেজিত করা। আর ঐ উত্তেজিত করার সর্বনিম্ন অবস্থা হলো অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়া। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেছেন, যখন আপনার দুশমনের উপর ক্রোধ এসে যাবে, বা শয়তান এই ক্রোধের মাধ্যমে আপনার মনোযোগকে আল্লাহ তা'আলার দিকে থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে আর ওই কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তির বাহ্যিক কোনো উপায় আপনার দৃষ্টিগোচর হবেনা, তখন আপনি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর তা আপনার পরিপূর্ণ নিষ্কলুষ হওয়ার মাধ্যম হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কখনো শয়তানকে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর জয়যুক্ত হতে ক্ষমতা দেবেন না। একথা ছাড়াও এ আয়াতের তাফসীরের ধারাবাহিকতায় তাফসীরবিদগণ অনেক কথা বলেছেন।

অনুরূপ একথাও যথার্থ হবে না যে, শয়তান ফিরিশতার আকৃতি ধারণা করে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাযির হয়েছে, তাঁকে সন্দেহের দিকে ধাবিত করেছে, আর এরূপ না নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে হয়েছে, আর না পরে হয়েছে। এ বিষয়ের উপর ইয়াকীন ও দৃঢ় বিশ্বাসই মুজিব্যার প্রমাণস্বরূপ হয়েছে।

^১. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৯৯।

^২. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:১০০।

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিষয় কখনো সন্দেহ হয়নি যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে ফিরিশতার আগমন হয়েছে, তিনি বাস্তবে তাঁর ফিরিশতা ছিলেন কিনা তা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সুস্পষ্ট ছিলো। আর আল্লাহ তা'আলা নির্ভরযোগ্য অকাট্য দলিল প্রমাণের সাহায্যে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এর বাস্তবতা প্রকাশ করে দেন, যাতে আল্লাহ তা'আলার বানীর সত্যতা ইনসাফের সাথে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলার বানীতে কোনো প্রকার পরিবর্তন নেই।

যদি এ বিষয় তোমরা দ্বিমত পোষণ করো। তাহলে বলো এ আয়াতের কী অর্থ হবে?

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ

اللَّهُ ءَايَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾

-আর আমি আপনার পূর্বে যত রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি সবার উপর কখনো এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে, যখনই তারা পাঠ করেছে, তখন শয়তান তাদের পড়ার মধ্যে মানুষের উপর কিছু নিজ থেকে সংযোজন করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ মুছে দেন ওই শয়তানের ওই সংযোজিত অংশটুকু, অতঃপর আল্লাহ আপন আয়াতসমূহ সুদৃঢ় করে দেন। আর আল্লাহ জ্ঞানবান, প্রজ্ঞাময়।^১

উক্ত আয়াতের তাফসীরে অনেক অভিমত রয়েছে। তন্মধ্যে কোনো কোনো তাফসীর প্রাঞ্জল আবার কোনো কোনো তাফসীর জটিল। আর কোনো কোনো তাফসীর সংক্ষিপ্ত আর কোনো কোন তাফসীর অতি দীর্ঘ। তবে সর্বোত্তম তাফসীর হলো যার উপর জমহূর তাফসীরবিদ ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন অর্থাৎ ওই আয়াতে “কামনার” অর্থ হলো- তিলাওয়াত করা। আর তাতে শয়তানের অনুপ্রবেশের অর্থ হলো, শয়তানের আবৃত্তিকারীর বা তিলাওয়াতকারীর মনোযোগ নষ্ট করে দেওয়া বা আবৃত্তি করার সময় আবৃত্তিকারীর খেয়ালে অস্থিরতা সৃষ্টি করা।

^১. আল কুরআন : সূরা হজ্ব, ২২:৫২।

অথবা তিলাওয়াতের সময় তিলাওয়াতকারীর মনোযোগকে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে দেওয়া, যাতে আবৃত্তিকারীর আবৃত্তিতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় অথবা শয়তান এরূপ করতো যখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শ্রোতার কান পর্যন্ত পৌঁছে যেতো, তখন সে নিজের পক্ষ থেকে বিকৃত করে কিছু কথা বানিয়ে তাদের মনে ঢেলে দিত, কিংবা ভুলব্যাখ্যা দিত। তখন আল্লাহ তা'আলা ওই কথাগুলো দূর করে দিতেন, রহিত করে দিতেন, তার মিশ্রিত কথামালা পৃথক করে দিতেন, আর এভাবে আল্লাহ তা'আলা আপন আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করে দিতেন। উক্ত আয়াত সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আল্লামা সমরকন্দি রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওইসব লোকদের কথা কঠোর ভাষায় খণ্ডন করেছেন যারা একথা বলে, শয়তান হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম এর রাজ্যে জয়যুক্ত হয়েছে, এ ধরনের বর্ণনা সমূহ সঠিক নয়। আমি এ বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম-এর ঘটনায় বিস্তারিত আলোচনা করব, যারা বলে জাসাদ বা দেহ দ্বারা ওই বংশধর উদ্দেশ্য যা তার থেকে জন্মলাভ করেছিল- একথার খণ্ডনে।

হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম এর ঘটনার এ আয়াত -

أَنِّي مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ .

-আমাকে শয়তান যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।^১

এ প্রসঙ্গে আবু মুহাম্মদ মক্কী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

এরূপ ব্যাখ্যা করা বৈধ নয় যে, শয়তান তাকে রোগাক্রান্ত করে দিয়েছে, আর তাঁর দেহে কষ্ট সৃষ্টি করে দিয়েছে। এ কাজ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও প্রত্যয় ছাড়া হতে পারে না। এ কারণে তিনি এভাবে তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করেন, তাদেরকে বিপদে অবিচল রাখেন, আর এভাবে তাদেরকে প্রতিদানের যোগ্য করে তোলেন।

মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কোনো কোনো লোকের অভিমত হলো যে, শয়তান হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম-এর স্ত্রী সম্পর্কে তাঁর অন্তরে কুমন্ত্রণা ঢেলে দিয়েছে। যদি তোমরা একথা বলো, তাহলে হযরত ইউশা' আলাইহিস্ সালাম-এর ব্যাপারে বর্ণিত এ বাণীর অর্থ কি হবে?

^১. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:৪১।

وَمَا أَنْسَيْنِي إِلَّا الشَّيْطَانُ .

-আর আমাকে শয়তানই ভুলিয়ে দিয়েছে।^১

অপর এক আয়াতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

فَأَنسَنُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ .

-অতঃপর শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিলো যে, সে তার প্রভু (বাদশাহ) এর সামনে ইউসুফের কথা উল্লেখ করবে।^২

অথবা আমাদের নবী হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যখন তিনি এক সফরে ঘুমিয়ে পড়েন, আর ফজরের নামায কাযা হয়ে যায়। তখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **إِنَّ هَذَا وَادِّ بِهِ شَيْطَانٌ**, শয়তান রয়েছে।^৩

অথবা যখন হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম ফিরাউন সম্প্রদায়ের এক যুবককে চপেটাঘাত করলে সে মারা যায়, তখন তিনি বললেন,

هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .

-এ কাজটা শয়তানের নিকট থেকে হয়েছে।^৪

^১. আল কুরআন : সূরা কাহাফ, ১৮:৬৩।

হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম স্বীয় শিষ্য হযরত ইউশা আলাইহিস্ সালামকে সাথে নিয়ে হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম এর খোঁজে সমুদ্রের কিনারা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের থলিতে একটি ভাজা মাছ রাখা ছিলো। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম শিষ্যকে পূর্বে বললেন যেখানে মাছটি অদৃশ্য হয়ে যাবে তখন আমাকে সে খবর জানিয়ে দেবে। কারণ সে স্থানে হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে সাক্ষাত লাভ হবে। মাছটি অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু হযরত ইউশা আলাইহিস্ সালাম এর সাথে সাক্ষাত লাভ হবে। মাছটি অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু হযরত ইউশা আলাইহিস্ সালাম ভুলে যান। তাই তিনি সে কথা হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে বলতে পারেননি। অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার পর যখন হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম হযরত ইউশা আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞেস করেন। তখন হযরত ইউশা আলাইহিস্ সালাম জবাবে কুরআনের উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

^২. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:৪২।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম কারাগারে অবস্থান করার সময় যে দু'জনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন, তাদের মধ্যে একজনকে বললেন, যখন তুমি বাদশাহের নিকট যাবে; তখন আমার কথা বলবে। কিন্তু শয়তান তাকে তা ভুলিয়ে দেয়। উক্ত আয়াতে ঐ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

^৩. ইমাম মালেক : মুয়াত্তা, ২:২০ হাদীস নং ৩৬।

^৪. আল কুরআন : সূরা কাসাস, ২৮:১৫।

এ সব প্রশ্নের জবাব হলো এই যে, আরববাসীদের মতে, সকল প্রকার মন্দ কাজ যা মানুষের দ্বারা সংঘটিত হয় তা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর তখন মানুষ মনে করে যে প্রকৃতই এটা শয়তানেরই কাজ।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

طَلَعَهَا كَأَنَّهُ زُرُّوسُ الشَّيْطَانِ

- সেটার মুকুল যেন শয়তানদের মাথা।^১

আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযী ব্যক্তির সামনে পথ চলাচলকারী সম্পর্কে বর্ণনা করেন, فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ - তার সাথে লড়বে। কারণ সে শয়তান।^২

হযরত ইউশা আলাইহিস্ সালাম এর কথার জবাব দেওয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য নয়। কারণ তখন হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম এর সাথে তাঁর নবুওয়াত প্রমাণিত হয়নি। এ কারণে কুরআন মজীদে ইরশাদ করা হয়েছে।

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ .

-আর স্মরণ করুন। যখন মুসা আলাইহিস্ সালাম আপন খাদেমকে বললো।^৩

কথিত আছে যে, হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর ওফাতের পর তিনি নবী হয়েছেন। কেউ কেউ বলেন, হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর ইহজগত ত্যাগের কিছু দিন পূর্বে তিনি নবী হয়েছেন। আর হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম তাঁকে নবুওয়াত লাভের পূর্বে মাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আর তিনি জবাব দেন।

আর হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম-এর ঘটনায় যে বলা হয়েছে যে, فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ - শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। সেই সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ দু'টি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি অভিমত হলো যে, ভুলে পতিত ব্যক্তি কারাগারে অবস্থানকারী দু'জনের মধ্যে একজন ছিলো। আর তার প্রভু বাদশাহ ছিলো। অর্থাৎ শয়তান তাকে তার প্রভুর সামনে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম এর কথা বলতে ভুলিয়ে দেয়।

^১ আল কুরআন : সূরা সফাত, ৩৭/৬৫।

^২ ইমাম মালেক : মুয়াত্তা, ২:২১৪ হাদীস নং ৫২৫।

^৩ আল কুরআন : সূরা কাহাফ, ৩৭:৬০।

আর দ্বিতীয় অভিমতটি হলো, ওই ধরনের শয়তানী কাজের ফলে হযরত ইউসুফ ও ইউশা আলাইহিস্ সালাম-এর উপর শয়তানের কুমন্ত্রণা আর ব্যাকুলতা জয়যুক্ত হয়নি। বরং এখানে অর্থ হবে এ যে, সাময়িক কিছু সময়ের জন্য তাদের অন্তর অন্য কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় সেহেতু তারা ওই কথা ভুলে যায়। এ কারণে তাঁদের তা স্মরণ করে দেওয়া হয়। আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ বর্ণনা করা যে,

إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ.

-এ উপত্যকায় শয়তান রয়েছে।^১

এর অর্থ এই নয় যে, (নাউযবিল্লাহ) শয়তান হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিজয়ী হয়েছে কিংবা তাঁর মুবারক ক্বালবে কুমন্ত্রণার সৃষ্টি করে দিয়েছে। বরং যদি ওই হাদীসের ভাষ্যকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এ বাণীর মাধ্যমে শয়তানের আচরণ প্রকাশ করেন-

إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَا فَلََمْ يَزَلْ يَهْدِيهِمَا يَهْدِي الصَّبِيَّ حَتَّى نَامَ.

-শয়তান হযরত বিলাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট আসে। আর তাকে ঠিক সেভাবে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, যেভাবে বাচ্চাদেরকে আলতো পরশ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়। এমন কি তিনি ঘুমিয়ে থাকলেন।^২

সুতরাং স্পষ্ট হয়েছে, ওই মাঠে শয়তানের প্রাধান্য শুধু হযরত বিলাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর হয়েছে, আর তাঁর দায়িত্ব ছিলো ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেওয়া।

^১ ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবুন নাওমি আনিস্ সালাত, ১:৩২, হাদীস নং : ২৩।

খ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুত তারিখিল আযান, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৫২, হাদীস নং : ৬৮৭।

গ) বায়হাকী : দালায়িলুন নবুওয়াত, বাবুল্লাহি ক্বাবাআ আরওয়াহিনা, ৪:৩৭০, হাদীস নং : ১৬২২।

ঘ) বায়হাকী : মা'রিফাতিস্ সুনান ওয়ালা আসার, ৩:২২৪, হাদীস নং : ১০৩৯।

^২ ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবুন নাওমি আনিস্ সালাত, ১:৩২, হাদীস নং : ২৩।

খ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুত তারিখিল আযান, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৫২, হাদীস নং : ৬৮৭।

গ) বায়হাকী : দালায়িলুন নবুওয়াত, বাবুল্লাহি ক্বাবাআ আরওয়াহিনা, ৪:৩৭০, হাদীস নং : ১৬২২।

হাদীসের এই ব্যাখ্যা তো ওই অবস্থায় হবে যখন আমরা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী- **إِنْ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ** “এটা শয়তানের স্থান।” নামায আদায়ের জন্য জামত না হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা হিসেবে ধর্তব্য হবে। কিন্তু যদি উক্ত বাণী এই অর্থে ধরা হয় যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করেছেন যে ওই স্থান দ্রুত ত্যাগ করে চলে যাবেন আর ওখানে নামায পড়বেন না, তাহলে এ অভিমত ওখানে নামায না পড়ার কারণ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় হযরত যায়িদ বিন আসলাম রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু বর্ণিত হাদীসের জন্য এ ব্যাখ্যা সহায়ক হতো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

فِي صِدْقِ أَقْوَالِهِ ﷺ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ

হযুর ﷺ এর বাণীর সত্যতা প্রসঙ্গে

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ সত্য ছিলো। আর এ বিষয়ের উপর (যুক্তি ও উক্তিগত) স্পষ্ট দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিত্তসূত্রে বর্ণিত মুজিবাসমূহের দ্বারাও হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাচনভঙ্গির যে পদ্ধতি ছিলো, সে সম্পর্কেও মুসলিম উম্মাহ ঐক্যমত্যে উপনীত হয়েছে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিক থেকেও নিষ্পাপ ছিলেন। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এমন বিষয়ের খবর দেননি যা ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, ভুলবশতঃ হয়ে বর্ণিত ঘটনার বিপরীত হয়েছে। আর ইচ্ছাকৃত ঘটনার বিপরীত বলা সম্পূর্ণ সঠিক নয়, কারণ এ বিষয়ের উপর মুজিবাস দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন, ‘আমার রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু ইরশাদ করেন, তা বাস্তব হয়েছে’। এ বিষয়ের উপর মুসলিম উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এখন বাকী রইলো ওই কথা যে, হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলবশতঃ কিছু ইরশাদ করেছেন, তার বিপরীত সংঘটিত হয়েছে। যেভাবে ইচ্ছাকৃত এটা সম্ভব নয়, ভুলবশতঃও তা সম্ভব নয়।

উস্তাদ আবু ইসহাক ইসফারাইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত হলো, যেহেতু ইচ্ছাকৃত ভুল না হওয়ার ব্যাপারে উম্মাহের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপ অনিচ্ছাকৃত ভুলের ব্যাপারেও উম্মাহের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে তাও মান্য করতে হবে।^১

কাযী আবু বকর বাকিলানীর অভিমত, (এইরূপ ধারণা করা যে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুল করে সংঘটিত বিষয়ের বিপরীত কথা বলেছেন) এটা শরীয়াতের বিধান আর হাদীসে মুতাওয়াতিরের সম্পূর্ণ বিপরীত।

১. ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবুন নাওমি আনিস্ সালাত, ১:৩২, হাদিস নং : ২৩।

খ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুত্ তারিখিল আযান, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৫২, হাদিস নং : ৬৮৭।

গ) বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়াত, বাবুল্লাহি ক্বাবাছা আরওয়াহিনা, ৪:৩৭০, হাদিস নং : ১৬২২।

ঘ) বায়হাকী : মা’রিফাতিস্ সুনান ওয়াল আসার, ৩:২২৪, হাদিস নং : ১০৩৪।

১. কাযী আবু ইসহাক আসকারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত হলো যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুল বশতঃ ও ঘটনায় বিপরীত কোনো কথা বলেননি। এই বিষয়ে উম্মাহের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত আছে।

বাকিস্থানী ও ইসফারাইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা এর মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তা মু'জিয়ার দলিল হওয়ার সম্পর্কে হয়েছে। আর আমি এখানে এ ধরনের সূক্ষ্ম বিষয়ে আলোচনা করে আলোচনাকে অনর্থক দীর্ঘায়িত করতে চাই না। তাহলে আলোচ্য বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যমত্যে উপনীত হয়েছে (যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে কাজে নিষ্পাপ ছিলেন, অনুরূপ তাঁর কথায়ও নিষ্পাপ ছিলেন) যে, শরীয়াতের দায়িত্ব পৌছানোর ব্যাপারে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তব ঘটনার বিপরীত কোনো কথা বলেননি। অনুরূপ তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে খবর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতের নিকট পৌছাবেন, আর আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট যা ওহী প্রেরণ করেছেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই উম্মাতের নিকট পৌছিয়েছেন।

তিনি ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, সুস্থ-অসুস্থ অবস্থায়, খুশি-অখুশিতে কোনো অবস্থায় সংঘটিত ঘটনার বিপরীত কোনো কথা বলেননি।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُتِبَ كُلُّ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فِي الرُّضَى وَالْغَضَبِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَإِنِّي لَا أَقُولُ فِي ذَلِكَ كُذِّبَ إِلَّا حَقًّا.

-আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয় করি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি কি আপনার নিকট থেকে যা শুনি তা সব লিখে রাখবো? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হ্যাঁ! আমি পুনরায় আরয় করি। আপনি সম্ভ্রষ্ট অবস্থায় যা বলেন, বা অসম্ভ্রষ্ট হয়ে যা বলেন তাও লিখে রাখবো? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হ্যাঁ! কারণ আমি সর্বাবস্থায় সত্যই বলি।^১

মু'জিয়ার দলিলের বিষয়ের প্রতি আমি পূর্বে ইঙ্গিত প্রদান করেছি। এখন সে বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। সুতরাং আমি বলছি যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সত্যতার উপর মু'জিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর

^১. আহমদ : আল মুসনাদ, ২:২০৭ হাদীস নং ৬৯৩০।

একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি সত্য ব্যতীত কোনো কথা বলেন নি। আর তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যই প্রচার করেছেন। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ لِأَبْلُغَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَأُبَيِّنُ لَكُمْ مَا نَزَّلَ عَلَيْنَا.

-আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত বার্তাসমূহ পৌছায় যা সহকারে তোমাদের প্রতি আমি প্রেরিত হয়েছি। আর আমার উপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা আমি বিস্তারিতভাবে তোমাদের সামনে বর্ণনা করে দিই।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ

-আর তিনি কোনো কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না। তা তো ওহীই, যা তাঁর প্রতি (নাযিল) করা হয়।^২

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ.

-তোমাদের নিকট এ রাসূল সত্য সহকারে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে শুভাগমন করেছেন।^৩

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

-এবং যা কিছু তোমাদেরকে রাসূল দান করেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো।^৪

উক্ত আয়াতসমূহের আলোকে বলা যায়, এটা বলা বৈধ হবে না যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কথা বলেছেন যা বাস্তব ঘটনার বিপরীত

^১. আল কুরআন : সূরা আন-নাযম, ৫৩:৩-৪।

^২. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১৭০।

^৩. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:৭।

সংঘটিত হয়েছে। চাই তা যে-কোনো অবস্থায় হোক না কেনো। যদি আমরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একথা বৈধ বলে মনে করি যে, ওহীর ব্যাপারে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুল হতে পারে বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্যদের মাঝে কোনো পার্থক্য অবশিষ্ট থাকবে না। আর তখন সত্য-মিথ্যা মিলিত হয়ে একাকার হয়ে যাবে। সুতরাং একথা স্বীকার করতে হবে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব বাণীই মু'জিয়া। আর ওইগুলো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যায়ন করেছে। যেমনটি আবু ইসহাক ইসফারাইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, উম্মাতের ঐকমত্য ও দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে ছিলো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

فِي دَفْعِ بَعْضِ الشُّبُهَاتِ

কতিপয় সন্দেহের অপনোদন

এখন দ্বিমত পোষণকারীদের প্রশ্নের দিকে মনোযোগ দেওয়া হবে। তাদের মধ্যে এক হলো এই যে, এক বর্ণনায় বর্ণিত, যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আন-নাজমের এ আয়াত আবৃত্তি করেন-

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَّ وَالْعُزَّىٰ ﴿١﴾ وَمَنْوَةَ الْثَالِثَةِ الْآخَرَىٰ ﴿٢﴾

-তবে কি তোমরা দেখেছো লাত ও ওয়্যা এবং ঐ তৃতীয় মানাত কে?

তারপর আবৃত্তি করেন-

تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهَا لَتُرْتَجَىٰ.

-এই প্রতিমা অবাধ্য পাখী তার মধ্যস্থতার আশা করা যায়।

অপর এক বর্ণনায় تُرْتَضَى (মনোনীত) এসেছে।

এক বর্ণনায় এসেছে-

إِنَّ شَفَاعَتَهَا لَتُرْتَجَىٰ وَإِنَّهَا لَمَعَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَىٰ.

অপর এক বর্ণনায় এসেছে-

وَالْغَرَانِيقُ الْعُلَىٰ، تِلْكَ الشَّفَاعَةُ لَتُرْتَجَىٰ.

অর্থের দিক থেকে বর্ণনাসমূহের বিষয়বস্তু একই যে, ওই প্রতিমাসমূহের শাফায়াত আল্লাহ তা'আলার নিকট গৃহীত হয়েছে। এরপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পুরা সূরা পাঠ শেষ করে সাজদা করেন। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুসলমানগণ সাজদা করেন। আর কাফিররা জানতে পারে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিমাদের প্রশংসা করেছেন। তখন তারাও সাজদা করে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে (নাউয়ুবিল্লাহ) শয়তান হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক মুখ দিয়ে ঐ বাক্যসমূহ উচ্চারণ করিয়েছে। এ জন্যই যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয় অভিলাসী ছিলেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এরূপ কোনো আয়াত

১. আল কুরআন : সূরা আন-নাজম, ৫৩:১৯-২০।

অবতীর্ণ হোক, যা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈকট্য প্রতিষ্ঠা করে দেয়। আর এক বর্ণনায় এসেছে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক ক্বালবে আকাজ্জা ছিলো যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর যেনো আগামীতে এ ধরনের কোনো আয়াত অবতীর্ণ না হয় যার কারণে তাঁর সম্প্রদায় তাঁর থেকে আরো বেশী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বর্ণনাসমূহে ওই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আগমন করেন। আর তিনি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এ সূরা আবৃত্তি করেন। যখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বাক্যদ্বয় পর্যন্ত পৌছেন। তখন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম বললেন যে, 'আমি তো এ দু'বাক্য নিয়ে আসিনি'। এই কথা শুনে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যিত হয়ে যান। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাক্ষ্যনা দিয়ে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى

الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ

اللَّهُ ءَايَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

-এবং আমি আপনার পূর্বে যত রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি সবার উপরও এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে, যখনই তারা পাঠ করেছে তখন শয়তান তাদের পড়ার মধ্যে মানুষের উপর কিছু নিজ থেকে সংযোজন করে দিয়েছে। অতঃপর মুছে দেন আল্লাহ তা'আলা ওই শয়তানের সংযোজিত অংশটুকু, অতঃপর আল্লাহ আপন আয়াতসমূহ সুদৃঢ় করে দেন, আর আল্লাহ জ্ঞানবান, প্রজ্ঞাময়।^১

আর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়-

وَأِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ

عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ

كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٢٩﴾

^১ আল কুরআন : সূরা হজ্জ, ২২:৫২।

- এবং তারা তো নিকটবর্তী ছিলো (হে হাবীব) আপনার পদস্বলন ঘটানোর আমার ওই ওহী থেকে, যা আমি আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি, যাতে আপনি আমার প্রতি অন্যকিছুর সম্বন্ধ গড়ে দেন। আর যদি এমন হতো তাহলে তারা আপনাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু করে নিতো। আর যদি আমি আপনাকে অবিচলিত না রাখতাম, তবে এ কথা নিকটবর্তী ছিল যে, আপনি তাদের প্রতি সামান্য কিছু ঝুঁকে পড়তেন।^২

এর জবাব জেনে নিন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মর্যাদা দান করুন যে, এ বর্ণনার উপর দু'ভাবে আলোচনা করা যায়। প্রথমত: এ বর্ণনা ভিত্তিগত দিক থেকে দুর্বল। এ কারণে এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত: যদি এ বর্ণনা গ্রহণও করা হয় যে, তাহলে তা বাতিল হওয়ার জন্য একথা যথেষ্ট হবে যে, এ বর্ণনা বিশুদ্ধ ছয় হাদীস গ্রন্থের কোনো বর্ণনাকারী বর্ণনা করেননি, আর না কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিক সনদে উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এটা গল্প-উপাখ্যান পছন্দকারী তাফসীরবিদ ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনা। যারা সহীহ ও দুর্বল সব বর্ণনা উল্লেখ করতেন।

এ কারণে কাযী বকর বিন আলা আল-মালেকী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অতি সত্য কথা বলেন, কোনো কোনো মনগড়া তাফসীরবিদদের কারণে অসংখ্য মানুষ ধোকাই পতিত হয়েছে। আর এ ধরনের বর্ণনাসমূহের দুর্বলতা, অনিচ্ছাকৃত বর্ণনা, সনদের বিচ্ছিন্নতা আর বর্ণনার শব্দগত পার্থক্যের কারণে কতিপয় নাস্তিক মাথাচড়া দিয়ে উঠেছে।

কেউ কেউ বলেছে যে, এ ঘটনা নামাযের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। অপর একদল বলেছে, যখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট গমন করেন তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। অপর একদল বলেছে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (প্রতিমাদের প্রশংসার) এ কথা বলেছেন, তখন তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। অপর একদল বলেছে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে মনে একথা বলেছেন। আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুল করে এ কথা বলেছেন। অপর একদল বলেছে যে, শয়তান হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জ্বানে এ বাক্য জারি করেছে। আর যখন হযুর

^১ অর্থাৎ হযুর ঝুঁকে পড়ার কাছেও যান নি, কারণ এটা 'لَوْ' শব্দের পরে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ যদি আমি আপনাকে মা'সুম হওয়ার মর্যাদা দিয়ে দৃঢ় না রাখতাম, তবে আপনি ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হতেন।

^২ আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭/৭৩-৭৪

আশ-শিফা [২য় খণ্ড]
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে এ কথা আবৃত্তি করে শুনান তখন তিনি বললেন, “আমি তো এ আয়াত আপনাকে আবৃত্তি করে শুনাইনি।”

অপর আরেক দল বলেছে যে, শয়তান ওই কাফিরদের একথা শিখিয়ে দিয়েছে। আর যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতে পারেন, তখন তিনি ইরশাদ করেন, **وَاللّٰهُ مَا فَكَدًا اَنْزَلَتْ** - ‘আল্লাহর শপথ! উক্ত আয়াত এভাবে অবতীর্ণ হয়নি।’ এরূপ আরো অসংখ্য বর্ণনা পাওয়া যায়।

তবে সব চেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই যে, যেসব তাবিঈন বা তাফসীরবিদ ওই বর্ণনা সমূহ উল্লেখ করেছেন, তারা কেউ না ধারাবাহিক সূত্র বর্ণনা করেছেন, আর না মারফু সূত্রে তাতে কোনো সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন।

বরং ওই বর্ণনা যত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, অধিকাংশই দুর্বল, অর্থহীন, মনগড়া। ওই বর্ণনাসূত্র সমূহের মধ্যে শো‘বার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিই মারফু পর্যায়ের, যার বর্ণনাকারী ছিলেন আবু বিশর, তিনি সাঈদ বিন জোবায়িরের বরাতে হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, যার সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমা বলেন, এ হাদীসটির ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে, আর ওই সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে ছিলেন। এরপর বর্ণনাকারী মূল ঘটনা বর্ণনা করেন। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবু বকর আল-বায্বার রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে এ ধরনের কোনো বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে কিনা তা আমরা জানি না। এভাবে তিনি ওই বর্ণনার দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। কারণ তাতে সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে। আর আমি উক্ত বর্ণনা গ্রহণ অযোগ্য হওয়ার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

এখন অবশিষ্ট রয়েছে কালবী থেকে বর্ণিত বর্ণনার প্রশ্নের জবাব। তার প্রশ্নের জবাবে এটা বলা যথেষ্ট হবে যে, তার সূত্রে বর্ণনা করা বৈধ হবে না, আর দুর্বলতা ও মিথ্যার সম্ভাবনার কারণে তার নিকট থেকে বর্ণিত বর্ণনা আলোচনার অযোগ্য হবে। যেমনটি হযরত বায্বার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইঙ্গিত করেছেন।

এ হাদীসের ধারায় যা সহীহ বর্ণনাসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা হলো এই যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সূরা আন নাজম আবৃত্তি করেন, তখন তিনি মক্কাতে ছিলেন, অতঃপর তিনি যখন সাজ্জদা করেন, তাঁর সাথে মুসলমান, মুশরিক, জ্বিন ও অন্যান্য মানুষও সাজ্জদা করে। এ বর্ণনায় পূর্ববর্তী বর্ণনার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।

এই দুর্বলতা তো অকৃত্রিমরূপে প্রকাশ পেয়েছে আর বিবেকের দিক থেকেও পূর্ববর্তী বর্ণনা দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে। কারণ এ কথার উপর দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদিক থেকে নিষ্পাপ ছিলেন, সকল প্রকার অশোভনীয় আচরণ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত ছিলেন।

এখন অবশিষ্ট রইলো ওই কথার জবাব যে, ‘হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্তরিক ইচ্ছা ছিলো’ (নাউযুবিল্লাহ)। এরূপ কোনো আয়াত নাযিল হোক যাতে মুশরিকদের প্রতিমাদের প্রশংসা করা হয়, এরূপ ইচ্ছা স্পষ্ট কুফরি। তা থেকেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র ছিলেন। এরূপ বলা যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর শয়তান জয়ী হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। সে কুরআনকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সন্দেহ যুক্ত করে দিয়েছে। এমন কি সে কুরআনে নিজের পক্ষ থেকে কোনো বিষয় সংযোজন করে দিয়েছে, আর যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের অংশ বলে ধারণা করেছেন (নাউযুবিল্লাহ), এমন কি হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেন- এসব বিষয় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অসম্ভব ছিলো। যদি বলা হয় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত কুর‘আনে এ সব সংযোজন করেছেন (যা মুশরিকদের সন্তুষ্টকারী ছিলো), এটাও তো কুফরী। যদি বলা হয় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলবশতঃ এরূপ করেছেন। তাহলে জানা থাকে উচিত যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা থেকেও নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিলেন।

আমি অকাট্য দলিল প্রমাণ ও উম্মাতের ঐকমত্যের দ্বারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষ্পাপ হওয়া পূর্ববর্তী অধ্যায় প্রমাণ করেছি যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক ক্বালবে না কুফরির ভাব দেখা দিতে পারে, আর না মুখ দিয়ে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিংবা ভুলবশতঃ এমন কোনো কথা উচ্চারিত হতে পারে। ওইসব দিক থেকেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষ্পাপ ছিলেন। আর না শয়তান তাঁর উপর কোনো কিছু প্রতিক্রিয়া করতে পারে, বা তাঁর উপর কোনো প্রকার প্রভাব বিস্তার লাভ করার বা আল্লাহ তা‘আলার বাণীর সাথে তাঁর কথা মিলিত করার সুযোগ পেয়েছে। ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত যে-কোনোভাবেই শয়তান হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এরূপ করার ক্ষমতা রাখতো না।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿١١﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿١٢﴾

-আর যদি তিনি আমার নামে একটা কথাও বানিয়ে বলতেন, তবে অবশ্যই আমি তাঁর নিকট থেকে সজোরে বদলা নিতাম^১, অতঃপর তাঁর হৃদয়-শিরা কেটে দিতাম।^২

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ
عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿١٣﴾

-এবং এমন হলে আমি আপনাকে দ্বিগুন বয়স এবং দ্বিগুন মৃত্যুর স্বাদ প্রদান করতাম। অতঃপর আপনি আমার বিরুদ্ধে আপন কোন সাহায্যকারী পেতেন না।^৩

দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে, উপর্যুক্ত বর্ণনা বিবেক ও প্রথাগত দিক থেকে প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব হয়েছে। আর তা এরূপ যেভাবে এ বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে যদি সেরূপ হয়, তাহলে তাতে এক প্রকার বিরোধ ও বৈষম্য দেখা দেবে। আর তাতে প্রশংসার সাথে নিন্দা জড়িয়ে যাবে। আর তাতে অবশ্যই কাব্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে। আর অবশ্যই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমান আর মুশরিকদের নিকট তা কখনো গোপন থাকতো না। যখন সাধারণ লোকদের এ অবস্থা হয়। তাহলে বলুন! হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওই বিষয় গোপন থাকবে কীভাবে? যার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তায় সমুন্নত মর্যাদাসম্পন্ন ছিলো। আর বর্ণনার বাচনভঙ্গির দিক থেকেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

(উক্ত বর্ণনাসমূহ ভ্রান্ত হওয়ার) তৃতীয় কারণ এটাও হতে পারে যে, শত্রু, মুনাফিক, মুশরিক ও দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলমানদের অভ্যাস ছিলো যে,

^১. অর্থাৎ যদি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা ছোট কথাও নিজে রচনা করে সেটা আমার দিকে সম্পৃক্ত করতেন তবে আমি তাকে এভাবে প্রতিদান দিতাম। তাঁর এমনি উন্নতি হতো না।

^২. আল কুরআন : সূরা হাক্কাহ, ৬৯:৪৪।

^৩. আল কুরআন : সূরা নবী ইসরাঈল, ১৭:৭৫।

তারা প্রথমবারই এ বিষয় ঘণাবোধ করতো (পক্ষান্তরে তারা তা করেনি) আর ফিতনাবাজ শত্রুদের ওই বিষয় নিজেদের পক্ষ থেকে আরও বিভিন্ন কথা সংযোজন করে মুসলমানদের লজ্জা দিতো, আর তাদের দুঃখ-কষ্টে আনন্দ-উল্লাস করতো। আর অবস্থা এরূপ ছিলো, দুর্বল ঈমানদার লোক যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিলো, কিন্তু তারা ঈমানের প্রকাশ করছিলো, তারা অতি সামান্য সন্দেহে ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যেতো। তবুও তাদের মধ্যে কেউ এ বিষয়ে কোনো অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেনি। যদি এরূপ অবস্থা হতো, তাহলে এর উপর ভিত্তি করে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের উপর জয়যুক্ত হতো। আর তাদের উপর দলিল কায়েম করতো। যেভাবেই তারা মিরাজের ঘটনায় করেছে। তাতে অনেক দুর্বল ঈমানদাররা মুরতাদ হয়ে গেছে। অনুরূপ হৃদয়বিয়ার সন্ধির সময় কোনো কোনো মুসলমান অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। যদি ওই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হতো তাহলে এর চেয়ে বড় ফিতনা আর কী হতে পারতো। দুশমনেরা ওই বিষয়ে হৈ চৈ করতো, কিন্তু কোনো শত্রু একটি কথাও বলে নি, না কোনো মুসলমানের মুখ থেকে এ বিষয় কোনো কথা বের হয়েছে। এসব কথায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ ঘটনা (অর্থাৎ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিমাদের প্রশংসা করা) সম্পূর্ণ মিথ্যা, মনগড়া ও ভিত্তিহীন। আমাদের উল্লেখিত দলিল প্রমাণে মিথ্যাবাদীদের মূল ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ও সংশয় নেই যে, মানুষ, জ্বিন ও শয়তানেরা ওই ঘটনা কোনো কোনো নির্বোধ হাদীস বর্ণনাকারীর মনে জাগিয়ে দিয়েছে, যাতে তা দুর্বল মুসলমানদের অন্তরে এ ঘটনা বর্ণনা করে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করতে পারে।

চতুর্থ কারণ এটা হতে পারে যে, বর্ণনাকারীগণ এ ঘটনাকে এ আয়াতের শানে নুযুল হিসেবে বর্ণনা করেছেন-

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيََا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ
عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا ﴿١٤﴾

-এবং তারা তো নিকটবর্তী ছিলো (হে হাবীব) আপনার পদস্বলন ঘটানোর আমার ওই ওহী থেকে, যা আমি আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি, যাতে আপনি আমার প্রতি অন্যকিছুর সম্বন্ধ গড়ে দেন। আর যদি এমন হতো তাহলে তারা আপনাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু করে নিতো।^১

^১. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭/৭৩।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, উক্ত আয়াত এ খবরকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে, যা ওইসব লোক বর্ণনা করেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বর্ণনা করেন, ওইসব লোক হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে, যাতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেন, আর তাঁর সাথে ওইসব কথা সম্পর্কিত করে দেবে যা তিনি বলেননি। আর যদি আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুদৃঢ় না রাখতেন, তাহলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়তেন। এখন একথা প্রকাশ পেয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয় থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখেছেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এতো সুদৃঢ় রেখেছেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিন্দু পরিমাণ তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েননি, বেশী ঝুঁকে পড়ার প্রশ্ন তো আসতেই পারে না। এ ধরনের মনগড়া বর্ণনাকারী নিজেদের ভ্রান্ত বর্ণনায় একথা উল্লেখ করেছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি এতো বেশী ঝুঁকে পড়েছেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন, আর তাদের প্রতিমাদের প্রশংসা করেছেন, আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **الشَّرِيتُ عَلَى اللَّهِ وَقُلْتُ مَا** - আমি আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছি। আর আমি ওই কথা বলছি যা তিনি বলেননি। অথচ এটা কুরআনের আয়াতের বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ কারণে এ হাদীস দুর্বল হয়েছে। যদি এ হাদীস সঠিক ধরা হয় তবুও এটা মনগড়া বর্ণনা স্থির হবে। একথা এ আয়াতের বর্ণনার মতো হয়েছে -

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ

يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ^১

-এবং হে মাহবুব! যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া আপনার উপর না থাকতো তাহলে তাদের মধ্যকার কিছু লোক এটা চাচ্ছে যে, আপনাকে ধোঁকা দেবে এবং তারা নিজেরা নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করেছে। এবং আপনার কিছুই ক্ষতি করবে না।^২

^১. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১১৩।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা অভিমত হলো যে, কুরআনে যে স্থানে **كَادَ** শব্দ এসেছে এর অর্থ হলো- তা কখনো সংঘটিত হবে না। যথা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ^১

-উপক্রম হয় সেটার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তিকে কেড়ে নেয়ার।^২ অথচ তারা অন্ধ হয়নি।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

أَكَادُ أَخْفِيًا

-এটাই নিকটবর্তী ছিলো যে, আমি সেটাকে সবার নিকট থেকে গোপন রেখে দিই।^৩ অথচ আল্লাহ তা'আলা তা গোপন করেন নি।^৪

কাযী কুশাইরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরাইশ ও সাকীফ গোত্রের প্রতিমাদের নিকট দিয়ে যেতেন, তখন তারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করেছিলো, আপনি যদি একবার এগুলোর প্রতি তাকান, যদি আপনি এরূপ করেন, তাহলে আমরা ঈমান আনবো। কিন্তু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেননি, এরূপ করতে পারেন না।

ইবনে আব্বাসী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না তাদের নিকট গমন করেছেন, না তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। উক্ত আয়াতের আরো অনেক তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে। আমি ইতোপূর্বে তা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অতি স্পষ্ট ভঙ্গিতে তাঁর রাসূলের নিষ্পাপ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। আর এর মাধ্যমে তাদের এ ধরনের ভ্রান্ত বর্ণনাসমূহ বাতিল করা হয়েছে। এখন আয়াতে এ কথা ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট থাকেনি যে,

^১. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৪৩।

^২. আল কুরআন : সূরা ছোয়া-হা, ২০:১৫।

^৩. উক্ত আয়াতসমূহে **كَادَ** শব্দ এসেছে। আর এর সাথে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা সংঘটিত হয়নি, এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, উক্ত আয়াতে **كَادَ** শব্দের সাথে একথা রয়েছে, সম্ভাবনা ছিল যে, তারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পথহারা করে দেবে। এর মর্মার্থ হলো, তারা কখনো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পথহারা করতে পারেনি।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিষ্পাপ ও সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাঁর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। অথচ কাফিররা নিজেদের জীবনবাজি রেখে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, যেভাবেই হোক হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। এসব যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা হলো উক্ত আয়াতের আলোচ্য বিষয়।

যদি ধরে নেওয়া হয়, উক্ত বর্ণনা কি পরিমাণ সঠিক হয়েছে (আল্লাহর শোকর, তিনি উক্ত বর্ণনার বিশুদ্ধতা থেকে আমাকে হিফায়ত করেছেন) এ অবস্থায়ও উম্মাতের আলেমগণ এর অনেক জবাব দিয়েছেন। তন্মধ্যে কোনো কোনো জবাব অতি দুর্বল হয়েছে, আর কোনো কোনো জবাব অতি সুদৃঢ় ও মজবুত হয়েছে।

তন্মধ্যে একটি হলো, বর্ণনার বর্ণনাকারী হযরত কাতাদা ও মুকাতিল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা তাঁরা বলেন, 'হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তন্দ্রা এসেছিলো, আর তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরা পাঠ করতে ছিলেন, তন্দ্রা প্রবল থাকায় তাঁর মুবারক মুখ দিয়ে প্রতিমাদের প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছে'। - একথা সঠিক নয়। কারণ এটা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমামিত মর্যাদা নয়। জায্বত অবস্থায় হোক বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক মুখ দিয়ে কোনো ভুল কথা উচ্চারণ করান না, আর না তাঁর উপর শয়তান জয়যুক্ত হয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সকল প্রকার ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখেছেন।

কালবী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অতিমত হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় অন্তরে একথা ধারণা করেছেন আর শয়তান তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে এসব কথা নিঃসৃত করেছে। ইবনে শিহাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা যা আবু বকর বিন আবদুর রহমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুল হয়ে গেছে, আর যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা স্মরণ করানো হয় তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ** - এটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। - এ কথাও সঠিক নয়। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ বিষয়ও নিরাপদ রাখা হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল করবেন বা এ ধরনের কোনো ভুল কথা বলবেন বা শয়তান তাঁর মুবারক মুখ দিয়ে এ ধরনের কথা বের করতে পারবে।

কেউ কেউ বলেন, সম্ভবতঃ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে কাফিরদের ধমক দেওয়া, আর তাদের নিজেদের ভুলের জন্য সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এরূপ কথা বলেছেন। যেমন- হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম নক্ষত্র সম্পর্কে বলেন, **هَذَا رَيْسِي** - এ আমার প্রভু! যার অর্থ হলো- এটা কী আমার প্রভু হতে পারে? যা প্রতিদিন অন্তমিত হয়ে যায়? অথবা **بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا** - বরং সেগুলোর মধ্যে সম্ভবতঃ ওই বড়টাই করেছে।^১ যখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম প্রতিমাগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেন, আর লোকেরা তাঁকে এ বিষয় প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তাদের বড়টি এ কাজ করতে পারে। সম্ভবতঃ উক্ত আয়াতের প্রথমার্শ আবৃত্তি করার পর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নীরব থাকেন, তারপর তাদেরকে তাদের ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপও ইরশাদ করেছেন, অতঃপর তিনি আবৃত্তি শুরু করেন। আবৃত্তি করার সময় এরূপ বিরতি দেওয়া সম্ভব, বাচনভঙ্গিও এটা প্রমাণ করে যে, এভাবে আবৃত্তিকৃত কুফরী বাক্যসমূহ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

কাযী আবু বকর বলেছেন, এর জন্য এ বর্ণনার বুনিয়াদের উপর অভিমত প্রকাশ করা যায় না যে, "হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের কালাম নামায়ে পাঠ করেছেন।" নামায়ে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু পাঠ করা যায় না। এ কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযের মধ্যে কথা বলার অনুমতি ছিলো।

উক্ত বর্ণনাকে সঠিক বলে সমর্থন করা অবস্থায় সত্যপন্থি আলেমগণ যে ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তা হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলো যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী কুরআন মজীদে আয়াতসমূহ ধীরস্থিরভাবে থেমে থেমে পাঠ করতেন। সুতরাং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিলাওয়াতকৃত প্রতিটি আয়াত পৃথক থাকতো, একথা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন। সম্ভবতঃ ওইসময় শয়তান ঘাপটি মেরে বসেছিলো আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই আয়াতের মধ্যে যে নীরবতা পালন করেন, ওই সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজে নিজের আওয়াজ (সম্পূর্ণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজের) সাদৃশ্য বানিয়ে এভাবে পড়ে দেয়। হতে পারে তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

^১ আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৭৬।

^২ আল কুরআন : সূরা আযিয়া, ২১:৬৩।

ওয়াসাল্লামের নিকট যেসব কাফির বসা ছিলো, তারা তা শুনতে পায়। আর এটাকে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ মনে করে সবার মধ্যে প্রচার করে দেয়। ওই সময় উপস্থিত মুসলমানগণও এটাকে মতবিরোধপূর্ণ মনে করেনি, এজন্যই যে ওই সূরাসমূহ তাদের কণ্ঠস্থ ছিলো। আর তারা একথা ভালো করে জানতো যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা প্রতিমাদের নিন্দা করতেন। এ ধরনের বর্ণনা ঐতিহাসিক মুসা যিনি ওকবা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর রচিত “মাগাজী” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের কুফরীমূলক বাক্য ওইসময় উপস্থিত মুসলমানদের কেউ শুনতেই পায়নি, বরং শয়তান ওই ধরনের কথা মুশরিকদের কানে ও অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। আর অন্য বর্ণনায় এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন, আর তা এ জন্য নয় যে, এ ধরনের কুফরী বাক্য হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জ্বানে কেনো প্রকাশ পেয়েছে, বরং ওই ধরনের মিথ্যা প্রচারণা তাঁর চিন্তার কারণ হয়েছিলো।

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ করেন—

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

—আর আমি আপনার পূর্বে যত রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি সবার উপর কখনো এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে, যখনই তারা পাঠ করেছে, তখন শয়তান তাদের পড়ার মধ্যে মানুষের উপর কিছু নিজ থেকে সংযোজন করে দিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ মুছে দেন ওই শয়তানের ওই সংযোজিত অংশটুকু, অতঃপর আল্লাহ আপন আয়াতসমূহ সুদৃঢ় করে দেন। আর আল্লাহ জ্ঞানবান, প্রজ্ঞাময়।^১

এখানে তَمَنَّى এর মর্মার্থ হলো, তিলাওয়াত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ এ অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে যে, নিরঙ্কর লোকেরা কিতাব সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা, কিন্তু মৌখিকভাবে পড়তে জানে মাত্র।^২

^১. আল কুরআন : সূরা হজ্জ, ২২:৫২।

^২. আল কুরআন : আল বাকারা, ২:৭৮।

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ আল্লাহ তা'আলা শয়তানের পক্ষ থেকে ঢেলে দেওয়া কথাসমূহ বিলুপ্ত করে দেন।^১ অর্থাৎ সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয় বিদূরীত করে স্বীয় আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় ও মজবুত করে দেন।

কেউ কেউ বলেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হলো, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতসমূহ আবৃত্তি করায় যে ভুল হতো, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করে দিতেন। আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ভুল থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন। কালবী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছেন। কালবী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু إِذَا تَمَنَّى শব্দের অর্থ নিজের কথা বলেছেন।

হযরত আবু বকর বিন আবদুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহুও এ ধরনের অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন পাঠে এ ধরনের ভুল হয়ে যেতো, তাতে না অর্থে কোনো পরিবর্তন হতো, না তাতে শব্দে কোনো পরিবর্তন হতো, আর না তাতে কুরআন মজীদে কোনো প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি হতো, বরং কোনো কোনো সময় এরূপ হতো যে, কোনো কোনো আয়াত বাদ পড়ে যেতো বা বাক্যের মধ্যে কোনো বাক্য বাদ পড়ে যেতো ভুল অবশিষ্ট থাকতো না। বরং আল্লাহ তা'আলা সর্বদা এ বিষয় তাঁকে সতর্ক করে দিতেন। পরবর্তী অধ্যায় আমি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। সেখানে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ পাওয়া বৈধ কিনা এবং কোনটি তাঁর জন্য সম্ভব আর কোনটি তাঁর জন্য অসম্ভব এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতায় আলোচনা করা জরুরী মনে হয় যে, হযরত মুজাহিদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন যদি আমরা الْقُرْآنَ الْعَلَى সম্বলিত বাক্যকে সমর্থন করি, তাহলে আমরা বলবো যে, ঠিক আছে আমরা মেনে নিলাম যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম الْقُرْآنَ ইরশাদ করেছেন। যদি এরূপ হয়েও থাকে তাহলেও ক্ষতির কোনো কারণ নেই। কারণ أَنْ شَفَاعَتُهُمْ لَتَرْجَبُنَّ যাদের শাফায়াতের আশা করা যায় তা প্রতিমা নয়, কারণ الْقُرْآنَ الْعَلَى এর মর্মার্থ হলো ফিরিশতা। এর ব্যাখ্যায় কালবী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এর অর্থ ফিরিশতা। এ কারণে কাফিরদের

^১. আল কুরআন : সূরা হজ্জ, ২২:৫২।

বিশ্বাস ছিলো যে, প্রতিমা ও ফিরিশতারা আল্লাহ তা'আলার কন্যা। এ কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে উল্লেখ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা বাতিল করে দেন। যথা সূরা- আন-নাযম ইরশাদ করা হয়েছে-

الَّذِينَ يَدْعُونَ لِلَّهِ وَاللَّاتِ وَالْأُتَى

-তোমাদের জন্য কী পুত্র আর তাঁর জন্য কী কন্যা?^১
আল্লাহ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত ধারণা বাতিল করে দেন। তবে ফিরিশতাদের শাফায়াতের আশা করা বৈধ। আর যখন মুশরিকরা এই ব্যাখ্যা করেছে যে, الذِّكْرُ এর অর্থ তাদের প্রতিমা। শয়তান তাদের মধ্যে সন্দেহ ঢেলে দেয়। আর তাদের অন্তরে তা ভালভাবে বদ্ধমূল করে দেয়। তাই আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত রহিত করে দেন। যা শয়তান তাদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছে। আর এভাবে তিনি স্বীয় আয়াতসমূহ সুদৃঢ় ও মজবুত করে দেন। এসব কথা ও শব্দসমূহ অর্থীঃ الذِّكْرُ ও الْاُنثَى এর তিলাওয়াতকে যার কারণে শয়তান পথ পেয়ে যায়। সন্দেহের কারণে তা রহিত করে দেওয়া হয়। যথা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে কতিপয় আয়াতকে রহিত করে দেন।

উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করায় আল্লাহ তা'আলার হিকমত ছিলো। আর তা রহিত করার মধ্যেও বিশেষ রহস্য ছিলো। তাহলো, আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন তাকে পথভ্রষ্ট করেন, যাকে হিদায়াত দানের ইচ্ছা করেন, তাকে হিদায়াত দান করেন। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা ফাসিক ছিলো।

আল্লাহ তা'আলার বাণী-

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ

فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ

^১. আল কুরআন : সূরা আন-নাযম, ৫৩:২১।

-যাতে শয়তানের সংযোজিত বিষয়কে ফিতনা করে দেয় তাদের জন্য, যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে এবং যাদের হৃদয় পাষণ, আর নিশ্চয় জালিমরা দুষ্টের মতভেদে রয়েছে। এবং এজন্য যে, জানতে পারে ওইসব লোকও, যারা জ্ঞান লাভ করেছে, যে তা আপনার প্রভুর নিকট থেকে সত্য; অতঃপর তারা যেন সেটার উপর ঈমান আনে, অতঃপর সেটার জন্য ঝুঁকে যায় তাদের অন্তরসমূহ। আর নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সরলপথে পরিচালনাকারী।^১

কোনো কোনো লোক বলে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উক্ত সূরা পাঠ করেন আর লাভ, উজ্জা ও তৃতীয় মানাতের আলোচনা পর্যন্ত পৌছেন, তখন কাফিরা ভীত হয়ে পড়ে, না জানি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কথা ইরশাদ করেন যাতে তাদের প্রতিমাদের দুর্নাম প্রকাশ পায়। তখন তারা ওই দু' বাক্য (الذِّكْرُ ও الْاُنثَى) এর দ্বারা প্রতিমাদের প্রশংসা শুরু করে দেয়। এভাবে তারা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবৃত্তি করা আয়াতসমূহ আর নিজেদের বাক্যসমূহের মাঝে মিশ্রিত করে দেয়। আর স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুর্নাম রটায় বা হট্টগোল করে, যা তারা অধিকাংশ সময় করতো।

যেমন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে ইরশাদ করেন,

لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

-এ কুরআন শ্রবণ করো না। আর তাতে অনর্থক শোরগোল করো, হয়তো এভাবেই তোমারা জয়ী হতে পারো।^২

তাদের এ কাজে শয়তানের পক্ষ থেকে আরো বেশী বেশী করে উৎসাহ দেওয়া হয়। আর শয়তান এ কাজ বেশী বেশী করে প্রচার করে একথা বলে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিমাদের প্রশংসা করেছেন, আর তাঁর প্রতি মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে, ফলে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁকে সজ্ঞনা প্রদান করেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى

الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ

^১. আল কুরআন : সূরা হজ্ব, ২২:৫৩-৫৪।

^২. আল কুরআন : আল ফুসলিলাত, ৪১:২৬।

-আর আমি আপনার পূর্বে যত রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি সবার উপর কখনো এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে, যখনই তারা পাঠ করেছে, তখন শয়তান তাদের পড়ার মধ্যে মানুষের উপর কিছু নিজ থেকে সংযোজন করে দিয়েছে।^১

আল্লাহ তা'আলা হক ও বাতিলকে পৃথক পৃথক করে আয়াতসমূহ সুদৃঢ় করে দেন। দুষমনেরা যে সন্দেহের অবতারণা করেছে তা দূর করে দেন, অতঃপর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আয়াতসমূহ সুদৃঢ় করে দিয়ে সর্বকালের জন্য কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যেমন ইরশাদ করেছেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٠﴾

-নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই সেটার সংরক্ষক।^২

এর ধারাবাহিকতায় হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর ঘটনা বর্ণনা করা যায় যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে স্বীয় সম্প্রদায়কে আযাব আসার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা করে। আর আযাব দূর হয়ে যায়। তখন হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম বললেন, আমি তো মিথ্যাবাদী হয়ে গেছি। এ কারণে আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাবো না। একথা বলে হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম রাগান্বিত হয়ে চলে যান।

এর জবাব জেনে নিন, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সম্মান দান করুন। এ বিষয় যেসব বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে কোনো বর্ণনায় একথা বলা হয়নি যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে একথা বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংসকারী। বরং ওই বর্ণনাসমূহে বলা হয়েছে যে, তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট বদ-দোয়া করেন। প্রকাশ থাকে যে, 'বদ-দোয়া' তো কোনো খবর নয় যে, তা সত্য হওয়ার দাবী করা যায়। তবে তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেন, অমুক সময় তোমাদের উপর আযাব আসবে। আর তাঁর কথা অনুযায়ী তাদের উপর নির্দিষ্ট সময় আযাব এসেছেও। তারপর তাদের তাওবা করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে দেন, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

^১. আল কুরআন : আল হুজ্ব, ২২:৫২।

^২. আল কুরআন : সূরা হিজর, ১৫:৯।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ءَازَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ

إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١﴾

-তবে এমন কোন জনপদ নেই (যারা আমার আযাব দেখে) ঈমান এনেছে, অতঃপর সে ঈমান তাদের কাজে এসেছে, কিন্তু একমাত্র ইউনুসের সম্প্রদায়। যখন (তারা) ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের থেকে লাঞ্ছনার শাস্তি পার্শ্ববর্তী জীবনে অপসারিত করে দিয়েছি, এবং একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদেরকে ভোগ করতে দিয়েছি।^১

হযরত ইবনে মাসউদ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তারা আযাব আসার নমুনা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে।

হযরত সাঈদ বিন জোবায়ির রাহিয়াল্লাহু আনহু বলেন, গিলাফ যেভাবে কবরকে আচ্ছাদিত করে ফেলে ঠিক সেইভাবে আযাবও তাদের আচ্ছাদিত করে ফেলে।

যদি এ বিষয় মতভেদ করা হয়, তাহলে হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ সম্পর্কে বর্ণিত, সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত লেখক ছিলো, পরে মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। আর কুরাইশদের বলতে শুরু করে যে, আমি যে দিকে ইচ্ছে করি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে দিকে ফেরাতে পারি। (নাউয়িবিল্লাহ), যেমন তিনি আমাকে বললেন, عَلِيمٌ حَكِيمٌ লিখো, তখন আমি বললাম, আমি কি عَلِيمٌ حَكِيمٌ লিখতে পারবো?। তখন তিনি বললেন হ্যাঁ, উভয়টি সঠিক।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, সে বলেছে যে, আমাকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন এভাবে লিপিবদ্ধ করো। তখন আমি বলতাম এভাবেও কি লিখতে পারবো? তখন তিনি বলতেন, তোমার মন যেভাবে চায় সেভাবে লিপিবদ্ধ করো।

তিনি আমাকে বললেন, عَلِيمٌ حَكِيمٌ লিখো, তখন আমি বললাম, আমি কি عَلِيمٌ حَكِيمٌ লিখেছি। তখন তিনি বললেন, তোমার মন যেভাবে চায় সেভাবে লিপিবদ্ধ করো।

^১. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০:৯৮।

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় সহীহ হাদীসে বর্ণিত, জনৈক খ্রিষ্টান মুসলমান হয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেখক নিযুক্ত হয়। পরবর্তী সময় সে মুরতাদ হয়ে বলতে শুরু করে- আমি যা লিপিবদ্ধ করতাম হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মেনে নিতেন। (নাউয়ুবিল্লাহ)

এর উত্তর জেনে নিন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিক পথে সুদৃঢ় রাখুন। আর শয়তানকে এ সুযোগ না দেয় যে, সে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলিত করে আমাদের পথভ্রষ্টতায় ফেলে দেবে। প্রথমতঃ এ বিষয় কোনো মু'মিনের অন্তরে যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করতে না পারে। কারণ এটা ধর্মত্যাগী ও কাফেরদের কথা, তারা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকারকারী হয়ে গেছে। আমাদের অবস্থা হলো এরূপ, আমরা ওই মুসলমানের বর্ণনা গ্রহণ করি না, যারা কোনো কারণে অভিযুক্ত হয়েছে। তাহলে বলুন, ওই কাফিরের কথা কীভাবে মেনে নেবো, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা বলে? যদি কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মুসলমান এ কথা সঠিক বলে মেনেও নেয়, তাহলে তার সম্পর্কে আশ্চর্য হওয়া ছাড়া আমাদের করণীয় আর কী থাকতে পারে? এ ধরনের কথা তো কেবল ওই ধরনের লোকদের দ্বারা প্রকাশ হতে পারে, যারা কাফির, দ্বীনের দুশমন ও দ্বীনের বিষয়ে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে। আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে। ওই বর্ণনা কোনো সাহাবী বা কোনো সুস্থবিবেকবান ব্যক্তি নকল করেনি। পক্ষান্তরে সে ওইসব বিষয়সমূহের সাক্ষী হয়েছে। মূলতঃ ওই কাফির হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছে। আর এ ধরনের মিথ্যা ওইসব লোক আরোপ করতে পারে, যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস রাখে না। শুধু তারাই ওই ধরনের মিথ্যা বলতে পারে, এরা সবাই মিথ্যাবাদী। আর হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন, বরং তিনি শ্রুত কথা বর্ণনা করেছেন। বায্যার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনাকে দুর্বল বলে সনাক্ত করেন। হযরত সাবিত রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা অন্য কোনো সূত্রে বর্ণিত হয়নি। আর হুমাইদী হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এ সংক্রান্ত যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন তাতেও প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত সাবিত রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।

কাযী আবুল ফযল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এ কারণে সাবিত ও হুমাইদী থেকে বর্ণিত হাদীস বাতিল বলে গণ্য করা হয়নি। আর এ সহীহ হাদীস যা আব্দুল আযীয বিন রুফাই হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, যা বিত্ত্ব হাদীস বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন, আমিও তা উল্লেখ করেছি। উক্ত বর্ণনায় হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলেননি। বরং তিনি এক ধর্মত্যাগী খ্রিষ্টানের মনগড়া কথা উদ্ধৃত করেছেন। যদি এ হাদীস সঠিক হয়, তাহলেও তাতে ক্ষতির কারণ নেই, কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর না হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন প্রচারে কোনো প্রকার ভুলত্রুটি বা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা যে কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করেছেন তার ছন্দ্যবদ্ধতা বা বিষয়বস্তুতে অদ্যাবধি কোনরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারেনি। এখন অবশিষ্ট রইলো লেখকের আয়াতের শেষে **عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ** লিখে দেয়া, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন এরূপ হবে। এরূপ হওয়ার কারণ হলো, লিখকের কলম ও জবান এ বাক্যদ্বয়ের প্রতি অগ্রগামী হয়ে গেছে। আর প্রথমে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রকাশ করে দেন। তার পর লেখক তা লিপিবদ্ধ করেছে। এটা আশ্চর্যজনক কথা নয়। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। তাই ঐ আয়াত ঐ বাক্য সমূহের প্রত্যাশা করেছে। এর দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, লেখক মেধাবী ছিলো বাক্যের ধরণ ও ভাবভঙ্গি বুঝতো। এ ধরনের মেধা ও কথার ব্যাখ্যা অধিকাংশ সময় পাওয়া যায় যে, একজন মেধাবী লোক কবিতা শুনছে আর তখন তার মেধাশক্তি কবিতার ছন্দের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। অথবা কেউ কোনো ভালো কথা শুনছে, তখন তার মেধাশক্তি ওই ধরনের বাক্য প্রণয়নের প্রতি এগিয়ে যায়। তবে এ আপেক্ষিকতা পুরো বাক্যে পাওয়া যায় না, এই ধরনের আপেক্ষিকতা পুরো এক আয়াত বা পুরো সূরার মধ্যে হয় না।

যদি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী “সব ঠিক আছে” সঠিক ধরা হয়, তাহলে তার জবাব হলো এই যে, কখনো কোনো আয়াতের সমাপ্তিতে দু'ধরনের কিরাত হতে পারে। আর উভয় কিরাতই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তন্মধ্যে এক কিরাত এক লেখক দ্বারা লিপিবদ্ধ করাতেন। আর লেখকের মেধা বাক্যের চাহিদা অনুযায়ী হওয়ার কারণে দ্বিতীয় কিরাতের প্রতি ধাবিত হতো। তাই লেখক তা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করতো। এরপর হযুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যেটা ইচ্ছা সুদৃঢ় করে দেন, আর যেটা ইচ্ছা রহিত করে দেন। এরূপ মতভেদ বিভিন্ন আয়াতের শেষে বিদ্যমান পাওয়া যায়। যেমন—

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴿٥٠﴾

—যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা আপনারই বান্দা এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিঃসন্দেহে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।^১

এই কিরাত জমহুর আলেমদের নিকট গৃহীত হয়েছে। কিন্তু একদল আলেম فَاِنَّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ পাঠ করতেন। কিন্তু এ কিরাত ওসমানী সংকলনে নেই। অনুরূপ ওই বাক্যসমূহ যা আয়াতের সমাপ্তিতে নেই। বরং আয়াতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাও দু'রকম হয়েছে। জমহুর আলেমগণ উভয় কিরাত পাঠ করেন। যথা—

وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ تُنْشِرُهَا.

উভয় বিদ্যমান রয়েছে। অথবা تُنْشِرُهَا ইত্যাদিতে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু এই মতবিরোধ কোনো সন্দেহের কারণে হয়নি। আর না এর দ্বারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কোনো প্রকার ভ্রান্ত ধারণা দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পরিবর্তনের এই বিষয়টি কুরআনুল কারীম ছাড়া অন্যান্য বিষয় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের উদ্দেশ্যে লিখাতে চেয়েছেন তাতে সংঘটিত হয়েছে, কিংবা সমার্থবোধক ওই শব্দাবলী দ্বারা বাক্যের দাবী ও ভাষ্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

^১. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫:১১৮।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
فَيَايَتُصِلُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَأَحْوَالِ نَفْسِهِ

আত্মিক ও দুনিয়াবী দিক থেকে হযুর ﷺ এর নিষ্পাপ হওয়া প্রসঙ্গে

পূর্ববর্তী অধ্যায় যা আলোচনা করা হয়েছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনপ্রচারের পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্কলুষ হওয়া প্রসঙ্গে ছিলো। কিন্তু ওই বিষয় সমূহ যা তাঁর প্রচার কাজের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং তা শুধু স্ববর বা বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত বিষয়ক, আর না তাতে শরীয়াতের বিধান প্রমাণিত হয়েছে, আর না তাতে পরকাল সম্পর্কিত বিষয়ক বার্তা ছিল, বরং তা পার্থিব বিষয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত হবে। তা যাই হোক তাঁর সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখা জরুরী যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংঘটিত ঘটনার বিপরীত কোন কথা বলেন নি, চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক, অথবা ভুলবশতঃ। এরূপ ধারণা পোষণ করতে হবে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভ্রষ্ট-অসম্ভ্রষ্ট, ভাব-গম্ভীর, আর হাসি-খুশি, সুস্থ-অসুস্থ সর্বাবস্থায় ভুলভ্রান্তি থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিলেন। এর প্রমাণ হলো এই যে, পূর্ববর্তী মহামনীষীগণ এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন, আর ওই বিষয়ে তাদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা সাহাবায়ে কেরামের দ্বীন ও ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়েছি। আর একথাও মান্য করতে হবে যে, সাহাবায়ে কেরাম হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় অবস্থা সত্যায়ন করেছেন। তাঁরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব বাণীর উপর পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, সেটা যে ব্যাপারেই হোক কিংবা যেকোন ঘটনার ক্ষেত্রেই হোক, তাঁরা তা নিঃসন্দেহে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা করতেন না, আর না তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেন, আর না তাঁরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কারণ জানতে চাইতেন, আর না প্রমাণ দাবী করতেন যে, এ বিষয়ে কোনো প্রকার ভুলভ্রান্তি হয়েছে কিনা?

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইবনে আবুল হুকাযিক নামক ইহুদীকে খাইবার থেকে বহিষ্কার করেন। সে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিকট প্রমাণ দাবী করে বললো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্থায়ীভাবে খাইবার অঞ্চলে বসবাস করার অনুমতি দান করেন। তখন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার সম্পর্কে বলেন, كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ? “যখন তোমাকে খাইবার থেকে বহিষ্কার করা হবে, তখন তোমার কী অবস্থা হবে? তখন সেই ইহুদী বললো,

আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাকে কৌতুকচ্ছলে একথা বলেছেন, তখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ -‘হে আল্লাহ তা'আলার দূশমন! তুমি মিথ্যা বলছো’।

এভাবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পার্শ্ব দিক থেকে নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ হলো যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন, স্বভাব, আচরণ, উত্তম গুণাবলীসমূহ খুব সতর্কতা, সততা আর নিষ্ঠার সাথে বিস্তারিত আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে একবারও একথা বলা হয়নি যে, তিনি তাঁর ভুলের জন্য অনুশোচনা করেছেন, কিংবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিষয় খবর দিয়েছেন, তাতে ভুল হয়েছে বলে সন্দেহ পোষণ করেছেন। যদি এরূপ কোনো ঘটনা ঘটতো তাহলে অবশ্যই হাদীসে তা বর্ণিত হতো। যেমন খেজুরের পরাগায়ণ সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আনসারদের যা বলেছেন। তা থেকে প্রত্যাবর্তন করার কথা বর্ণিত আছে।^১

পরাগায়ণ নিষেধ করা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক অভিমত ছিলো, এটা কোনো খবর ছিলোনা। (যার সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তব ঘটনার বিপরীত কোনো কথা বলেছেন)। এছাড়াও এ ধরনের আরো অনেক কথা রয়েছে যা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়, তা খবরের আলোকে আসে না।

যেমন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَاللَّهُ لَا أَخْلَفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا فَعَلْتُ الَّذِي خَلَفْتُ عَلَيْهِ وَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي.

-আল্লাহর শপথ আমি যখন কোনো বিষয়ে শপথ করে ফেলি, তারপর তার থেকে উত্তম কোনো বিষয় যদি আমার দৃষ্টিগোচর হয়, যা আমি না

^১. আনসারগণ পূর্ব থেকে নর খেজুরকে মাদী খেজুরের সাথে পরাগায়ণ করতো, তাতে ফলন বেশী হতো। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা জানার পরে বললেন, আমি এরূপ করা অপছন্দ করি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তা অপছন্দ করতে দেখে আনসাররা পরাগায়ণ বন্ধ করে দেয়। ফলে ওই বছর ফলন অনেক কম হয়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা জানার পর তাদের একথা বলে পরাগায়ণ করার অনুমতি দিয়ে বললেন, তোমরা ক্ষেত খামার ও দুনিয়ার কাজে আমার চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ। যদি পরাগায়ণের কারণে ফলন বেশী হয়, তাহলে তোমরা তা করো। (সহীহ আল-মুসলিম)

করার শপথ করেছি, তখন আমি তা করবো আর শপথ ভঙ্গ করার কাফ্ফারা বা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেবো।^১

আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইরূপ বলা যে,

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ.

-তোমরা আমার নিকট মোকাদ্দমাসমূহ নিয়ে আসো।^২

অথবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ বলা যে,

اسْقِ يَا رَبِّيزُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ الْجَذَرَ.

-হে জোবায়ির! তুমি তোমার ভূমিতে এভাবে পানি সেচ দাও যেন প্রান্ত সীমায় পানি পৌঁছে যায়।^৩

^১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু লা তাখালিফু বি আবায়িকুম, ২০:৩৩১, হাদিস নং : ৬১৫৮।

খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুল কাফ্ফারা কবলাল হানসি, ১২:৮৯, হাদিস নং : ৩৭২০।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী আবু মুসা আশ'আরী, ৪০:২৩১, হাদিস নং : ১৮৯১৪।

^২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মান আকামা বাইয়ানাযু বা'দাল ইয়াকীন, ৯:১৭৬, হাদিস নং : ২৪৮৩।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুল মাহকাম বিয় যাহিরা, ৯:১০২, হাদিস নং : ৩২৩১।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুল হকমি বিয়-যাহিরা, ১৬:২৪২, হাদিস নং : ৫৩০৬।

এ ঘটনা হাদীসে এভাবে বর্ণিত আছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আমার নিকট মোকাদ্দমা নিয়ে আসো। আর এক ব্যক্তি তার জোরালো বক্তব্যের দ্বারা তার মোকাদ্দমা প্রমাণ করে। আমি তার পক্ষে রায় দেই। তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে এক ব্যক্তি মিথ্যা মোকাদ্দমা নিয়ে আসে, আর আমি তার জোরালো বর্ণনা শুন্য পরে তার পক্ষে রায় দিয়ে যদি এক খণ্ড যমীন তাকে দিয়ে দিই, তাহলে মনে রাখবে আমি তাকে যমীনের টুকরা দেইনি, বরং তাকে জাহান্নামের এক টুকরা দিয়েছি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট মিথ্যা মামলা নিয়ে আসবে না।

^৩. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ওরবিল আলা কুবলাল আসফাল, ৮:১৭৮, হাদিস নং : ২১৮৮।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুল উজুবী ইতবাযিহি, ১২:৪১, হাদিস নং : ৪৩৪৭।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ওয়া মিন সূরাতিন্ নিসা, ১০:২৮৯, হাদিস নং : ২৯৫৩।

এ ঘটনা অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার হযরত জোবায়ির রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাগানে পানি সেচ দেয়, তখনও পুরো জমিতে পানি সেচ দেয়া হয়নি, তার পাশের বাগানের আনসারী মালিক সেচকর্ম বন্ধ করে পানি ছেড়ে দেয়ার দাবী করে। হযরত জোবায়ির রাদিয়াল্লাহু আনহু সেচকর্ম বন্ধ করতে অস্বীকার করেন। তাই ওই আনসারী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিচার পেশ করে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বলে সেটার মীমাংসা করেন যে, জোবায়ির প্রথমে পানি সেচ দেবে, তারপর সে পানি সেচ বন্ধ করে পানি ছেড়ে দেবে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই রায় শুন্য পর আনসারী বললো, জোবায়ির যেহেতু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো ভাই, তাই তিনি তাঁর পক্ষে রায় দিয়েছেন, আর এ ধৃষ্টতা দেখানোর পরে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বললেন, জোবায়ির তার যমীনে এতো পানি সেচ দেবে যাতে যমীনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত

অনুরূপ আরো অনেক জটিল ঘটনা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব (ইনশাআল্লাহ)।

আর এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, যদি কোনো লোকের মাধ্যমে কোনো মিথ্যা খবর প্রকাশ পায়, কিংবা ওই লোকদের কথায় সন্দেহ দেখা দেয়, তখন ওই লোকের কথার গ্রহণযোগ্যতা থাকেনা, আর না ওই কথা মানুষের মনে বদ্ধমূল হতে পারে। একারণে হাদীসবেস্তা ও আলেমগণ এমন ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণ অযোগ্য বলে বর্জন করেন, যাদের বর্ণনায় সন্দেহ পাওয়া যায় বা যারা অলস ও অসতর্ক হয়, বা যাদের স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে অতিমাত্রায় ভুলের আশঙ্কা থাকে, যদিও ওই ব্যক্তি অন্যদিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য হোক।

দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, দুনিয়াবী ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলা গুনাহ, আর অধিকহারে মিথ্যা বলা সর্বসম্মতিক্রমে কবির গুনাহ। তাতে মানুষের মর্যাদা ভুলুষ্ঠিত হয়। যখন কোনো বিজ্ঞ আলেম বা জ্ঞানী লোকের মর্যাদা মিথ্যা বলার কারণে ভুলুষ্ঠিত হয় তাহলে বলুন, নবুওয়াতের মর্যাদার জন্য তা কী করে সম্ভব হতে পারে?

নবুওয়াতের মর্যাদা ওইসব দোষত্রুটি মুক্ত। যদি একবার মিথ্যা কথা বলা হয়, তাহলে তা মিথ্যা উচ্চারণকারীকে দোষী বানিয়ে দেয়। আর এ ধরনের লোকের কথা সন্দেহযুক্ত হয়। চাই আমরা ওই গুনাহকে সগিরা গুনাহই বলি না কেনো। সুতরাং বিত্ত্ব কথ্য হলো যে, নবুওয়াত যাবতীয় মিথ্যা থেকে পবিত্র, চাই তা কম হোক বা বেশি, ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়। কারণ নবুওয়াতের মূল কাজ হলো প্রচার-প্রসার, বিশুদ্ধ বর্ণনা উপস্থাপন ও আনীত বাণীর সত্যায়ন প্রতিষ্ঠা করা।

আর আমাদের বিশ্বাস হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে আগমন করেছেন তা সবই সঠিকভাবে প্রচারিত হয়েছে। সুতরাং ওই বিষয় সমূহকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্কিত করা নবুওয়াতের মহান মর্যাদায় সন্দেহ উদ্বেককারী ও সংশয় সৃষ্টিকারী। সুতরাং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা নবুওয়াত লাভের পূর্বে বাস্তবঘটনার বিপরীত কোনো কথা প্রকাশ হয়নি আর না নবুওয়াত লাভের পরে প্রকাশ পেয়েছে। আর এরূপ

পানি পৌছে যায়, আর সে পানি ছেড়ে দেবে না। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উক্ত আয়াত নাযিল হয়- **لَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْعَلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَزَنًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَتُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ** -হে মাহবুব! আপনার প্রভু শপথ, তারা মুসলমান হবে না যতক্ষণ পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না। অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন; তাদের অন্তর সমূহে সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা পাবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে। (সূরা: নিসা:৬৫)

সম্বন্ধ তাঁর মুজিয়ারও পরিপন্থি হবে। সুতরাং আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আশিয়ায়ে কেরাম যা ইরশাদ করেন, তা কস্মিনকালেও বাস্তব ঘটনার বিপরীত হতে পারে না, চাই এ বাণী ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত হোক। যে ব্যক্তি অলসতা আর অসতর্কতায় এরূপ বলে যে, ভুলবশতঃ আশিয়ায়ে কেরাম দ্বারা বাস্তবতার বিপরীত ঘটনা সংঘটিত হতে পারে, আমরা তাদের ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাসী নই। কারণ এ কথা তাঁদের ত্রুটিপূর্ণ ও সন্দেহযুক্ত করে দেয়, আর এতে মানুষের অন্তরে তাঁদের সম্পর্কে ঘৃণা দেখা দেয়, মানুষ তাঁদেরকে সত্যায়ন করে না। আমরা দেখতে পেয়েছি কুরাইশরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কীরূপ বৈরী মনোভাব পোষণ করতো, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন কুরাইশদের নিকট হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতো, তখন তারা ভীষণ শত্রুতা পোষণ করা সত্ত্বেও নিঃসঙ্কোচে বলতো, তিনি সদাসর্বদা সত্য কথা বলে থাকেন। এভাবে তারা তাঁর সত্যবাদিতার কথা অকপটে স্বীকার করতো। মোদাকথা, বর্ণনাসমূহে সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমত্যে উপনীত হয়েছে যে, আমাদের নবী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে উপরোল্লিখিত সকল প্রকার গুনাহ থেকে নিষ্পাপ ছিলেন। আমি তা এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, যা তাঁর বাণীর সত্যতা ও সত্যতা প্রমাণ করে। আমি এখানে শুধু সে বিষয়ের ইঙ্গিত করেছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

رَدُّ بَعْضِ الْإِعْزَاضَاتِ

কতিপয় আপত্তির নিরসন

যদি তোমরা বলো যে, ভুল সংক্রান্ত হাদীসের ধারাবাহিকতায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা ইরশাদ করেছেন, তার মর্মার্থ কী হবে? যার বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, তিনি বলেন, একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের ইমামতি করেন, আর দু'রাকাআত নামায আদায়ের পর সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করেন, তখন হযরত জুল ইয়াদাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি নামায সংক্ষিপ্ত করেছেন, না ভুল হয়েছে? তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, كُلُّ ذَلِكَ - এর মধ্যে কোনোটিই নয়।^১ অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, مَا قَصُرْتُ الصَّلَاةَ وَمَا نَسِيتُ - না নামায সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, আর না আমি ভুল করেছি।^২ এভাবে তিনি উভয় অবস্থায় নিষেধ করেছেন। অথচ উভয় অবস্থার মধ্যে এক অবস্থা তো হয়েছে। যথা হযরত জুল ইয়াদাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন। আলেমগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন, তন্মধ্যে অনেকে ন্যায়সঙ্গত উত্তর দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ এর বিপরীত জবাব দিয়েছেন। যেসব লোক এ বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন, তাদের বক্তব্য আমি পূর্বেই বাতিল করে দিয়েছি। তাদের অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে হাদীসটির ব্যাপারে জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে যেসব লোক 'হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা ভুলত্রুটি সম্পন্ন হতে পারে না' আকিদা পোষণ করে, তারা এভাবে হাদীসসমূহ সম্পর্কে ধারণা করে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেনে-গুনে ইচ্ছাকৃত ভুল করেছেন, যাতে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সুতরাং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, لَمْ أُنْسَ -

^১ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু সাহ ফীস্ সালাত, ৩:২১৩, হাদিস নং : ৮৯৭।

খ) নাসায়ী : আস্ সুনা, বাবু হাল ইয়াজুজু আন তাকুনা সিদ্ধাতান্ আতওয়ালু, ৪:৩৪৪, হাদিস : ১১২৯।

গ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা ইয়াফআলু মিন সালামিন, ১:২৮৩, হাদিস নং : ১৯৬।

^২ ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা ইয়াফআলু মিন সালামিন, ১:২৮৪, হাদিস নং : ১৯৭।

খ) নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ১:২০০।

গ) ইবনে খুযাইমা : আস্ সহীহ, বাবু সাহ ফীস্ সালাত, ৪:১৬৬, হাদিস নং : ৯৮০।

“আমি ভুল করিনি।” হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাঁর নিজ খবরে সত্যবাদী ছিলেন। কারণ প্রকৃতপক্ষে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলে যাননি, না নামায সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়েছে। তবে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করেছেন যাতে ভুল করার বিষয়টি অনুসরণীয় ব্যক্তির ভুল থেকে উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, এ অভিমত গ্রহণ। আমি পরবর্তীতে এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করবো।

কিন্তু যদি এ কথা বলা হয় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুল হওয়া অসম্ভব ছিলো, তা কাজের বৈধতা পাবেনা। আমি অচিরেই বিষয়টি উল্লেখ করে এর কতিপয় জবাব দেবো।

প্রথমত: জবাব হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আন্তরিক বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী খবর দিয়েছেন। কসর বা ত্বাসের অস্বীকৃতি তো বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থায় বৈধ হয়। কারণ প্রকাশ্যে ধারণা হয় যে, কমতি হয়নি। বাকী রইলো ভুলে যাবার বিষয়। এ সম্পর্কে বলা যায় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ধারণা অনুযায়ী খবর দিয়েছেন। আর তাহলো এই যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বী। ধারণা অনুযায়ী ভুলে যান নি। সম্ভবত: এ বিষয় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে খবর দিয়েছেন, তিনি স্বীয় ধারণা অনুযায়ী তা ইচ্ছা করেছেন, যদিও তিনি তাঁর ধারণার কথা উল্লেখ করেন নি। আর এটা সঠিক হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা বলা যে, আমি ভুলে যায়নি, তা সালাম সম্পর্কে বলেছেন, অর্থাৎ আমি যে সালাম ফিরিয়েছি তা ইচ্ছাকৃতই করেছি। তবে রাকাআতের সংখ্যায় ভুলে গেছি। অর্থাৎ তা হলো এই যে, আমি সালামে ভুল করিনি, এ জবাব সন্দেহযুক্ত হয়েছে। এটা দূরবর্তী ব্যাখ্যা।

তৃতীয়ত: এ জবাব আরো বেশী দূরবর্তী, তবুও কতিপয় আলেম এ জবাব গ্রহণযোগ্য বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী “কোনটিই হয়নি” এর মর্মার্থ হলো এই যে, উভয় কাজ অর্থাৎ কসর ও ভুল উভয়টি সমবেত হয়নি, বরং তন্মধ্যে একটি বিষয়ই সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মর্মার্থের বিপরীত হয়েছে। কারণ অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا قَصُرْتُ الصَّلَاةَ وَمَا نَسِيتُ.

“না নামায সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, আর না আমি নামাযে ভুল করেছি।”

^১ ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা ইয়াফআলু মিন সালামিন, ১:২৮৪, হাদিস নং : ১৯৭।

উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহ হলো এরূপ যা আমি আমাদের মাজহাবের ইমামদের অভিমতে পেয়েছি। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সম্পর্কে তাঁদের এরূপ ধারণা ছিলো, এরূপ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ ছিলো। আবার কেউ কেউ এ বিষয়ে অতিরঞ্জন করেছে, আবার কেউ কেউ ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা করেননি।

কাযী আবুল ফযল আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ বিষয় আমি যা বলেছি, তা ওইসব জবাবসমূহের অতি নিকটবর্তী হবে। তাহলো এই যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ বলা যে, **لَمْ أُنْسَ** “আমি ভুল করিনি”। মূলতঃ এতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সত্তাগত ভুলের কথা নিষেধ করেছেন অর্থাৎ আমার দ্বারা সত্তাগত ভুল হতে পারে না। আর তিনি উম্মাতের একথা অপছন্দ হওয়ার বিষয়ে কোনো কোনো সময় বলেন, তোমাদের জন্য এটা অশোভনীয় যে তোমরা আমাকে বলছো যে,

بُشْتًا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ.

—তোমাদের কারো এমন কথা বলা কতইনা নিন্দনীয় যে, আপনি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছেন। বরং একথা বলো যে, অমুক আয়াত আপনাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।^১

অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَسْتُ أَنْسِي وَلَكِنْ أَنْسِي.

—আমি ভুলে যাই না, বরং আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়।

সুতরাং যখন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল যে, নামায কী কম করে দেওয়া হয়েছে? তখন তিনি কম করার কথা অস্বীকার করেন। আর একথা যথার্থ ছিলো যে, নামায তো কম করে দেওয়া হয়নি। আর যখন প্রশ্নকারী ভুল করাকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্কিত করে তখন যেহেতু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম নিজে ভুলে যান নি, বরং আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুল অস্বীকার করেন। আর যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য ব্যক্তিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন, তখন এ বিষয় নিশ্চিত হতেন যে, তিনি ভুলে গেছেন। যাতে এটা সুন্নাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, উম্মাত যদি নামাযে ভুল করে তাহলে তাদের কী করণীয় হবে? সুতরাং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা বলা যে, **لَمْ أُنْسَ** - আমি না ভুল করেছি আর না নামায কম করে দেওয়া হয়েছে। এর কোনটিই হয়নি। এরূপ বলা সত্য যথার্থ হয়েছে। কারণ মূলতঃ নামায কম করা হয়নি, আর না তিনি নিজে ভুল করেছেন বরং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

অপর এক প্রকার ব্যাখ্যা যা আমি অন্যান্য মাশায়েখ ওলামায়ে কেরামের অভিমত থেকে গ্রহণ করেছি তা হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহু করতেন কিন্তু আত্মবিস্মৃতি হতেন না। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেহেতু বিস্মৃতি হতো না, সে কারণে তিনি স্বীয়সত্তার ব্যাপারে বিস্মৃতির কথা নিষেধ করেছেন। তা এ জন্য যে, বিস্মৃতি হলো উদাসীনতা ও একপ্রকারের বিপদস্বরূপ, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। কিন্তু ভুল (সাহু) হলো এক ধরনের আত্মিক ধ্যানে মগ্ন হওয়া।^১ এজন্য বলা হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে সাহু করতেন, কিন্তু নামায থেকে অমনোযোগী ও উদাসীন হতেন না। তাঁর উপর এমন ভাবের উদ্বেক হতো যাতে তাঁর নামাযের গতি সমায়িক কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যেতো কিন্তু নামায থেকে উদাসীন হতেন না।

সুতরাং যদি একথা যথার্থ প্রমাণিত হয়, তখন তাঁর এ বাণী— **مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَمَا نَسِيتُ** - “না নামায কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আর না আমি নামাযে ভুল করেছি।”^২ এর মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না। আমার ধারণা হলো যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ ইরশাদ করা যে, **مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَمَا نَسِيتُ** - “না

খ) নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ১:২০০।

গ) ইবনে খুযাইমা : আস্ সহীহ, বাবু সাহ ফীস সালাত, ৪:১৬৬, হাদিস নং : ৯৮০।

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ৫০৩২।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ৭৯০।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবদিল্লাহ ইবনে মাস‘উদ, ৮:৪১১, হাদিস নং : ৩৮৭৬।

ঘ) দারেমী : আস্ সুনান, বাবু ফী তা-হদীল কুরআন, ৮:৪২৩, হাদিস নং : ২৮০১।

১. অর্থাৎ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা গুণাবলী অবলোকন করে, এমনভাবে ধ্যান মগ্ন হয়ে পড়তেন যার ফলে তাঁর সাহু হয়ে যেতো। এটা বিপদের কারণ নয় বরং বিশেষ রহমত ও পুরস্কার স্বরূপ।

২. ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা ইয়াকআলু মিন সালামিন, ১:২৮৪, হাদিস নং : ১৯৭।

খ) নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ১:২০০।

গ) ইবনে খুযাইমা : আস্ সহীহ, বাবু সাহ ফীস সালাত, ৪:১৬৬, হাদিস নং : ৯৮০।

নামায কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর না আমি ভুল করেছি।' এখানে বিস্মৃতিকে ছেড়ে দেয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এটাও বিস্মৃতির দুই অবস্থার এক অবস্থা হতে পারে। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

এর মর্মার্থ হলো এই যে, আমি দু' রাকাআতের পর যে সালাম ফিরিয়েছি তা এ জন্য নয় যে, আমি নামায পূর্ণ করা ত্যাগ করেছি, বরং আমি নামায পরিপূর্ণ করতে ভুলে গেছি, কিন্তু এ ভুল আমার পক্ষ থেকে হয়নি। এর প্রমাণ হলো হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই বাণী যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

إِنِّي لَأَنْسَى أَوْ أَنْسَى لِأُسْنٍ.

-আমি ভুলি না বরং আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়, যাতে সুনাত প্রতিষ্ঠিত হয়।^১

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে এরূপ বলা যে, الْكَذِبَانَةُ الثَّلَاثُ তিনি তিনবার ঘটনার বিপরীত কথা বলেছেন। তন্মধ্যে দু'টি বিষয় কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হলো-

إِنِّي سَقِيمٌ.

-আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো।^২

আর অপরটি হলো-

قَالُوا قَالِ ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِطَاهِتِنَا يٰأَبْرَاهِيمُ ۖ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا.

^১. ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু ওয়া হাদীসানী আনু মালেক, ১:৩০২।

খ) আবু নাইস ইম্পাহানী : মা'রিফাতুস সাহাবা, বাবু মিন ইসমিহী উসমান, ১৪:৬৬, হাদিস নং : ৪৪০০।

^২. আল কুরআন : সূরা সাফাত, ৩৭:৮৯।

[মেলায় যোগদানের দিন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়ের লোকজন মেলায় যাত্রা করে। মেলায় যোগদানের সময় তারা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে যোগদান করতে অনুরোধ করে। তাদের অনুরোধ শুনে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম বললেন, “আমি অসুস্থ হয়ে আছি।” অথচ তিনি সুস্থ ছিলেন। সম্প্রদায়ের লোকদের অনুপস্থিতির সুযোগে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম প্রতিমাসমূহ ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলেন। আর সর্ববৃহৎ প্রতিমা অক্ষত রেখে দেন। পরবর্তী সময় যখন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে এ বিষয় জিজ্ঞেস করে যে, এ কাজ কে করেছে? তিনি বললেন, এ প্রতিমাদের মধ্যে বড়টি এ কাজ করেছে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর স্ত্রী খুব রূপসী ছিলেন। তার সন্দেহ হয়েছে যে, যদি মিশরের বাদশাহ জ্ঞানতে পারে যে, তিনি আমার স্ত্রী, তাহলে আমাকে মেরে ফেলে আমার স্ত্রীকে তার নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেবে। তাই তিনি বলেছেন, এ আমার বোন।

-তারা বললো, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমাদের খোদাগুলোর সাথে এ আচরণ করেছো? তিনি বললেন, বরং সেগুলোর মধ্যে সম্ভবতঃ ওই বড়টাই করেছে।^১

অথবা বাদশাহকে তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে একথা বলা যে, إِنَّهَا أَخْتِي -তিনি আমার বোন।

তোমরা জেনে রেখো। আল্লাহ! তোমাদের সম্মান দান করবেন যে, এসব বিষয় মিথ্যা হয়নি। বরং এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাতে মিথ্যার অবকাশ নেই।

তাঁর একথা إِنِّي سَقِيمٌ -আমি অসুস্থ। এ সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমুখ বলেন, এর মর্মার্থ হলো, অনতিবিলম্বে আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো। অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টজীব অসুস্থ হতে পারে। সুতরাং উৎসবে যোগদানে অপরাগতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এরূপ বলেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এর মর্মার্থ হলো, আমার মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে আছে। আবার কেউ কেউ বলেন, এর মর্মার্থ হলো, তোমাদের কুফরী কর্মকাণ্ড দেখে আমার অন্তর অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

কেউ কেউ বলেন, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম অমুক নক্ষত্র যখন উদিত হতে দেখেছেন তখন বুঝতে পেরেছেন যে, আমি অসুস্থ হয়ে যাবো। কারণ এটা অভ্যাস ছিলো। সুতরাং এটা মিথ্যা বলা হয়নি। বরং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এক সত্য খবর দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এটা ভর্ৎসনা ও প্রতিবাদ স্বরূপ বলেছেন। কারণ তিনি ধারণা করেন, তিনি আকলী দলিল নক্ষত্রসমূহের রব না হওয়ার যে জবাব দিয়েছে, তা দলিল হিসেবে দুর্বল। কারণ তিনি ওই সময় না একত্ববাদের প্রচার করেছেন, আর না শিরককে পূর্ণাঙ্গ নিষেধ করেছেন। সুতরাং তিনি স্বীয় দলিল প্রমাণের দুর্বলতাকে স্বীয় অসুস্থতা বলে উল্লেখ করেছেন। তবুও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর তাওহীদ সম্পর্কে কোনো প্রকার সন্দেহ ছিলো না। আর না তাঁর ঈমান দুর্বল ছিলো। তবে বড়জোর এটা বলা যায় যে, তাঁর দলিল দুর্বল ছিলো, আর তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার পদ্ধতি দুর্বল ছিলো। কারণ ওই সময় তিনি তাঁদের উপর দলিল প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি,

^১. আল কুরআন : সূরা আযিয়া, ২১:৬২-৬৩।

এরূপ বাক্য ব্যবহার করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, حُجَّةٌ سَاقِيَةٌ অসুস্থ বা দুর্বল দলিল। তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর দলীল দুর্বল ছিলো, এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বিশুদ্ধ দলিল-প্রমাণ পেশ করার বিষয় জানিয়ে দেন, আর তাঁকে চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রের মাধ্যমে দলিল প্রমাণ পেশ করার বিষয় শিখিয়ে দেন। যা পবিত্র কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আমি তা পূর্বে আলোচনা করেছি।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের এ বাণী-

بَلْ فَعَلَهُمْ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ .

-বরং সেগুলোর মধ্যে সম্ভবতঃ ওই বড়টাই করেছে, সুতরাং সেগুলোকে জিজ্ঞাসা করো যদি সেগুলো কথা বলে।^১

এর জবাব হলো এই যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর এ খবরকে ওই বড় প্রতিমার কথা বলার সাথে সম্পর্কিত করেছেন। সম্ভবতঃ তিনি এ কথাই বলেন, “যদি সে কথা বলতে পারে। তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।” এ কথা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলেছেন। আর একথা সত্যও ছিলো, তিনি ঘটনার বিপরীত কোনো কথা বলেননি।

বাকী রইলো তিনি যে, তাঁর স্ত্রীকে أَخِي-আমার বোন বলেছেন। এর প্রতি উত্তর হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম স্বীয় প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে বলেন, “তুমি ইসলামের দৃষ্টিতে আমার বোন।” আর এরূপ বলা জাযিব ছিলো। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ .

-মুসলমান-মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই।^২

যদি তোমরা দ্বিমত পোষণ করো যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর তিন কথার জন্য “মিথ্যা” শব্দ কেনো ব্যবহার করেছেন। কারণ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ .

^১ আল কুরআন : সূরা আমিয়া, ২১:৬৩।

^২ আল কুরআন : সূরা হজরাত, ৪৯:১০।

-হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তিন কথা ব্যতীত কখনো মিথ্যা বলেননি।^১

আর শাফায়াতের হাদীসে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হাশরের মাঠে যখন মানুষ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর নিকট শাফায়াত করার আবেদন করবে তখন তিনি স্বীয় মিথ্যা কথা বলার কথা স্মরণ করে শাফায়াত করতে অস্বীকার করবেন। তাই এর জবাব হলো এই যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর সারা জীবনে মিথ্যার সাদৃশ্য তিন কথা ব্যতীত আর কোনো কথা বলেন নি। যদিও কথাগুলো মূলতঃ সত্য ছিলো। তবুও এগুলোর বাহ্যিকদিক আভ্যন্তরীণ দিকের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলো। এ কারণে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথাগুলোর ব্যাপারে “মিথ্যা” শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ কারণে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর জবাবদিহিতার বিষয়ে ভীত হবেন।

এখন অবশিষ্ট রইলো ওই হাদীসের বিষয়-كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ - যখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো যুদ্ধের ইচ্ছা করতেন, তখন দ্বৈত অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে অন্য কোনো দিকের কথা উল্লেখ করতেন।^২

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা সংঘটিত ঘটনার বিপরীত হয়নি। কারণ এভাবে তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য গোপন করতেন। যাতে দুশমনেরা আত্মরক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে না পারে। কারণ গোপনীয়তা রক্ষার্থে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় স্থানের কথা প্রশ্ন হিসেবে উল্লেখ করতেন। আর এভাবে ওই স্থানের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। এভাবে তিনি স্বীয় লক্ষ্য স্থলের কথা

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ইত্তিখাযিস্ সারারী, ১৬:২৪, হাদিস নং : ৪৬৯৪।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৭:৪১৬, হাদিস নং : ৮৮৭৩।

গ) আবু ইয়ালা : আল মুসনাদ, বাবু লাম ইয়াক্বিব ইবরাহীম, ১২:২৯২, হাদিস নং : ৫৯০৪।

^২ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ২৭৬৯।

খ) দারেমী : আস্ সুনান, বাবু ফীল হারবি খদয়াহ, ৭:৩৭৫, হাদিস নং : ২৫০৬।

গ) তাবারী : তাহযিবুল আসার, বাবু হুরবিলা খদ'আহ, ৪:১৬৪, হাদিস নং : ১৪৪৯।

দ্বৈত অর্থবোধক শব্দকে ‘তাওরীয়াহ’ বলা হয়। অর্থাৎ প্রথম অর্থের প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে মন ধাবিত হবে। আর দ্বিতীয় অর্থের প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে মন ধাবিত হয় না। শব্দ ব্যবহারকারী দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য করে শব্দটি ব্যবহার করে। আর শ্রোতা শব্দের প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য করে শব্দটি ব্যবহার করে। আর শ্রোতা শব্দের প্রথম অর্থ বুঝতো। এভাবে শব্দ ব্যবহারকারী মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে যায়। আর স্বীয় উদ্দেশ্য অপরের নিকট গোপন থেকে যায়।

গোপন রাখতেন। হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এরূপ বলতেন না যে, অমুক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছি বা চলো অমুক স্থানে যেতে হবে। হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের লক্ষ্য সেই স্থান হতো না। (কিন্তু এ অবস্থায় সংঘটিত ঘটনার বিপরীত কথা হলেও) কিন্তু প্রথমোক্ত অবস্থায় সংঘটিত ঘটনার বিপরীত কথা হতো না। (যদিও দ্বিতীয় অবস্থায় বলা যায় যে, হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনার বিপরীত কথা বলেছেন।)

যদি বলা হয় যে, তাহলে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর এ কথার কী অর্থ হবে? যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই যুগের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকে? তখন তিনি জবাব দেন যে, আমি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। একথায় আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর উপর অসন্তুষ্ট হন। কারণ তিনি জ্ঞানকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত করেননি। অর্থাৎ তিনি এই কথা বলেন নি- 'ওয়াল্লাহু আলামু বিস সাওয়াব' (আল্লাহ তা'আলা অধিক জ্ঞাত)। আর আল্লাহ তা'আলা বললেন,

قَالَ بَلْ عَبْدٌ لَنَا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَعْلَمُ مِنْكَ.

-দুই সমুদ্রের সম্মিলনে আমার এক বান্দা আছেন যিনি তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী।^১

এটাও এক ধরনের খবর যা আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে জানিয়ে দেন। আর তাঁর নিকট স্পষ্ট করে দেন যে, তুমি যা বুঝতে পেরেছো তা সঠিক নয়।

স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে সহীহ হাদীসে এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দান করছেন, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনার জানা মতে এমন লোক আছে কী, যিনি আপনার চেয়ে বেশী জ্ঞানী? হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বললেন, আমার জানা মতে এমন কোনো লোক নেই, যিনি আমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী। তিনি তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী জবাব দিয়েছেন। আর এরূপ খবর দেওয়া তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী হয়েছে। আর এরূপ খবর দেওয়া তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী সঠিক ও যথার্থ ছিলো। আর তাতে না হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম সংঘটিত ঘটনার বিপরীত জবাব দিয়েছেন।

^১. এখানে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম নবী হয়েও ঘটনার বিপরীত কথা কেন বলেছেন? সম্মানিত গ্রন্থকার এ অভিযুক্তের জবাব দেবেন।

^২. বুখারী : আস্ সহীহ, ১২২; মুসলিম : আস্ সহীহ, ২৩৮০।

আর না তিনি কোনো ভুল কথা বলেছেন। যদি প্রথম বর্ণনাকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে দ্বিমত পোষণ করা হয় তাহলে এর উত্তর হলো এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান অনুযায়ী জবাব দিয়েছেন যে, আমার চেয়ে জ্ঞানী কোনো লোক নেই। কারণ তিনি নবী ও রাসূল ছিলেন। আর রিসালাতের চাহিদাও তাই।^১ সুতরাং যদিও হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম স্বীয় ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী এরূপ কথা বলেছেন। তিনি সত্যকথা বলেছেন। এটাকে ভুল বলা যাবে না।

দ্বিতীয় জবাব হলো যে, যখন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বলেন, أَعْلَمُ আমি অধিক জ্ঞাত। তাহলে তাঁর কথার অর্থ হলো, নবুওয়াতের ফরযসমূহ তাওহীদের জ্ঞান, শরীয়াতের বিধানাবলী, রাষ্ট্র পরিচালনার জ্ঞানের দিক থেকে উম্মত থেকে তিনি বেশী জ্ঞানী ছিলেন। হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম তাঁর থেকে দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানের দিক থেকে বেশী জ্ঞানী ছিলেন। এটা এমন এক জ্ঞান যা আল্লাহ তা'আলা শিক্ষাদান না করা পর্যন্ত কেউ জানতে পারে না। আমার মতে তা হলো অদৃশ্য জ্ঞান।^২ যা এ ঘটনায় প্রকাশ হয়েছে। আর যা ওই দুই ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর কুরআন মজীদেও তা উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা আমি যেসব জ্ঞানের কথা আলোচনা করেছি। সেই দিক থেকে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন, যে জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অবস্থায় দান করেন। এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا .

-এবং আমি তাকে আপন অদৃশ্য বিষয়াদীর জ্ঞান দান করেছি।^৩

এখন অবশিষ্ট রইলো ওই কথা, তাহলে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের উপর অসন্তুষ্ট হলেন কেন? যেহেতু তিনি তাঁর নিজের জ্ঞানকে আল্লাহ

^১. মূল কথা হলো, পৃথিবীতে একই সময়ে একাধিক নবী বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু একই সময়ে পৃথিবীতে একাধিক কিতাব ও শরীয়াতের বিধান প্রবর্তনকারী রাসূল বিদ্যমান থাকতে পারে না। যেহেতু হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম রাসূল ছিলেন। তাই তিনি ধারণা করেন যে, এ সময় পৃথিবীতে কোনো রাসূল থাকতে পারেন না। এ সময় তো একমাত্র আমিই রাসূল। সুতরাং এখন বর্তমানে আমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী কেউ বিদ্যমান নেই।

^২. জ্ঞান দু'প্রকার যথা তাশরীফী বা শরীয়াতের জ্ঞান। আর তাকবিনী বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান। এ সময় হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাশরীফী বিষয়ে সব চেয়ে বেশী জ্ঞানী ছিলেন। আর হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম তাকবিনী বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানে বড় জ্ঞানী ছিলেন।

^৩. আল কুরআন : সূরা কাহাফ, ১৮:৬৫।

তা'আলার সাথে সম্পর্কিত করেননি। কোনো কোনো ওলামাদের মতে এর জবাব হলো এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ফিরিশতামুলী যেভাবে একথা বলে, **لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمَنَا** "আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন আমরা তা-ই জানি।" এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর অসম্ভব হন। আল্লাহ তা'আলা আইনসঙ্গতভাবে তাঁর একথা পছন্দ করেন নি। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত। আর তাতে পরিণামদর্শিতা এই ছিলো যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর উম্মাতের কোনো ব্যক্তি যদি মর্যাদার দিক থেকে তাঁর মর্যাদা পর্যন্ত উপনীত না হয়েও থাকে, যদিও তার ব্যক্তিসত্তা এতো উন্নত-পবিত্রও হয়, কখনো এরূপ হবে না যে, আত্মগৌরব করে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম নিষ্পাপ ছিলেন, কিন্তু তাঁর উম্মাত নিজ মুখে নিজের প্রশংসা করে অহংকার ও উদ্ধত্য প্রকাশ করে, আর নিজেকে অনেক বড় দাবী করতে শুরু করে। অধিকন্তু আশিয়ায়ে কেরাম এ ধরনের অশোভনীয় অভ্যাস থেকে পবিত্র ছিলেন। তবুও অন্যান্য লোকেরা তাদের অনুসরণ করে, এর কারণে তারা অন্ধকারে পতিত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা রক্ষা করেন। সুতরাং তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যাতে তিনি স্বীয় নফসকে এ বিষয় থেকে রক্ষা করেন। আর এ বিষয় মানুষ যেনো তাঁর অনুসরণ করে।

এ কারণে আগাম সতর্কতা স্বরূপ স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা ইরশাদ করেন,

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ.

-আমি আদম সন্তানদের সরদার। একথা আমি অহংকার করে বলছি না।^১

যারা একথা বলে যে, হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম নবী ছিলেন। এ হাদীস (যা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও খিযির আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে আমি উপরে উল্লেখ করেছি) তাদের দলিল। যেহেতু উক্ত হাদীসে হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম এর কথা বলা হয়েছে- **أَعْلَمَ مِنْكَ** "আমি হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম থেকে বেশী জ্ঞানী"। আর একথা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে, কোনো ওলী কোনো নবী থেকে বেশী জ্ঞানী হতে পারে না। কিন্তু হযরত

আশিয়ায়ে কেরাম জ্ঞানের দিক থেকে পরস্পরে একে অপরের উপর মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এ কারণে হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম বলেছেন (নৌকা ছিদ্রকরণ, বালক হত্যা ও প্রাচীর পুনঃনির্মাণ করার বিষয়) আমি আমার নিজের ইচ্ছায় এরূপ করিনি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এ বিষয়ে তাঁর নিকট ওহী এসেছে।

আর যারা বলেন যে, হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম নবী ছিলেন না। তারা বলে যে, হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম এর একথা **وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي** "আমি এ কাজ আমার নিজের ইচ্ছায় করিনি।" এর মর্মার্থ এটা হতে পারে যে, "তাকে অন্য কোনো নবী (যিনি তাঁর যুগে বিদ্যমান ছিলেন) তিনি এরূপ করার কথা বলেছেন। কিন্তু এ অভিমত অত্যন্ত দুর্বল। কারণ আমরা যতদূর জানি যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এর যুগে তাঁর ভ্রাতা হযরত হারুন আলাইহিস্ সালাম ব্যতীত অন্য কোনো নবী বিদ্যমান ছিলেন না। আর হাদীসবেস্তাগণও অন্য কোনো নবীর থাকার কথা বর্ণনা করেনি। আমরা আল্লাহ তা'আলার বাণী "তিনি (খিযির) তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী" কথাটি ব্যাপকতার উপর প্রয়োগ করিনা বরং এটা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এটাকে খিযির আলাইহিস্ সালামের নবুওয়াত প্রমাণ করার জন্য দলিল হিসেবে পেশ করা যাবে না। এ কারণে কোনো কোনো মাশায়েখে কেরাম বলেন, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম থেকে বেশী জ্ঞানী ছিলেন, ওই বিষয়ে যা তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে লাভ করেছেন। আর ওই অদৃশ্য জ্ঞানের দিক থেকে যা হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে সম্পর্কিত হয়েছে। সেজ্ঞানের বিষয়ে হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম থেকে বেশী জ্ঞানী ছিলেন। কোনো কোনো আলেমগণ বলেন, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম এর নিকট পাঠানো হয়েছে শিষ্টাচার শিক্ষার জন্য, জ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে নয়।

^১ আল কুরআন : সূরা বাকারাহ, ২:৩২।

^২ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তাফাখিলি নাবিয়্যিনা, ১২:৩৬৬, হাদিস নং : ৪২৯৮।

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী ফাযাযিলি নবী, ১২:৬১, হাদিস নং : ৩৫৪৮।

গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু যিকরিশ্ শাফা'আত, ১২:৩৬৬, হাদিস নং : ৪২৯৮।

عِصْمَةُ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَالْكِبَائِرِ الْمُؤَبَّاتِ

সম্মানিত নবীগণ কবীরাগুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র হওয়া প্রসঙ্গে

সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস্ সালামের ওইসব কাজ যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত তন্মধ্যে তাঁদের মুখের ভাষাও অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর তাওহীদ ব্যতীত ক্বালবের কাজও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্ ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে যে, সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম অশ্লীলতা ও ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহ থেকে নিষ্পাপ ছিলেন। এটা জমহুর ওলামায়ে কেরামের আকীদা। আর তাঁরা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমতকে নির্ভরযোগ্যসূত্র সহ উল্লেখ করেছেন। কাযী আবু বকর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও এ অভিমতের সমর্থক।

ঐক্যমত পোষণ ছাড়াও অন্যান্য আলেমগণ সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম থেকে ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহ প্রকাশ হওয়াকে জ্ঞানের দিক থেকে অসম্ভব মনে করেন। সমস্ত আলেমগণ এই অভিমতের সমর্থক হয়েছেন। ওস্তাদ আবু ইসহাক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ অভিমতের সমর্থক। অনুরূপ ওই বিষয়ও আলেমগণ ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম রিসালাতের দায়িত্ব পালনে কোন কিছু গোপন করা ও দ্বীনের বিধান প্রচারে ত্রুটি থেকেও মুক্ত ছিলেন। কারণ এমন হওয়াটা সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস্ সালামের নিষ্কলুষতার দাবী। আর মুসলিম উম্মাহ হযরত আশিয়ায়ে কেরামের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয় ঐক্যমত পোষণ করেছেন। হুসাইন নাজ্জারী ব্যতীত জমহুর আলেমগণ এ অভিমতের সমর্থক যে, আশিয়ায়ে কেরামকে উল্লেখিত গুনাহসমূহ থেকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সুরক্ষিত ও নিষ্পাপ রাখা হয়েছে। আর তাঁদের নিষ্পাপ হওয়া তাঁদের কর্ম ও ইচ্ছার মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু হুসাইন নাজ্জারী বলেন, হযরত আশিয়ায়ে কেরামের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয় কোনো ক্ষমতাই ছিলো না।

তবে পূর্ববর্তী কতিপয় মহামনীষী যেমন আবু জা'ফর তাবারী ও অন্যান্য ফিকহবিদ, হাদীসবিদ ও কতিপয় তর্কশাস্ত্রের আলেমগণ বলেন, হযরত আশিয়ায়ে কেরাম দ্বারা ছগিরা গুনাহ হওয়া সম্ভব। তাদের দলিল আমি অনতিবিলম্বে বর্ণনা করবো। অপর একদল আলেম এ বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। বিবেকের দিক থেকেও তাঁদের দ্বারা ছগিরা গুনাহ হওয়া অসম্ভব নয়।

আর সম্ভব হওয়া ও অসম্ভব হওয়ার বিষয় শরীয়াত চূড়ান্ত মীমাংসা করেনি। সুতরাং এ বিষয় নিরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

ফিকহবিদ ও মোতাকাল্লিম সত্যপন্থি ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো এই যে, সম্মানিত নবীগণ যেভাবে কবীরা গুনাহ থেকে পবিত্র তেমনি সগীরা গুনাহ থেকে ও মুক্ত ছিলেন। ওই বিষয়ে মত বিরোধ রয়েছে যে কোনটি কবীরা গুনাহ আর কোনটি সগীরা গুনাহ।

হযরত ইবনে আব্বাস রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ও অন্যান্য হযরতগণের অভিমত হলো, ওইসব কাজ যাতে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী হয় তা কবীরা গুনাহ। তবে এমন কতিপয় গুনাহ রয়েছে যাতে অন্য গুনাহের তুলনায় নাফরমানী কম হয়- এই সূত্রে এটাকে সগীরা গুনাহ বলা হয়। যে-কোনো কাজে আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা করা হয় তা কবীরা গুনাহ হবে।

কাযী আবু মুহাম্মদ আবদুল ওহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতাকে সগীরা গুনাহ বলা কোনো মতেই সম্ভব হবে না। তবে এ দিক থেকে সগীরা গুনাহ বলা যাবে যে, কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার কারণে তা মাফ হয়ে যাবে। কবীরা গুনাহ এর ব্যতিক্রম যে, বান্দা যে পর্যন্ত তাওবা না করে সে পর্যন্ত তা মাফ হয় না। এমন কোনো আমল নেই যার বিনিময়ে কবীরা গুনাহ এমনি এমনি মাফ হয়ে যাবে। তবে তাকদীরের ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিতে পারেন। কাযী আবু বকর, আশ'আরী একদল আলেম ও অধিকাংশ ফিকহবিদ এ অভিমতের সমর্থক।

আমাদের কোনো কোনো আলেম বলেন, এ বিষয় দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও হযরত আশিয়ায়ে কেরাম সগীরা গুনাহ থেকেও মুক্ত। কারো কারো অভিমত, এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, তাঁরা সগীরা গুনাহের পুনরাবৃত্তি ও আধিক্য থেকে মুক্ত ছিলেন। কারণ সগীরা গুনাহ বার বার করা হলে তা কবীরা গুনাহের স্তরে পৌছে যায়। অনুরূপ সগীরা গুনাহ ব্যক্তিমর্যাদাকে ভুলুষ্ঠিত করে। আর সে স্বীয় মান মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়ে নিম্নস্তরে পতিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এ বিষয় উম্মতের আলেমদের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হযরত আশিয়ায়ে কেরাম ওই ধরনের গুনাহ থেকে নিষ্পাপ। কারণ এসব বিষয় সম্মানিত নবীগণকে অভিযুক্ত করে। আর তাঁদের সম্পর্কে মানুষের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করে। প্রকাশ থাকে যে, সম্মানিত নবীগণ ওইসব মন্দ বিষয় থেকেও মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। বরং তাঁদের স্থান এর চেয়ে আরো অনেক উর্ধ্বে। তাঁরা তো ওই ধরনের অনেক জাযিয় কাজ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন যা কোনো এক সময় হারামের প্রতি ধাবিত করতে পারে।

কোনো কোনো আলেমগণ বলেন, সম্মানিত নবীগণ ইচ্ছাপূর্বক কোনো অপছন্দনীয় কাজ করতেন না। যেসব আলেমগণ বলেন সম্মানিত নবীগণ সগীরা গুনাহ থেকে নিষ্পাপ ছিলেন, তাদের দলিল হলো এই যে, সম্মানিত নবীগণ হলেন পথ প্রদর্শক, মানুষ তাঁদের প্রবর্তিত বিধানের উপর আমল ও তাঁদের অনুসরণ করে। সুতরাং এখন বলুন তারা কিভাবে সগীরা গুনাহের ধারক হবেন? জমহুর ফিকহবিদ ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সহচর, আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অভিমত হলো যে, কোন কারণ অনুসন্ধান না করে সম্মানিত নবীগণের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে। আর এ বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই যে, তাঁদের কোন কাজ করা জাযিয় হয়েছে আর কোন কাজ করা নাজাযিয় হয়েছে। ইবনে খোইয়াজ, মিনদাজ ও আবুল ফারাজ ইমাম মালিক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, আশিয়ায়ে কেরামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। আবহারী, ইবনে কুসার, অধিকাংশ মালেকী মতাবলম্বী আলেমগণ এ অভিমতের সমর্থক।

কিন্তু ইরাকবাসী অধিকাংশ আলেমগণ ইবনে সুরায়িজ, ইসতাখরী, ইবনে খায়রানসহ ও শাফিঈ মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো, আশিয়ায়ে কেরামের অনুসরণ করা মুস্তাহাব। একদল আলেম বলেন, আশিয়ায়ে কেরামের অনুসরণ করা মুবাহ বা জাযিয়।

কোনো কোনো আলেমগণ বলেন, দ্বীনের বিষয়ে আশিয়ায়ে কেরামের অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। আর এর আলোকে তাঁদের নৈকট্য লাভ করতে হবে। যেসব আলেম আশিয়ায়ে কেরামের অনুসরণ করা মুবাহ বা জাযিয় বলেছেন, তারা ওই বিষয় কোনো প্রকার শর্তারোপ করেন নি। তাঁরা বলেন, যদি আমরা একথা মেনে নিই যে, আশিয়ায়ে কেরামের দ্বারা সগীরা গুনাহ হতে পারে তাহলে তাদের অনুসরণ করা জাযিয় হবে কী করে? কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ সম্পর্কে আমাদের নিকট এমন কোনো মাপকাঠি নেই যে, যার মাধ্যমে আমরা এটা জানতে সক্ষম হবো যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে কোন কাজটি নৈকট্য লাভের কারণ ও ইবাদত হবে, তাঁর কোন কাজটি মুবাহ বা জাযিয় হবে, কোন কাজটি করা নিষেধ, আর কোন কাজটি গুনাহ হবে। বিশেষ করে ওই সকল বিধান বিশেষজ্ঞগণের অভিমত মতবিরোধের সময়কে কাজের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। আমি এই দলিলের পরিধি আরো স্পষ্ট করে এ কথা বলছি যে, ওইসব লোক যারা এ অভিমতের সমর্থক হয়েছেন যে, আমাদের নবী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো অবৈধ কাজ বা ভুল কথা শুনতেন তখনই তার প্রতিবাদ করতেন। আর যখন তিনি কোনো কাজ

করতে দেখতেন তখন নীরবতা বা মৌনতা অবলম্বন করতেন। তাহলে এর মর্মার্থ হলো ওই কাজ বৈধ। যখন অপর কোনো লোকের ব্যাপারে এ অবস্থা হতো যে, অতি নগন্য বিষয় চাই তা কাজ হোক বা কথা হোক তিনি প্রতিবাদ করতেন। তাহলে এটা কী করে সম্ভব হবে যে, তিনি স্বয়ং ওই ধরনের কাজ করবেন? এ বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করে অবশ্যই এ কথা মানতে হবে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল দোষনীয় কাজ থেকে নিষ্পাপ ও পবিত্র ছিলেন। এর চেয়ে আরো বেশী হলো যে, নাজাযিয় কাজ বা গুনাহ (নাউযবিল্লাহ)। যদি তাঁর দ্বারা হয়েও যেতো তাহলে নিশ্চিত মানুষ তাঁর অনুসরণ করতো। একরূপ অবস্থা হলে এটা কিভাবে সম্ভবত হবে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে অবৈধ কাজ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দান করবেন।

আমরা সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা এ বিষয়টি ভালোভাবে অবগত হয়েছি যে, তাঁরা চোখ বন্ধ করে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ-অনুকরণ করতেন। সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহকামের অনুসরণ করতেন অনুরূপভাবে তাঁরা কাজেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করতেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর স্বর্ণের আংটি খুলে ফেলে দেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের স্ব-স্ব আংটি খুলে ফেলে দেয়। আরেক বার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পায়ের মোজা খুলতে দেখে সাহাবায়ে কেরাম স্ব-স্ব মোজা খুলে ফেলে দেয়। কেউ এরূপ প্রশ্ন করেন নি যে, আমরা কী আংটি বা মোজা পরিধান করতে পারবো কিনা?

হযরত ইবনে ওমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি একদিন বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পশ্রাব করতে বসেন, আর তিনি এ দলিল পেশ করেন যে, আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে দেখেছি। অথচ অনেক সাহাবায়ে কেরাম অভ্যাস আর ইবাদতের বিষয়ে হযরত ইবনে ওমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা অনুসরণ করতেন। আর তাঁদের এ অনুসরণের ভিত্তি হলো শুধু হযরত ইবনে ওমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ওই বাণী “আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।”

রোযা রেখে স্ত্রীকে চুমো দেয়ার বিষয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বললেন,

هَلَّا خَبَرْتِيهَا أَنِّي أَقْبَلُ وَأَنَا صَائِمٌ.

-তুমি কী ওই স্ত্রী লোককে বলোনি যে, আমি রোযা রেখে তোমাকে চুমো দিই।

আর পরবর্তী সময় হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এ কথা দলিল হিসেবে পেশ করে বলেন-

كُنْتُ أَفْعَلُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-আমি ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় এরূপ করেছি।^১

যখন এক সাহাবীকে একথা বলা হয়, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা জানার পর ভীষণ অসম্ভব হয়ে ইরশাদ করেন-

يَحِلُّ لِلَّهِ لِرَسُولِهِ مَا يَشَاءُ. إِنِّي لَأَخْشَاكُمُ اللَّهَ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ.

-আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য যা ইচ্ছা তা হালাল করে দেন, আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ তা'আলাকে সর্বাধিক বেশী ভয় করি। আল্লাহ তা'আলার আহকামের নির্ধারিত সীমারেখা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।^২

এ সম্পর্কে এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। তবুও আমরা ওই বর্ণনাসমূহের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে নিশ্চিত বুঝতে পারি যে, চূড়ান্তভাবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ আমাদেরকে তাঁর সকল কাজে অনুসরণ করতে হবে। তবে ওইসব বিষয় বর্জন করতে হবে যা তিনি স্পষ্টভাবে বর্জন করতে বলেছেন, যা তাঁর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন একত্রে চার জনের অধিক রমণীকে বিবাহ করা, তাঁর ওফাতের পর উম্মতজননীগণকে উম্মতের জন্য বিবাহ করা হারাম হওয়া ইত্যাদি। সাহাবায়ে কেরামের যদি কোনো বিষয় তাঁর বিপরীত করা জাযিয় মনে করতেন, তাহলে কোনো না কোনো সাহাবী থেকে অবশ্যই তা বর্ণিত হতো আর এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যেতো। আর নিঃসন্দেহে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের ভুলের জন্য সতর্ক করে দিতেন। যা সম্পর্কে আমি পূর্বে আলোচনা করেছি।

^১ ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, ৬২৯, ৬৩০।

^২ (ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, ১:২৯১, হাদীস নং ১৩।

(খ) তবরানী : আল মু'জামুল আওসাত, ২:২৬০ হাদীস নং ১৯২৩।

তবে আশিয়ায়ে কেরামের দ্বারা মুবাহ বা বৈধ কাজ সংঘটিত হতো। কারণ তাতে কোনো ক্ষতি হতো না, বরং তা অনুমোদিত হতো অর্থাৎ অন্যান্য লোকদের জন্য যেভাবে মুবাহ জিনিসসমূহ হালাল ও বৈধ হয়েছে, আশিয়ায়ে কেরামের জন্যও তা বৈধ হতো। এটা অত্যাবশ্যিক হতো যে, হযরত আশিয়ায়ে কেরাম সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা মারিফাতের জ্যোতিতে তাঁদের বক্ষসমূহ প্রশস্ত করেছেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার দিক থেকে তাঁরা মনোনীত হয়েছেন। তাঁদের মনোযোগ সর্বদা আখিরাতমুখি থাকতো। এ কারণে তাঁরা দুনিয়ার মুবাহ জিনিসসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করতেন, যাতে তারা এর মাধ্যমে স্বীয় দ্বীনের কল্যাণের আয়োজন করতে পারেন, আর নিজে ওই রাস্তায় চলার শক্তি লাভ করতে পারেন।

(তাঁরা আমাদের দুনিয়াদার লোকদের মতো দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হতেন না) আর তাঁরা দুনিয়াতে এরূপে জীবন-যাপন করতেন যে, তাঁদের জীবন-যাপন ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ হয়ে যেতো। যেমনটি আমি এ গ্রন্থের শুরুতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় অভ্যাস, চরিত্রের বিবরণে উল্লেখ করেছি। আমার পূর্ববর্তী আলোচনা: আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য আশিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা ও ফযিলত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকল প্রকার কাজ ও আমলের অনুসরণকে আনুগত্য ও ইবাদত বানিয়ে দিয়েছেন। কারণ তাঁদের যাবতীয় কর্ম বা আমল আল্লাহ তা'আলার আহকামের বিরোধিতা ও অবাধ্যতা মুক্ত ছিলো।

নবুওয়াতের পূর্বে সম্মানিত নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া প্রসঙ্গে

হযরত আশিয়ায়ে কেরাম নবুওয়াত লাভের পূর্বে নিষ্পাপ ছিলেন কিনা এ বিষয়ে মতভেদতা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, নবুওয়াত লাভের পূর্বে তাঁদের দ্বারা গুনাহের কাজ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। কেউ কেউ বলেন, গুনাহের কাজ সম্পাদিত হওয়া সম্ভব।

তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো যে, আশিয়ায়ে কেরাম সকল প্রকার দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁরা ওইসব দোষত্রুটি থেকে সন্দেহভীতভাবে মুক্ত ছিলেন যা সন্দেহ ও সংশয়ের কারণ হতে পারে। আর তা হবেনই না কেন? তাঁদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করাও সম্ভব নয় যে, তাঁরা নবুওয়াত লাভের পূর্বে গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়েছেন। কারণ গুনাহ ও নিষিদ্ধতার প্রচলন তো শরীয়াত প্রবর্তনের পরে হয়েছে।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উ'র ওহী অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোন শরীয়াতের অনুসারী ছিলেন- সে বিষয় মতবিরোধ রয়েছে। একদল আলেমের অভিমত হলো, তখন তিনি কোনো শরীয়াতের অনুসারী ছিলেন না, এটা জমহুরের অভিমত। যদি এ কথা সঠিক বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলেও একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ওই সময় তাঁর কোনো প্রকার গুনাহ বিদ্যমানই ছিলো না। সুতরাং ওই সময় তাঁর সম্পর্কে গুনাহ শব্দের উল্লেখ করা যাবে না। কারণ শরীয়াতের বিধান আদেশ নিষেধ তো শরীয়াত প্রবর্তনের পরই নির্ধারিত হয়। যারা এ অভিমতের সমর্থক তারা এ অভিমতের স্বপক্ষে অনেক দলিল প্রমাণ পেশ করেছেন।

সাইফুস সুন্নাহ ও অন্যান্য মতাবলম্বীদের পুরোধা কাযী আবু বকর বলেন, এসব বিষয় জানার একমাত্র মাধ্যম হলো শুধু নকল ও বর্ণনা। যদি অবস্থা এরূপ হতো (অর্থাৎ নবুওয়াত লাভের পূর্বে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য শরীয়াতের অনুসারী হতেন) তাহলে অবশ্যই বর্ণনাসমূহে ওই বিষয় উল্লেখ করা হতো। আর সাধারণতঃ এ ধরনের কথা গোপন করা অসম্ভব। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে জীবন-যাপন করেছেন তাতে এটাও এক উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিলো। আর ওই শরীয়াতের অনুসারীগণ এ বিষয় গর্ববোধ করতো, আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এর দ্বারা দলিল পেশ করতো। কিন্তু ওইরূপ কোনো বর্ণনা বর্ণিত হয়নি।

একদল আলেমের অভিমত হলো যে, বিবেকের দিক থেকে এটা অসম্ভব। কারণ যে ব্যক্তি সম্পর্কে এ কথা প্রসিদ্ধ হয় যে, তিনি অমুক শরীয়াতের অনুসারী ছিলেন, পরবর্তী সময়ে তাঁর শরীয়াতের প্রবর্তক হওয়া ধারণাভীত। তিনি স্বীয় দলিল প্রমাণের আলোকে ভালো-মন্দ নির্ধারণ ও বর্ণনা করতেন। কিন্তু তাদের এধরনের দলিল প্রমাণ পেশ করা বৈধ নয়, কারণ ওই ধরনের যাবতীয় বিষয় নকল ও বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত হয়ে আসছে। সুতরাং ওই সম্পর্কে কাযী আবু বকর দলিল প্রমাণের যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা সবচেয়ে বেশী বিশুদ্ধ ও সঠিক হয়েছে।

একদল আলেম এবিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আর তারা কোনো চূড়ান্ত হুকুম আরোপ করেননি। কারণ তাদের কথা বিবেকের দিক থেকে উভয় বিষয় (অন্য শরীয়াতের অনুসারী না হওয়া) অসম্ভব নয়। তাদের ধারণা হলো যে, ওই দু' বিষয় সম্পর্কে কোনো বর্ণনায় কিছু প্রমাণিত হয়নি। আবুল মা'য়ালী রাঈয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ অভিমতের সমর্থক।

তৃতীয় অভিমত হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী শরীয়াতের অনুসারী ছিলেন। তারপরও তারা এ বিষয় দ্বিমত পোষণ করে বলেন যে, ওই সময় নির্দিষ্ট কোনো শরীয়াত ছিল কিনা? কেউ কেউ শরীয়াত নির্দিষ্ট করার বিষয় নীরবতা অবলম্বন করেছে। আবার কেউ কেউ নির্দিষ্ট শরীয়াত নির্ধারণ করেছে। তারপর শরীয়াত নির্ধারণকারীদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন শরীয়াতের অনুসারী ছিলেন? কেউ কেউ বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত নূহ, কেউ বলেন, হযরত ইবরাহীম, কারো মতে হযরত মূসা, কেউ বলেছেন হযরত ইসা আলাইহিমুস সালামের শরীয়াতের অনুসারী ছিলেন। এই হলো এ লোকদের মাসায়ালা মূলকথা। এ বিষয়ে সবচাইতে বিশুদ্ধ অভিমত হলো কাযী আবু বকর রাঈয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অভিমত।

আর যারা শরীয়াত ও দীন নির্দিষ্ট করেছেন। তাদের ওই দাবী যুক্তি বহিঃত। যদি ওই ধরনের কোনো কিছু ঘটতো; তাহলে অবশ্যই তা বর্ণিত হতো। যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। তারপরও কথা হলো এই যে, ওই ধরনের বিষয় গোপন থাকার কথা নয়। সুতরাং ওই বিষয়ে তাদের নিকট কোনো দলিল প্রমাণ নেই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ববর্তী শেষ নবী ছিলেন। সুতরাং তাঁর পরবর্তী লোকজন তাঁর অনুসারী ছিলো। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর দীন ব্যাপক ছিলো না। বরং সত্য কথা হলো

আশ-শিফা [২য় খণ্ড]
যে, আমাদের নবী হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কোনো নবীর
দীন ব্যাপক ছিলো না।^১

আর যদি কেউ এ আয়াতকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করে-

أَنْ أَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا .

-একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের দ্বীনের অনুসরণ করুন।^২

এটা সঠিক হবে না। আর না এ আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করা যথার্থ হবে
যে,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا .

-তিনি তোমার জন্য ধর্মের ওই পথ নির্ধারণ করেছেন, যার নির্দেশ তিনি
নূহকে দিয়েছেন।^৩

উক্ত আয়াত পূর্ববর্তী আশিয়ায়ে কেরামের তাওহীদের অনুসরণ করার
ধারাবাহিকতায় অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ آفَتِدَةٌ .

-এরা হচ্ছে এমন সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন।
সুতরাং তোমরা তাদেরই পথে চলো।^৪

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা এরূপ আশিয়ায়ে কেরামেরও উল্লেখ করেছেন,
যারা কোনো নির্দিষ্ট শরীয়াত নিয়ে প্রেরিত হননি। যেমন হযরত ইউসুফ বিন
ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম। এটা ওই ব্যক্তির কথা অনুযায়ী হয়েছে, যারা এ কথা
বলে যে, তিনি রাসূল ছিলেন না। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা ওই আয়াত সমূহে ওই
দলের নামও উল্লেখ করেছেন যাদের শরীয়াত ব্যতিক্রম ছিলো। আর তাদের
একত্রে সমবেত করা সম্ভব ছিলো না। আল্লাহ তা'আলা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ প্রদান করেছেন। তাতে প্রমাণিত
হয়েছে যে, প্রত্যেক নবীর (যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে), হযুর সালাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে তাঁদের শরীয়াতের আনুগত্য করুন। যার

^১. পূর্ববর্তী নবীগণ বিশেষ সম্প্রদায় বা বিশেষ অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্টভাবে প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু
আমাদের নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

^২. আল কুরআন : সূরা নাহল, ১৬:১২৩।

^৩. আল কুরআন : সূরা তুরা, ৪২:১৩।

^৪. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৯০।

উপর সব আশিয়ায়ে কেরাম ঐক্যমতে উপনীত হয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ আর
আল্লাহ তা'আলার ইবাদত। যে ব্যক্তি আনুগত্যের সমর্থক নয়, তারা ওই বিষয়ের
সমর্থক হয়েছে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত সব আশিয়ায়ে
কেরামের উপর একথা অত্যাৱশ্যক হয়েছে যে, (তাঁরা পূর্ববর্তী আশিয়ায়ে
কেরামের অনুসরণ করার ধারাবাহিকতায়) পার্থক্য করতেন।^১

আর যারা এ অভিমতের সমর্থক, তাদের মতে, আকলের দিক থেকে একজন
নবীর জন্য অন্য নবীর শরীয়াতের অনুসরণ করা অসম্ভব। তারা সব আশিয়ায়ে
কেরাম সম্পর্কে নিঃসন্দেহে এরূপ ধারণা পোষণ করে, তবে আমাদের নবী
ব্যতীত।

যারা শুধু বর্ণনা ও নকলকে বুনিয়ে মান্য করে তাদের ধারণা হলো যে, কোনো
বর্ণিত বর্ণনায় এটা প্রমাণিত হয়নি যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য
কোন নবীর শরীয়াতের অনুসরণ করেছেন।

আর যারা এ বিষয় নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তাদের নীরবতা অবলম্বনের ভিত্তি
হলো যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য শরীয়াতের অনুসরণ করেছেন
কী করেননি? এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত হতে পারেন নি।

যারা উক্ত আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ করেছে যে, পূর্ববর্তী আশিয়ায়ে কেরামের
অনুসরণ করা জরুরী। তারা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়
থেকে বাদ দিয়েছেন। আর কেউ কেউ অন্যান্য আশিয়ায়ে কেরামের জন্য এটা
অবধারিত করেছেন যে, প্রত্যেকেই কোনো নবীর শরীয়াতের অধীনে ছিলো যেমন
হযরত হারুন আলাইহিস্ সালাম হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম এর শরীয়াতের
অধীনে প্রেরিত হয়েছেন।

^১. তাদের ধারণা হলো যে, অন্যান্য আশিয়ায়ে কেরাম অন্য শরীয়াতের অনুসরণ করতেন। কিন্তু আমাদের
নবী হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু আশিয়া কেরামের সর্দার ও তাঁর শরীয়াত সর্বশেষ
শরীয়াত। এ কারণে তাঁর জন্য অন্য কোনো শরীয়াতের অনুসরণ করার প্রয়োজন ছিলো না।

ইচ্ছাকৃত শরীয়াত বিরোধী যেসব কাজ করা হয়ে থাকে তাকে পাপ (مَغْصِيَّة) বলা হয়। আর মানুষ তা থেকে বাঁচার দায়বদ্ধ ছিলো। কিন্তু ওই কাজ যা অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়, যেমন শরীয়াতের নির্ধারিত কোন ফরয কাজ আদায়ে ভুল বা বিস্মৃতি হওয়া। আর এ জন্য তাকে কোনো প্রকার জবাবদিহি করতে হয়না। সম্মানিত নবীগণকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন না হওয়ার কারণ হলো তাঁদের ওইসব কর্ম সাধারণ উম্মতের অনুরূপ পাপ ছিল না। এ ধরনের ভুলের দু' অবস্থা হয়।

প্রথম অবস্থা হলো- দীন প্রচার ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, শরীয়াতের আহকাম উম্মাতকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যা করা হয়-এগুলো অনুসরণ করা না করার বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

আর দ্বিতীয় অবস্থা ওইসব বিষয় যা প্রথম প্রকারে অন্তর্ভুক্ত নয় এবং শুধু নবীগণ আলাইহিস সালামের সত্তার সাথে সম্পর্কিত।

একদল আলেমের মতে প্রথম অবস্থায় নিষ্পাপ হওয়া মৌখিক ভুলের অন্তর্ভুক্ত। আর এ বিষয় আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ওইসব বিষয় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুল হওয়া অসম্ভব। এভাবে এ অবস্থায় কর্মের ক্ষেত্রে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কোনো ভুল হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসব থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখেছেন। কারণ তাঁর উক্তিগত ভুলের বিষয়টি দীন প্রচারের সাথে সম্পৃক্ত। আর যদি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্মে কোনো প্রকার ভুল হতো তাহলে তাতে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিতো। আর শত্রুরা তা নিয়ে উপহাস করতো। বাকী রইলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে কোনোরূপ ভুল হতো কিনা? আমি ওই হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা পরে আলোচনা করবো। আবু ইসহাক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ অভিযতের সমর্থক। কিন্তু অধিকাংশ ফিকহবিদ ও তার্কিক আলেমের অভিমত হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনপ্রচারের কাজে ও শরীয়াতের আহকামে অনিচ্ছাকৃত ভুল হওয়া বৈধ ছিল। যা অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায়ে ভুল হয়ে যেতো। কিন্তু তারা বলতো যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন প্রচারের কাজে ও কথায় ভুল হতো না।

কারণ এটা মু'জিয়া হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত প্রতিটি বানী সত্য ও সঠিক ছিলো। সুতরাং যদি বলা হয় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায়ও ভুল হতো, তাহলে তা হবে মু'জিয়ার পরিপন্থি। তবুও তাঁর কাজে ভুল হওয়া মু'জিয়ার পরিপন্থি নয়। আর না তা তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদার পরিপন্থি। আর তাঁর কাজে ভুলত্রুটি হওয়া, বা সামান্য সময়ের জন্য মুবারক কালবের অচেতন হয়ে পড়ার বিষয়টি মানবীয় গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي.

-নিশ্চয় আমি মানুষ, আমিও তোমাদের মতো ভুলে যাই, অতএব আমি ভুলে গেলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও।^১

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ ভুলে যাওয়া বা বিস্মৃতি লোকদের জন্য শিক্ষণীয় উপকারী হতো, আর শরীয়াতের বিষয় বর্ণনায় সহায়ক হতো। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنِّي لَأَنْسَى أَوْ أُنْسَى لِأَسْنٍ.

-আমি এ কারণে ভুল করি কিংবা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সুনাত প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।^২

এক বর্ণনায় এসেছে,

لَسْتُ أَنْسَى وَلَكِنْ أُنْسَى.

-আমি ভুল করিনা বরং আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুল বা বিস্মৃতিতেও দীনের ব্যাপক প্রচার ও নিয়ামতের পূর্ণতা রয়েছে।^৩

^১ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু সাহ ফীস সালাত, ৩:২০৫, হাদিস নং : ৮৮৯।

খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু তাহরী, ৪:৪৯২, হাদিস নং : ১২২৭।

গ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ইয়া সালাত খামসান, ৩:২০৫, হাদিস নং : ৮৬১।

^২ ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু ওয়া হাদাসানী আন মালেক, ১:৩০২।

খ) আবু নাইস ইম্পাহানী : মা'রিফাতুস সাহাবা, বাবু মিন ইসমিহী উসমান, ১৪:৬৬, হাদিস নং : ৪৪০০।

^৩ এ জন্যই যে, যাতে মানুষ ভুল করার বিষয় অবগত হতে পারে। মনে করুন যদি নামায়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুল না হতো তাহলে উম্মাত কিভাবে জানতো যে, নামায়ে ভুল হলে কী করতে হবে? এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে নামায়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

আর যেহেতু আল্লাহ তা'আলা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর নিয়ামতরাজি পরিপূর্ণ করেছেন, এ কারণে ওইসব বিষয় না হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছে আর না দোষণীয় হয়েছে। এ কারণে যেসব লোক বলে, কাজের মধ্যে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুল হয়ে যেতো, তারা এ কথা মেনে নিয়ে বলেছেন যে, সম্মানিত রাসূলগণ ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতেন না। বরং তাঁদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে সতর্ক করে দেওয়া হতো, যাতে তাঁদের দ্বারা আর ওই ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়।

কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের অভিমতে দেখা যায়, তাঁদেরকে এর হুকুমও জানিয়ে দেওয়া হতো যে আপনাদেরকে এটা করতে হবে। এ অভিমত বিতর্ক হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ওফাতের পূর্বে তাঁদেরকে আহকাম জানিয়ে দেওয়া হতো। প্রথম অভিমতটি অধিক বিতর্ক।

দ্বিতীয় প্রকারের ভুল যা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সন্তাগত কাজে হয়েছে তা তাঁর নিজের সাথে বিশেষভাবে বিশেষিত ছিলো। এর উদ্দেশ্য না দীন প্রচার ছিলো, আর না শরীয়াতের বিধান বর্ণনা করা ছিলো। যেমন তাঁর মুবারক ক্বালবের যিকির করা। এগুলো এমন কাজ যা তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত, অনুসরণীয় নয়। ওইসব কাজ সম্পর্কে উম্মাতের অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো, ওই কাজে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এমন ভুল বৈধ ছিল। আর কখনো কখনো হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক ক্বলব যিকির থেকে সাময়িক উদাসীন ও অসতর্ক হয়ে যেতো, এর কারণ ছিল তাঁর উপর এ দায়িত্ব অর্পিত ছিলো যে, তিনি সৃষ্টি জীবের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করবেন, উম্মাতের মধ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন, পরিবার পরিজনের দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের খোঁজ খবর নিবেন, শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। আর এরূপ অবস্থা না বার বার হতো, না তিনি একেবারে উদাসীন হয়ে যেতেন। বরং কখনো কিছ্রিত সময়ের জন্য এধরণের অবস্থার সম্মুখীন হতেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **إِنَّ لِيْغَانًا عَلَى قَلْبِي** - কখনো কখনো আমার মুবারক হৃদয় পর্দাবৃত হয়ে যায়, অতঃপর আমি আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার করি।^১

দ্বারা ভুল করান। যাতে উম্মাত জানতে পারে যে, নামাযে ভুল হলে এরূপ করতে হবে। মোটকথা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুল করা ও উম্মাতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। মূলত: এটাও দীন প্রচারের অংশবিশেষ ছিল।

^১. নাসায়ী : সুনানুল কুবরা, ৬:১১৬; ইবনে আবী আসেম : বাবু ইব্রাহীম লা ইউগানু..., ৩:৩২৫, হাদিস নং : ১০২৬।

আর এটা এমন কোনো বিষয় নয় যে, যা দ্বারা তাঁর মর্যাদায় ঘাটতি দেখা দিবে বা তাঁর মু'জিয়ার পরিপন্থি হবে।

অপর একদল আলেম হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ভুল, বিস্মৃতি, উদাসীনতা, অসতর্কতাকে একবাক্যে অস্বীকার করেন। এরূপ ধারণা হলো সুফিয়ায়ে কেরামের ও আধ্যাত্মিকতায় বিশেষজ্ঞদের, যারা ক্বালবের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত। এ হাদীসসমূহ সম্পর্কে তারা যে অভিমত প্রকাশ করেছেন আমি সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সামনে আলোচনা করবো।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

فِي الْكَلَامِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورِ فِيهَا السَّهْوُ مِنْهُ ﷺ

ভুল সংক্রান্ত হাদীসসমূহের বিবরণ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি ওইসব কাজ ও অবস্থার উল্লেখ করেছি যে, কোন ভুলগুলো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সংঘটিত হওয়া বৈধ আর কোনটি বৈধ নয়। আমি পূর্বে আলোচনা করেছি যে, দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুল ভ্রান্তি হওয়া বৈধ। তবে দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত কাজ ওই কল্যাণের ভিত্তির উপর কোনো কোনো অবস্থায় ভুল ভ্রান্তির সম্ভাব্যতাকে বৈধতা দেওয়া যায়। আমি এখন এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে ভুল সম্পর্কিত তিনটি সহীহ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে।

১. حَدِيثُ ذُو الْيَدَيْنِ فِي السَّلَامِ مِنْ اثْنَيْنِ.

১. প্রথম বর্ণনা হযরত জুল ইয়াদাইন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দু সালামের স্থলে এক সালামে যথেষ্ট করেছেন।^১

২. حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ فِي الْقِيَامِ مِنْ اثْنَيْنِ.

২. দ্বিতীয় হাদীস হযরত ইবনে বুহায়না রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাতের পর বসার স্থলে দাঁড়িয়ে যান।^২

৩. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا.

৩. তৃতীয় বর্ণনা হযরত ইবনে মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর তিনি বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়েছেন।^৩

^১ বুখারী : আস্ সহীহ, হাদিস : ১২২৮; মুসলিম : আস্ সহীহ, হাদিস : ৫৭৩।

^২ বুখারী : আস্ সহীহ, হাদিস : ১২২৪, ১২২৫; মুসলিম : আস্ সহীহ, হাদিস : ৫৭০।

^৩ বুখারী : আস্ সহীহ, হাদিস : ১২২৪, ১২২৫; মুসলিম : আস্ সহীহ, হাদিস : ৫৭০।

উক্ত তিন হাদীস হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুলের উপর নির্ভরশীল। যা তাঁর কাজে সংঘটিত হয়েছে।

আর এর হিকমত হলো যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সুনাত নির্ধারিত হওয়া।^১ কারণ এরূপ বাস্তব শিক্ষা কার্যকর করা মৌখিক প্রচার থেকে অধিক স্পষ্ট ও অধিক সন্দেহদূরকারী। আর এর শর্ত হলো, ভুলের উপর স্থির না থাকা। বরং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাৎক্ষণিকভাবে তা অনুভব করতে পারতেন যে, কাজের মধ্যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুল ও বিস্মৃতি সংঘটিত হয়েছে, আর তা তাঁর মু'জিযা ও সত্যতার পরিপন্থি হয় নি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي.

-নিশ্চয় আমি মানুষ, আমিও তোমাদের মতো ভুলে যাই, অতএব আমি ভুলে গেলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও।^২

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

رَحِمَ اللَّهُ فُلَانًا لَقَدْ أَذَكَّرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَسْقُطُهَا.

-আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করুন, যে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ছেড়ে দিয়েছি। এক বর্ণনায় এসেছে, أُنْسَيْتُهُمْ -যে আয়াতসমূহ আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।^৩

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنِّي لَأَنْسَى أَوْ أَنْسَى لِأُسْنٍ.

-আমি ভুলি না বরং আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়, যাতে সুনাত প্রতিষ্ঠিত হয়।^৪

^১ পর্দাবৃত হওয়ার অর্থ কস্বিনকালেও এটা নয় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রভুর মাঝে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা এসে যেতো। কারণ মুশাহাদার যে সমুন্নত স্তরে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপনীত হয়েছেন, সে সম্পর্কে ধারণা করা সাধ্যাতীত। পর্দাবৃত হওয়ার অর্থ হলো এই যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোযোগ একই সময় শ্রুতি ও সৃষ্টি উভয়ের প্রতি থাকতো।

^২ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু সাহ ফীস্ সালাত, ৩:২০৫, হাদিস নং : ৮৮৯।

খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু তাহরী, ৪:৪৯২, হাদিস নং : ১২২৭।

গ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ইয়া সালাত খামসান, ৩:২০৫, হাদিস নং : ৮৬১।

৩ বুখারী : আস্ সহীহ, হাদিস : ১২২৪, ১২২৫; মুসলিম : আস্ সহীহ, হাদিস : ৫৭০।

৪ ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু ওয়া হাদিসানী আনু মালেক, ১:৩০২।

কেউ কেউ বলেন, এটা বর্ণনাকারীর সন্দেহ। বরং বিশুদ্ধ বর্ণনা হলো এই যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَسْتُ أَنْسَى وَلَكِنْ أَنَسَى لِأَسْنٍ.

-আমি ভুলি না বরং আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়। যাতে আমি সুনাত প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

ইবনে নাফে' ও ইসা ইবনে দীনার রাহিমাতুল্লাহি তা'আলা আনহুমার অভিমত হলো, এটা বর্ণনাকারীর সন্দেহ নয়, বরং এর মর্মার্থ হলো সত্তাগতভাবে আমি ভুলি না আল্লাহ তা'আলা আমাকে ভুলিয়ে দেন।

আবুল ওয়ালিদ বাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ওই দু'বর্ণনাকারী ইবনে নাফি ও ইসা বিন দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা এর কথার অর্থ- এটাও হতে পারে যে, আমি জাযত অবস্থায় ভুলে যাই। আর ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়। অথবা এর মর্মার্থ এটাও হতে পারে যে, আমি মানবীয় চাহিদার আলোকে বিস্মৃত হয়ে যাই। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও ভুলে যাওয়া ও ভুলিয়ে দেওয়া আল্লাহ তা'আলার হিকমতের অধীনে হয়েছে। অনুরূপ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক প্রকার ভুলকে নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। এ জন্যই যে, মানুষ হওয়ার দিক থেকে এরূপ হওয়ার কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পাওয়া যেতো। আর একপ্রকার ভুলের ব্যাপারে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। কারণ ওই ধরনের ভুলে যাওয়া হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছাধীন ছিলো না, বরং তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হতো।

একদল ভাষাবিজ্ঞানী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতায় বলেন, অবশ্যই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে ভুল করেছেন কিন্তু তিনি বিস্মৃত হননি। কেননা বিস্মৃতি তো অলসতার কারণে হয়। তা এক ধরনের বিপদ। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ধরনের বিপদ থেকে নিরাপদ ছিলেন। তবে ভুল হলো এক ধরনের মনোযোগ। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে ভুল করতেন, তাঁর অবস্থা কখনো এরূপ হতো যে, নামাযের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি এমনভাবে বিভোর হয়ে পড়তেন যে, বাহ্যিক অবস্থায় পরিবর্তনের কথা মনেই থাকতো না। অলসতার কারণে এ রূপ হতো না বরং বিভোর হয়ে পড়ার কারণে ওই অবস্থার সৃষ্টি হতো। তারা দলিল হিসেবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী পেশ করে বলে যে, لَا أَنْسَى আমি ভুলিনি।

খ) আবু নাইস ইম্পাহানী : মা'রিফাতুস সাহাবা, বাবু মিন ইসমিহী উসমান, ১৪:৬৬, হাদিস নং : ৪৪০০।

একদল আলেমের অভিমত হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুল হতেই পারে না। ইচ্ছায়- অনিচ্ছায় তিনি যে ভুল করেছেন, তা সুনাত প্রতিষ্ঠার জন্য করেছেন। কিন্তু তাদের এ অভিমত পছন্দনীয় নয়, তাতে মতদ্বৈততা রয়েছে। কারণ এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, একই সময় একই জিনিস স্মরণে রাখতেন আবার ভুলেও যেতেন? তাদের একথা বলা জাযিয় হবে না যে, তাকে আদেশ করা হয়েছে আপনি ইচ্ছাকৃত ভুল করুন, যাতে সুনাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা এ কারণে বলা জাযিয় হবে না যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, إِيَّيْ لَا أَنْسَى أَوْ أَنْسَى -আমি নিজে ভুল করি অথবা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাণীর দ্বারা দুই অবস্থার এক অবস্থাকে প্রমাণ করেছেন। অর্থাৎ কখনো আমি নিজে ভুলে যাই, আর কখনো আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়। মতবিরোধের অবস্থাকে তিনি এভাবে বাতিল করে দেন যে,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي.

-নিশ্চয় আমি মানুষ, আমিও তোমাদের মতো ভুলে যাই, অতএব আমি ভুলে গেলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও।

আমাদের আলেমগণ ও সত্যপন্থি ইমামদের অনেকে এ অভিমতের সমর্থক। তাঁদের মধ্যে আবুল মোজাফ্ফর ইসফারাইনীও রয়েছেন। কিন্তু তিনি ছাড়া অন্যান্য আলেমগণ এ অভিমত পছন্দ করেননি। আমি নিজেও এই অভিমত পছন্দ করিনা। তাঁদের উভয় দলের জন্য হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী- لَسْتُ أَنْسَى وَلَكِنْ أَنَسَى -আমি ভুলি না বরং আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়। এটাকে দলিল হিসেবে পেশ করা জাযিয় হবে না। কারণ এ বর্ণনায় চূড়ান্তভাবে ভুলকে অস্বীকার করা হয়নি বরং শুধু ভুলের শব্দটিকে নিষেধ করা হয়েছে, ভুল শব্দটি বলা নিন্দনীয় হয়েছে। যেমন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, بِسْمَا لِّأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَذَا وَلَكِنَّهُ نَسِيَ -তোমাদের একথা বলা ভীষণ নিন্দনীয় যে আমি অমুক আয়াত ভুলে গেছি, বরং আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অথবা একথা নিষেধ করা হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্মৃত হয়ে যেতেন বা তাঁর মুবারক হৃদয় নামাযে কম গুরুত্ব

১. (ক) আহমদ : আল মুসনাদ, ১:৪২৩ হাদীস নং ৪০২০।

(খ) বুখারী : আস সহীহ, ৬:১৯৩ হাদীস নং ৫০৩২।

(গ) নাসায়ী : আস সুনাউল কুবরা, ১:৪৮৬ হাদীস নং ১০১৭।

দিয়েছেন, বরং তাঁর অবস্থা এরূপ হতো যে, তিনি নামাযে পুরোপুরি বিভোর হয়ে যাবার কারণে নামাযের বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তনের কথা ভুলে যেতেন। পরিখা খননের দিন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায ত্যাগ করেন, এমনকি নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। আর তিনি শত্রুদের থেকে আত্মরক্ষায় মশগুল থাকেন। সম্ভবতঃ তিনি এক ইবাদতে (জিহাদ) ব্যাপ্ত থাকার কারণে অন্য ইবাদত (নামায) ত্যাগ করেন। হাদীস শরীফে এসেছে, খন্দকের যুদ্ধে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার ওয়াক্ত নামায কাযা করেন। যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এটাকে ওইসব লোক দলিল হিসেবে পেশ করে যারা এ অভিমতের সমর্থক যে, শত্রুর ভয় থেকে আত্মরক্ষার্থে নামায যথাসময়ে আদায় করা সম্ভব না হলে, বিলম্বে আদায় করা জাযিয। এটা সিরিয়াবাসীদের অভিমত। তবে সহীহ বর্ণনা হলো এই যে, ভয়কালীন নামাযের বিধান এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর দ্বারা পূর্ববর্তী আদেশ রহিত করে দেয়া হয়েছে।^১

যদি আপনারা দ্বিমত পোষণ করে বলেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে এক জঙ্গলে গুয়ে পড়েন। তাতে ফজরের নামায কাযা হয়ে যায়। তাহলে এ সম্পর্কে আপনার কী বলবেন? অথচ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانٍ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

-আমার চোখ ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু আমার অন্তর ঘুমিয়ে পড়ে না।^২

তাই জেনে রাখুন যে, আলেমগণ এর অনেক জবাব দিয়েছেন।

তন্মধ্যে এক জবাব হলো, হাদীসে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ ইরশাদ যে, إِنْ عَيْنِي تَنَامَانٍ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي -আমার চোখ ঘুমিয়ে যায়, আর হৃদয় ঘুমায় না।^৩ এতে তিনি অধিকাংশ সময়ের কথা বলেছেন। কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম

^১ আগামীতে যদি উম্মাতের দ্বারা কোনো ভুল সংঘটিত হয়ে যায়। তা হলে এরূপ করতে হবে।

^২ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ফি সাল্লাতিল নবী, ৪:৩১৯, হাদিস নং ১০৭৯।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু সাল্লাতিল লাইলী, ৪:৮৯, হাদিস নং : ১২১৯।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী ওয়াস্ফি সাল্লাতিল নবী, ২:২৩৪, হাদিস নং : ৪০৩।

ঘ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু সাল্লাতিল নবী, ১:৩৫৫, হাদিস নং : ২৪৩।

ঙ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফী সাল্লাতিল লাইলী, ৪:১১১, হাদিস নং : ১১৪৩।

°(ক) মালেক : মুয়াত্তা, ২:১৬৪ হাদীস নং ৩৯৪।

(খ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফিস সাল্লাতিল লাইল, ২:৪০ হাদীস নং ১৩৪১।

(গ) নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ১:২৩২ হাদীস নং ৩৯২।

(ঘ) বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবু বদয়িলু ওহী, ৩:৫৯।

হয়। ঠিক এ অবস্থায় তাঁর মোবারক অভ্যাসের বিপরীত কাজ হয়ে যেতো। ওই ব্যাখ্যার সত্যতা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীতে বিদ্যমান পাওয়া যায়, إِنْ اللَّهُ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا -আল্লাহ তা'আলা আমাদের মুবারক রুহসমূহকে কিছুক্ষণের জন্য কবজ করে নেন।^১ অথবা হযরত বিলাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর এ কথা বলা যে, আমার এমন ঘুম এসেছে, এর পূর্বে আমার আর কখনো এরূপ ঘুম আসেনি। ওই অবস্থা এক হিকমতের আলোকে হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ওই ঘটনায় তাঁর বিধান আর সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আর তিনি চেয়েছেন যে, এভাবে শরীয়াতের বিধান প্রকাশ হয়ে যাক। যেমন অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে-

لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَيَقُظْنَا وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لَنَا بَعْدُكُمْ.

-যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করতেন, তাহলে অবশ্যই আমাকে জাগিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন, যাতে পরবর্তীদের জন্য সহজতর হয়।

দ্বিতীয় কথা হলো যে, ঘুমের অবস্থায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হৃদয় বিভোর হয়ে পড়তো না। এমন কি নিদ্রাবস্থায়ও তাঁর অঙ্গু বিনষ্ট হতো না।

এটাও বর্ণিত আছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়তেন। আর তাঁর নিশ্বাস বড়ো হয়ে যেতো, তাঁর নাকের শব্দ শুনা যেতো, এরূপ হওয়া সত্ত্বেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করতেন কিন্তু অযু করতেন না।

আর এ বর্ণনা হযরত ইবনে আক্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহধর্মীদের নিকট শয়ন করতেন, আর ঘুম থেকে উঠে অযু করতেন। এই হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোয়া থেকে উঠার পর এ কারণে অযু করতেন, হতে পারে স্ত্রীকে স্পর্শ করা বা অন্য কোনো কারণে অপবিত্র হলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করতেন। তারপর এ হাদীসের শেষ ভাগে বলা হয়েছে,

ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيْطَةً. ثُمَّ أَقِيَمْتُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

^১ বুখারী : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ৭৪৭১।

-হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযের পর শুয়ে পড়তেন, এমন কি আমি তাঁর মুবারক নাকের শব্দ শুনতাম। অতঃপর ইকামাত বলা হলে তিনি উঠে নামাযের ইমামতি করতেন, কিন্তু অযু করতেন না।^১

কেউ কেউ বলেছেন, ঘুমের অবস্থায় হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক কলব এ কারণেই জাগ্রত থাকতো যে, কখনো কখনো নিদ্রাবস্থায় তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হতো। উপত্যকায় ঘুমানোর ঘটনায় শুধু এটা বলা হয়েছে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক চক্ষু ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য দেখতে পাননি। সূর্য দেখা মুবারক কালবের কাজ নয় বরং চক্ষু মুবারকের কাজ।

এ কারণে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ঘটনায় ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا.

-যে আল্লাহ তা'আলা আমার রুহ কবজ করে নিয়েছেন। সুতরাং যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তাহলে আমাকে অন্য সময় জাগিয়ে দিতে পারতেন।^২

ওই স্থান সম্পর্কে যদি একথা বলা হয় যে, যদি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুমে বিভোর হয়ে পড়ার অভ্যাস না থাকতো তাহলে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে একথা বলতেন না যে, كُنَّا لَنَا الْمُنْبَجُ - তুমি আমাদের জন্য ভোর হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।^৩ অর্থাৎ ফজরের নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। এর প্রতি উত্তর হলো এই, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায অন্ধকারে পড়তেন।

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু সামারি ফীল ইলম, ১: ১৯৯, হাদিস নং ১১৪।

খ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফী সালাতিল লাইলী, ৪:১১৯, হাদিস নং : ১১৫১।

গ) আহমদ ইবনে হামল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবদিদ্বাহ ইবনে আক্বাস, ৭:৩৬, হাদিস : ৩০০৩।

২. ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবুনা ওমি আনিস্ সালাত, ১:৩২, হাদিস নং : ২৩।

খ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু তাখিরিল আযান, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৫২, হাদিস নং : ৬৮৭।

গ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যা, বাবুদ্বাহি ক্বাছা আরওয়াহানা..., ৪:৩৭০, হাদিস নং : ১৬২২।

৩. ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবুনা ওমি আনিস্ সালাত, ১:৩১, হাদিস নং : ২২।

আর যিনি গভীর নিদ্রায় অভিহু হয় তাঁর জন্য প্রথম সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় না, কারণ সময় চেনার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সজাগ ও সচেতন থাকা জরুরি। এ কারণে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নিয়োজিত করে ইরশাদ করেন, যেন তিনি প্রথম ওয়াক্ত অনুভব করে তাকে অবগত করে দেন। যদি ঘুম ব্যতীত অন্য কোন কাজে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশগুল হতেন তাহলেও হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে না কাউকে নিয়োজিত করে আদেশ করতেন যে, ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হলে আমাকে জাগিয়ে দেবে। এটা তাঁর নবুওয়াতের শানের পরিপন্থি নয়।

যদি বলা হয় যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁর নিজের সম্পর্কে এরূপ বলেন, نَسِيتُ 'আমি ভুল গেছি'। একথা বলতে নিষেধ করেছেন কেন?

অথচ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বর্ণনা করেন, إِنِّي أَنَسَى كَمَا - আমিও তোমাদের মতো ভুলে যাই, অতএব আমি ভুলে গেলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও অথবা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, لَقَدْ أَذْكُرْنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَنَسِيهَا - অমুক ব্যক্তি আমাকে অমুক আয়াত স্মরণ করে দিয়েছে। যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

এর জবাব স্মরণ রাখুন। এর জবাব হলো যে, ওই সমস্ত বর্ণনায় কোনো বিরোধ নেই। 'হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলে গেছেন।' - হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা বলতে নিষেধ করার কারণ হলো যে, তিনি যেসব আয়াত তিলাওয়াত করা ত্যাগ করেছেন, তা এ কারণে করেননি যে তিনি উদাসিনতার কারণে ভুলে গেছেন বরং আল্লাহ তা'আলা ওই আয়াতসমূহ রহিত করে দিয়েছেন। তারপর ওই আয়াতসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যেগুলো ইচ্ছা সেইগুলো তাঁর অন্তর থেকে মুছে দেন আর যেগুলো ইচ্ছা বহাল রাখেন।

আর যেসব আয়াত ভুলে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিলাওয়াত থেকে বাদ পড়ে যেতো, সেগুলো কেউ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতো। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো সম্পর্কে ইরশাদ করছেন যে, نَسِيتُ - আমি ভুলে গেছি।

কেউ কেউ বলেন, যখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করতেন, 'আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।' তখন তিনি বৈধতার সূত্রে ভুলানোকে স্বীয় শ্রদ্ধার সাথে সম্পর্কিত করতেন। আর যখন তিনি জাযিযের সূত্রে ভুলে যাবার কথা

বলতেন, তখন ভুলকে তাঁর আপন সত্তার সাথে সম্পর্কিত করতেন, কারণ তাতে বান্দার সম্পৃক্ততা রয়েছে।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের নিকট শরীয়াতের প্রচার ও আহকাম পৌছে দেওয়ার পর কোনো আয়াত তিলাওয়াত করা ছেড়ে দেওয়া আর ভুলে যাওয়া, আর উম্মত কর্তৃক তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া বা স্বয়ং তাঁর খেয়ালে এসে যেতে পারে। তবে ওই আয়াতসমূহ না তাঁর স্মরণে আসতো, আর না কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া পছন্দ করতেন, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা রহিত করে তাঁর অন্তর থেকে মুছে দিয়েছেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ওই আয়াতসমূহ উল্লেখ না করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা যেসব আয়াত রহিত করার ইচ্ছা করেছেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওইসব আয়াত ভুলে যেতেন। এটাও সম্ভব হতে পারে যে, কোনো কোনো আয়াত উম্মতের নিকট পৌছানোর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা রহিত করে দেন।^১

আর ওই আয়াতসমূহ রহিত করায় কুরআন মজীদে বাক্য বিন্যাসে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়নি, আর না কোটা বিধান এলোমেলো হয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা সেগুলো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার এমন ব্যবস্থা করেন, যেনো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তা ভুলে না যান। কারণ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। আর তিনি তাঁর অবশিষ্ট আয়াতসমূহ উম্মতের নিকট পৌছানোর দায়িত্ব হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অর্পণ করেছেন। এ কারণে কখনো এটা হতে পারে না, অবহিত আয়াতসমূহ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বকালের জন্য ভুলে গেছেন।^২

^১. নামায ত্যাগ করা জায়যি হবে না, বরং কুরআন মজীদে ভয়কালীন নামায যেভাবে আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেভাবে যুদ্ধের সময় নামায আদায় করতে হবে।

^২. উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মিরাজ রজনীতে মুসলিম উম্মাহর জন্য পঞ্চাশ ওয়াস্ত নামায ফরয করা হয়। কিন্তু ঐ আদেশ উম্মাহর নিকট পৌছার পূর্বে রহিত করে দেওয়া হয়। আর পাঁচ ওয়াস্ত নামাযকে পঞ্চাশ ওয়াস্ত নামাযের স্থলা ভিসিস্ত করা হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَجَازَ عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّغَائِرِ

সম্মানিত নবীগণ কর্তৃক সগীরা গুনাহ সম্পাদনের ধারণার খণ্ডন প্রসঙ্গে

আম্বিয়ায়ে কেরামের দ্বারা সগীরা গুনাহ সম্পাদন যারা বৈধ মনে করে, এ অধ্যায়ে তাদের দলিলসমূহ উল্লেখ করে পর্যালোচনা করা হবে। স্মরণ রাখুন, যে সকল ফিকহবিদ, হাদীসবেত্তা ও তাঁদের সমর্থক তार्কিক আলেমগণ সম্মানিত নবীগণের দ্বারা সগীরা গুনাহ হওয়া সম্ভব বলে মত ব্যক্ত করেছেন, তারা এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে অনেক আয়াত ও হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন তাহলে কবীরা গুনাহসমূহও উম্মতের ঐকমত্যে স্বীকারের পর্যায়ে পৌছে যাবে। যা কোন বিশ্বাসী মুসলমান বলেনি। এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? এরূপ মনোভাব পোষণকারীগণ যে আয়াতসমূহ দলিল হিসেবে পেশ করে, ওই আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদগণ ব্যাপক মতভেদ প্রকাশ করেছেন, আর তারা অনেক সন্দেহের উল্লেখ করেছেন, আর ওই আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সলফে-সালেহীন আলেমগণ যে ব্যাখ্যা করেছেন তা ওইসব লোকদের নির্ধারিত অর্থের পরিপন্থি হয়েছে। তাদের অভিমতের আলোকে উম্মতের ঐকমত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর তাদের উত্থাপিত দলিলসমূহ নিয়ে পূর্ববর্তী যুগ থেকে মতভেদ ও মতবিরোধ চলে আসছে। আর তাদের এ অভিমতের বিরুদ্ধে দলিল প্রমাণ পেশ করে তাদের উত্থাপিত অভিমতসমূহ ভ্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় অভিমত হলো, হযরাত আম্বিয়ায়ে কেরাম ছগীরা গুনাহ থেকেও নিষ্পাপ ছিলেন এটা যথার্থ হয়েছে, তাই এ অবস্থায় প্রথম অভিমত পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। আর বিস্তৃত অভিমতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় আমি তাদের উত্থাপিত দলিল-প্রমাণসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

তাদের একটি দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ.

-যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করে দেন আপনার পূর্ববর্তীদের ও আপনার পরবর্তীদের।^১

^১. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২।

আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .

-আর হে মাহবুব! আপন খাস লোকদের এবং সাধারণ মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদের পাপরাশির ক্ষমা প্রার্থনা করুন।^১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۖ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۖ

-এবং আপনার উপর থেকে আপনার সেই বোঝা নামিয়ে নিয়েছি, যা আপনারা পৃষ্ঠ ভেঙ্গেছিলো।^২

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ .

-আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি তাদের কেন অনুমতি দিলেন।^৩

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

-যদি আল্লাহ পূর্বেই একটা কথা লিপিবদ্ধ না করতেন, তবে হে মুসলমান! তোমরা যা কাফিরদের নিকট থেকে মুক্তিপণের মাল গ্রহণ করেছো, তজ্জন্য তোমাদের উপর মহা শাস্তি আসতো।^৪

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ

-তিনি ক্রুদ্ধিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এ কারণে যে, তাঁর নিকট সেই অন্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে।^৫

^১. আল কুরআন : সূরা মুহাম্মদ, ৪৭:১৯।

^২. আল কুরআন : সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:২-৩।

^৩. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৪৩।

^৪. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৬৮।

^৫. আল কুরআন : সূরা আবাসা, ৮০:১৬।

এছাড়াও অন্যান্য আয়াতসমূহ আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আশিয়া কেরামের ঘটনায় উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ .

-এবং আদম থেকে আপন প্রভুর নির্দেশের ক্ষেত্রে ত্রুটি সংঘটিত হলো, তখন যেই উদ্দেশ্যে চেয়েছিলো সেটার পথ পায়নি।^১

অপর আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

فَلَمَّا ءَاتَتْهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا ۖ فَتَعَالَىٰ

اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

-অতঃপর যখন তিনি তাদের উভয়কে নেক সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁর দানের মধ্যে তাঁর শরীক দাঁড় করালো, কিন্তু তাদের শিরক হতে আল্লাহ বহু উর্ধ্বে।^২

তারপর হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম যা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা নকল করে ইরশাদ করেছেন-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

الْخَاسِرِينَ .

-হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। সুতরাং যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়া না করো, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।^৩

অনুরূপ হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম এর বাণী-

سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .

-পবিত্রতা তোমারই নিশ্চয় আমার দ্বারা অশোভন কাজ সম্পাদিত হয়েছে।^৪

^১. আল কুরআন : সূরা ভোয়া-হা, ২০:১২১।

^২. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৯০।

^৩. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:২৩।

^৪. আল কুরআন : সূরা আশিয়া, ২১:৮৭।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে—

وَقَدْ دَاوُدُ أَنْمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝
فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۝

-এখন দাউদ বুঝতে পেরেছে যে, আমি এটা তাকে পরীক্ষা করেছি, তখন আপন প্রভুর নিকট ক্ষমা চেয়েছে, সাজদায় লুটিয়ে পড়েছে ও ফিরে এসেছে। অতঃপর আমি তাকে তা ক্ষমা করেছি এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তার জন্য আমার দরবারে নৈকট্য ও ভালো ঠিকানা রয়েছে।^১

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—
وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِمْ وَهُمْ يَدْعُونَ ۖ

-এবং নিশ্চয় স্ত্রীলোকটা তার কামনা করেছিলো এবং সেও স্ত্রীলোকের ইচ্ছা করতো।^২

অথবা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন—

فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ
إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۖ

-অতঃপর মূসা তাকে ঘুষি মারলো, সুতরাং সে তাকে মেরে ফেললো, আর বললো এ কাজ শয়তানের নিকট থেকে হয়েছে। নিশ্চয় সে শত্রু, প্রকাশ্য পথভ্রষ্টকারী।^৩

আর হযুর সালাহুদ্দাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে দোয়া করতেন—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ.

-হে আমার আল্লাহ! আমার পূর্বাপর, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ক্রটি মার্জনা করে দাও।^৪

^১. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:২৪-২৫। এটা সাজদার আয়াত আশাকরি সম্মানিত পাঠক উক্ত আয়াত পাঠ করে সাজদা আদায় করবেন।

^২. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:২৪।

^৩. আল কুরআন : সূরা কাসাস, ২৮:১৫।

^৪. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কাওলিন্ নবী, ২০:৮, হাদিস নং : ৫৯১৯।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু দোয়া ফী সালাতিল্ লাইলি, ৪:১৬৯, হাদিস নং : ১২৯০।

অথবা হযুর সালাহুদ্দাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন দোয়াসমূহে অনুরূপ বলা।
অথবা শাফায়াতের হাদীসে আশিয়ায়ে কেরামের নিজ নিজ ভুল-ত্রুটি স্মরণ করা,
অথবা হযুর সালাহুদ্দাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন দোয়াসমূহে এরূপ বলা যে,
إِنَّهُ لَيَغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

-আমার মুবারক কালবে পর্দা পড়ে যায়। আর তখনই আমি ইসতিগফার পাঠ করি।^১

অথবা হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণিত হাদীস, যাতে বলা হয়েছে যে, হযুর সালাহুদ্দাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً.

-প্রতিদিন আমি আমার প্রভুর নিকট সত্তরবারের অধিক তাওবা ইসতিগফার করি।^২

হযরত নূহ আল্লাইহিস্ সালামের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

وَلَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ.

-এবং তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো ও দয়া না করো আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।^৩

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন—

وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ.

-এবং যালিমদের সম্পর্কে আমাকে কিছুই বলো না। তাদেরকে অবশ্যই ডুবিয়ে মারা হবে।^৪

আর হযরত ইবরাহীম আল্লাইহিস্ সালাম এর পক্ষ থেকে ইরশাদ করা হয়েছে—

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝

গ) ভিরমিযী : আস্ সুনা, ১১:৩০০, হাদিস নং : ৩৩৪৩।

১. নাসায়ী : সুনাউল কুবরা, ৬:১১৬।

২. বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ইসতিগফারিন্ নবী, ১৯:৩৬৫, হাদিস নং : ৫৮৩২।

৩. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৭:১৭৯, হাদিস নং : ৮১৩৭।

৪. তাবরীযী : মিশকাহুল মাসাবীহ, বাবুল ইসতিগফার ওয়াত্ তাওবা, পৃ. ২৩, হাদিস নং : ২৩২৩।

৫. আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১:৪৭।

৬. আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১:৩৭।

-এবং তিনিই যার প্রতি আমার আশা আছে যে, আমার অপবাদসমূহ
কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করবেন।^১

আর হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম ইরশাদ করেছেন-

تَبْتُ إِلَيْكَ

-আমি তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি।^২

হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম-এর ঘটনায় ইরশাদ করা হয়েছে-

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ

-এবং নিশ্চয় আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম।^৩

আর এরূপ বাহ্যিক অনেক আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করে প্রমাণ করেছে যে,
আম্বিয়ায়ে কেরামের দ্বারা সগীরা গুনাহ সংঘটিত হতে পারে।

এখন শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার তাদের প্রতি উত্তর দানের সূচনা করে বলেন-

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

-যাতে আল্লাহ আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করে দেন আপনার
পূর্ববর্তীদের ও আপনার পরবর্তীদের।^৪

উক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে মুফাস্সিরীনে কেরাম মতদ্বৈততা প্রকাশ
করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা ওই ভুলত্রুটিসমূহ বুঝানো হয়েছে। যা
নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে বা পরে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা
প্রকাশিত হতে পারে।^৫

কেউ কেউ বলেন, এর মর্মার্থ হলো এই যে, যদি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের দ্বারা পূর্বে বা পরে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হয়েও থাকে। তবে
আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তা পূর্বে ক্ষমা করে দেওয়া
হয়েছে। কিন্তু হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা গুনাহ হয়নি।

^১. আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ২৬:৮২।

^২. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৪৩।

^৩. আল কুরআন : সূরা সোদ্দাদ, ৩৮:৩৪।

^৪. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২।

^৫. কখনো এরূপ অবস্থা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল প্রকার
ভুলত্রুটি থেকে সর্বকালের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখেছেন।

কেউ কেউ বলেন, ওই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শুধু হযুর সালাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের নিষ্পাপ হওয়ার কথা প্রকাশ করার ইচ্ছা করেছেন। আহমদ বিন
নজর এই অর্থ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের গুনাহ
সমূহ বুঝানো হয়েছে।^৬

কেউ কেউ বলেন, ওইসব ভুল-ত্রুটি বুঝানো হয়েছে যা ভুলবশতঃ বা অসতর্কতা
অবস্থায় হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। আল্লামা
তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ অভিমত উল্লেখ করেছেন। আর আল্লামা
কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ মতকে গ্রহণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা 'পূর্ববর্তী গুনাহ' বলে হযরত আদম আলাইহিস্
সালাম-এর ভুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর পরবর্তী গুনাহ বলে হযুর
সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের গুনাহ বুঝিয়েছেন। আল্লামা সমরকন্দী
ও সুলামী, হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে এ বর্ণনা উল্লেখ
করেছেন। এ ব্যাখ্যার পূর্বে উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের আলোকে উল্লেখ করা
হয়েছে-

وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

-এবং হে মাহবুব! আপন খাস লোকদের এবং সাধারণ মুসলমান পুরুষ
ও মুসলমান নারীদের পাপরাশির ক্ষমা প্রার্থনা করুন।^৭

আল্লামা মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যদিও উক্ত আয়াতে হযুর সালাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। তবুও এর দ্বারা উম্মাতকে বুঝানো
হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, যখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলার
আদেশ দেওয়া হয়েছে-

وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

^৬. এটা উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ রহমত যে, তিনি এ উম্মতের অসংখ্য গুনাহ
অতি নগন্য নেকীর কারণে ক্ষমা করে দেবেন। আর কিয়ামত দিবসে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের শাফায়াতে অসংখ্য উম্মাত ক্ষমা পেয়ে যাবে। একমাত্র হযুর সালাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের ওসীলায় মুসলিম উম্মাহ এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে।

^৭. আল কুরআন : সূরা মুহাম্মদ, ৪৭:১৯।

-আর আমি জানিনা আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে।^১

উক্ত আয়াত শুনে কাফিররা ভীষণ উল্লাসিত হয়ে উঠে, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন-

لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ.

-যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করে দেন, আপনার পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের।^২

আর এর পরবর্তী আয়াতে মু'মিনদের শেষ পরিণতির উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। আয়াতের অর্থ হলো এই যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। যদি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা কোন ভুল হয়েও যায়, তাহলে সেগুলো সম্পর্কে তাঁকে পাকড়াও করা হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে মাগফিরাতের অর্থ হলো, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল প্রকার দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন। বাকী রইলো আল্লাহর বাণী-

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿١﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٢﴾

-এবং আপনার উপর থেকে আপনার সেই বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা আপনার পৃষ্ঠ ভেঙ্গেছিলো।^৩

এর দ্বারা ওই ভুলত্রুটিসমূহ বুঝানো হয়েছে, যা নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা প্রকাশ হয়েছে। এ অভিমত ইবনে যায়িদ, হাসান বসরী ও কাতাদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রমুখের। কারো কারো অভিমত হলো যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সব ভুল-ত্রুটি থেকে নবুওয়াত প্রকাশের পূর্ব থেকেই নিরাপদ রাখা হয়েছে। যদি এরূপ করা না হতো, তাহলে আজ তাঁর মুবারক পিঠ ভেঙ্গে পড়তো, সেহেতু আমি পূর্ব থেকে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর থেকে ওই বোঝা সরিয়ে দিয়েছি। আল্লামা সমরকন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

^১ আল কুরআন : সূরা আহকাফ, ৪৬:৯।

^২ আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২।

^৩ আল কুরআন : সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:২-৩।

কেউ কেউ বলেন, এর মর্মার্থ হলো, নবুওয়াতের বোঝা, যা তিনি প্রচার করেছেন। যা প্রচার করার মাধ্যমে হালকা হয়ে গেছে। আল্লামা মাওয়ারদী ও সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এর মর্মার্থ হলো এই যে, আমি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর থেকে জাহিলীয়াতের বোঝা সরিয়ে দিয়েছি। আল্লামা মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এর মর্মার্থ হলো এই যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানীয়াতের গোপনীয় রহস্যাবলী ও ভয়-ভীতির বোঝা। কারণ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শরীয়াতের প্রত্যাশী ছিলেন যেটার উপর তিনি আমল করতে পারেন। তখন আমি তাঁকে শরীয়াত দান করে সে বোঝা হালকা করে দিয়েছি। আল্লামা কুশাইরী এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো এই যে, আমি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অর্পিত বোঝা হালকা করে দিয়েছি। কারণ আমি নিজেই সে বিষয়ের হিফাযত করেছি, যার হিফাযত করার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিলো। যার ফলে তাঁর মুবারক পিঠ ভেঙ্গে পড়েছিলো। তাঁর মুবারক পিঠ ভেঙ্গে পড়ার মর্মার্থ হলো এই যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক পিঠ ভেঙ্গে পড়েছে। যারা এটাকে নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে ধর্তব্য মনে করে তাদের মতে এর মর্মার্থ হলো ঐ কাজসমূহ যেগুলোর ব্যবস্থাপনায় হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে মশগুল থাকতেন। আর নবুওয়াত প্রকাশের পর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে বিষয় নিষেধ করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা সেটাকে বোঝা স্থির করেন। তাই এর অর্থ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা থেকে বাঁচিয়েছেন। আর তা ওনাহ সমূহ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। যদি ওইসব কাজ অবশিষ্ট থাকতো তাহলে নবুওয়াত লাভের পর তাঁর উপর দ্বিগুণ বোঝা হয়ে যেতো। (আল্লাহ তা'আলা তা হালকা করে দেন।) অথবা এটাও হতে পারে যে, জাহিলীয়াতের কাজ-কর্ম দেখে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা জাহিলীয়াতের দোষত্রুটি দূর করে তাঁর মুবারক হৃদয়কে হালকা করে দেন। আর এর অর্থ হলো, ওই সংরক্ষণের যে দায়িত্ব হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ন্যস্ত করেছেন, সেই দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সেই দায়িত্ব হালকা করে দেন। বাকী রইলো আল্লাহ তা'আলার বাণী-

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ

-আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলেন।^১

এটা তো এমন এক বিষয় যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্বে নিষেধ করেন নি যে, এ কাজ করার পর আপনার দ্বারা অবাধ্যতা হয়ে যাবে। আর না ওই ধরনের কাজকে আল্লাহ তা'আলা নাফরমানী বা অবাধ্যতা বলে গণ্য করেছেন। বরং জ্ঞানী আলেমগণ তো এ আয়াতকে অসন্তোষমূলক আয়াত বলেন নি। যারা এটাকে অসন্তোষি অর্থে মনে করে তারা ভুল করেছে।

নিফতুবীয়া বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দোষ ঘোষণা করে মূলতঃ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় গ্রহণ করার অধিকার দান করেছেন।^২ আর আলেমগণ বলেন, এ বিষয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী অবতীর্ণ হয়নি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকার ছিল তিনি যা চাইতেন তা করতেন। বলুন! এরূপ হবেই না কেনো? কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

فَأَذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ

-তখন আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুমতি দিয়ে দিন।^৩

^১. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৪৩।

^২. উক্ত আয়াত তাবুক যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত। তাবুক যুদ্ধের সময় ভীষণ গরম পড়ছিলো, মুনাফিকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওয়র-আপত্তি পেশ করে যুদ্ধে যোগদানে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে, কারণ সেটি গরমের মৌসুম ছিল। তাই গরমে ভ্রমণ করা ভীষণ কষ্টকর। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি না দিয়ে বললেন, যদি তোমরা যুদ্ধে যোগদান করতে না চাও তাহলে যোগদান করো না। আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উভয় বিষয়ের অধিকার প্রদান করেছেন। যদি আপনি চান তাহলে ওই লোকদের যুদ্ধে আপনার সাথে নিয়ে যেতে পারেন। আর যদি কাউকে মদীনাতে থাকার অনুমতি দান করতে চান, তাও করতে পারেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই মুনাফিকদের যুদ্ধে যোগদান না করে মদীনাতে থাকার অনুমতি দান করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন যে, যদি আপনি তাদের অনুমতি নাও দিতেন তাহলেও তারা কখনো মুসলিম সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে যোগদান করতো না।

^৩. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৬২।

আর যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুমতি দেন, তখন আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে বিষয়টি অবহিত করে দেন। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ইচ্ছা ও মনোবাসনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। আর আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন যে, যদি আপনি তাদের অনুমতি না দিতেন, তখনও তারা বসে থাকতো। সুতরাং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন তাতে ক্ষতির কোনো কারণ ছিলো না। উক্ত আয়াতে বর্ণিত عَفَا শব্দের অর্থ ক্ষমা করা নয়, বরং এক হাদীসে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَفَا اللَّهُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ.

-আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ঘোড়া ও ক্রীতদাসের যাকাত থেকে মুক্ত রেখেছেন।^১

পক্ষান্তরে ওইসব কিছু উপর কখনো যাকাত ওয়াজিব ছিলো না। সুতরাং এখানে মাফ করে দেওয়ার অর্থ হবে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তা অত্যাবশ্যিক ছিলো না।

আল্লামা কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, الْعَفْوُ لَا يَكُونُ إِلَّا 'غُناহ ছাড়া ক্ষমার কথা আসতে পারেনা।' ওই ধরনের কথা ওইসব লোক বলতে পারে যারা আরববাসীদের ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো। অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, عَفَا اللَّهُ عَنْكَ 'আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন'। এর অর্থ এ নয় যে, আপনি গুনাহ করেছেন, আর আল্লাহ তা'আলা তা মাফ করে দিয়েছেন। বরং এর অর্থ হলো এই যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কাজ করার কারণে তাঁর উপর কোনো গুনাহের অপরিহার্যতা আসবে না।

দাউদী বলেন, উক্ত আয়াত হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদায় বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন- هُوَ اسْتِفْتَاحُ كَلَامٍ مِثْلَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ -মূলতঃ আলোচ্য বিষয়ের সূচনা বাক্য হয়েছে। যেমন বলা হয় যে, আল্লাহ

^১. বাযযার : আল মুসনাদ, ৩:৭৫।

তা'আলা আপনাকে সংশোধন করুন বা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মর্যাদা দান করুন।

আল্লাহা সমরকন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিরাপত্তা দান করেছে।

বদরের বন্দীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন-

مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتَخَيَّرَ فِي الْأَرْضِ
تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٧٧﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧٨﴾

-কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, কাফিরদেরকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত যমীনে তাদের খুন প্রবাহিত করবেন না। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করে থাকো এবং আল্লাহ চান আখিরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। যদি আল্লাহ পূর্বেই একটা কথা (বিধান) লিপিবদ্ধ না করতেন, তবে হে মুসলমানগণ! তোমরা যা কাফিরদের নিকট থেকে 'মুক্তিপণের মাল' গ্রহণ করেছো, তজ্জন্য তোমাদের উপর মহা শাস্তি আসতো।'

এর দ্বারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর গুনাহের দোষারোপ করা হয়নি, বরং তাতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছেন। অন্যান্য আশিয়ায়ে কেরাম এরূপ মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। আর এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে, এমর্যাদা আপনি ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। আর অন্যান্য আশিয়ায়ে কেরাম ওই মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। এ কারণে বলা হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে কোনো নবীর জন্য মুক্তিপণ আদায় করা সঙ্গত ছিলো না। এ জন্যই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, أَجَلْتُ لِي الْفَنَائِمُ وَلَمْ تَجِلْ لِنَبِيِّ قَبْلِي - আমার জন্য

১. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৬৭-৬৮।

যুদ্ধলব্ধ মাল হালাল করা হয়েছে। অথচ আমার পূর্বে কোনো নবীর জন্য তা বৈধ করা হয়নি।' যদি বলা হয়, তাহলে এ আয়াতের কী অর্থ হবে?

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ.

-তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করে থাকো, আর আল্লাহ আখিরাত চান।'

এর প্রতি উত্তর হলো, এই যে, এটা ওইসব লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা দুনিয়ার সম্পদ প্রত্যাশী ছিলো। তাদের যুদ্ধে যোগদানের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পার্শ্ব স্বার্থসিদ্ধি করে স্বীয় ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করা। ওই আয়াতের দ্বারা না হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে, আর না তাঁর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের বুঝানো হয়েছে।

হযরত দ্বাহ্বাক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় এসেছে যে, বদরের যুদ্ধে মুশরিক বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর যখন কিছু লোক গণীমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর এ কারণে তারা সাময়িক কিছু সময়ের জন্য জিহাদের কথা ভুলে যায়। এমনকি হযরত উমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আশংকা করেন, না জানি মুশরিক বাহিনী ফিরে আসে। এরপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন-

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

-যদি আল্লাহ পূর্বেই একটা কথা লিপিবদ্ধ না করতেন, তবে হে মুসলমানগণ! তোমরা যা কাফিরদের নিকট থেকে "মুক্তিপণের মাল" গ্রহণ করেছো, তজ্জন্য তোমাদের উপর মহা শাস্তি আসতো।'

উক্ত আয়াতের তাফসীরে মতভেদ রয়েছে, কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, لَوْلَا أَنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنْ لَا أُعَذِّبَ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ التَّهْنِی -

১. (ক) বুখারী : আস সহীহ, ৪:৮৫ হাদীস নং ৩১২২।

(খ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসনাদ, ১২:৪৩৫।

তাফসীর ও হাদীসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত, বদরের যুদ্ধে বন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মুক্ত করে দেন। এপ্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। এরপর পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ করেন।

২. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৬৭।

৩. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৬৮।

لَعَذْبُكُمْ - যদি আমার পক্ষ থেকে একথা প্রকাশ না হতো যে আমি যতক্ষণ নিষেধ না করতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে শাস্তি দিতাম না। এ তাফসীরের আলোকে বন্দীদের ব্যাপারে আপনার ব্যবস্থাপনাকে গুনাহের কাজ বলা যাবে না।

কেউ কেউ বলেন, যদি তোমাদের কুরআনের উপর ঈমান না থাকতো আর তা প্রথম কিতাব, যাতে তোমাদের ক্ষমা করা ওয়াজিব ঘোষণা করা হয়েছে, তবে গনীমতের ব্যাপারে তোমাদের জবাবদিহী করা হতো। এ তাফসীর দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, আয়াতের মর্মার্থ হলো, যদি তোমরা কুরআনের উপর ঈমান না রাখতে, আর তোমরা ওইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত না হতে, যাদের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, তাহলে সীমা অতিক্রমকারীদের যেভাবে ধর-পাকড় করা হয়েছে, তোমাদেরকেও সেভাবে পাকড়াও করা হতো।

কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, লাওহে মাহফুযে যদি পূর্বে লিখে দেওয়া না হতো যে, গনীমতের মাল তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তাহলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হতো।

উক্ত তাফসীর ও ব্যাখ্যাসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোনো গুনাহ ও অবাধ্যতার বিষয়টি দূর করে দিয়েছে। কারণ যদি কোনো লোক কোনো হালাল কাজ করে তাহলে তা গুনাহ হতে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا.

-সুতরাং তোমরা আহার করো, যে গনীমত তোমরা লাভ করেছো বৈধ ও পবিত্র।^১

কেউ কেউ বলেন, এ বিষয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অধিকার দেয়া হয়েছে।

হযরত আলী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, বদরযুদ্ধের দিন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আগমন করে বলেন যে,

خَيْرُ أَصْحَابِكَ فِي الْأَسَارِيِّ إِنْ شَاؤُوا الْقَتْلَ وَإِنْ شَاؤُوا الْفِدَاءَ عَلَى أَنْ
يَقْتُلَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ مِثْلَهُمْ.

-বন্দীদের ব্যাপারে আপনার সঙ্গীদের ইখতিয়ার বা অধিকার প্রদান করুন যে, তারা যদি ইচ্ছে করেন তাহলে তাদের হত্যা করতে পারবে, নতুবা মুক্তিপণ গ্রহণ করবে এই শর্তে যে, তাদের নিকট থেকে (মুক্তিপণ আদায়ের কারণে) আগামী বছর এই পরিমান লোক শহীদ হবে।^১

এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, আমরা (ইখতিয়ার প্রদানের ব্যাপারে) যা বলেছি তা সঠিক ও যথার্থ হয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরাম তাই করেছেন যা তাঁদের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো কোনো সাহাবী দুই অবস্থার মধ্যে যা সবচেয়ে বেশী দুর্বল ছিলো তা গ্রহণ করেন (অর্থাৎ মুক্তিপণ গ্রহণ করা)। তারা এর প্রতি বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেন। অথচ এর চেয়ে উত্তম ছিলো দ্বিতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যে, বন্দীদেরকে তাত্ক্ষণিকভাবে হত্যা করে ফেলা। সুতরাং দুর্বল ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তাদের তিরস্কার করা হয়। আর তাদের এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, তোমরা যে অবস্থা গ্রহণ করছো তা দুর্বল ছিলো। এর মর্মার্থ কখনো এই নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম অবাধ্য ও গুনাহগার ছিলেন। আল্লামা তাবারী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন, যদি আসমান থেকে আযাব আসতো তাহলে উমর ব্যতীত কেউ রক্ষা পেতো না। এরূপ বলার উদ্দেশ্য হলো, হযরত উমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অভিমত যে সঠিক ছিলো সে দিকে ইঙ্গিত করা। আর ওইসব লোকদের সমর্থন করা, যারা এ বিষয়ে হযরত উমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অভিমতের সমর্থক ছিলেন। কারণ তাদের হত্যা করা এই দ্বীনের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি লাভ করবে। আর এর ফলে শত্রুদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হবে, ইসলামের কালিমা সমুন্নত হবে। আর ইসলামের শত্রুরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন অবশিষ্ট রইলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা কেনো ইরশাদ করেন, “যদি আযাব আসতো তাহলে ওইসব লোক বেঁচে যেতো।” এর কারণ হলো, যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের বন্দীদের ব্যাপারে সবার মনোভাব জানতে চান, তখন সর্বপ্রথম হযরত উমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বন্দীদের হত্যা করার পরামর্শ দেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এই শাস্তি তখনও নির্ধারণ করেন নি। আর সাহাবায়ে কেরামকে অধিকার প্রদান করে রাখেন।

দাউদী বলেন, প্রথমতঃ এ বর্ণনা চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয়নি। তবুও যদি আমরা এটাকে সঠিক মনে করি, তবুও কমপক্ষে এটা ধারণা করা যায় না যে, হযুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো আদেশ দান করতে পারেন, যার ধারাবাহিকতায় না কোনো উদ্ধৃতি বা কুরআনের আয়াত বর্ণিত হয়েছে। আর না তা নির্দেশনামূলক উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। উক্ত বিষয়কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখেছেন।

কাযী আবু বকর বিন আলা বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন যে, আপনাকে (মুক্তিপণ ও হত্যা করা সম্পর্কে) যে নির্দিষ্ট মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে, তা এর উপযোগী ছিলো যা ওই কাফিরদের তাকদীরের লিপিবদ্ধ ছিলো। কারণ গনীমতের মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। তাহলে বলুন, মুক্তিপণ গ্রহণ করা কেন হালাল হবে না। বদর যুদ্ধের পূর্বেও একবার মুসলমানগণ এক ঘটনায় মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করেছে। যখন আবদুল্লাহ বিন জাহশ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পরিচালিত সারিয়ায় (ছোট যুদ্ধ) হাকাম বিন কায়সান ও তার সাথীদের দ্বারা হযরত ইবনুল খায়রামী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শহীদ হন। ওই ঘটনায় মুসলমানগণ মুক্তিপণ গ্রহণ করায় আল্লাহ তা'আলা তাদের কোনো প্রকার তিরস্কার করেননি। ওই ঘটনা সম্ভবতঃ বদর যুদ্ধের এক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছে বা তার চেয়েও অনেক পূর্বে।

এসব বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বন্দীদের সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ব্যাখ্যা ও পূর্ণাঙ্গ বিচক্ষণতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এ সম্পর্কে আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে কোনো অভিযত প্রকাশ করেননি। মুক্তিপণ গ্রহণ করা হলো কেনো? কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে তাদের সংখ্যাধিক্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামতসমূহের প্রকাশ ও স্বীয় ইহসানের গুরুত্ব ভালভাবে জ্ঞাত। এ কারণে তিনি সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যে, তাদের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ ছিল। অবস্থা যখন এরূপ তাহলে তিরস্কার করার অবকাশ কোথায়? আর গুনাহ হবে কিভাবে? এটাই যথার্থ ব্যাখ্যা।

আল্লাহ তা'আলার বানী-

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى

-তিনি ক্রুদ্ধকৃত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন, একারণে যে, তাঁর নিকট সে অন্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে।^১

এখানেও দেখা যায় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো প্রকার গুনাহ প্রমাণিত হয়না। বরং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আপনি যাদের পাক-পবিত্র করতে চান, যদি আপনি হাকীকত জানতেন তাহলে আপনার ওই দুই ব্যক্তির মধ্যে অন্ধ লোকটির প্রতি মনোযোগী হওয়া বেশী উত্তম ছিলো।^২ আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কাজ-অন্ধের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে কাফিরদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে দ্বীনের প্রচার ও তাদের মনোভাবকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা। এ কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে আদেশ দান করেছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ ভূমিকা গ্রহণ করা না গুনাহ ছিলো, না বিরুদ্ধচারণ। আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতসমূহে ওই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো উভয় ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর দেয়া। এবং এক কাফিরকে ঘৃণা করা। আর এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। অতঃপর বলা হয়েছে, وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزُكَّى -যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে পবিত্র না হয়, তাহলে তার জন্য আপনাকে দোষারোপ করা হবে না।^৩ কেউ কেউ

^১ আল কুরআন : সূরা আবাসা, ৮০:১।

^২ সূরা আবাসা পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। একদিন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কতিপয় কোরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারণা ছিলো যে, যদি তারা কোনোভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। ঠিক ওইসময় অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু আসেন, তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদেরকে ইসলামের হাকীকত বুঝাচ্ছিলেন। আলোচনার মাঝে তিনি এসে বললেন, হযুর! আমাকে কুরআনের আয়াতসমূহ শিক্ষা দান করুন। প্রকাশ থাকে যে, একজন মুসলমানকে কুরআনের আয়াত শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কতিপয় কাফিরকে মুসলমান বানানো। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রতি মনোযোগ দেননি। যেহেতু তিনি আলোচনার মধ্যে কথা বলে বাঁধা সৃষ্টি করেছেন। এটা শিষ্টাচার পরিপন্থী। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেন। যদিও ইবনে উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্ধ ছিলেন। তিনি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া দেখতে পাননি। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইবনে উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়। কারণ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু চোখ অন্ধ ছিলো, কিন্তু তাঁর অন্তর আলোকিত ছিলো। আর ওই কাফিররা বাহ্যিকভাবে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন থাকলেও অভ্যন্তরীণ দিক বিচারে অন্ধ ছিলো। তাদের অন্তর দুনিয়ার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো।

^৩ আল কুরআন : সূরা আবাসা, ৮০:৭।

বলেন, **عَبَسَ** এর মর্মার্থ হলো, ওই কাফির যারা ওই সময় হযুর সাওয়াহিহ বনের, আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির ছিলো। তাদেরকে দেখে হযুর সাওয়াহিহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম না ক্ষুব্ধিত করেছেন আর না মুখ ফিরিয়ে নেন। বরং ওই কাফিররা এ কাজ করেছে। আবু তামাম এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এখন আসুন আমরা হযরত আদম আল্লাইহিস্ সালামের ঘটনা আলোচনা করি। যা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

فَاَكَلَا مِنْهَا

-অতঃপর তারা দু'জন তা থেকে ভক্ষণ করলো।^১

আর এর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.

-আর এ বৃক্ষের নিকট যেওনা। গেলে সীমা অতিক্রমকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।^২

আরো ইরশাদ করা হয়েছে-

أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ.

-আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি?^৩

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় হযরত আদম আল্লাইহিস্ সালামের জ্ঞাতি কথ্য উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন-

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ.

-আর আদম থেকে আপন প্রভুর নির্দেশের ক্ষেত্রে জ্ঞাতি সংঘটিত হলো, তখন যেই উদ্দেশ্য চেয়েছিলো সেটার পথ পায়নি।^৪

কেউ কেউ বলেন, হযরত আদম আল্লাইহিস্ সালামের দ্বারা জ্ঞাতি সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আল্লাইহিস্ সালামের আপত্তির উল্লেখ করে ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسَىٰ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ لَهُ عَزْمًا

-আর নিশ্চয় আমি আদমকে এর পূর্বে দৃঢ়তার সাথে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তা ভুলে গিয়েছিলো আমি তার ইচ্ছা পাইনি (গুনাহের মধ্যে; কারণ তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, ইচ্ছা তাঁর মধ্যে ছিলো না)।^১

হযরত ইবনে যায়িদ রাহমাতুল্লাহি আল্লাইহি বলেন, হযরত আদম আল্লাইহিস্ সালাম ইবলিশের শত্রুতা ভুলে যান। আর তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির কথাও ভুলে যান। কারণ আল্লাহ তা'আলা পূর্বে তাঁকে জানিয়ে দেন যে,

إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ.

-এ ইবলিশ তোমার ও তোমার স্ত্রীর প্রকাশ্য শত্রু।^২

কেউ কেউ বলেন, হযরত আদম আল্লাইহিস্ সালামের নিকট শয়তান ছলচাতুরী প্রকাশ করলে তিনি তার পূর্বশত্রুতার কথা ভুলে যান।

হযরত ইবনে আব্বাস রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, ইনসানকে 'ইনসান' এই কারণে বলা হয় যে, তার নিকট থেকে যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, সে ওই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায়।

কেউ কেউ বলেন, হযরত আদম আল্লাইহিস্ সালাম ইচ্ছাকৃত আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিরোধিতা করেননি, আর না তিনি হালাল মনে ওই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেছেন। বরং তিনি ইবলিশের শপথ করার কারণে এমনটি করেন। কারণ ইবলিশ তাঁকে শপথ করে বলেছিলো-

إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.

-নিশ্চয়! আমি তোমাদের উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী।^৩

হযরত আদম ও হাওয়া আল্লাইহিমুস সালাম মনে করেন যে, বলুন! এ ধরনের শপথ কী করে মিথ্যা হতে পারে?

^১. আল কুরআন : সূরা ফোয়াহা, ২০:১২১।

^২. আল কুরআন : সূরা বাকারাহ, ২:৩৫।

^৩. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:২২।

^৪. আল কুরআন : সূরা ফোয়াহা-হা, ২০:১২১।

^১. আল কুরআন : সূরা ফোয়াহা-হা, ২০:১১৫।

^২. আল কুরআন : সূরা ফোয়াহা-হা, ২০:১১৭।

^৩. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:২১।

আশ-শিফা [২য় খণ্ড]
কোনো কোনো বর্ণনায় হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের এরূপ অনেক ওয়র-
আপত্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে জোবায়র রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ইবলিশ হযরত আদম
ও হাওয়া আলাইহিমাস্ সালাম-এর সামনে আল্লাহর নামে শপথ করে তাঁদেরকে
প্রতারিত করেছে। আর মু'মিন ব্যক্তি তো শপথের কারণে ধোঁকায় পড়ে থাকে।

কেউ কেউ বলেন, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম জেনে-শনে, স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে
বিরোধিতা করেননি বরং তিনি ভুলে যান। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ
করেন, لَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا - আমি তাঁর মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় পাইনি। অর্থাৎ তিনি স্বেচ্ছায়
আমার আদেশের বিরোধিতা করেননি। অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, উক্ত
আয়াতে যে, عَزْمًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, ওই عَزْمًا সাবধানতা (সতর্কতা) ও
সবর বা ধৈর্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম
সাবধানতা অবলম্বন করেননি।

কেউ কেউ বলেন, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম যখন ওই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল
ভক্ষণ করেন, তখন তিনি ভাবে বিভোর ছিলেন। কিন্তু এ অভিমত খুব দুর্বল।
কারণ আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানাতের শরাবের গুণাগুণ বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, তা
পানে নেশাগ্রস্ত হবে না। সুতরাং যদি একথা বলা হয় যে, হযরত আদম
আলাইহিস্ সালাম সেই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যান। এটাতো স্পষ্ট যে, ভুলে
যাওয়া কোনো অপরাধ নয়। অনুরূপ যদি একথা বলা হয় যে, হযরত আদম
আলাইহিস্ সালামকে ভুলে পেয়ে বসেছে। এ কারণে এ বিষয় সবাই ঐকমত্যে
উপনীত হয়েছেন যে, ভুল-ভ্রান্তিকারীকে কোনো প্রকার জবাবদিহী করা হয় না।

শাইখ আবু বকর বিন ফুরাক ও প্রমুখ বলেন, ওই ঘটনা হযরত আদম আলাইহিস্
সালামের নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। এ অভিমতের দলিল হলো
এ আয়াত-

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١﴾ ثُمَّ أَجْتَبَنِي رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

-আর আদম থেকে আপন প্রভুর নির্দেশের ক্ষেত্রে ত্রুটি সংঘটিত হলো, তখন
যেই উদ্দেশ্যে চেয়েছিলো সেটার পথ পায়নি। অতঃপর তাঁর প্রভু তাঁকে
মনোনীত করলেন; তারপর তাঁর দিকে কৃপাদৃষ্টি ফেরালেন এবং আপন বিশেষ
নৈকট্যের পথ প্রদর্শন করলেন।^১

অতএব, প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর ইজতিবা বা
নবুওয়াতের জন্য মনোনীত হওয়া ও আপন বিশেষ নৈকট্যের পথ পাওয়া ওই
ত্রুটির পর কার্যকর হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম পরীক্ষা স্বরূপ ওই বৃক্ষের ফল
ভক্ষণ করেছেন। কারণ তিনি জানতেন না যে, এটাই সেই বৃক্ষ যার ফল ভক্ষণ
করতে তাঁকে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ধারণা করেন
যে, তাঁকে নির্দিষ্ট একটি বৃক্ষ থেকে ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে। একই জাতীয়
সব বৃক্ষের ফল ভক্ষণ থেকে নয়। এ কারণে বলা হয়েছে যে, হযরত আদম
আলাইহিস্ সালাম স্বীয় অবাধ্যতার জন্য তাওবা করেন নি, বরং অসাবধানতা
বশতঃ ত্রুটি সংঘটিত হওয়ার কারণে তাওবা করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম মনে করেন, যেই বৃক্ষের ফল
ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা হারাম হওয়ার কারণে নিষেধ করা হয়নি।
তাই তিনি ভক্ষণ করেছেন।

এখন যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা সর্বাবস্থায়তো এটাই বলেছেন -

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١﴾

-আর আদম থেকে আপন প্রভুর নির্দেশের ক্ষেত্রে ত্রুটি সংঘটিত হলো,
তখন যেই উদ্দেশ্যে চেয়েছিলো সেটার পথ পায়নি।

অতঃপর বলেছেন,

فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿٢﴾

-তারপর তাঁর দিকে কৃপাদৃষ্টি ফেরালেন এবং আপন বিশেষ নৈকট্যের
পথ প্রদর্শন করলেন।^২

তাছাড়া শাফায়াতের হাদীসে বলা হয়েছে, যখন হযরত আদম আলাইহিস্
সালামের নিকট হাশরের ময়দানে মানুষ শাফায়াতের জন্য আবেদন করবে। তখন
তিনি স্বীয় গুনাহের কথা স্মরণ করে বলবেন, আমাকে বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে
নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু আমি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যচারণ করে বসেছি। এ
অভিমতের বিস্তারিত জবাব ইনশাআল্লাহ! এ পরিচ্ছেদের শেষে আলোচনা করা
হবে।

আশ-শিফা [২য় খণ্ড]
এখন দেখা যাক হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম এর ঘটনায় কী বলা হয়েছে
ওই ঘটনার কতিপয় বিষয় আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর গুনাহ স্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। স্পষ্ট দলিল (أَبَى) দ্বারা শুধু এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি রাগান্বিত হয়ে চলে যান। এ বিষয়ে আমি পূর্বে আলোকপাত করেছি।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামকে তিরস্কার করেছেন যে, তিনি আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়কে ছেড়ে কেনো চলে গেলেন।

কেউ কেউ বলেন, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সম্প্রদায়কে আযাব আসার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন। তখন হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম বললেন, আমি মিথ্যাবাদীর চেহারা নিয়ে কখনো সম্প্রদায়ে নিকট ফিরে যাবো না।

কেউ কেউ বলেন, তাঁর সম্প্রদায় মিথ্যাবাদীকে হত্যা করে ফেলতো। হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম ধারণা করেন যে, আমি তো এখন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়েছি। সুতরাং আমি যদি তাদের নিকট ফিরে যাই, তাহলে তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে। এ কারণে তিনি ভীত হয়ে পুনরায় তাদের নিকট ফিরে যাননি।

কেউ কেউ বলেন, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম রিসালাতের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন। আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি। তবে এ সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় ছিলো।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١﴾

-যখন সে বোঝাই নৌযানের দিকে বের হয়ে পড়েছিলো।^১

মুফাসসিরগণ الْمَشْحُونِ শব্দের অর্থ করেছেন- দূর হয়ে যাওয়া (বা যেহেতু পড়া)। কারণ পলায়ন করা শব্দ নবীর শানে ব্যবহার করা অশোভনীয়। এখন

^১. আল কুরআন : সূরা সাফাত, ৩৭:১৪০।

অবশিষ্ট রইলো- তারপরও আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামের বচন উদ্ধৃত করে বলেন,

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

-নিশ্চয় আমার দ্বারা অশোভন কাজ সম্পাদিত হয়েছে।^২

কোন বস্তুকে তার যথোপযুক্ত স্থানে না রাখা হলো 'জুলুম'। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এভাবে হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম আপন গুনাহ স্বীকার করে নিয়েছেন, এর উত্তর হলো, এটা কোনো গুনাহ নয়, বরং হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত নিজ শহর ছেড়ে অন্য এক শহরে চলে যাবার ইচ্ছা করেন। এ কারণে এ যাত্রাকে তিনি গুনাহ মনে করেছেন।

একটি কারণ এটাও হতে পারে যে, তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন। সুতরাং একথা বলে তিনি (স্বীয় গুনাহের নয়) বরং স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। অথবা এটাও হতে পারে যে, তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের উপর বদ-দোয়া করাকে গুনাহ স্থির করে তা স্বীকার করে নেন। অথচ হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্য বদ-দোয়া করেছেন, কিন্তু তাঁর জন্য তাঁকে জবাবদিহী করতে হয়নি।

আল্লামা ওয়াসেতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এর অর্থ হলো এই যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম 'জুলুম' শব্দ উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলাকে জুলুম থেকে পবিত্র ঘোষণা করেন। আর জুলুমকে নিজের সাথে সম্পর্কিত করে তা স্বীকার করে নেন। আর নিজেকে অপরাধী স্থির করেন।

অনুরূপ হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস্ সালামের বাণী-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا.

-হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজের প্রতি অন্যায় করেছি।^২

তাঁরা উভয়জনকে প্রথম আবাসস্থল জান্নাত থেকে দ্বিতীয় আরেকটি স্থানে নামিয়ে দেয়ার এবং জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়াতে বসবাস করানোর কারণ তারা নিজেরাই ছিলেন।

^১. আল কুরআন : সূরা আযিয়া, ২১:৮৭।

^২. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:২৩।

হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের বিষয়ে ঐতিহাসিক ও কতিপয় তাকসীরবিদ আহলে কিতাব, যারা আসমানী কিতাবসমূহ স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে তাদের নিকট থেকে যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন, তাদের কথায় কখনো মনোযোগ দেয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা ওই বিষয়ে কুরআন মজীদে স্পষ্ট বর্ণনা উল্লেখ করেননি। আর না এ সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর যে বিষয়ের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা হলো এই যে,

وَمَنْ دَاوُدُ أَنْمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ
فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّوَاقِبَ ۖ

-এখন দাউদ বুঝতে পেরেছে যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি; তখন আপন রবের নিকট ক্ষমা চেয়েছে এবং সাজদায় লুটিয়ে পড়েছে ও ফিরে এসেছে। অতঃপর আমি তাকে ক্ষমা করেছি এবং নিশ্চয় তার জন্য আমার দরবারে অবশ্যই নৈকট্য ও ভালো ঠিকানা রয়েছে।^১

ওই বিষয় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম অত্যন্ত প্রত্যাবর্তনকারী ছিলেন। সুতরাং **أَوَابٌ** শব্দের অর্থ হলো (فَتَنًا) আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। আর **مُطِيعٌ** শব্দের অর্থ হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মতে আনুগত্য প্রকাশ করা। এ ব্যাখ্যা অতি উত্তম হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম এক ব্যক্তির সাথে এর চেয়ে বেশী কিছু করেননি যে, তুমি আমার উদ্দেশ্যে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যাও। আর আমাকে তার জিম্মাদার বানিয়ে দাও।

এই কথা বলার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তিরস্কার করেন, আর এ সম্পর্কে সতর্ক করে এ বিষয় অস্বীকার করেন যে, “এইভাবে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে”। একথা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

কেউ কেউ বলেছেন, ওই স্ত্রী লোককে পূর্বে এক ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে ছিলো। তবুও হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন।

^১. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:২৪-২৫। আয়াতটি সিজদার আয়াতসমূহের একটি, অতএব পাঠক এ আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা আদায় করবেন।

কেউ কেউ বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম মনে মনে ইচ্ছা করেন যে, ওই স্ত্রী লোকের স্বামী যেন শহীদ হয়ে যায়।

আল্লামা সমরকন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম যে গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, তাহলো, দু' ব্যক্তি মোকাদ্দমা নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হলে, একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে, আর হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম শুধু তাঁদের বর্ণনা শুনে প্রতিপক্ষকে একথা বলেন যে, **لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ** তুমি অন্যায় করছো, নিশ্চয় সে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে, যে তোমার মাদী দুশাটাও তার মাদী দুশাগুলোর সাথে যুক্ত করতে চাচ্ছে।^১ অর্থাৎ তাদের ঝগড়ার কারণে তারা জুলুম করেছে।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামকে বিশাল রাজত্ব দান করেছেন, আর তাকে দুনিয়ার অফুরন্ত সম্পদ দান করেছেন। এটা দেখে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের অন্তরে এ ভীতির সঞ্চার হয় যে, এগুলো দ্বারা যেন তাঁকে পরীক্ষা করা না হয়। এ জন্য হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম ইসতিগফার করে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।

হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামকে যেসব কাল্পনিক মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে সত্যপন্থী আলেমগণ- যেমন আহমদ বিন নসর ও আবু তামাম প্রমুখ ওইসব ঘটনা অস্বীকার করেছেন।

দাউদী বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম ও ওই মহিলার যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। আর না কোনো নবীর সম্পর্কে এরূপ ভ্রান্তধারণা করা যাবে। এরূপ ভুল ধারণা পোষণকারী কোনো মুসলমানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।^২

কেউ কেউ বলেন, কুরআন মজীদে বর্ণিত আয়াতে যে দু'ব্যক্তির ঝগড়ার কথা বলা হয়েছে, তারা উভয় একটি বকরীর বাচ্চা নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত ছিল।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর ভ্রাতাদের যে ঘটনা কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে, এর আলোকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের উপর কোনো

^১. এ ব্যাখ্যা বিতর্ক ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

^২. এ কারণে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে এ ধরনের মিথ্যা ঘটনা বর্ণনা করবে তাকে মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করে কেরাঘাত করতে হবে। কারণ সে একজন নবীকে মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্ত করে কলঙ্কিত করেছে।

অভিযোগ আরোপ করা যায় না। আর তাঁর ভ্রাতাদের নিকট তখন তাঁর নবুওয়াত প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং এ বিষয়টি ধর্তব্য নয়। তাই এ ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করা যায় না।

অবশিষ্ট রইলো এই প্রশ্ন যে, কুরআন মজীদে হযরত আশিয়া কেরামের আলোচনা করে **الْأَسْبَاطُ** সন্তানদের আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং একথা বলা যায় যে, তার ভাইও নবী ছিলেন। তাই তাফসীরবিদগণ বলেন, **الْأَسْبَاطُ** -বংশধরের অর্থ এই নয় যে, আশিয়া কেরামের সব সন্তানই নবী ছিলেন। বরং তাঁদের পুত্রদের মধ্যে কেউ কেউ নবী হয়েছেন। এ কারণে **الْأَسْبَاطُ** এর অর্থ হলো ওই পুত্র যিনি নবী হয়েছেন। কেউ কেউ বলেন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম-এর ওই ভাই যিনি তাঁকে কূপে ফেলে দিয়েছে, তখন তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। এ কারণে দ্বিতীয়বার যখন মিশরে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়, তিনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে চিনতে পারেনি।

দ্বিতীয় কথা হলো, তাঁরা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামকে বলেছিলো যে, আগামী দিন আমাদের ভাই ইউসুফকে আমাদের সাথে যেতে দিতে হবে। তাহলে আমরা তাকে সাথে নিয়ে খেলাধুলা করবো। তাহলে প্রমাণিত হলো যে, এর অনেক পরেই তাঁর নবুওয়াত প্রকাশিত হয়। (আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত)

আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِمِثْلِهِمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ

-এবং নিশ্চয় স্ত্রীলোকটা তার কামনা করেছিলো এবং সেও স্ত্রীলোকের ইচ্ছা করতো যদি আপন প্রভুর নিদর্শন না দেখতো।^১

এ সম্পর্কে অধিকাংশ ফিকহবিদ ও হাদীসবেত্তাগণের ধারণা হলো, মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্পের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে না, এটা পাপও নয়। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় প্রভুর বাণী উল্লেখ করেছেন,

إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ

-যখন আমার বান্দা কোনো গুনাহের ইচ্ছা করে আর তা বাস্তবায়ন না করে, তাহলে তার আমলনামায় গুনাহের পরিবর্তে নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়।^২

^১ আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:২৪।

^২ আহমদ : আল মুসনাদ, ৪:৩১৫ হাদীস নং ২৫১৯।

যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেয়া হয় যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম অনিচ্ছাকৃত কোনো প্রকার ভুল করে থাকেন, তবে তাতেও তাঁর কোনো অপরাধ হয়নি। কারণ সত্যপন্থি ফকীহ ও হাদীসবেত্তাগণের অভিমত হলো, যখন মানব প্রবৃত্তি মন্দকাজের পুরোপুরি ইচ্ছা করে, তখন ওই ইচ্ছাটি অপরাধ বিবেচিত হয়। আর ওইসব ধ্যান-ধারণা যা মানুষের মনে আসে আর চলে যায়, তা যত খারাপই হোক না কেনো, তা ক্ষমা করে দেয়া হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ইচ্ছাও এ ধরনের ছিলো। এখন কথা হলো হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম কুরআনের ভাষায় কেন বলেছেন-

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي

إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

-আর আমি নিজ প্রবৃত্তিকে নির্দোষ বলছি না। নিশ্চয় প্রবৃত্তি তো মন্দকর্মের বড় নির্দেশদাতা, কিন্তু যার প্রতি আমার রব দয়া করেন। নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল, দয়ালু।^১

এর মর্মার্থ হলো, ওই ধরনের কামনা-বাসনা হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের অন্তরে এসেছিলো যার ফলে একথা বলা যায় যে, তিনি বিনয় ও নমনীয়তা প্রকাশার্থে এরূপ কথা বলেছেন। মূলতঃ এটা ছিলো তাঁর অঙ্গীকার যে আমি আমার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করেছি। কারণ তিনি পূর্ব থেকেই পাক-পবিত্র ছিলেন।

আবু হাতেম আবু উবায়দা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম কোনো প্রকার খারাপ সংকল্প করেননি। বরং কথার মধ্যে কিছু পূর্বাপর হয়েছে আর তা হলো এই-

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِمِثْلِهِمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ

-আর নিশ্চয় স্ত্রীলোকটা তার কামনা করেছিলো এবং সেও স্ত্রীলোকের ইচ্ছা করতো যদি আপন প্রভুর নিদর্শন না দেখতো।^২

আর আল্লাহ তা'আলা ঐ স্ত্রীলোক সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

وَلَقَدْ رَاودَتْهُ عَنِ نَفْسِهِ ۖ فَأَسْتَعْصَمَ

^১ আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:৫৩।

^২ আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:২৪।

-আর নিশ্চয় আমি তাকে প্রলোভিত করতে চেয়েছি। অতঃপর তিনি নিজেই নিজেকে পবিত্র রেখেছেন।^১

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ.

-আমি এরূপ এজন্যই করেছি যেন তার থেকে মন্দ ও অশ্লীলতাকে দূরে রাখি।^২

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ^৩ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ.

-আর দরজাগুলোর সবই বন্ধ করে দিলো। এবং বললো, এসো তোমাকেই বলছি। বললো, আল্লাহরই আশ্রয়। সেই আশীষ তো আমার প্রভু অর্থাৎ লালনকারী। তিনি আমাকে ভাল মতে রেখেছেন।^৩

কেউ কেউ বলেন, উক্ত আয়াতে বর্ণিত “رَبِّي” শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা। আবার কেউ কেউ বলেন, মিশর অধিপতি আশীষ।

কেউ কেউ বলেছেন, اَمْرًا^৪ অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম সেই যুলাইখাকে সতর্ক করার ইচ্ছা করে তাকে উপদেশ দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, এর মর্মার্থ হলো যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম ওই মহিলার ভ্রাতৃ ধারণা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

কেউ কেউ বলেন, ইচ্ছা করার অর্থ হলো এই যে, তিনি যুলাইখা কে দেখতে পেয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম যুলাইখা কে প্রহারের ইচ্ছা করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এই ঘটনা নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। (সুতরাং এ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে না।)

^১. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:৩২।

^২. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:২৪।

^৩. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:২৩।

কেউ কেউ বলেন, মহিলারা সর্বদা হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের নিকট কুপ্রবৃত্তির মানসে ধাবিত হতো, কারণ তিনি অতীব সুন্দর ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাকে জানিয়ে দেন এবং তাঁর মুবারক চেহারায় নবুওয়াতের ভীতি ঢেলে দেন। তাই অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, নবুওয়াতের ভীতির কারণে কেউ তাঁর সৌন্দর্যের প্রতি মনোযোগী হতে পারতো না।

এখন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর ঘটনায় আসা যাক। তিনি এক ব্যক্তিকে চপেটাঘাত করে হত্যা করে ফেলেন। সে তাঁর দূশমন ছিলো। একথা কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, সে কিবতী ও ফিরাউনের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলো। আর পুরো সূরায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ওই ঘটনা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে।

হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। তাকে হত্যা করার ইচ্ছা ছিলো না। অতএব এটা কোনো অপরাধ হতে পারে না। অপরাধ তো তখন সংঘটিত হতো যদি হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করতেন। এখন বাকী রইলো, তাহলে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ওই কাজকে عَمَلِ الشَّيْطَانِ^১ এটা শয়তানের পক্ষ থেকে উল্লেখ করে একথা কেন বলেন, ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي^২ - আমি আমার প্রবৃত্তির উপর যুলুম করেছি, অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।^১

হযরত ইবনে যুরাইজ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কোনো নবীর জন্য এটা শোভনীয় ছিলো না যে, তিনি আল্লাহর আদেশ ব্যতীত কাউকে হত্যা করতে পারেন।

নাক্বাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ইচ্ছাকৃত ভাবে তাকে হত্যা করেন নি। তিনি অত্যাচার দমন করার উদ্দেশ্যে চপেটাঘাত করেন। তাই ঘটনাচক্রে সেই ব্যক্তি মারা যায়।

কেউ কেউ বলেন, ওই ঘটনা নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। বর্ণিত আয়াতের পূর্বাপর যোগসূত্রে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَفَتَّنَكَ فُتُونًا.

^১. আল কুরআন : সূরা কাসাস, ২৮:১৬।

-আর তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছে।^১ অর্থাৎ আমি ক্রমান্বয়ে তোমাকে বহুবার পরীক্ষা করেছে।

কেউ কেউ বলেন, উক্ত আয়াত হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম ও ফিরাউনের মাঝে সংঘটিত ঘটনার ধারাবাহিকতায় বর্ণিত হয়েছে।

কেউ কেউ উক্ত আয়াতকে সিন্দুক নদীতে নিক্ষেপ করার ঘটনার সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো এই যে, আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ করে সকল প্রকার ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করে দিয়েছি। হযরত জোবায়ির ও মুজাহিদ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যে আরববাসীরা বলে যে, আমরা রৌপ্যকে অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করে পরিশুদ্ধ করি। “ফিতনা” শব্দের অর্থ হলো পরীক্ষা করার মাধ্যমে কোনো বস্তুর আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশ করা। কিন্তু শরীয়াতের পরিভাষায়-ওই পরীক্ষাকে বলা হয় যা অপছন্দনীয়তার সাথে মিশ্রিত করা হয়।

অনুরূপ সहीহ বর্ণনায় এসেছে, فَلَمَّ عَيْنُهُ فَفَقَّاهَا -যখন মৃত্যুর ফিরিশতা হযরত আজরাঈল আলাইহিস্ সালাম হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম এর রূহ কবজ করতে আসেন, তখন তিনি হযরত আজরাঈল আলাইহিস্ সালামকে এমন জোরে চপেটাঘাত করেন যার ফলে তাঁর চোখ বের হয়ে যায়। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর এ কাজ সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করা হয়। কিন্তু এখানে এমন কোনো কথা বলা হয়নি। যার দ্বারা হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর উপর সীমা অতিক্রম বা অযৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অভিযোগ আরোপ করা যায়। কারণ এটাতো স্বতসিদ্ধ কথা। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের এ কাজ অবৈধ ছিলো না। কারণ হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম ওই ব্যক্তি থেকে আত্মরক্ষা করেছেন, যে তাঁর প্রাণ নিতে এসেছে। মৃত্যুর দূত হযরত আজরাঈল আলাইহিস্ সালাম মানব আকৃতিতে আগমন করেন। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের পক্ষে এটা জানা সম্ভব ছিলো না, আগন্তুক ব্যক্তি মৃত্যুদূত। যদি তিনি নিশ্চিত জানার পর এরূপ করতেন যে, তাঁর চোখ নষ্ট হয়ে যাবে কিংবা ফিরিশতা মানব আকৃতিতে এসেছে। আর এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা ছিলো। সুতরাং পুনরায় যখন মৃত্যুর ফিরিশতা তাঁর নিকট আসেন আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে জানিয়ে দেন যে, তিনি আমার প্রেরিত

দূত। তখন হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম নতশিরে আত্মসমর্পণ করেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণ এ হাদীসের অনেক জবাব দিয়েছেন। তাঁদের উল্লেখিত এ জবাব আমার নিকট বেশী শক্তিশালী ও মনোপূত হয়েছে। এ জবাব আমার শাইখ আবু আবদুল্লাহ মাযারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির। এর পূর্বে হযরত আয়েশা রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ও অন্যান্য আলেমগণ হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের ওই ঘটনার ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর চপেটাঘাত করাকে দলিল দেওয়া আর মৃত্যুর ফিরিশতার চোখ বেরিয়ে পড়ার দলিল উল্লেখ অযোগ্য বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর তারা এটাকে আরববাসীদের প্রচলিত ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন।^২

এখন আসুন দেখা যাক হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম-এর ঘটনা ও কাহিনী সম্পর্কে তাফসীরবিদ আলেমগণ এর ধারাবাহিকতায় যা বর্ণনা করেছেন। হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের গুণাহের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ.

-আর নিশ্চয় আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম।^১

এখানেও “ফিতনা” শব্দের অর্থ পরীক্ষা করা হয়েছে।

হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম ইরশাদ করেন, একদিন হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম বলেন,

لَا تُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِثْلِ امْرَأَةٍ أَوْ تَسْعَ وَتَسْعَيْنَ كُلُّهُنَّ يَأْتِينَ بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ. فَلَمْ تَحْمَلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشَقِّ رَجُلٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

^১. অর্থাৎ গুলামায়ে কেরামের ধারণা হলো যে, না হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম চপেটাঘাত করেছেন। আর না মৃত্যুর ফিরিশতা চোখ বের হয়েছে। বরং এটা এক প্রকার রূপকার্ণ হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো, মুসা আলাইহিস্ সালাম দলিল পেশ করেছেন। আর মৃত্যুর ফিরিশতা দলিল পেশ করেন নি। কিন্তু মৃত্যুর ফিরিশতা স্বীয় দলিলে হেরে যান।

^২. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:৩৪।

-আজ রাতে আমি আমার একশ' বা নিরানব্বই জন স্ত্রীর সাথে মিলিত হবো। তাহলে প্রত্যেকে স্ত্রীর গর্ভে একজন করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী জন্ম হবে। হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের সঙ্গী একথা শুনে বললেন, আপনি 'ইনশাআল্লাহ' বলুন। কিন্তু হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম 'ইনশাআল্লাহ' বলেন নি। পরিণতি এই হয় যে, তাঁর একশ' স্ত্রীদের মধ্যে এক স্ত্রী ব্যতীত কোনো স্ত্রী গর্ভধারণ করেন নি। আর গর্ভবতী স্ত্রী অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করেন। এরপর হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম 'ইনশাআল্লাহ' বলেন, ওই মহান সন্তার শপথ! যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, যদি হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম 'ইনশাআল্লাহ' বলতেন, তাহলে নিশ্চয় তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী একশ' মুজাহিদ জন্মগ্রহণ করতো।'

ভাষাবিদগণ বলেছেন- شق শব্দের অর্থ হলো, ওই দেহ যা তার আসনে উপবিষ্ট করে পেশ করা হয়। এটাই ছিলো তাঁর জন্য পরীক্ষা।

কেউ কেউ বলেন, সন্তান তো ভূমিষ্ট হয়েছে। কিন্তু ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে মারা যায়। আর সে মৃতশিশুকে হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের সিংহাসনে রেখে দেওয়া হয়।

কেউ কেউ বলেছেন, হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের এ কামনা-বাসনাকে আল্লাহ তা'আলা ভ্রান্তি গণ্য করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম স্বীয় কামনা তীব্রতর হওয়ার কারণে 'ইনশাআল্লাহ' বলেননি।

কেউ কেউ বলেন, হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামকে তাঁর ওই ভুলের কারণে পাকড়াও করা হয়েছে। কিছুদিনের জন্য তাঁর রাজত্ব তাঁর নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর তাঁর আরো এক ভুল এই ছিলো যে, তিনি মনে মনে পছন্দ করেন যে, তিনি এক মোকদ্দমা স্বীয় শত্রুরের আত্মীয়ের পক্ষে মিমাংসা করেন।^১

^১ বাযযার : আল মুসনাদ, মুসনাদু আবী হামযা আনাস, ১৭:১৯৭ হাদীস নং ৯৮৩৫।

^২ হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম-এর জারদাহ নামক এক স্ত্রী ছিলো। তার ভাই ও অন্য এক ব্যক্তির মাঝে কোনো এক বিষয়ে ঝগড়া হয়। একদিন জারদাহ হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের নিকট আরয় করে যে, মোকদ্দমা আপনার সামনে পেশ করা হলে, আপনি আমার ভাইয়ের পক্ষে রায় দেবেন। হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম বললেন, ঠিক আছে। তোমার ইচ্ছানুযায়ী মামলার রায় ঘোষণা করা হবে। কিন্তু হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম তা করেননি। তবুও তিনি যেহেতু স্বীয়

কেউ কেউ বলেন, হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামকে ওই গুনাহের কারণে পাকড়াও করা হয়েছে যা তাঁর এক স্ত্রীর পাপের কারণে হয়েছে।'

ওই বিষয় ঐতিহাসিকগণ যে বর্ণনাসমূহের উল্লেখ করেছেন, তাতে তারা বলেন, শয়তান হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের আকৃতি ধারণ করে তাঁর রাজত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। আর তাঁর উম্মাতদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে। এ অভিমত সম্পূর্ণ ভুল। কারণ শয়তান এভাবে হযরত আশিয়া কেরামের উপর প্রধান্য লাভ করতে পারে না। শয়তানের প্রাধান্য লাভ করা থেকে সম্মানিত নবীগণ নিরাপদ ছিলেন। এ বিষয় যদি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, তারপরও হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম ইনশাআল্লাহ বলেন নি কেনো? এ অভিমতের বিভিন্ন জবাব দেয়া হয়েছে।

তন্মধ্যে এক উত্তর হলো এই, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম 'ইনশাআল্লাহ' বলা ভুলে যাবে আর এভাবে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা কার্যকরী হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় উত্তর হলো এই যে, যখন তাঁর সাক্ষী তাঁকে ইনশাআল্লাহ বলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তখন হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম রাষ্ট্রীয় কাজে বেশী ব্যস্ত ছিলেন। তাই স্বীয় সঙ্গীর কথা শুনতেই পাননি।

এখন অবশিষ্ট রইলো এই যে, হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম এভাবে দোয়া করেছেন কেনো-

وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي.

স্ত্রীর আরয় করায় একথা বলেন, আমি তাই করবো। এ কারণে তাঁকে জবাবদিহী করতে হয়েছে। (নাসীমুর রিয়াজ)

^১ কোনো কোনো বর্ণনায় বর্ণিত আছে। একবার হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম একটি দ্বীপ জয় করে সেই দ্বীপের শাহজাদীকে বিবাহ করে নিজ গৃহে নিয়ে আসেন। গৃহে আসার পর শাহজাদী স্বীয় পিতার শোকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। তখন সে স্ত্রী হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের নিকট আরয় করে যে, আপনি যদি জিনদের আদেশ দেন তাহলে তারা আমার পিতার প্রতিকৃতি বানিয়ে দেবে। তাহলে আমি আমার পিতার প্রতিকৃতি দেখে সুস্থ হয়ে যাবো। হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম অনুমতি দেন। কারণ তখন প্রতিকৃতি তৈরী করা নিষিদ্ধ হয়নি। প্রতিকৃতি তৈরী করে দেয়ার পর শাহজাদী দাসীদের সাথে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা ওই প্রতিকৃতির সম্মুখে এসে মস্তক অবনত করে সাজদা করতো। হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের উজির আসিফ বিন বরখীয়া হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামকে এ বিষয়টি অবহিত করার পর তিনি সেই প্রতিকৃতি ধ্বংস করে ফেলেন। ওই ঘটনায় যে গুনাহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। ওই গুনাহও তাঁর স্ত্রীর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। (নাসীমুর রিয়াজ)

-আর আমাকে এমন রাজ্য দান করো, যা আমার পর কারো জন্য উপযোগী না হয়।^১

হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম দুনিয়ার শান-শওকতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এ আবেদন করেননি। অথবা তিনি দুনিয়ার চাকচিক্যকে বেশী পছন্দ করতেন তাও নয়। বরং তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন, তাঁর এরূপ দোয়া করার উদ্দেশ্য হলো যে, তাঁর পর যেন অন্য কাউকে এ ধরনের ক্ষমতা ও অধিকার দেয়া না হয়। যেমন ওইসব লোকদের কথা যারা এ অভিমত সঠিক মনে করে যে, তাঁর পরীক্ষাকালীন কিছু সময়ের জন্য জিনদেরকে তাঁর উপর প্রবল করে দেয়া হয়।^২

কেউ কেউ বলেন, হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম আশা করেন, অন্যান্য আশিয়ায়ে কেরামদের মতো বিশেষ কোনো ফযিলত বা মর্যাদা লাভ হোক যা তাঁর নবুওয়াতের দলিল হবে। যেভাবে তাঁর পিতা হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামকে লোহা বিগলিত করার মু'জিয়া দেয়া হয়েছে, হযরত ইসা আলাইহিস্ সালাম মৃতকে জীবিত করার মু'জিয়া লাভ করেছেন আর হযরত সালাহুদ্দীন আলাইহিস্ সালামকে শাফায়াতের মর্যাদা দান করা হয়েছে।

হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের ঘটনা সত্যকথা হলো এই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার ঐ প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করেন,

وَأَهْلَآءَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ

-যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে তারা ব্যতীত আপন পরিবার-পরিজনকে ও অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে।^৩

এর বাহ্যিক দিকের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তা'আলার নিকট স্বীয় পুত্রের নাজাতের আবেদন করেন। আর এটাও আশা করেন যে, আল্লাহ তা'আলার ওই (তাঁর পুত্র সম্পর্কে) ফয়সালার বিষয় জানতে পারবেন, যা তিনি হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের নিকট গোপন করে রেখেছেন। এরূপ কথা ছিলো না যে, হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামকে

^১ আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:৩৫।

^২ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত বর্ণনাকে ভ্রান্ত বলে বাতিল করা হয়েছে। বরং হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম এটা চাননি যে, কোনো বাতিলপন্থি মানুষ জিন ও শয়তান তাঁর উপর প্রবল হোক এ ধরনের আকাংখা করা ভুল নয়।

^৩ আল কুরআন : সূরা হূদ, ১১:৪০।

জানিয়ে দেন যে, (তাঁর পুত্র কাফির) তাঁর নাম নূহের পরিবারবর্গের তালিকায় নেই, যাদের নাজাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কারণ সে দুষ্কর্মা ও কাফির। আর আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেন যে, সেও অন্যান্য অত্যাচারী কাফিরদের মতো পানিতে নিমজ্জিত হবে। সুতরাং আপনি ওইসব লোকদের ব্যাপারে আমার নিকট কোনো সুপারিশ করবেন না। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম পিতৃস্নেহের আলোকে আল্লাহ তা'আলার বাণী وَأَهْلَآءَ 'পরিবার' এ স্বীয় পুত্র অন্তর্ভুক্ত ধারণা করেছেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তিরস্কার করেন। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম স্বীয় আবেদনের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হন। কারণ বিনা অনুমতিতে আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করা নিষেধ। আর তিনি ভীত হয়ে আপত্তি পেশ করার আলোকে বলেন, "এ পুত্রও আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।"

নাক্কাশা তাঁর তাফসীরে বলেন, হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম একথা জানতেন না যে তাঁর পুত্র কাফির। এ কারণে তিনি পুত্রের জন্য সুপারিশ করেছেন। এ আয়াতের এছাড়াও আরো অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবুও কোনো ব্যাখ্যার আলোকে একথা বলা যায় না যে, হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের উপর একথা ব্যতীত কোনো আপত্তি আরোপ করা যায় যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বিনা অনুমতিতে স্বীয় পুত্রের জন্য সুপারিশ করেছেন। কিন্তু হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামকে অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে নিষেধ করা হয়নি। সেহেতু তিনি পবিত্র, তাই তার উপর কোনো প্রকার অভিযোগ আরোপ করা যায় না।

আর ওই বর্ণনা যা সহীহ হাদীসে^১ বর্ণিত হয়েছে যে, এক পিপিলীকা এক নবীকে দংশন করার কারণে ওই নবী পিপিলীকার পুরো বসতি জ্বালিয়ে দেন।^২ এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ঐ নবীর নিকট ওই প্রেরণ করেন যে, এক পিপিলীকা তোমাকে দংশন করেছে আর তুমি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি উম্মাতদের মধ্যে পুরো এক উম্মাতকে জ্বালিয়ে দিয়েছো। অথচ ওই জাতি তথা পিপিলীকার দল আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠকারী ছিলো। এর প্রতি উত্তর হলো, ওই হাদীসে তো একথা বলা হয়নি যে, নবী যে কাজ করেছেন তা গুনাহ ছিলো। বরং সঠিক কথা

^১ এই বর্ণনা সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে।

^২ উক্ত ঘটনা কোন নবীর সময় সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তাবারী ও হাকিম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা বলেন, ওই ঘটনা হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের সাথে সংঘটিত হয়েছে। মুনিযীরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ওই ঘটনা হযরত উজাইর আলাইহিস্ সালামের সাথে সংঘটিত হয়েছে। কোনো কোনো আলেমগণ বলেন। ওই ঘটনা যে নবীর সাথে সংঘটিত হয়েছে, তিনি এর পূর্বে তাঁর নবুওয়াত লাভের কথা জানতেন না। এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর যখন তাকে পাকড়াও করা হয় তখন তাকে বলা হয় যে, তুমি নবী।

হলো, নবী যা করেছেন তাতে কল্যাণ কামনা উদ্দেশ্য ছিলো যে, এরূপ কষ্ট দানকারীকে ধ্বংস করে দিলে উপকার হয়। যে বৃক্ষ থেকে উপকৃত হওয়া আল্লাহ তা'আলা বৈধ করেছেন তা উপভোগ করতে এরা বাঁধা দেয়।

তোমার কী জানা নেই যে, এক মহান নবী বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থান করছেন আর যখন তাঁকে পিপিলীকা দংশন করে, তখন তিনি ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি উক্ত স্থান ত্যাগ করে চলে যান। যাতে পুনরায় তারা দংশন করতে না পারে। তারপর আল্লাহ তা'আলার ওহীতে এমন কোনো কথা নেই যে, যাতে অপরাধ প্রমাণিত হয়। বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ধৈর্যধারণ করে প্রতিশোধ গ্রহণ না করার প্রতি উৎসাহী করেন। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

وَلَيْنَ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ.

—তবে নিঃসন্দেহে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য ধৈর্যই সর্বাধিক উত্তম।^১

এ জন্যই যে তাদের বাহ্যিক কাজ এই ছিলো যে, পিপিলীকা বিশেষ করে তাকে কষ্ট দিয়েছে। তাই তারা তাদের নিকট থেকে নিজেদের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। আর যদি ওই পিপিলীকার দল ওই স্থানে বহাল থেকে যায় তাহলে সম্ভবতঃ তারা অন্যদের সাথেও এ ধরনের আচরণ করতে পারে। এ ভয়ে তারা পিপিলীকার পুরো বসতি জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়। যাতে আল্লাহ তা'আলার অপর সৃষ্টিজীব ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। ওইসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি যাতে ওই নবী তাঁর নিষেধের বিরোধিতা করার কারণে নবীর উপর ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর না নবীকে তাওবা ইস্তিগফার করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আর না আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোনো আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত)

যদি বলা হয় হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর কী অর্থ হবে? مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَلَمَ بِذَنْبٍ أَوْ كَادَ، إِلَّا يَحْتَسِبُ بِنِ زَكْرِيَا -এমন কোনো মানুষ নেই যে গুনাহের অভিযোগে অভিযুক্ত কিংবা নিকটবর্তী হননি। কিন্তু হযরত ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম ব্যতীত।

এর প্রতি উত্তর পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আশিয়ায়ে কেরামের যে ক্রটির কথা প্রকাশিত হয়েছে তা তাদের অনিচ্ছায় ভুল ও অসতর্কতা বশতঃ হয়েছে। তাঁদের এ ক্রটিকে গুনাহ বলা যাবে না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

حَالَةُ الْأَنْبِيَاءِ فِي خَوْفِهِمْ وَاسْتِغْفَارِهِمْ

আশিয়ায়ে কেরামের ভয়-ভীতি ও ক্ষমা প্রার্থনার রহস্য

যদি আপনারা এ বিষয়ে দ্বি-মত পোষণ করেন যে, তাফসীরবিদগণ ও সত্যপন্থি আলেমগণ তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে একথা প্রমাণ করেছেন, আশিয়ায়ে কেরাম গুনাহ থেকে নিষ্পাপ ছিলেন। তাহলে আল্লাহ তা'আলার বাণী—

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ.

—আর আদম থেকে আপন প্রভুর নির্দেশের ক্ষেত্রে ক্রটি সংঘটিত হয়েছে। তখন যেই উদ্দেশ্যে চেয়েছিলো সেটার পথ পায়নি।^১

এ ছাড়াও অনেক আয়াত ও হাদীসে একাধিক বার বর্ণিত হয়েছে যে, আশিয়ায়ে কেরাম তাঁদের ভুল-ক্রটিসমূহ স্বীকার করেছেন, আর তাঁরা তাওবা ইসতিগফার করেছেন, তাঁদের কৃতকর্মের জন্য কান্নাকাটি করেছেন। তাহলে এটা কিভাবে হতে পারে যে, তাঁরা কোনো ভুলক্রটি ছাড়াই ভীত হয়ে পড়েছেন বা তাঁদের তাওবা এমনিতে কবুল করে তাঁদের ক্ষমা দেয়া হবে? এর প্রতি উত্তর হলো যে, আশিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা ছিলো সমুন্নত। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ তা'আলার মারিফতের একচ্ছত্র অধিকারী। আর বান্দার সাথে সম্পর্কিত বিধান সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও রাজত্ব এবং তাঁর কঠোর শাস্তির ব্যাপারে অবগত ছিলেন। এ কারণে তাঁদের উপর সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ভীতি প্রবল থাকতো। আর তাঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহী করাকে এ জন্য ভয় করতেন যে, সাধারণ লোকের মতো তাঁদের যেনো জবাবদিহী করতে না হয়। এরূপ অনেকবার হয়েছে যে, তাঁদেরকে না কোনো কাজ করার আদেশ করা হয়েছে, না কোনো কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবুও তারা যখন ওই কাজ করেছেন, তখনই তাদেরকে জবাবদিহী করতে হয়েছে, আর তাঁদের তিরস্কার করা হয়েছে, আর তাঁদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। ওই মহাত্মাগণ স্বীয় ধারণার আলোকে ভুলবশতঃ বা বৈধ মনে করে ওইসব কাজ করেছেন। কিন্তু ভয় করতেন যে, না জানি ওই কাজ তাঁদের মর্যাদার দিক থেকে গুনাহের অন্তর্ভুক্ত না হয়। অথবা তাঁদের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের দিক থেকে অপরাধ না হয়। এমন কোনো কথা নেই যে, তারা যে কাজ করতেন, সে কাজে তাদের অন্যান্যদের গুনাহের মতো গুনাহ হতো। কারণ নীচ অসভ্য ও হীন বস্তু বা কাজকে গুনাহ বলা হয়। এ কারণে

আরবী ভাষায় প্রত্যেক বস্তুর শেষ ও নীচের অংশকে غَوِي বলা হয়। সুতরাং সাধারণ মানুষ নীচু স্তরের হয়, নবীগণ নন।

আম্বিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে বড়জোর একথা বলা যায় যে, তাঁদের নিম্নস্তরের আমল তাঁদের মর্যাদার দিক থেকে মন্দ হিসেবে পরিগণিত, অধিকন্তু তাঁরা পুতঃপবিত্র মানুষ ছিলেন। তাঁদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নেক আমল, পবিত্র কালিমার যিকির সরবে ও নীরবে অব্যাহত ছিলো। তাঁরা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন। আর আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বের গুণকীর্তনে ব্যাপ্ত থাকতেন। অন্যান্য লোক কবীরাগুনাহে লিপ্ত হয়ে থাকে আর হযরত আম্বিয়ায়ে কেরামের পদাঙ্কলন অন্যদের তুলনায় নেক কাজের মর্যাদা রাখতো। যেমন বলা হয়েছে- حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ، سَيِّئَاتُ الْمُفْرِينَ -পুণ্যবানদের পুণ্যকর্মও নৈকট্যভাজনদের জন্য পাপ হিসেবে বিবেচিত হয়।^১ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কেরাম ও নৈকট্যভাজন লোক যেহেতু অতি উচ্চমর্যাদা ও সমুন্নত স্তরের অধিকারী হয়েছেন, সেহেতু তাঁদের ওই নেক কাজসমূহ গুনাহের মত পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং যদি তাদের এ ধরনের কোনো কাজ হয়ে যায়, তা গুনাহের শব্দযোগে উল্লেখ করা হয়। মোটকথা, যে-কোনো অবস্থায় চাই তাদের পদাঙ্কলন ভুলবশতঃ হোক বা তাদের ধ্যান-ধারণার আলোকে তা অপরাধ ও বিরোধিতা হোক আল্লাহ তা'আলার নিকট গুনাহ হিসাবে স্মরণ করা হয়।

কুরআনের আয়াতে যে غَوِي শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে, এর অর্থ হলো, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম জানতেন না যে, তাঁকে ওই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, غَوِي শব্দের অর্থ হলো, হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের ভুল হয়েছে। কারণ তিনি ধারণা করেন, ওই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলে আমি সারা জীবন বেহেশতে বসবাস করতে পারবো। কিন্তু তাঁর সেই আশা পূর্ণ হয়নি।^২

^১. (ক) বাগাভী : মা'আলিমুত তানফিল, ৭:২৯৭।

(খ) কুরতুবী : আল জামি'লি আহকামিল কুরআন, ১:৩০৮।

^২. আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থা ছিল ত্যাগ ও বিসর্জন দেয়ার আর আমাদের অবস্থা হলো এই যে, কুরআন মজীদে আমাদেরকে বার বার আদেশ করা হয়েছে, বেহেশতের নিয়ামত লাভের আশা করো। অনন্তকাল বেহেশতে বসবাস করার প্রত্যাশী হও। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ করা হয়েছে- خَلِّتُمْ مِثْلَ وَلِيٍّ ذِي هِزْءٍ وَكِبْرٍ وَهُوَ غَرِيبٌ لَا أَمْرَ لَهُ فِي الْآيَاتِ الْأُولَى (সূরা: মুতাক্ব্বিফীন: আয়াত- ২৬)

যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম কারাগারে তাঁর দুই সাথীদের একজনকে বলেছেন-

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ.

-তাঁকে বললো, তোমার প্রভু বাদশাহ'র নিকট আমার কথা উল্লেখ করো। অতঃপর শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিলো যে, সে তার প্রভু বাদশাহ'র সামনে ইউসুফের কথা উল্লেখ করবে। সুতরাং ইউসুফ আরো কয়েক বছর কারাগারে রইলো।^৩

কেউ কেউ বলেন, উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হলো, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর স্মরণকে ভুলে যান।

কেউ কেউ বলেন, কারাগারের সাথীকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই সে তার প্রভু বাদশাহের সামনে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের কথা উল্লেখ করতে পারেনি। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, لَوْلَا كَلِمَةُ يُوسُفَ مَا لَبِثَ فِي السَّجْنِ مَا لَبِثَ -যদি হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম তাঁর সাথীকে একথা না বলতেন, তাহলে তাঁকে আরো কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হতো না।

ইবনে দীনার বলেন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম যখন তাঁর সাথীকে একথা বলেছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, তুমি আমাকে ছেড়ে অন্যের উপর ভরসা করছো, তাই আমি তোমার কারাভোগের মেয়াদ আরো বাড়িয়ে

লক্ষ্য করে দেখুন আমাদের যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি আমরা সে কাজ করি তাহলে আমরা সাওয়াব পাবো। আর তা আমাদের জন্য নেককাজ হিসেবে গণ্য হবে। আর যখন ওই কাজ একজন নবী করলেন তখন তাঁকে এর জন্য জবাবদিহী করতে হয়েছে তাঁকে বেহেশত থেকে বের হতে হয়েছে। এটাকে বলা হয়েছে- حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ، سَيِّئَاتُ الْمُفْرِينَ -পুণ্যবানদের পুণ্যকর্মও নৈকট্যভাজনদের জন্য পাপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

আমাদের জন্য বেহেশতের কামনা-বাসনা করা নেককাজের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর জন্য ভুল হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। কারণ এখানে পদমর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে। আমাদের স্তর হলো কামনা-বাসনার আর আম্বিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা স্তর হলো সম্ভ্রষ্ট। ওখানের অবস্থা হলো তুমি ইচ্ছাকৃত কিছু চাইতে পারবে না। আমার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেবে। এখানে তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে পাকড়াও করবো। কারণ তোমরা তো সাধারণ মানুষের মতো নও।

^৩. আল কুরআন : ইউসুফ, ১২:৪২।

দেবো। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম আরম্ভ করেন, হে আমার আল্লাহ! বিপদের কারণে আমার অন্তর আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই আমার স্মরণ ছিলো না। আর আমি ভুল করে আমার কারাগারের সাথীকে বলেছি। কিন্তু আমি ভাগ্য বিড়ম্বিত হই।

কেউ কেউ বলেন, আশিয়ায়ে কেরামের অতি সামান্য ত্রুটি প্রকাশ পেলেই তাদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হতো। কারণ আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁদের মর্যাদা ছিল অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের মোকাবিলায় অন্যদের দ্বারা বহুগুণ শিষ্টাচার বর্জিত হলেও তা ক্ষমা করে দেওয়া হতো। কারণ আল্লাহর নিকট অন্যান্যদের এতো গুরুত্ব নেই। এ কারণে তাদের কোনো ভয় থাকতো না। (যেসব আলেমগণ আশিয়ায়ে কেরামকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিষ্পাপ মনে করেন।) তারা আমাদের ওই কথার উপর অভিমত পেশ করেন যে, যখন হযরত আশিয়ায়ে কেরামকে ভুল-ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহী করা হয়েছে, যথা আপনি বর্ণনা করেছেন। আর আপনি বলেছেন, তাঁদের মর্যাদা অনেক সমুন্নত। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণ হয়েছে যে, (নাউযবিদ্লাহ) অন্যান্যদের মোকাবিলায় তাঁদের আরো বেশী বিপদের সম্মুখীন হয়ে অসহায় হতে হয়েছে। এখন ঐ অভিমতের জবাব শুনুন! আল্লাহ তা'আলা আপনাদের ইচ্ছত-সম্মান দান করুন যে, আমাদের একথা বলা যে, 'তাঁদের ক্ষেফতার হতে হয়েছে'। এ কথার মর্মার্থ এ নয় যে, তাঁদেরও ক্ষেফতার ওইভাবে হতে হয়েছে। যেভাবে অন্যান্যদের হতে হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো এই যে, দুনিয়াতে তাঁদের এ কারণে জবাবদিহী করতে হয়েছে যে, যাতে তাঁদের মর্যাদা সমুন্নত থাকে আর ঐ পরীক্ষা করার কারণে তাদের মর্যাদা আরো সমুন্নত করা হবে। স্বয়ং হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে-

ثُمَّ أَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٠﴾

-অতঃপর তাঁর প্রভু তাঁকে মনোনীত করলেন, তারপর তাঁর দিকে কৃপা দৃষ্টি ফেরালেন এবং আপন বিশেষ নৈকট্যের পথ প্রদর্শন করলেন।^১

হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম এর সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে-

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّكَامٍ ﴿١٢١﴾

-অতঃপর আমি তাকে তা ক্ষমা করেছি, এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তার জন্য আমার দরবারে নৈকট্য ও ভালো ঠিকানা রয়েছে।^২

^১. আল কুরআন : সূরা তোয়া-হা, ২০:১২২।

^২. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:২৫।

আর হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম বললেন, আমি তাওবা করেছি। তখন তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে-

إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ

-হে মুসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে লোকদের মধ্য থেকে মনোনীত করে নিয়েছি।^১

হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামকে পরীক্ষা করার পর ইরশাদ করা হয়েছে-

فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءَ حَيْثُ أَصَابَ ﴿١٢٢﴾

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿١٢٣﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي

الْأَصْفَادِ ﴿١٢٤﴾ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

﴿١٢٥﴾ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّكَامٍ ﴿١٢٦﴾

-অতঃপর আমি বায়ুকে তার অধীন করে দিলাম, যা তার নির্দেশে মৃদু-মন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো। যেখানেই সে চাইতো; এবং শয়তানদেরকে অধীন করে দিয়েছি। প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী এবং ডুবুরীদেরকে এবং আরো অনেককে শৃংখলে আবদ্ধাবস্থায়। এটা আমার দান। এখন তুমি ইচ্ছা করলে অনুগ্রহ করো, অথবা রুখে দাও! তোমার উপর কোনো হিসাব নেই। এবং নিশ্চয় তার জন্য আমার দরবারে অবশ্যই নৈকট্য ও উত্তম ঠিকানা রয়েছে।^২

কোনো কোনো আলেমগণ বলেন, হযরত আশিয়ায়ে কেরামের পদস্থলনসমূহ বাহ্যিক দৃষ্টিতে পদস্থলনই মনে হলোও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁদের কারামত ও নৈকট্য লাভের ওসীলা হয়েছে। যথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর একথাও হতে পারে যে, এভাবে হযরত আশিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত ওইসব লোক যারা তাঁদের মর্যাদার স্তরে পৌছতে সক্ষম হয়েছেন- অর্থাৎ নেককারদের সতর্ক করা হতো এ বলে যে, আশিয়ায়ে কেরামের অবস্থা শুনে তোমরা সাবধান হয়ে যাও। যখন অতি নগন্য বিষয়ে আশিয়ায়ে কেরামকে জবাবদিহী করতে হয়েছে, তখন

^১. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৪৪।

^২. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:৩৬-৪০।

অন্যদের আর কি মর্যাদা থাকবে। সুতরাং অন্যদের সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতে হবে আর সর্বদা জবাবদিহীতার কথা স্মরণ রাখতে হবে, যাতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা যায় এবং বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করে। এতো সম্মুখত মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আশিয়ায়ে কেরামের উপর বিপদ এসেছে। যেখানে আশিয়ায়ে কেরামের এ অবস্থা হয়েছে, সেখানে অন্যদের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত সালেহ মারবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের যিকির তাওবাকারীদের জন্য সাজনার কারণ হয়েছে। ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামের যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন তাতে তাঁর কোনো ক্রটি প্রকাশিত হয়নি, বরং ওই ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো (ওই ঘটনা জেনে) যাতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বেশী ধৈর্যধারণ করতে পারেন। ওইসব লোক যারা আশিয়ায়ে কেরামের দ্বারা ছগিরা গুনাহ হওয়া সম্ভব মনে করে, সম্মানিত গ্রন্থকার তাদের সম্বোধন করে বলেছেন, আপনারা ওই কথা স্বীকার করছো যে, (কবীরা গুনাহ) পরিত্যাগকারীদের ছগিরাগুনাহ তো তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর আপনারা ওই কথাও স্বীকার করছো যে, আশিয়ায়ে কেরাম কবীরাগুনাহ থেকে নিষ্পাপ। তাহলে আপনাদের নিজেদের অভিমত অনুযায়ী আশিয়ায়ে কেরামের ছগিরাগুনাহ এমনি মাফ হয়ে যায় (কারণ তারা কবীরাগুনাহ থেকে নিষ্পাপ হয়েছেন) তাহলে বলুন! আপনাদের অভিমত অনুযায়ী তাঁদের জবাবদিহী করতে হয়েছে কেনো? আর তারা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন কেনো? অথচ যেসব গুনাহের কারণে তাঁদের জবাবদিহী করতে হয়েছে তা তো পূর্বেই ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে? আপনারা ওই প্রশ্নের যে জবাব দেবেন, বাকী ভুল আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জবাব দেবো আমরা।^১

কোনো কোনো লোক বলেছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক সংখ্যায় তাওবা-ইস্তিগফার করতেন, বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য আশিয়ায়ে কেরাম যারা বার বার তাওবা করতেন, (তা এ কারণে নয় যে, নাউযবিলাহ তাঁদের দ্বারা গুনাহের কাজ সাধিত হয়েছে।) বরং তাঁরা বিনয়,

^১ এ জবাবকে গতানুগতিক জবাব বলা যায়। আপনারা আমার অভিমতের যে জবাব দেবেন আমিও আপনাদের অভিমতের ওই জবাব দেবো। যেমন কোনো ব্যক্তি কোনো সম্মানিত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে যে, পাঁচ গুয়াস্ত নামায ফরয করা হলো কেনো? তিনি প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমার নাক তোমার চেহারা উপর দেওয়া হয়েছে কেনো? পিঠের উপর দেওয়া হয়নি কেনো? তোমার যে জবাব হবে, আল্লাহর ইচ্ছায় আমারও সেই জবাব হবে।

নমনীয়তা ও আবদীয়াত বা বান্দাসূলভ অবস্থা প্রকাশার্থে এরূপ করেছেন। তাঁরা যখন আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামত প্রত্যক্ষ করতেন আর অনুভব করতেন যে, এই অফুরন্ত নিয়ামতের পুরোপুরি শুকরিয়া আদায় করা তাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তখন তাঁরা নিজেদের বিনয় ও নমনীয়তা প্রকাশার্থে ইস্তিগফার করতেন। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার পূর্ববর্তীর ভুল-ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করা দেয়া হয়েছে, তবুও তিনি ইরশাদ করেন,

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

-আমি কী আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবো না?

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَتَّقِي.

-আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলাকে সর্বাধিক বেশী ভয় করি, যেহেতু তোমাদের মধ্যে আমি আল্লাহ তা'আলাকে সবচেয়ে বেশী জানি।

এ কারণে আমি সবচেয়ে বেশী জানি যে, আমাকে কোন কোন বিষয় তাঁকে ভয় করতে হবে।

হযরত হারিস বিন আসাদ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

خَوْفُ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ خَوْفٌ عِظَامٌ وَتَعَبُّدٌ لِلَّهِ لِأَنَّهُمْ آمِنُونَ.

-ফিরিশতাগণ ও আশিয়া কেরামের আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার অর্থ আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্বকে ভয় করা, এটা তাদের ইবাদত স্বরূপ। কারণ তাঁরা সকল প্রকার আযাব থেকে নিরাপদ ছিলেন।

কেউ কেউ বলেন, আশিয়ায়ে কেরাম এ কারণে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতেন, এবং ইস্তিগফার করতেন যে, যাতে এ বিষয় মানুষ তাঁদের অনুসরণ করে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَصَحِحْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

-আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তাহলে তোমরা খুব কম হাসতে, আর বেশী কাঁদতে।^১

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ক্রিয়ামিন্ নবী, ৪:২৯২, হাদিস নং : ১০৬২।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ইক্সারিল আ'মাল, ১৩:৪৪০, হাদিস নং : ৫০৪৪।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফীল ইজতিহাদ ফীস্ সালাত, ২:১৮৭, হাদিস নং : ৩৭৭।

এছাড়া তাওবা ও ইসতিগফার করার আরো এক সূক্ষ্ম হিকমত হলো এই যে, - যার প্রতি কোনো কোনো আলেমগণ ইঙ্গিত করেছেন- তা আল্লাহ তা'আলার মহকমতের প্রত্যাশা করার এক মাধ্যম। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

-নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন অধিক তাওবাকারীদেরকে এবং পছন্দ করেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে।^১

সুতরাং সম্মানিত নবী ও রাসূলগণের তাওবা-ইসতিগফার করা, তাঁদের আল্লাহ তা'আলার প্রতি আসক্ত হওয়া, অক্ষমতা ও বিনময় প্রকাশ করা মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা প্রত্যাশায় ছিলো। আর তাঁদের ইসতিগফারের মধ্যে তাওবার অর্থ পাওয়া যায়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা একথা বলার পর ইরশাদ করেন, আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বাপর ভুলত্রুটিসমূহ পূর্বেই ক্ষমা করে দিয়েছি। যেমন ইরশাদ করা হয়েছে-

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ.

-নিশ্চয় আল্লাহর রহমতসমূহ ধাবিত হলো এ অদৃশ্যের সংবাদদাতা এবং ওই মুহাজিরগণ ও আনসারদের প্রতি।^২

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٢٠﴾

-অতঃপর আপন রবের প্রশংসাকারী অবস্থায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর থেকে ক্ষমা চান, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী।^৩

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুস সদকা ফীল কুসুফ, ৪:১৫৯, হাদিস নং : ৯৮৬।

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু কাওলিন্ নবী, ৮:২৮৮, হাদিস নং : ২২৩৪।

গ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবুল আমল ফী সালাতিল কুসুফ, ২:৭৬, হাদিস নং : ৩৯৮।

ঘ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবুল হযনী ওয়াল বুকাযী, ১২:২৩০, হাদিস নং : ৪১৮০।

২. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:২২২।

৩. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১১৭।

৪. আল কুরআন : সূরা নসর, ১১০:৩।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

فَائِدَةٌ مَأْمُورٌ مِنَ الْفُضُولِ الَّتِي بُحِثَتْ مَسْأَلَةُ الْعِصْمَةِ

ইসমত প্রসঙ্গে আলোচনার সারমর্ম

আমার পূর্ববর্তী আলোচনায় আপনারা অবশ্য অবগত হয়েছেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অনবগত থেকে নিষ্পাপ ছিলেন, বা শরীয়াতের যেসব বিধান ওহীর মাধ্যমে তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি ওইসব বিষয় জানতে অক্ষম হয়েছেন অথবা যখন থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবী বানান বা তাঁকে রাসূল মনোনীত করে প্রেরণ করেন তখন থেকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃত বা ভুল করে সংঘটিত ঘটনার বিপরীত এমন কোনো কথা (যাকে মিথ্যা বলা যায়) তাঁর মুবারক জবানে উচ্চারিত হয়েছে এমন ধারণা পোষণ করা যাবেনা, হযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুয়্যাত প্রকাশের পূর্বে ও পরে নিষ্পাপ ছিলেন এ বিষয় উম্মাতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, শরীয়াতের বিষয়ে ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুল-ত্রুটি, অসতর্কতা, অলসতা, ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদি থেকে পবিত্র ছিলেন।

সুতরাং এখন তোমাদের জন্য অবধারিত হয়েছে যে, পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে ঐ সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ নির্বিদ্বায় মেনে নেওয়া। আর কৃপণের মতো ওই বিষয় সমূহ আঁকড়ে রাখা(কোনো অবস্থায় এগুলো পরিত্যাগ না করা) এ বিষয়ে উপর যা আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর মূল্যায়ন করা আর উপকৃত হওয়া। কারণ যারা এ বিষয়সমূহ অবগত নয় যে, তাদের হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিরূপ আকীদা পোষণ করা জরুরী, অথবা যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব, তাহলে ওই বিষয়ে তাদের সন্দেহ দেখা দিতে পারে, তারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এমন কোন আকীদা পোষণ করে, যা সংঘটিত বিষয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে অথবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এমন এমন বিষয় সম্পর্কিত করা যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত করা অবৈধ হয়। এভাবে ওই ব্যক্তি এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যে, সে জানতেও পারবে না। আর সে জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে গিয়ে পতিত হবে। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা, যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জায়িজ নয়, তা মানুষকে ধ্বংসের আন্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে দেয়।

এ কারণে এক রাতে যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ইতিফাক পালন করেন তখন তাঁর নিকট তাঁর পূণ্যবতী স্ত্রী হযরত সাফিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ছিলেন, (আর দু'জন আনসার সে স্থান দিয়ে যায়) তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, إِنَّهَا صَفِيَّةٌ “এ হলো আমার স্ত্রী সাফিয়া।” তখন তারা আশ্চর্য হয়ে বললো! সুবহানাল্লাহ। ভালো! আমরা তো আপনার সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা করেনি। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي
قُلُوبِكُمْ شَيْئًا فَتَهْلِكُوا.

—শয়তান আদম সন্তানের রক্তে চলাচল করে। এ কারণে আমার সন্দেহ হয় যে, কখনো সে তোমাদের অন্তরে খারাপ ধারণা ঢেলে না দেয়, ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও।^১

সম্মানিত গ্রন্থকার পাঠক মহলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন! ঐ উপকারিতাসমূহের মধ্যে এটাও এক উপকারিতা যা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। সম্ভবতঃ কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় অজ্ঞতার কারণে এসব কথা শুনে বলবে যে, এটা অতিরিক্ত কথা। আর এ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা উত্তম, কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। বরং ওই বিষয় বর্ণনা আলোচনা করায় অনেক উপকারিতা রয়েছে। ওই উপকারিতাসমূহের মধ্যে এক উপকারিতা হলো এই যে, এসব বিষয়ে উসূলে ফিকহ^২র প্রয়োজনে আসবে। কারণ ওই বিষয়সমূহের দ্বারা ওই মাসআলাসমূহ উদ্ভাবিত হয়েছে। যদিও ওইগুলোকে ফিকহ^২র মাসআলায় গণ্য করা হয় না, তবুও ওইগুলো জানার মাধ্যমে বিভিন্ন ফিকহী মাসআলায় উচ্চবাচ্য করা থেকে অব্যাহতি লাভ করা যাবে।

মোটকথা হল, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কাজের ওই হুকুম। (হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র ছিলেন) এটা এক গুরুত্বপূর্ণ কথা। বরং যদি একথা বলা হয় যে, এটা উসূলে ফিকহ^২র মূল, তাহলে ভুল হবে না। সুতরাং এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দানে ও প্রদত্ত বিধান প্রচারে সত্যনিষ্ঠ

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু শাহাদাতি তাক্বু ইন্দাল হাকেম, ২২:৯৪, হাদিস নং : ৬৬৩৬।

খ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফী যিরারিল মুশরিকীন, ১২:৩২৮, হাদিস নং : ৪০৯৬।

গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফীল মু'তাক্বিফ, ৫:৩৩৮, হাদিস নং : ১৭৬৯।

ছিলেন। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা ওইসব বিষয় ভুল ভ্রান্তি হতে পারে না। তিনি জেনেগুনে কখনো কোনো কাজে আল্লাহ তা'আলার বিধানের বিরোধিতা করেন নি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের আমল থেকে নিষ্কলুষ ছিলেন। সুতরাং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা সগিরা গুনাহ হওয়ার বিষয়ে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ কারণে তাঁদের স্ব-স্ব ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজে অনুসরণ ও অনুকরণ করার ক্ষেত্রেও মতভেদ করেছে। এ বিষয় ওই গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এখানে ওই বিষয়সমূহ আলোচনা করে আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না।

এ বিষয় আলোচনা করায় তৃতীয় আরো এক উপকারিতা হলো এই যে, বিচারক ও মুফতীর ওই বিষয়সমূহ জানা জরুরী, যেসব বিষয়কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। কারণ যদি কোনো বিচারক বা মুফতি ওই বিষয়সমূহ না জানে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন গুণাবলীসমূহের বিশ্বাসস্থাপন জাযিয়, আর কোনটি জাযিয় নয়। আর কোন সিফাতের উপর মুসলিম উম্মাহর ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর কোন সিফাত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে- তাহলে তারা কিভাবে দৃঢ়তা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ফতওয়া দেবেন। আর তাঁরা কী করে বুঝবেন যে, অমুক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে যেসব কথা বলছে, তাতে না হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করা হয়েছে, না নিন্দা করা হয়েছে। সুতরাং ওইসব বিষয় না জানার কারণে সে যে-কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করার ফয়সালা দিয়ে দেবে। অথবা কোনো শান্তিযোগ্য বেআদবকে শান্তি না দিয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাহানি করার অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে।

যেভাবে হযরত আযিয়ায়ে কেরামের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয় মতভেদ রয়েছে, অনুরূপভাবে উসুলবিদ, আযিম্মায়ে কেরাম ও সত্যপন্থি আলেমদের মধ্যে ফিরিশতাদের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়েও মতবিরোধ রয়েছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

عِصْمَةُ الْمَلَائِكَةِ

ফিরিশতাদের নিষ্পাপ হওয়া

মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম উম্মাহ'র সকল ইমাম এ বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন যে, ফিরিশতাদের মধ্যে যারা রাসূলগণের নিকট বার্তা পৌছানোর দায়িত্ব প্রাপ্ত তাঁদের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে তাঁরা আশিয়ায়ে কেরাম সদৃশ। আর আশিয়ায়ে কেরামের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আশিয়া ও ফিরিশতা আর তাঁদের হক সম্পর্কে ওইসব আশিয়ায়ে কেরামের মতো হয়েছেন, যারা আপন উম্মাতদের দ্বীনের প্রচার করেছেন। আর যেসব ফিরিশতা সংবাদ বাহক নন তাঁদের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

কোনো কোনো লোক ফিরিশতাদের সংবাদ বাহকের দিক থেকে নিঃসন্দেহে নিষ্পাপ মনে করে। তাদের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী-

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

-তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেনা এবং যা তাঁদের প্রতি আদেশ হয়, তাই করে।^১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦﴾ وَإِنَّا لَنَخُنُ الصَّافُونَ ﴿١٧﴾

وَإِنَّا لَنَخُنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٨﴾

-আর ফিরিশতাগণ বলে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের একটা স্থান নির্ধারিত রয়েছে এবং নিশ্চয় আমরা পাখা সম্প্রসারিত করে নির্দেশের অপেক্ষায় আছি এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।^২

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

^১. আল কুরআন : সূরা তাহরীম, ৬৬:৬।

^২. আল কুরআন : সূরা সাফাত, ৩৭:১৬৪-১৬৬।

-আর তাঁর নিকটবর্তীগণ তাঁর ইবাদত থেকে অহংকারবশতঃ বিমূখ হয় না এবং না ক্লান্ত হয়। দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং আলস্য করে না।^৩

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ

وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾

-নিশ্চয় ওইসব লোক যারা তোমার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা অহংকারে তাঁর ইবাদত বিমূখ হয় না, তারা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে ও তাঁর প্রতি সাজদা অবনত হয়।^৪

আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

كَرَامٌ بَرَزُوا ﴿٢٢﴾

-যারা মর্যাদাসম্পন্ন পুণ্যবান।^৫

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে-

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٢٣﴾

-সেটাকে যেন স্পর্শ না করে কিন্তু অযু সম্পন্নরা।^৬

এরূপ অন্যান্য প্রতিলিপির দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ফিরিশতাগণ নিষ্পাপ। একদল আলেম বলেন, ওইসব আয়াত বিশেষত ওই ফিরিশতাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সংবাদ বহনকারী সম্মানী ও নৈকট্যভাজন। আর তাঁরা ওই বর্ণনা সমূহ দলিল হিসেবে পেশ করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ও তাফসীরবিদ যা বর্ণনা করেছেন আমি অনতিবিলম্বে ইনশাআল্লাহ তা আলোচনা

^৩. আল কুরআন : সূরা আশিয়া, ২১:১৯-২০।

^৪. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:২০৬।

উক্ত আয়াতে সাজদা আছে, সম্মানিত পাঠককে উক্ত আয়াত পাঠ করার পর সাজদা আদায়ের অনুরোধ রইল।

^৫. আল কুরআন : সূরা আবাসা, ৮০:১৬।

^৬. আল কুরআন : সূরা ওয়াক্বিয়াহ, ৫৬:৭৯।

করবো। তবে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত অভিমত হলো যে, সব ফিরিশতা তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণকারী সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে পবিত্র। আমি আমার কোনো কোনো শায়খকে দেখেছি, তাঁরা ওই বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করেন যে, কোনো আলেমের ফিরিশতাদের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমার অভিমত হলো, ফিরিশতাদের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয় উপকারিতা হলো আশিয়ায়ে কেরামের নিষ্পাপ হওয়ার উপকারিতার মতোই। তবে অবশ্য এটা মেনে নেয়া জরুরী যে, আশিয়ায়ে কেরামের বাণী ও কর্মের অবস্থা পৃথক। আমি এখানে বিতর্কিত বিষয় আলোচনা করতে চায় না। যারা ফিরিশতাদের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয় মানতে রাজী নয় তারা দলিল হিসেবে হারুত ও মারুতের ঘটনা পেশ করে। যা ঐতিহাসিক ও তাফসীরবেত্তাগণ বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা তাঁদের বর্ণনাসমূহে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন, আর তাদের পরীক্ষা করার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ বিষয়ে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ বা দুর্বল কোনো বর্ণনা বর্ণিত হয়নি। শুধু কিয়াসের উপর ভিত্তি করে ওই বর্ণনাসমূহ মান্য করা যাবে না। আর কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ওইসব আয়াতের ব্যাখ্যায়ও ভাষ্যকারদের ও তাফসীরবিদগণের মতভেদ রয়েছে। আমি সে বিষয় পরে আলোচনা করবো।

অধিকাংশ পূর্ববর্তী আলেম ও তাফসীরবেত্তাগণ তা অস্বীকার করেছেন। হারুত ও মারুত সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনা মূলতঃ ইহুদীদের গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তারা ফিরিশতাদের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। অনুরূপ তারা হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামকেও মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে (নাউযুবিল্লাহ), তাঁকে কাফির স্থির করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে ওই মিথ্যা অভিযোগসমূহ উল্লেখ করেছেন।

১. এ ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, ফিরিশতাগণ আদম সম্পর্কে এ কারণে অভিমত প্রকাশ করেন, এরা যমীনে গিয়ে ফ্যাসাদ ও রক্তপাত করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের বললেন, তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ফিরিশতা মনোনীত করো, তখন তারা হারুত ও মারুতকে মনোনীত করে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের নফস দান করে তাদের উভয়কে যমীনে নামিয়ে দেন। তারা উভয়ে যোহরা নামক এক মহিলার প্রেমে বিভোর হয়ে পড়ে। মহিলা তাদের বললো, তোমরা শিরকে লিপ্ত হও, তারা অস্বীকার করে। অতঃপর বললো, তোমরা এ শিশুকে হত্যা করো, এবারও তারা অস্বীকার করে, তারপর মহিলা তাঁদের উভয়কে শরাব পান করায়। তারপর তারা উভয় সে মহিলার সাথে মিলে শিশুকে হত্যা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তোমাদের অপরাধের শাস্তি এ দুনিয়াতে ভোগ করতে চাও, না আখিরাতে। তখন তারা উভয় দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করা পছন্দ করেন। তাই তাদের শাস্তি দেয়া শুরু হয়। আর ওই মহিলাকে যোহরা নামক রূপান্তর করে দেওয়া হয়।

আমি এ ঘটনার ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহ আলোচনা করে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ দূর করে দেবো ইনশাআল্লাহ। আর তাদের উত্থাপিত অভিমতসমূহ খণ্ডন করে দেবো।

এ ঘটনায় যে ক্রটি-বিচ্যুতি রয়েছে আমি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তা বর্ণনা করে ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহ দূর করে দেবো।

প্রথম কথা হলো এই যে, এ বিষয় মতভেদ রয়েছে যে, হারুত মারুত ফিরিশতা ছিলো, না মানুষ ছিলো? অথবা পবিত্র কুরআন মজীদে مَلَكَيْنِ যে শব্দ এসেছে তার দ্বারা এ দু' ফিরিশতাকে বুঝানো হয়েছে, না অন্য ফিরিশতাকে বুঝানো হয়েছে? مَلَكَيْنِ শব্দটি পঠনে مَلَكَيْنِ লাম বর্ণ যবর যোগে দুই বাদশাহ অর্থে হয়েছে, নাকি مَلَكَيْنِ লাম বর্ণ যের যোগে হয়েছে? আর কুরআন মজীদে বর্ণিত-

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ

-আর ওই যাদুও, যা 'বাবেল' শহরে দু'জন ফেরেশতা-হারুত ও মারুতের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর তারা দু'জন কাউকেও কিছু শিক্ষা দিতো না।^১

এর مَا শব্দটি না বোধক হয়েছে, না হ্যাঁ বোধক? তা যাই হোক অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ কথা বলেন, “আল্লাহ তা'আলা ওই দু'ফিরিশতার দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করেছেন। কারণ তারা উভয় যাদু শিক্ষা দানকারী ছিলো, যা শিক্ষাদান করা কুফুরী। সুতরাং যে যাদু শিক্ষা করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে যাদু শিখবে না, সে মু'মিন থেকে যাবে। কুরআন বর্ণিত আছে, তারা বলেছেন- إِنْ شَاءَ-আমরা তো নিছক পরীক্ষা।^২ আর তাঁদের যে শিক্ষা ছিলো; তাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে ডয়কারী ছিলো। অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, যারা তাঁদের নিকট যাদুবিদ্যা শিক্ষা করতে আসতো তাঁরা তাদের বলতো এ কাজ কখনো করবে না। কারণ এ বিদ্যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। সাবধান! কখনো এ বিদ্যা শিক্ষা করার ধারণা করবে না, কারণ এটা যাদুবিদ্যা। মানুষ এ বিদ্যা শিক্ষাগ্রহণ করার কারণে কাফির হয়ে যায়। সুতরাং এ তাফসীরের আলোকে দেখা যায় যে, উভয়

^১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১০২।

^২. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১০২।

আশ-শিফা [২য় খণ্ড]
ফিরিশতার কাজে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য রয়েছে। কারণ তাদের যে বিষয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে, যদি তারা সে আদেশ পালন করে তাতে তাদের কোনো অপরাধ হয়নি। কিন্তু তারা ব্যতীত অন্যদের জন্য এটা ছিলো পরীক্ষা।

খালিদ বিন আবু ইমরান সম্পর্কে বর্ণিত, তাঁর সামনে হারুত মারুত সম্পর্কে আলোচনা করা হয় যে, তাঁরা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিতো। তখন তিনি বললেন, আমি তাঁদের এ থেকে মুক্ত ও পবিত্র মনে করি। তখন কেউ কেউ এ আয়াত পাঠ করে- **وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ** - আর যা দু'জন ফিরিশতার উপর অবতীর্ণ করা হয়।^১

তখন খালিদ বললেন, তাদের উভয়ের উপর অবতীর্ণ করা হয়নি, খালিদের মতো বিজ্ঞ আলেম স্বীয় জ্ঞানে প্রজ্ঞাবান হওয়া সত্ত্বেও ওই দুই ফিরিশতাকে যাদু শিক্ষা দেয়া থেকে পবিত্র স্থির করেছেন। যেমন অপর একদল তাফসীরবেত্তা বলেন, তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাদু শিক্ষা দান করো, তবে শর্ত হলো যে, তোমরা লোকদের বলবে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা কুফরী। তাফসীরবিদদের মতো এটা একদিক থেকে লোকদের জন্য পরীক্ষার বস্তু ছিলো। তাহলে খালিদের মতো একজন জ্ঞানী যাদু শিক্ষা দেওয়া থেকে ফিরিশতাদ্বয়কে পবিত্র ঘোষণা করেছে। তাহলে এখন বলুন! তিনি (ঐতিহাসিকগণ) তাঁদের উভয়কে কবীরা গুনাহ ও কুফরী থেকে কিভাবে পবিত্র ঘোষণা করেছে।^২

আর খালিদ একথা বলেন, তাদের উভয়ের উপর নাযিল করা হয়নি, অর্থাৎ তিনি **مَا** শব্দটিকে 'না বোধক' অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উদ্দেশ্য করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাহিমাতুল্লাহ তা'আলা আনহুমাও এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, ওই আয়াতের অর্থ হলো, হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম কুফরী করেননি। অর্থাৎ শয়তান হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করেছে যে, তিনি যাদু করতেন। ইহুদীরাও একথা বলেছে। তাদের এ কথা অনুসৃত হয়েছে যে, ফিরিশতাদের যাদুবিদ্যা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে অবতারণ করা হয়নি।

^১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১০২।

^২. পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকায় যে হত্যা ও মদ্যপানের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যা কোনো কোনো ভাষ্যকার ইহুদীদের গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করে ফিরিশতাদের সাথে সম্পর্কিত করেছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এই যে, যখন ফিরিশতাদ্বয় যাদু শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে (খালিদের অভিমত) পবিত্র ছিলো। তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, ওই পবিত্র নফসদ্বয় হত্যা ও মদ্যপানের মতো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হতে পারে?

মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ওই দুই ফিরিশতা ছিলেন হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল আলাইহিমাস সালাম। তাঁদের উভয়কে ইহুদীরা যাদুবিদ্যা শিক্ষা দান করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে; অনুরূপ তারা হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামকেও মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যাবাদী উল্লেখ করে বলেন, না ফিরিশতারা যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে। আর না সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম বরং যারা যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে তারা ছিলো শয়তান। কেউ কেউ বলেন, হারুত মারুত দু'জন মানুষ ছিলো। তারা শয়তানের নিকট যাদুবিদ্যা শিক্ষা করেছিলো।

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, হারুত ও মারুত দু'জন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি **مَلَكَيْنِ** শব্দের লাম বর্ণে যবরের স্থলে যের যোগে **مَلَكَيْنِ** - দুই বাদশাহ অর্থে পাঠ করেন। এখানে **مَا** শব্দটি হ্যাঁ বোধক হয়েছে।

আবদুর রহমান বিন আরযী লাম বর্ণে যের দিয়ে পাঠ করতেন। তবে তিনি বলেন, দু'জন বাদশাহর অর্থ হলো হযরত দাউদ ও সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম। এখানে **مَا** শব্দটি না বোধক হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, বনী ইসরাঈলে দু'জন বাদশাহ ছিলো। যাদের যাদুবিদ্যা শিক্ষা করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দেন। আল্লামা সমরকন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরো বলেন, **مَلَكَيْنِ** এর লাম বর্ণে যেরযোগে খুব অল্প সংখ্যক লোক পাঠ করে থাকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য আবু মুহাম্মদ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমত অনুযায়ী সঠিক হবে। তাতে এটা প্রমাণিত হয়েছে, ফিরিশতাদ্বয় পাক-পবিত্র ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দেন। তাদের পবিত্র করে তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

كَرَامَ بَرَزَةٍ ۝

-যারা মর্যাদাসম্পন্ন পূণ্যবান।^১

এরপর ইরশাদ করা হয়েছে-

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

^১. আল কুরআন : সূরা আবাসা, ৮০:১৬।

-তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা তাদের প্রতি আদেশ হয়।^১

যারা ইবলীসের ঘটনা পেশ করে বলে যে, সে ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাদের সরদার জান্নাতের রক্ষক ছিলো। তারা দলিল হিসেবে বলে, আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে ফিরিশতাদের থেকে পৃথক করে দিয়ে ইরশাদ করেন-

فَسَجِدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ.

-তখন সবাই সাজদা করেছিলো ইবলীস ব্যতীত।^২

এর প্রতি উত্তর হলো, এ ব্যাপারে (ইবলীস ফিরিশতা ছিলো) আলেমগণ ঐক্যমত হননি। বরং অধিকাংশ আলেমগণ এর বিরোধিতা করে বলেন, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম আবুল বাশার বা মানবজাতির পিতা ছিলেন। তেমনি ইবলীস আবুল জিন বা জিনজাতির পিতা ছিলো। এটা হযরত হাসান বসরী, হযরত কাতাদা ও ইবনে যায়িদ রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের অভিমত।

শাহর বিন হশাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জিনেরা যখন আসমানে বিশৃঙ্খলা করে তখন ফিরিশতারা তাদের যমীনে তাড়িয়ে দেয়।

অবশিষ্ট রইলো আল্লাহ তা'আলার ইবলীসকে ফিরিশতাদের থেকে পৃথক করে দেয়ার কথা। আর প্রকাশ থাকে যে, একই বস্তু থেকেও পৃথকীকরণ করে।

যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ করা হয়েছে-

مَا هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَتْبَاعُ الظَّنِّ.

-তাদের এ সম্পর্কে কোনো খবর নেই; কিন্তু এ ধারণাই অনুসরণ মাত্র।^৩

আর এ সম্পর্কে যেসব বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে যে, ফিরিশতাদের একদল আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিরোধিতা করে সাজদা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, আর তাদেরকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয়বার তাদের আদেশ দেয়া হয়, হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সাজদা করো। দ্বিতীয়বার আরেকদলও হযরত আদম

^১. আল কুরআন : সূরা তাহরীম, ৬৬:৬।

^২. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:৩৪।

^৩. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১৫৭।

উক্ত আয়াতে ইলম থেকে 'ওহাম' বা ধারণাকে বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ ইলম এক বস্তু, আর ওহাম বা ধারণা আরেক বস্তু। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, শুধু একই বস্তু থেকে ইসতিসনা বা বাদ দেয়া হয় না। বরং ভিন্ন বস্তু থেকেও বাদ দেওয়া বা ইসতিসনা করা যায়।

আলাইহিস্ সালামকে সাজদা করতে অস্বীকার করে, আর তাদেরকেও আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তখন তাদের মধ্যে ইবলীস ব্যতীত সব ফিরিশতা সাজদা করে। আর আল্লাহ তা'আলা ওই ঘটনা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন, সব ফিরিশতা সাজদা করেছে। কিন্তু ইবলীস সাজদা করতে অস্বীকার করে। এ বর্ণনাসমূহ মনগড়া ও ভিত্তিহীন। সहीহ হাদীসে ওই বর্ণনাসমূহ বাতিল উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি।

الْبَابُ الثَّانِي

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

فِيَا يَخْصُصُهُمْ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَمَا يُطْرَأُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَوَارِضِ الْبَشَرِيَّةِ

মানবীয় চাহিদা ও পার্শ্বিক কাজে আশিয়া কেরামের বিশেষত্ব

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবীগণ মানবীয় আকৃতিতে এই ধরাধামে আগমন করেছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক দেহও মানবীয় আকৃতির ছিলো। আর যেভাবে একজন মানুষ শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়, স্বভাবের পরিবর্তন হয়, ব্যাধিগ্রস্ত হয়, মৃত্যুর সুধা পান করতে হয়, তেমনি আমাদের নবী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ওইসব অবস্থাসমূহ অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু এটা কোনো দোষ বা ত্রুটি নয়। কারণ ত্রুটি বা অপূর্ণতা হলো কারো নিকট অতিরিক্ত কোনো জিনিস বিদ্যমান থাকা। আর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবাসীদের জন্য এই বিষয়টি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, -“فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ”- তারা এখানে জীবন যাপন করবে। আর এখানে তাদের মৃত্যু হবে। এরপর একদিন তাদেরকে এ যমীন থেকে বের করে নেওয়া হবে।” তিনি মানুষকে সব পরিবর্তন ও পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। সেহেতু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কখনো কখনো অসুস্থ হয়েছেন, ব্যাথা অনুভব করেছেন, উষ্ণতা ও শীতলতা অনুভব করেছেন, ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়েছেন, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। তাঁর উপর দুর্বলতা ও বার্ষক্য এসেছে।

একবার তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে পাজরের হাঁড়ে আঘাত পান। কাফিররা তাঁকে আহত করেন, মুবারক দাঁত শহীদ করে দেন, তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়, তাঁর উপর যাদু করা হয়। আর তিনি ঔষধ ব্যবহার করেছেন, সিঁদা লাগিয়েছেন, ঝাড়-ফুক করেছেন। এভাবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র হায়াত পূর্ণ করে ওফাতপ্রাপ্ত হন। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফিকে আ'লার সান্নিধ্যে মিলিত হন।^১ আর সন্তাগত পরীক্ষার জীবন (দুনিয়া) থেকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অব্যাহতি লাভ করেন।

^১. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:২৫।

^২. এখানে কেউ কেউ ধোঁকায় পতিত হয়েছে যে, তারা মনে করে মৃত্যুর পর আমরা যেভাবে অনুভূতিহীন হয় শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে ফেলি (নাউযুবিল্লাহ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও একই অবস্থা হবে। অথচ তা কখনো হবে না। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবশ্যই মৃত্যু কার্যকর হয়েছে। কারণ প্রত্যেককে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পরে তাঁর মুবারক দেহে তাঁর হায়াত ফিরিয়ে দেন। ঐ সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হায়াতের অবস্থা কিরূপ হবে। আমরা নিকৃষ্ট বান্দা। আমরা তা কীভাবে অনুভব করবো? তবে আমাদের অবশ্যই

এসব মানবীয় নিদর্শনাবলী থেকে কেউ বাদ পড়েনি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্যান্য আশিয়ায়ে কেরামকেও আরো অনেক বেশী দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, তাঁদের অনেককে হত্যা করা হয়েছে, আগুনে জ্বালানো হয়েছে, কাউকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। আর তাঁদের অনেকেই এ ধরনের অবস্থা থেকে আল্লাহ তা'আলা বাঁচিয়েছেন। আর অনেককে শহীদ করা হয়েছে। আর কাউকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেছেন। অনুরূপ তিনি আমাদের নবী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিফায়ত করেছেন। উহুদ যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইবনে কামীর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তায়িফবাসীদের দীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তায়িফ তশরীফ নেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দুশমনদের চোখে পর্দা আবৃত করে দেন। তাই তারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করতে পারে নি। হিজরতের রাতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বগৃহ ত্যাগ করে কিছু সময়ের জন্য সওর পর্বতে আশ্রয় নেন।^১ তখন আল্লাহ তা'আলা সাময়িক কিছু সময়ের জন্য কাফিরদের চোখ আলোহীন করে দেন। তাই তারা কিছু সময়ের জন্য হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পায়নি।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোরাছের তরবারী থেকে রক্ষা করেছেন।^২

এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওজা মুবারকে পূর্ণ হায়াতে জীবিত আছেন।

^১ হিজরতের রাতে কাফিররা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করার ইচ্ছা করে। তারা উনুজ তরবারী হাতে নিয়ে চতুর্দিক থেকে নবী গৃহ ঘেরাও করে ফেলে কিন্তু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)কে নিজের বিছানায় ছাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রেখে, তাদের সামনে দিয়ে চলে যান। আল্লাহ তা'আলা তাদের চোখে পর্দা আবৃত করে দেন।

^২ সহীহ আল-বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় এক বৃক্ষের সাথে তরবারী ঝুলিয়ে রেখে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। পাপিষ্ঠ কাফির গোরাছ এসে তরবারী হাতে নিয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বললো; আল আমার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে কে? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে রক্ষা করবেন আল্লাহ তা'আলা। এ কথা শুনে সে কাফির থর থর করে কাঁপতে শুরু করে। তার হাত থেকে তরবারী পড়ে যায়।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম তার বক্ষে হাত দিয়ে আঘাত করায় তার হাত থেকে তরবারী মাটিতে পড়ে যায়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারী হাতে নিয়ে বললেন, বলো! এখন তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? তখন সে থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেয়। সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অনুরূপ আবু জহলের পাথরের আঘাত থেকে আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করেন।^১

অনুরূপ সুরাকার ঘোড়াকে থামিয়ে দেওয়া হয়।^২ অনুরূপ তিনি আল্লাহ তা'আলাই তাঁকে শুধু লবীদ বিন আসিমের যাদু থেকে রক্ষা করেননি, বরং ইহুদী মহিলার বিষক্রিয়া থেকেও রক্ষা করেছেন।^৩ অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা হযরত আশিয়ায়ে কেরামকে পরীক্ষা করেছেন। আর রক্ষা করেছেন। আর তাতে আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট হিকমত হলো এই যে, তিনি এভাবে হযরত আশিয়ায়ে কেরামের সমুন্নত মর্যাদা প্রকাশ করেন। আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন এভাবে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। আর তাতে তাঁদের পূর্ণাঙ্গ মানবীয় রূপ প্রকাশ হয়ে যাবে। কারণ হযরত আশিয়ায়ে কেরামের হাতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এ কারণে দুর্বলচিত্তের অধিকারী লোকজন ঐ সব কাজও মু'জিয়া দেখে সন্দেহে পতিত হয়েছে। যথা হযরত ইসা মসীহ আলাইহিস্ সালাম-এর মু'জিয়া দেখে নাসারাগণ পঞ্চভ্রষ্ট হয়েছে। তাঁকে খোদার পুত্র বলতে শুরু করে। সাধারণ লোক পঞ্চভ্রষ্ট হতে পারে এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের বিপদে পতিত করেন। আর মানবীয় ক্রটি-বিচ্যুতি তাঁদের সাথে সংযোজিত করে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, অবশ্যই তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত বান্দা তো অবশ্যই হয়েছেন কিন্তু কোন বান্দা খোদা হতে পারে না।

ওয়াসাল্লামের ক্ষমাশূণ দেখে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে পরে তার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে ইসলাম প্রচার শুরু করে। (নাসীমুর রিয়াজ-৪র্থ খণ্ড, ২৪৪পৃঃ)

^১ একবার আবু জহল শপথ করেছে যে, যদি আমি আগামী দিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়া অবস্থায় দেখতে পাই তাহলে আমি তাকে ধ্বংস করে ফেলব। ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় দিন সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারাম শরীফে নামায পড়তে দেখে সে হযুরকে করে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে পাথর হাতে তুলে নেয়। পাথর তার হাতে আটকে যায়। সে ভীত হয়ে দ্রুত উক্ত স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাপিষ্ঠ আবু জাহলের হাত থেকে রক্ষা করেন। ফলে অভিশপ্ত আবু জাহল তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

^২ হিজরতের সফরে পুরস্কারের লোভে সুরাকা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ধাওয়া করে। যখন তার ঘোড়া হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হয় তখন যমীন তার ঘোড়ার পেট পর্যন্ত গ্রাস করে ফেলে। তখন সুরাকা বুঝতে পারে যে, সত্যি তিনি নবী। তখন সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিরাপত্তা দান করেন। সে ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ খিলাফত কালে ইহজগত ত্যাগ করেন।

^৩ লবীদ বিন আসিম মদীনার বড় যাদুবিদ ইহুদী ছিলো। তার কন্যারাও যাদু করতো। তাদের যাদু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া করেনি। আল্লাহ তা'আলা তাদের যাদুর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া থেকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করেছেন।

হযরাত আশিয়ায়ে কেরামের উপর এ কারণে মসিবত এসেছে যে, যাতে তাঁদের উম্মাতের জন্য এটা আমলের এক নমুনা হয়। (আর তারা মসিবতে ধৈর্যধারণ করতে পারেন)। হযরত আশিয়ায়ে কেরামের উপর মসিবত আসার বিনিময়ে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি লাভ করে। আর আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁদের মর্যাদা সমুন্নত হওয়ার কারণ হতে পারে।

কোনো কোনো সত্যপন্থি ওলামায়ে কেরামের মতে, হযরাত আশিয়ায়ে কেরামের সাথে এ ধরনের ক্রটি-বিচ্যুতি ও পরিবর্তন সংযোজন করা হয়েছে তা শুধু তাদের বাহ্যিক দেহের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের পবিত্র রূহ ও আভ্যন্তরীণ অবস্থায় বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয়নি। এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রকাশ করা যে, তাঁরা মানুষ ছিলেন। আর যেভাবে মানুষ বিপদে-আপদে পতিত হয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁদের অভ্যন্তরীণ দিক ঐ অবস্থা থেকে মুক্ত থাকতো। তাঁরা সর্বদা মালায়িআলা বা উর্ধ্বজগতের ফিরিশতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। কারণ এ দিকে তাঁদের উপর ওহী অবতীর্ণ হতো। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانٍ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

-আমার চোখযুগল নিদ্রামগ্ন হয় কিন্তু আমার অন্তর নিদ্রামগ্ন হয় না।^১

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.

-আমি তোমাদের মতো নই। আমি আমার রবের সাথে অবস্থান করি। তিনি আমাকে পানাহার করান।^২

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

لَسْتُ أُنْسَى وَلَكِنْ أُنْسَى لِيُسْتَنَّى بِي.

-আমি ভুলি না, বরং আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়। যাতে আমি সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করতে পারি।^৩

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ক্রিয়ামিন্ নবী, ৪:৩১৯, হাদিস নং : ১০৭৯।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু সালাতিল লাইলি..., ৪:৮৯, হাদিস নং : ১২১৯।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী ওয়াস্ ফিস্ সালাত, ২:২৩৪, হাদিস নং : ৪০৩।

২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল ভিসাল ওয়া মান কুলা লাইসা ফীল লাইল, ৭:৬৯, হাদিস নং : ১৮২৮।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুন নাহী আনিল ভিসাল, ৫:৪০৪, হাদিস নং : ১৮৫০।

গ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবুন নাহী আনিল ভিসাল, ২:৩৮৯, হাদিস নং : ৫৯০।

৩. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল ভিসাল ওয়া মান কুলা লাইসা ফীল লাইল, ৭:৬৯, হাদিস নং : ১৮২৮।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ করে দেন যে, তাঁর সির বা গোপন তত্ত্ব তাঁর অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও তাঁর মুবারক রূহ এরূপ নহে। যেমন তাঁর দেহ মুবারক ও তাঁর বাহ্যিক অবস্থা।^১ সুতরাং এ ধরনের বিচ্যুতি যথা দুর্বলতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা অনভূত হওয়া, তাঁর ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়া তা শুধু তাঁর বাহ্যিক দেহ মুবারকের উপর প্রতিফলিত হতো। অন্যান্য মানুষের মতো তাঁর অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর প্রতিফলিত হতো না। সুতরাং অন্যান্য মানুষ যখন শয়ন করে তখন নিদ্রামগ্ন হয়ে যায়, তাদের দেহ ও অন্তরের উপর তা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হৃদয় জাগ্রত অবস্থায় যেভাবে সজাগ থাকতো নিদ্রিত অবস্থায় অনুরূপ সজাগ থাকতো। সুতরাং অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমানোর পর বেঅযু হওয়া থেকে নিরাপদ থাকতেন। কারণ ঘুমানো অবস্থায়ও তাঁর মুবারক হৃদয় জাগ্রত থাকতো। এ বিষয় আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষ যখন ক্ষুধার্ত হয়, তখন তাদের দেহ দুর্বল হয়ে শক্তি হারিয়ে ফেলে। আর এ অবস্থা চলতে থাকলে কিছুদিন অনাহারে থাকার কারণে সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর অবস্থা হতো সম্পূর্ণ এর বিপরীত।

সুতরাং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.

-আমার অবস্থা তোমাদের মতো হয় না। আমি তো আমার প্রভুর সাথে অবস্থান করি। তিনি আমাকে পানাহার করান।^২

আমি বলছি যে, দুঃখ-কষ্ট-ব্যাধি-যাদু ও রাগান্বিত হওয়া এগুলো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক বাহ্যিক দেহের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর এইগুলোর কোনো প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো না যে, যাতে তাঁর কোনো ক্ষতি হতো। অথবা তাঁর মুবারক জবান দিয়ে এমন কোনো

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুন নাহী আনিল ভিসাল, ৫:৪০৪, হাদিস নং : ১৮৫০।

গ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবুন নাহী আনিল ভিসাল, ২:৩৮৯, হাদিস নং : ৫৯০।

১. বাধ্য হয়ে এ শব্দ লিপিবদ্ধ করতে হয় উর্দু ভাষায় এর কোনো প্রতিশব্দ হয় না। এর শাব্দিক অর্থ হলো “রায” বা গোপন রহস্য। যা সরাসরি আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে বলা হয়। তা শুধু বান্দা ও প্রভুর মধ্যে হয়। এ কারণে এ শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কারণ এটা উৎসাহ ও উদ্দীপনার ব্যাপার।

২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল ভিসাল ওয়া মান কুলা লাইসা ফীল লাইল, ৭:৬৯, হাদিস নং : ১৮২৮।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুন নাহী আনিল ভিসাল, ৫:৪০৪, হাদিস নং : ১৮৫০।

গ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবুন নাহী আনিল ভিসাল, ২:৩৮৯, হাদিস নং : ৫৯০।

কথা উচ্চারিত হয়ে যেতো, যা তাঁর মর্যাদার বিপরীত হতো অথবা তাঁর অঙ্গ সৌষ্ঠব দ্বারা এরূপ কোনো কাজ সংঘটিত হয়ে যেতো, যা তাঁর মর্যাদার বিপরীত ছিলো। যা সাধারণতঃ অন্যান্য মানুষের সাথে হয়, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এ প্রকারের ধারণা করা জাযিয় নেই।^১

^১. আমরা যখন রোগাক্রান্ত হই তখন আমরা যন্ত্রণায় চটফট করি। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে দুর্বল হই। রাগান্বিত হলে আজে-বাজে কথা বলতে শুরু করি কেনো? কারণ আমাদের বাহ্যিক অবস্থার প্রভাবে অভ্যন্তরীণ অবস্থা আক্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের আকা সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওইসব থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। এ জন্যই যে, এ সব অবস্থা শুধু তাঁর বাহ্যিক দেহের উপর প্রতিফলিত হতো। তাঁর অভ্যন্তরীণ অবস্থা সর্বদা মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাযির থাকতো। এ কারণে এ অবস্থায় তাঁর কি আসে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

حَالَتُهُمْ بِالنُّسْبَةِ لِلشَّخْرِ

হযুর ﷺ-র উপর যাদুর প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে

যদি আপনারা অভিমত প্রকাশ করেন যে, সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদুর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত আছে,

سُجِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ .

—যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করা হয়, তখন তাঁর উপর যাদুর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করতেন যে, আমি অমুক কাজ করেছি, অথচ তিনি সে কাজ করেননি।^১

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ .

—এমনকি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করতেন, তিনি তাঁর পৃণ্যবতী স্ত্রীদের নিকট গমন করেছেন। অথচ তিনি তাঁদের নিকট গমন করেননি।

প্রকাশ থাকে যে, এ ধরনের অবস্থা ওই ব্যক্তির হয় যাকে যাদু করা হয়। কিন্তু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ অবস্থা হলো কেনো? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিষ্পাপ ছিলেন?

এর প্রতি উত্তর বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, কিন্তু নাস্তিকরা এটাকে পুঞ্জি করে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে, তাদের এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার কারণ হলো জ্ঞানের স্বল্পতা, তারা এভাবে শরীয়াতের মধ্যে সন্দেহের সূচনা করতে চাইতো। অথচ আল্লাহ তা'আলা শরীয়াত ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত রেখেছেন। তবে বড়জোর এটা বলা যায়, যাদু এক প্রকার ব্যাধি। আর অন্যান্য ব্যাধির মতো এ ব্যাধি (অর্থাৎ যাদু) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রকাশ পেতে পারে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

^১. আহমদ : আল মুসনাদ, ৬:৬৩।

কিন্তু তাতে তাঁর নবুওয়াতে কোনো প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়নি। আর অন্যান্য বর্ণনাসমূহে বলা হয়েছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে হতো আমি এ কাজ করেছি, অথচ তিনি ওই কাজ করেননি- এতে দ্বিমত পোষণ করার কিছু নেই। কারণ এর বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া তাঁর নবুওয়াত ও শরীয়াতের বিধান প্রচারে প্রতিফলিত হয়নি, আর না তাঁর সত্যবাদীতায় ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহাত্ম্য দলিল আর উম্মাতের ইজমা বা ঐক্যমত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর যে অবস্থা সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, তা তাঁর পার্থিব কাজে সংঘটিত হয়েছে, যে কাজে তাঁকে প্রেরণ করা হয়নি, আর না এর দ্বারা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুনিয়ার সাধারণ মানুষের মতো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও দুঃখ-দুর্দশা এসেছে। আর এটা দোষের নয়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওইসব কাজের খেয়াল হতো সে সব কাজের কোনো স্থায়িত্ব ছিলো না। কিন্তু খুব দ্রুতই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এর বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যেতো।

এ বিষয়কে অন্যান্য বর্ণনায় আরো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারণা হতো যে, তিনি তাঁর পৃণ্যবতী স্ত্রীগণের নিকট গমন করেছেন, অথচ তিনি গমন করেননি।

হযরত সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কঠিনতর যাদু করা হয়েছে। আর যাদু সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে বর্ণনা সমূহ বর্ণিত হয়েছে তাতে এটা উল্লেখ রয়েছে। এর বিপরীত কোনো বর্ণনা বর্ণিত হয়নি। অর্থাৎ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করতেন যে, আমি এ কাজ করেছি। অথচ তিনি ওই কাজ করেননি। এটা শুধু তাঁর ধারণা ছিল।

কেউ কেউ বলেন, হাদীসের অর্থ হলো এই যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ধারণা করতেন যে, আমি অমুক কাজ করেছি। অথচ তিনি ওই কাজ করেননি। এটা ছিলো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারণা মাত্র। তিনি এটা সঠিক মনে করতেন না। সুতরাং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বাস ও বাণীসমূহ সঠিক ও বিশুদ্ধ ছিলো। আর প্রতিউত্তরসমূহ যা আমাদের ইমামগণ এ হাদীসের ধারায় বর্ণনা করেছেন, আমি এখানে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি। আর তাতে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করেছি। ওইগুলোর মধ্যে প্রতিটি ব্যাখ্যায় যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু আমার মনে আরো এক ব্যাখ্যার উদ্রেক হয়েছে যা আরো বেশী স্পষ্ট ও ভ্রষ্টদের অভিমত থেকে উত্তম। তাছাড়া এ ব্যাখ্যা হাদীস

দ্বারা বুঝে এসেছে। হযরত ওরওয়া বিন জুবায়ের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, বনী যুরাইক গোত্রের ইহদীরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করে তা কূপের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে, এর ফলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো জিনিষ দেখা সত্ত্বেও তা অস্বীকার করতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যাদু সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর কূপ থেকে যাদুর উপকরণসমূহ বের করে ফেলা হয়। অনুরূপ বর্ণনা ওয়াকিদী আবদুর রহমান বিন কা'ব ও আমার বিন আল হাকাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আতা খোরাসানী ইয়াহইয়া বিন ইয়া'ম্মার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

حُبْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ سَنَةً فَبَيْنَا هُوَ نَائِمٌ أَنَا
مَلَكَانِ فَقَعَدَا أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ.

-এক বছর যাবত হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা গৃহে গমন থেকে বিরত রাখা হয়। ওইসময় তিনি একদিন শুইয়ে ছিলেন। ইত্যবসরে তাঁর নিকট দু'জন ফিরিশতা আগমন করেন। একজন মাথার দিকে আর অপরজন মূবারাক পদযুগলের দিকে বসেন।^১

আবদুর রাযযাক বলেন,

حُبْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ خَاصَّةً سَنَةً حَتَّى أَنْكَرَ بَصَرَهُ.

-হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ করে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নিকট এক বছর আসা বন্ধ করে দেন। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়।^২

মুহাম্মদ বিন সা'দ হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি

^১ অতঃপর এক ফিরিশতা অন্য ফিরিশতাকে জিজ্ঞাসা করে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী হয়েছে? দ্বিতীয় ফিরিশতা বললেন, তাঁকে যাদু করা হয়েছে। এভাবে উভয় ফিরিশতা পরস্পরে বাক্যলাপ করেন। তাঁরা লবীদ বিন আসেম ইহদীর নাম উল্লেখ করে বলে, জারওয়ান কূপে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুলের উপর যাদু করা হয়েছে।

^২ মা'মার ইবন রাশেদ : আল জামে, ১১:১৪ হাদীস নং ১৯৭৬৫।

স্ত্রীদের নিকট গমন করা ও পানাহার ছেড়ে দেন। তখন দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করেন, অতঃপর পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন।

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের দ্বারা তোমাদের নিকট একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, যাদুর প্রতিক্রিয়া হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রতিফলিত হয়েছে, তাঁর মুবারক হৃদয়, আকিদা, বিশ্বাস ও আকলের উপর প্রতিফলিত হয়নি। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়া আর তাঁর পূণ্যবতী স্ত্রীগণের নিকট গমন করা বন্ধ করে দেয়া, পানাহার বন্ধ করে দেয়ায় তাঁর মুবারক দেহ দুর্বল হয়ে যায়। এতে তাঁর মুবারক রূহ ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা দুর্বল হয়নি।

আর যে বর্ণনায় এসেছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূণ্যবতী স্ত্রীগণের নিকট গমন করতেন না। অথচ তিনি অনুভব করতেন যে, তিনি গমন করেছেন। এর মর্মার্থ হলো এই যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুবারক শিষ্টাচার অনুযায়ী প্রফুল্লতা অনুভব করতেন। কিন্তু তিনি স্ত্রীদের নিকট গমন করতেন না। সম্ভবত! সুফিয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কঠিন যাদু করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজ না করেও ধারণা করতেন যে, তিনি ওইকাজ করেছেন। এরূপ করার কারণ হলো, যাদুর প্রভাব হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিশক্তির উপর প্রতিফলিত হয়েছে।

সুতরাং অবস্থা এরূপ হতো যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীর প্রতি তাকাতেন বা কোনো স্ত্রীর কাজ প্রত্যক্ষ করতেন। অথচ তিনি ধারণা করতেন যে, দেখেননি। তাঁর এই যে দুর্বলতা হয়েছে, তা শুধু তাঁর দৃষ্টিশক্তিতে হয়েছে। তাঁর মুবারক জ্ঞানে কোনো প্রকার ত্রুটি হয়নি। যদি বাস্তবে ত্রুটি হয়েও থাকে- যা বর্ণনাসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে, এর দ্বারা না তাঁর নবুওয়াত প্রভাবিত হয়েছে, আর না অভিমত পোষণকারীদের অভিমত প্রকাশ করার সুযোগ হয়েছে।^১

^১ কারণ সম্মানিত আশিয়ায়ে কেরাম নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও রোগাক্রান্ত হওয়া থেকে মুক্ত ছিলেন না। মানুষ হিসেবে তাঁরাও অন্যান্য মানুষের মতো আকস্মিকভাবে ব্যাধিতে আক্রান্ত হতেন। কিন্তু ব্যাধি ও আকস্মিক বিপদ থেকে তাঁদের মুবারক রূহ ও ক্বালব মুক্ত থাকতো আমাদের বিপরীতে। আমরা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের রূহ ও দেহ আক্রান্ত হয়ে যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

أَخْوَالُهُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا

হযুর ﷺ এর পার্শ্ববর্তী কাজের অবস্থাসমূহ প্রসঙ্গে

এ অবস্থা (যা পূর্ববর্তী অধ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে) তাঁর পবিত্র দেহের ছিলো। বাকি তাঁর দুনিয়াবী কাজ-কর্ম সম্পর্কে আমি আমার পূর্ব রীতিনীতি আকীদা-বিশ্বাস ধ্যান-ধারণার আলোকে আলোচনা করেছি। দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ ছিলো যে, তিনি দুনিয়ার কোনো কর্মকাণ্ডের প্রতি এক ধরনের খেয়াল করতেন। আর কখনো তা তাঁর ধারণার বিপরীত হয়ে যেতো। অথবা ওই বিষয়ে তাঁর সন্দেহ বা সংশয় হয়ে যেতো। কিন্তু শরীয়াতের বিষয় কখনো এরূপ হতো না। সুতরাং হযরত রাফি বিন খোদাইজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনাতে আগমন করেন। মদীনাবাসীরা খেজুর গাছে পরগায়ন করতো। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা এটা কী করছো? তারা আরয করে যে, আমরা সর্বদা এরূপ করে আসছি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে,

لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا.

-যদি তোমরা এরূপ না করতে তাহলে সম্ভবতঃ তোমাদের জন্য উত্তম হতো।^১

তারা পরাগায়ন করা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ওই বছর খেজুরের ফলন অনেক কম হয়। সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়টি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ.

-নিশ্চয় আমি তো মানুষ। সুতরাং আমি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের যা আদেশ করবো তোমরা তা পালন করবে। আর যদি আমি স্বীয় বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী (তোমাদের দুনিয়াবী বিষয় অভিমত প্রকাশ করি)। তবে আমি তো মানুষই।^২

^১ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ওজুবি ইসতিসাল..., ১২:৫৩, হাদিস নং : ৪৩৫৭।

খ) তাবরী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ, পৃ. ৩২, হাদিস নং : ১৪৭।

ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ওজুবি ইসতিসাল..., ১২:৫৩, হাদিস নং : ৪৩৫৭।

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনায় এসেছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

-তোমরা নিজেদের দুনিয়াবী বিষয় আমার চেয়ে বেশি ভালো জানো।^১

অপর এক হাদীস এসেছে যে,

إِنَّمَا ظَنَنْتُمْ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ.

-আমি তো এ বিষয় ধারণা অনুযায়ী পরামর্শ স্বরূপ বলি। সেহেতু আমার কোনো ধারণা সম্পর্কে তোমরা আমাকে জবাবদিহী করতে চাইবে না।^২

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে খেজুরের পরাগায়ন সম্পর্কিত বর্ণনায় এ কথা বলা হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ فَهُوَ حَقٌّ، وَمَا قُلْتُ فِيهِ مِنْ قِيلٍ نَفْسِي فَلِئَلَّا أَنَا بَشَرٌ، أَخْطِئُ وَأُصِيبُ.

-আমি তো মানুষ, সুতরাং আমি তোমাদিগকে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে যা বলি তা সত্য। আর যখন আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলি, তখন মনে করবে আমি মানুষ হই, কখনো ভুল করি, আবার কখনো সहीহ বলি।^৩

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়াত সম্পর্কে নিজের স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী কোনো অভিমত প্রকাশ করতেন এবং কোনো সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করতেন।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের কূপসমূহ থেকে দূরে যে তার ফেলেন (যেখানে পানি কম ছিলো) তখন হযরত হোবাব বিন মুন্জির রাযিয়াল্লাহু

তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কী এ স্থানে আল্লাহর নির্দেশে তার স্থাপন করেছেন? তাহলে তো আমরা আর আগে অগ্নসর হতে পারবো না। অথবা আপনি আপনার ধারণা অনুযায়ী এ স্থানে তার স্থাপন করেছেন? না এটা যুদ্ধের কোনো কৌশল? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন 'না'; বরং আমি আমার নিজের ধারণা অনুযায়ী এ স্থানে তার ফেলেছি, আর আমি তা যুদ্ধের কৌশল অনুযায়ী করেছি। তখন আমি আরম্ভ করি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এখানে তার স্থাপন করা ঠিক হবে না। আপনি এখান থেকে সামনে অগ্নসর হয়ে পানির নিকট তার স্থাপন করুন। তাহলে এ কূপসহ অন্যান্য কূপ আমাদের নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। তাহলে কাফিররা পানি সংগ্রহ করতে পারবে না। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি সঠিক সিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। হযরত হোবাব বিন মুন্জির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যা বলেছেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করেন। আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দান করেন-

وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ.

-আর কার্যাদিতে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।^৪

একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দুশমনদের সাথে মদীনার এক তৃতীয়াংশ খেজুরের বিনিময় সন্ধি স্থাপন করার বিষয়ে আনসারদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন আনসারগণ তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করে। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পূর্ববর্তী অভিমত প্রত্যাহার করে নেন। এটা মূলতঃ দুনিয়াবী কাজ ছিলো। না এতে দ্বীনী ইলমের কোনো দখল ছিলো, না আকীদাগত দিক থেকে শিক্ষণীয় কোনো দখল ছিলো। সুতরাং ওইসব বিষয় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ধ্যান-ধারণার বিপরীত কাজ করেছেন। যেমনটি আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। তাহলে এতে ক্ষতির কিছু নেই। এগুলি তো ওই ধরনের মোয়ামলাত যা অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যেসব লোক ওই বিষয়ে অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছে তারা তো স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও কর্মক্ষমতা জানার পেছনে ব্যয় করে ওই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছে।

আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা ছিলো এরূপ যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হৃদয় সর্বদা আল্লাহর মারিফতে পূর্ণ,

^১ আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫৯।

খ) তাবরীযী : মিশকাহুল মাসাবীহ, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ৩২, হাদিস নং : ১৪৭।

^২ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ওজুবি ইসতিসাল..., ১২:৫৪, হাদিস নং : ৪৩৫৮।

খ) তাবরীযী : মিশকাহুল মাসাবীহ, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ৩৩, হাদিস নং : ১৪৮।

^৩ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ওজুবি ইসতিসাল..., ১২:৫২, হাদিস নং : ৪৩৫৬।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী মুহাম্মদ তালাহা, ৩:৩৩০, হাদিস নং : ১৩২।

^৪ ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ওজুবি ইসতিসাল..., ১২:৫৩, হাদিস নং : ৪৩৫৭।

খ) তাবরীযী : মিশকাহুল মাসাবীহ, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ৩২, হাদিস নং : ১৪৭।

মুবারক বক্ষ কার্পণ্যহীন শরীয়াতের জ্ঞানে উজ্জ্বল আর অন্তরের উম্মাতের ইহলৌকিক কল্যাণ ও প্রয়োজনের পেছনে লেগে থাকতো। এ কারণে প্রকাশ থাকে যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে এমনটি করতেন। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, পার্শ্বিক বিষয়ে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো কদাচিৎ উদাসীন হয়ে যেতেন। বিশেষ করে দুনিয়াবী ওইসব বিষয় যা দুনিয়ার হিফায়ত ও দুনিয়াবী সূক্ষ্ম বিষয়ের উপকারিতার সাথে সংশ্লিষ্ট হতো। অধিকাংশ সময় হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্শ্বিক বিষয়ে উদাসীন হতেন না। এ সম্পর্কে মুতাওয়াতির বা ধারাবাহিক বর্ণনা বিদ্যমান পাওয়া যায়।

যাতে প্রমাণ হয়েছে যে, দুনিয়াবী অনেক বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানা ও ওইগুলোর সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা; তাছাড়া দুনিয়ার বিভিন্ন দলসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার দিক থেকে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতো সমুন্নত মর্যাদা রাখতেন যে, এগুলোকে মুজিয়াই বলা যায়। তা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। আমি এ বিষয়টি উক্ত গ্রন্থের মু'জিয়া অধ্যায় বর্ণনা করেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

أَحْكَامُ الْبَشَرِ الْجَارِيَةُ عَلَى يَدَيْهِ

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর হাতে শর'ঈ বিধান প্রচলন

মানবীয় ওই আহকাম ও মোকাদ্দমার মীমাংসা যা হযুর এর মুবারক হাতে প্রচলিত হতো, অথবা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা, বা উপকারী ও অনুপকারী বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা- এসবের ওই হুকুম হবে যা দুনিয়াবী কাজের ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

-নিশ্চয় আমি মানুষ, তোমরা তোমাদের মোকাদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তির জন্য আমার নিকট নিয়ে আসো। সম্ভবত! তোমাদের মধ্যে কেউ একে অন্যের চেয়ে বেশী বিচক্ষণ ও হুশিয়ার। সুতরাং আমি যেভাবে শুনবো, সেভাবেই মীমাংসা করে দেবো। অতএব আমি যদি কারো পক্ষে রায় ঘোষণা করি, মূলতঃ যদি তা তার হক না হয়, তাহলে তার উচিত হবে তার ভাইয়ের জিনিস না নেয়া। কারণ এভাবে যেন আমি তাকে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত এক টুকরা আগুন দিচ্ছি।^১

হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَخِيبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ.

-সম্ভবত! তোমাদের মধ্যে একপক্ষ অপরপক্ষ থেকে অধিক বাকপটু হও, আর আমি তার কথা সত্য মনে করে তার পক্ষে রায় দেবো।^২

^১ ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মাওয়াজাতুল ইমাম, ২২:৯১, হাদিস নং : ৬৬৩৪।

খ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু তা'রগীব ফীল কুথা বিল হক্ক, ৪:৪৭৫, হাদিস নং : ১২০৫।

গ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফী কুথায়িল কাযী, ৯:৩৮-৭, হাদিস নং : ৩১১২।

^২ বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ইসমি মিন খাসিম ফী বাতিল, ৮:৩৩৮, হাদিস নং : ২২৭৮।

আলোচ্য হাদীসসমূহের মর্মার্থ হলো এই যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিচারালয়ের আসনে তাশরীফ রাখতেন, তখন বাহ্যিক অবস্থার উপর হুকুম জারি করতেন। অর্থাৎ সাক্ষীদের সাক্ষ্য, বা শপথকারীদের শপথের উপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হকের প্রতি খেয়াল করতেন। আর বাহ্যিক ও সাক্ষীর উপর নির্ভর করে মীমাংসা করতেন। আর খোদায়ী হিকমতের চাওয়া পাওয়াও হলো তাই। কারণ যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করতেন তাহলে বান্দার অন্তরের কথা ও উম্মাতের মনে উদ্বেক হওয়া কামনা-বাসনা সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করে দিতেন। আর এ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি এরূপ হয়ে যেতো, তাহলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিত বিশ্বাসের উপর আদেশ জারী করতেন। কোনো পক্ষের অঙ্গীকার বা সাক্ষ্য শপথে সন্দেহের কোনো প্রশ্নই আসতো না। কিন্তু অবস্থা হলো এই যে, একদিকে আল্লাহ তা'আলা উম্মাতকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ, অনুকরণ করার আদেশ দিয়ে রেখেছেন। তাই যদি আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষ ইলম প্রকাশের ইচ্ছাশক্তি দিতেন, আর এ দিক থেকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাধান্য দান করতেন, তাহলে উম্মাতের জন্য তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করার কোনো রাস্তাই বাকী থাকতো না। আর শরীয়াতের দিক থেকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত মীমাংসা দলিল হিসেবে ব্যবহার করা হতো না। কারণ আমরা তো এটা জানি না যে, কোন বিশেষ মোকাদ্দামায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন বিশেষ ইলম দান করা হয়েছে, যার আলোকে তিনি মীমাংসা করেছেন। আর ওই বিশেষ গোপন ইলম যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে উম্মাত যদি তা জানতে পারতো, তাতে সব বিষয় ব্যতিক্রম হয়ে যেতো। আর উম্মাতের সামনে আমল করার কোনো উত্তম আদর্শ ও আমলের নমুনা বিদ্যমান থাকতো না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিয়েছেন, বাহ্যিক অবস্থার উপর (অর্থাৎ সাক্ষ্য-প্রমাণ, শপথ ও অঙ্গীকার) যাতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্যান্য লোক সমান মীমাংসা করতে পারে। তাতে উম্মাত পুরোপুরি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ করে মোকাদ্দামাসমূহ মীমাংসা করতে পারবে। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যাবলী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মোকাবিলায় অধিক স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য ও সন্দেহমুক্ত ছিলো। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যাবলীতে না শাসনিক দিক থেকে সন্দেহ থাকতে পারে, আর না কোনো ব্যাখ্যাকারী এর ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে। বেশী হলে এটা হতে পারে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মোকাদ্দমার বাহ্যিক অবস্থার উপর মীমাংসায় অগ্রণী ছিলেন। আহকামের বিভিন্ন শাখার দিক থেকেও বেশী উপযুক্ত ছিলেন। তাছাড়া ঝগড়া ও বিরোধ মীমাংসা করার দিক থেকে যদি দেখা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, এ পদ্ধতি এ কারণে গ্রহণ করা হয়েছে যে, যাতে উম্মাতের বিচারকগণ তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ করতে পারে। আর যেসব আহকাম হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নকল করা হয়েছে। তাতে শরীয়াতের বিধান সুদৃঢ় হয়েছে। অদৃশ্য জ্ঞানের যে অংশ আল্লাহ তা'আলা গোপন রেখেছেন আর তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে যা দান করার ইচ্ছা করেছেন, তাঁকে তা দান করে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে পরিমাণ দান করার ইচ্ছা করেছেন তা থেকে যা চেয়েছেন তা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ করেছেন। আর যা নিজের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, তাতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতে কোনো প্রকার ত্রুটি আসে নি, আর না তাতে তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে ক্ষতিও অপূর্ণতার আশংকা দেখা দিয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
أَخْبَارُهُ الدُّنْيَوِيَّةُ

পার্শ্ব বিষয়ে হযুর ﷺ এর বাণী

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই বাণীসমূহ যাতে তিনি তাঁর নিজের ও অন্যের অবস্থা বর্ণনা করেছেন অথবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই কাজসমূহ যা তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন- আমি এ বিষয় পূর্বে উল্লেখ করেছি। এর বিপরীত হওয়া সর্বাবস্থায় অসম্ভব; চাই তা স্বেচ্ছায় হোক বা ভুলবশতঃ, সুস্থ অবস্থায় বা রুগ্ন অবস্থায়, সন্তুষ্ট অবস্থায় হোক বা অসন্তুষ্ট অবস্থায় হোক। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিক থেকেও নিষ্পাপ ছিলেন। এ সব কথা ওই বিষয় হতে পারে যা তিনি খবর হিসেবে ইরশাদ করেছেন আর যাতে সত্য মিথ্যার অবকাশ থাকতে পারে। কারণ সব খবরে সত্য মিথ্যার সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষত্ব হলো এই যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানে উচ্চারিত প্রতিটি খবরই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তাতে মিথ্যার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ও অবকাশ ছিলো না। তবে ওই ইঙ্গিতসমূহ যেগুলোর বাহ্যিক দিক অভ্যন্তরীণ দিকের বিপরীত হতো, ওইগুলো প্রকাশ হওয়া যুক্তিসঙ্গত কারণে বৈধ হয়েছে। যেমন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সন্তুষ্ট অবস্থায় জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন, তখন তিনি দ্বৈত অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে স্বীয় উদ্দেশ্য গোপন রাখতেন। যাতে শত্রুরা আত্মরক্ষার সুযোগ না পায়। অন্যান্য বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো উম্মাতের প্রফুল্লতা ও মু'মিনদের মনোভূষ্টির উদ্দেশ্যে কৌতুক করতেন, যেন তাদের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং তারা উৎফুল্ল হয়। যেমন একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কৌতুক করে বললেন, اَلْأَمْرُ عَلَى ابْنِ الْثَاقِفِ আমি তোমাকে উটনীর বাচ্চার পিঠে আরোহন করাবো। জনৈক মহিলা তার স্বামীর সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, اَلَّذِي بَعَيْنِهِ بَيَاضٌ ওই ব্যক্তি যার চোখে সাদা দাগ রয়েছে? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওইসব কথা সত্য ছিলো। কারণ প্রত্যেক উট কোন উট্টীর বাচ্চাই হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক মানুষের অক্ষিগোলক সাদা হয়। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, اِنِّي لَأَمْرُحٌ وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا নিশ্চয় আমি কৌতুক করে থাকি আর তা সত্যই বলে থাকি।^১ এ সবই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

^১. তবরানী : আল মু'জামুল কাবীর, উবাইদ ইবনে উমায়র, ১২:৩৯১ হাদীস নং ১৩৪৪৩।

ওয়াসাল্লামের অমর বাণীর ধারাবাহিকতায় হয়েছে। যা খবরের সাথে সম্পর্কিত। আর ওইসব বাণী যা খবর নয়। যেমন দুনিয়াবী বিষয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ দেওয়া, বা কোনো বিষয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধ করা- ওই বিষয়সমূহেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য কথাই ইরশাদ করেছেন। কারণ কখনো এরূপ হতে পারে না যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে কোনো কাজের আদেশ করেছেন, বা কোনো কাজে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তিনি এর বিপরীত চিন্তা-ভাবনা করেছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائِنَةٌ الْأَعْيُنُ কোনো নবীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি স্বীয় চোখের খেয়ানত করবেন।^২

তাই যেখানে নবীর জন্য চোখের খেয়ানত করা জাযিয় নেই; সেখানে অন্তরের খেয়ানত করা কীভাবে জাযিয় হবে? যদি এ মত পোষণ করা হয়, তাহলে হযরত যারিদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন ঘটনায় কুরআন মজীদে যে আয়াত বর্ণিত হয়েছে, ওই আয়াতের মর্মার্থ কী হবে? ইরশাদ হয়েছে-

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ^৩

-আর হে মাহবুব! স্মরণ করুন, যখন আপনি বলতেন তাকে, যাকে আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, এবং আপনিও তাকে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, 'নিজ স্ত্রীকে নিজের কাছেই থাকতে দাও, এবং আল্লাহকে ভয় করো'। আর আপনি স্বীয় অন্তরে ওই কথা (গোপন) রাখতেন, যেটাকে প্রকাশ করা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এবং আপনি লোকদের সমালোচনার আশঙ্কা করতেন। আর আল্লাহই অধিক উপযোগী এ কথার যে, আপনি তাঁরই ভয় রাখবেন।^২

এর প্রতি উত্তর হলো এই যে, উক্ত আয়াতের বাহ্যিক শব্দে এরূপ সন্দেহ করা যাবে না যে, বাহ্যিক দিক দিয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যারিদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে আদেশ করেন, সে তার স্ত্রী হযরত জয়নাব বিনতে

^১. ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৮:৬৯৬।

^২. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৩৭।

জাহাশ রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহাকে নিজের নিকট রেখে দিক। অথচ তিনি মনে মনে কামনা করতেন যে, সে তাকে তালাক দিয়ে দিক। (নাউয়িবিল্লাহ), যেমনটি কোনো কোনো তাফসীরবিদ উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে সহীহ বর্ণনা হলো, যা তাফসীরবিদগণ হযরত আলী বিন হুসাইন রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন যে, হযরত জয়নাব রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহা আপনার পূণ্যবতী স্ত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন। সুতরাং হযরত যায়িদ রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু যখনই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত জয়নাব রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতো তখনই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ আয়াতটি বলতেন যে, **تُؤْمِنُ بِكَ وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ** তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছেই রেখে দাও। আর এ বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো।^১ তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মনে ওই বিষয় গোপন রেখে দেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দেন যে, অচিরই আপনি হযরত জয়নাব রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহাকে বিবাহ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন তা প্রকাশ করবেন যখন হযরত যায়িদ রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু তাঁকে তালাক দেবে। আর তখনই আপনি তাঁকে বিবাহ করবেন।

অনুরূপ বর্ণনা হযরত আমর বিন ফায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত যুহরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেছেন। যাতে বলা হয়েছে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আগমন করে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা হযরত জয়নাব রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহাকে আপনার নিকট বিবাহ দেবেন'। তিনি এ কথা নিজ অন্তরে গোপন রাখেন। অন্য কারো নিকট প্রকাশ করেন নি। তাফসীরবিদদের এ অভিমতের সমর্থন পরবর্তী বর্ণনায়ও বিদ্যমান পাওয়া যায়। যাতে ইরশাদ করা হয়েছে—

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.

—আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।^২

অর্থাৎ অবশ্যই অবশ্যই আপনি (হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জয়নাব রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহাকে বিবাহ করবেন। এ হাকীকত ওই কথাই প্রকাশ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত জয়নাব রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহার

^১. আল কুরআন : আল আহযাব, ৩৩:৩৭।

^২. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৪৭।

ব্যাপারে একথা ব্যতীত যে, আপনি তাঁকে বিবাহ করবেন, অন্য কোনো কথা বলেননি। সুতরাং প্রমাণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যা প্রকাশ করেছেন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরে তা গোপন রেখে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ওই ঘটনার ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেছেন—

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ^১ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

—নবীর জন্য কোনো বাধা নেই এ কথায় যা আল্লাহ তাঁর জন্য নির্ধারিত করেছেন। আল্লাহ বিধান চলে আসছে তাদের মধ্যে যারা পূর্বে অতীত হয়েছে এবং আল্লাহর কাজ সুনির্ধারিত।^২

কারণ এটা আল্লাহ তা'আলার বিধান। এ কথা দলিল হয়েছে যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন তাতে দোষের কিছুই ছিলো না।

আল্লামা তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ কোনো কাজ যা তিনি তাঁর জন্য হালাল করেছেন, তাকে অভিযোগমূলক বলেন নি। কারণ এরূপ কাজ পূর্ববর্তী আশিয়ায়ে কেরামের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা ওই বিষয় তাঁদের উপর কোনো প্রকার অসম্মতির ভাব প্রকাশ করেন নি। যথা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ.

—আল্লাহর বিধান চলে আসছে তাদের মধ্যে, যারা পূর্বে অতীত হয়েছে।^২

যদি ঘটনা বর্ণনা অনুযায়ী হয়— যেমন হযরত কাতাদা রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, (নাউয়িবিল্লাহ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে হযরত জয়নাব রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পছন্দ করে নিয়েছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইতেন যে, হযরত যায়িদ রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু তাঁকে তালাক দিয়ে দেয়— তাহলে তাতে ভীষণ ক্ষতির কারণ দেখা দেবে। কারণ তা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমুন্নত মর্যাদার জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি হযরত জয়নাব রাখিয়াল্লাহ তা'আলা আনহার প্রতি দৃষ্টি দান করবেন, যে

^১. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৩৮।

^২. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৩৮।

বিষয় তাঁকে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার বাহ্যিক রূপ সৌন্দর্য। এ কাজ তো নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য যা প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রকাশ পায়। যেটা কোনো খোদাতীক লোক পছন্দ করেন না, সেখানে সম্মানিত নবীগণের সরদার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে কীভাবে এরূপ প্রশ্ন আসতে পারে?

কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ধরনের কোনো কথা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করবে সে অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ করলো। আর এরূপ করায় এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এ ধরনের লোকজন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমুন্নত ফযিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে আদৌ অবগত নয়। একথা কীভাবে বলা যায় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হযরত জয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে দেখার পর তাঁর ভাল লেগেছে। পক্ষান্তরে হযরত জয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ছিলেন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো বোন। তিনি তাঁকে জন্মের পর থেকে দেখে আসছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নারীদের পর্দা করতে হতো না, কারণ পর্দার বিধান এরপরে অবতীর্ণ হয়েছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হযরত জয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে হযরত য়াঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট বিবাহ দেন। আসল কথা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন যে, হযরত য়াঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত জয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে তালাক দিবে, আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করবেন। তাহলে পালক পুত্র (দত্তক) বানানোর রীতি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর এ রীতি সর্বকালের জন্য বাতিল ঘোষিত হয়ে যাবে।^১

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ

—মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন।^২

^১. জাহিলী যুগে আরববাসীরা যাকে পুত্র বানাতো, তাকে ঔরসজাত পুত্রের সমান মর্যাদা দিতো। মুখ ডাকা সে পুত্রকে উত্তরাধিকারী করতো। আর তার স্ত্রীর নিজের ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রীর মতো হারাম হয়ে যেতো। এটা এক অবাস্তব ও কৃত্রিম বানানো রীতি। আল্লাহ তা'আলা এ রীতি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করার ইচ্ছা করেন। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত য়াঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)কে পালক পুত্র বানিয়েছেন। বর্তমানেও এ রীতি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে। যার ফলে অনেক ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়।

^২. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৪০।

এরপর আরো ইরশাদ করেছেন—

لَيْتَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

—যাতে মুসলমানদের জন্য কোনো বাধা না থাকে তাদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীগণের বিবাহের ব্যাপারে।^১

এরূপ বর্ণনা ইবনে ফওরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।

আবু লাইস সমরকন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যদি কেউ এ ধরনের প্রশ্ন করে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেনো হযরত য়াঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে হযরত জয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার নিকট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন? এর প্রতি উত্তর হলো যে, আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন যে, হযরত জয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাঁর পৃণ্যবতী স্ত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত য়াঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে তালাক দিতে নিষেধ করেন। কারণ তাদের মধ্যে ভালবাসা ছিলো না। আর আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানিয়ে দেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অন্তরে গোপন রাখেন। আর যখন হযরত য়াঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তালাক দেন, তখন তিনি লোকদের লজ্জা করতেন যে, লোকজন বলবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত জয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বিবাহ করার আদেশ এজন্য দেন যে, যাতে এটা উম্মাতের জন্য জাযিয় হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

لَيْتَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا

قَضَوْا مِنْهُمْ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

—যাতে মুসলমানদের জন্য কোনো বাধা না থাকে তাদের পোষ্যদের স্ত্রীগণের বিবাহের ব্যাপারে, যখন তাদের দিক থেকে তাদের প্রয়োজন মিটে যায়। আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়ে থাকে।^২

^১. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৩৭।

^২. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৩৭।

কেউ কেউ বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়িদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এ কারণে বিরত থাকার আদেশ করেন যাতে তিনি প্রবৃত্তিকে বাধা দিয়ে রাখেন, আর প্রবৃত্তি তা পাওয়া থেকে সরে যায়।^১ এ ব্যাখ্যা তখন হতে পারে যখন আমরা এ কথা সমর্থন করবো যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জয়নাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে দেখে তাৎক্ষণিকভাবে পছন্দ করেছেন। আর আমরা এটাকে মানবীয় স্বভাবের মধ্যে ধর্তব্য মনে করবো, রূপ-সৌন্দর্য দেখে মানুষ পছন্দের কথা বলতে পারে। আর তাৎক্ষণিকভাবে কারো প্রতি দৃষ্টি পড়া ক্ষমার যোগ্য। তার পরও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফসকে তার থেকে বাধা দান করেন। আর হযরত যায়িদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে তালাক দেওয়া থেকে বিরত থাকার আদেশ দান করেন। এ ঘটনায় যে পাদটীকা সংযোজন করা হয়েছে তা মনগড়া অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য হয়েছে। সঠিক বর্ণনা হলো যা আমরা হযরত আলী বিন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছি। আল্লামা সমরকন্দী ও ইবনে আতা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এ অভিমতের সমর্থক। কাযী কুশাইরী ও ইবনে ফওরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমাও এ অভিমত পছন্দনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে ফওরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এটা সত্যপন্থি তাফসীরবিদের অভিমত। ইবনে ফওরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রে অসম্ভবতার ভাব প্রকাশ করে স্বীয় রীতিনীতির বিপরীত কথা বলেছেন, আর মনে মনে ইচ্ছা করতেন যে, হযরত যায়িদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে তালাক দেবে। আর পরে আমি তাকে বিবাহ করবো (নাউযুবিল্লাহ)। আর মুখে বলতেন যে হযরত যায়িদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জয়নাবকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দিক। কিন্তু নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতা বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন-

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ

-নবীর জন্য কোনো বাধা নেই এ কথায় যা আল্লাহ তাঁর জন্য নির্ধারিত করেছেন।^২

^১. এটা অতি অর্থহীন ও পরিত্যাজ্য ব্যাখ্যা। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমামণ্ডিত শানের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। কারণ হাদীস শরীফে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা আমাকেও নফস দান করেছেন, কিন্তু আমি তাকে অনুগত বানিয়ে নিয়েছি। তাই সে আমাকে নেক রাস্তা থেকে সরানোর কোনো চেষ্টা করে না, এরপর তাঁর প্রতি এরূপ অভিযোগ আরোপ করা জঘন্য মিথ্যাচার, ভ্রান্ত ও পরিত্যাজ্য। বরং এটাকে মুনাফিকদের চক্রান্ত বললেও অত্যুক্তি হবে না।

^২. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৩৮।

সুতরাং যারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তারা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। ইবনে ফওরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বাড়িয়ে বলেন, উক্ত আয়াতে خَشْيَةً যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ ভীত হওয়া নয়, বরং তা এখানে الاستحياء অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে লজ্জাবোধ করতেন যে, লোকেরা বলবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পুত্রবধু বিবাহ করেছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ লজ্জার আশঙ্কায় ছিলেন যে, মুনাফিক ইহুদীরা মুসলমানদের নিকট বলে বেড়াবে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুত্র বধু বিবাহ করতে নিষেধ করে তিনি স্বয়ং স্বীয় পুত্র বধু বিবাহ করেছেন। আর যখন তিনি বিবাহ করেছেন তখন আল্লাহ তা'আলা জোরালোভাবে ঘোষণা করলেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো অবৈধ কাজ করেননি। বরং আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যা হালাল করেছেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করেছেন।

অনুরূপ সতর্কবাণী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওই সময়ও করা হয়েছে, যখন তিনি স্বীয় স্ত্রীদের সম্ভবতার অনুসরণ করেছেন। যে বিষয়ে সূরা তাহরীমে বর্ণনা করা হয়েছে।^১

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ
أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

^১. হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহা'র ঘরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন তিনি হযুরের খেদমতে মধু পেশ করতেন। এ কারণে সেখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করতেন। এ বেশিক্ষণ অবস্থান করা হযরত আয়েশা ও হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'র নিকট অসহ্যের কারণ হলো এবং তাঁদের মনে ঈর্ষা জাগলো। তাঁরা দু'জনে পরস্পর পরামর্শ করে নির্ধারণ করলেন যে, এরপর যখনই আমরা দু'জনের কারো নিকট হযুর তাশরীফ আনেন, তখন আমরা আরও করবো, আপনার পবিত্র মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ আসছে। মাগাফীর এক ধরনের গন্ধযুক্ত ফল। সুতরাং তাঁরা দু'জন তা-ই করলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি মাগাফীর তো খাই নি, মধু পান করেছি। আচ্ছা! আমি মধুকে নিজের উপর হারাম করে নিচ্ছি, আর কোনো দিন মধু পান করবো না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সতর্ক করে ইরশাদ করেন, আপনি আপনার স্ত্রীদের কথায় আপনার জন্য যা হালাল করা হয়েছে তা কেনো হারাম করছেন?

-হে মহান নবী! আপনি নিজের উপর কেন হারাম করে নিচ্ছেন ওই বস্তুকে যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন? আপন স্ত্রীগণের সম্ভ্রটি চাচ্ছেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।^১

অনুরূপ ওই স্থানেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করা হয়েছে,

وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَحْشَنَهُ.

-আর আপনি লোকদের সমালোচনার আশঙ্কা করতেন এবং আল্লাহই অধিক উপযোগী এ কথার যে, আপনি তাঁরই ভয় রাখবেন।^২

হযরত হাসান বসরী ও হযরত আয়েশা রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে,

لَوْ كُنْتُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَكُنْتُمْ هَذِهِ الْآيَةَ لِمَا فِيهَا مِنْ عَتَبَةٍ وَإِنْدَاءٍ مَا أَخْفَاهُ.

-যদি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো আয়াত গোপন করার ইচ্ছে করতেন, তাহলে অবশ্যই ওই আয়াত গোপন করতেন। কারণ ওই আয়াতে তাঁর প্রতি বিরক্তি ও অসম্ভ্রটি প্রকাশ পেয়েছে। আর যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের গোপন ছিলো তা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

^১. আল কুরআন : সূরা তাহরীম, ৬৬:১।

^২. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৩৭।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

حَدِيثُ الْوَصِيَّةِ

হাদীসে কিরতাস এসঙ্গে

যদি আপনারা বলেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় কথাবার্তার দিক থেকে নিষ্পাপ প্রমাণিত হয়েছেন। আর এ বিষয় কোনো মতভেদ নেই যে, চাই স্বেচ্ছায় হোক, বা ভুলবশতঃ, বা সুস্থ অবস্থায়, বা অসুস্থ অবস্থায়, বা ইচ্ছাকৃত হোক, বা প্রফুল্ল অবস্থায় বা রাগান্বিত অবস্থায় বা যে কোনো অবস্থায় হোক না কেনো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক জবানে বাস্তবতার বিপরীত কোনো কিছু প্রকাশিত হয়নি। তাহলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই ওসিয়াতের কী অর্থ হবে যা হযরত ইবনে আব্বাস রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় কতিপয় সাহাবায়ে কেলাম হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করেন। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ আসো! আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু কথা লিপিবদ্ধ করে দিতে চাই, যার ফলে আমার পর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।^১ এরপর কোনো কোনো সাহাবায়ে কেলাম বললেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ যন্ত্রণা চরমে পৌছেছে।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, آتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا তোমরা আমার নিকট কাগজ কলম নিয়ে আসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু কথা লিপিবদ্ধ করে দেবো, তাহলে আমার পর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এরপর সাহাবায়ে কেলামের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। তাঁরা বললেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী হয়েছে? তিনি কষ্টের কারণে কী সব কথা বলছেন? (নাউযুবিল্লাহ)। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে এর হাকীকত জেনে নাও। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, دَعُونِي فَإِنَّ الَّذِي آتَا فِيهِ خَيْرٌ আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যে অবস্থায় আছি ভাল আছি।

কোনো কোনো সূত্রে বর্ণিত আছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বরের প্রকোপে প্রলাপ বকেছেন।

^১. বুখারী : আস সহীহ, ৬:৯ হাদীস নং ৪৪৩২।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, এটা কী ধরনের প্রলাপ? তখন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বললেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে (চিন্তিত হওয়ার কিছুই নেই!) আমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার কিতাব বিদ্যমান। তা আমাদের হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট। এরপর লোকজন জোরে জোরে কথা বলতে শুরু করে। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, قَوْمُوا عَنِّي - তোমরা এখান থেকে চলে যাও।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا

-আহলে বায়ত এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেন, আর তাঁদের মধ্যে মতভেদ হয়ে যায়। কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরাম বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কাগজ কলম পেশ করে লিপিবদ্ধ করে নেয়া হোক।^১

আবার কেউ কেউ হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যা বলেছেন তাই বলেন।

উক্ত বর্ণনা সম্পর্কে আমাদের হাদীসবিশারদগণ বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডুল থেকে নিষ্পাপ ছিলেন। কিন্তু তিনি রোগ-ব্যাদি থেকে নিরাপদ ছিলেন না। যথা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীব্র ব্যথা অনুভব করেছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অচেতন হতে হয়েছে। তবুও তিনি এ দিক থেকে অবশ্যই নিষ্পাপ ছিলেন যে, এ ধরনের অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা এমন কোনো কথা প্রকাশ পায়নি। যা তাঁর নিষ্পাপ হওয়া বা তাঁর নবুওয়াতের পরিপন্থি হয়েছে আর তাতে শরীয়াতের বিষয় কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি দেখা দিয়েছে। যথা, প্রলাপ বকা বা অর্থহীন কথা বলা।

এর আলোকে যিনি হাদীসের বর্ণনায় هَجَرَ (হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রলাপ বকেছেন) বলা সহীহ হবে না। কারণ এর দ্বারা এ কথা অত্যাৱশ্যক হবে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনর্থক কথা বলেছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রলাপ বলেছেন। যদি কেউ প্রলাপ বলতে শুরু করে দেয় তখন هَجَرَ هَجَرَ বলা হয়। আর যখন কেউ ওই কথা বলতে শুরু

^১. মুসলিম : আস সহীহ, ৩:১২৫৯ হাদীস নং ১৬৩৭।

করে, তখন বলা وَأَهْجَرَ هَجَرَ এর সংকর্ম ক্রিয়া হয়। সহীহ হলো أَهْجَرَ। এ কথা ওই ব্যক্তি বলেছে যে লিপিবদ্ধ করার অস্বীকৃতির ধারাবাহিকতায় দ্বিমত পোষণ করতে থাকে।^১ সহীহ বুখারী শরীফে যুহরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত বর্ণনার মর্মার্থ হলো এটাই। আর এ মর্মার্থ মুহাম্মদ বিন সালাম ইবনে উয়াইনার সূত্রে নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আসিলীও এরূপ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও সুফিয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যান্য বর্ণনাকারীদের সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতেও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ওই বর্ণনাকে এ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। আর উক্ত বর্ণনা থেকে প্রশ্নবোধক বর্ণনা উহ্য মানতে হবে। কারণ বক্তা এতো বেশী ভীত হয়ে পড়েছে যে, যার কারণে তিনি প্রশ্নবোধক বাক্য ব্যবহার করেননি। আর তিনি এ বিষয় ভীত হয়ে পড়েন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। আর এ অবস্থায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা করেছেন। আর ওই বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের মতভেদ হয়ে যায়। তাই ওই বিষয় তারা এতো বেশী ভীত ও হতাশ হয়ে পড়েন যে, তাঁরা এ শব্দ সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারেননি। আর পূর্ণাঙ্গ ব্যথা-বেদনার সময় মনের অজান্তে মুখ দিয়ে প্রলাপ বকা শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায়। এর অর্থ এ নয় যে, তাঁরা ওই আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন যে, (নাউযুবিল্লাহ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রলাপ বকেছেন। এটা সম্পূর্ণ এরূপ হয়েছে যে, যেমন আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষের ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখবেন। তারপরও সাহাবায়ে কেরাম তাঁর তাবু পাহারা দিতে চেয়েছেন।

আর أَهْجَرَ শব্দ যুক্ত বর্ণ যা সহীহ বুখারী শরীফে আবু ইসহাক মুসতামালীর আর ইবনে জুবায়িরের হাদীস কুতাইবার সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা

^১. যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিপিবদ্ধ করার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেন তখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে দু'ধরনের লোক দেখা দেয়। কেউ কেউ বলেন, লিপিবদ্ধ করে নাও। আবার কেউ কেউ বলেন, এখন তো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ কষ্টে আছেন। সুতরাং এখন কোনো কিছু লিখে নিয়ে তাঁকে অতিরিক্ত কষ্ট দিয়ে কী লাভ? আমাদের হিদায়াতের জন্য কুরআনই যথেষ্ট। তখন যারা লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তারা বিরোধিতাকারীদের বললো, আপনার লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছেন না কেন? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লিপিবদ্ধ করে নেওয়ার কথা বলছেন, এটা তো কোনো প্রকার প্রলাপ বকা নয় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিপিবদ্ধ করতে চাচ্ছেন না? এর মর্মার্থ কখনো এই নয় যে, তারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা প্রলাপ অর্থে ধর্তব্য করেছেন।

আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে ওইসব লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে মতভেদ করেছেন। তারা একে অপরকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় মতবিরোধ করছো। এভাবে স্বয়ং হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অনর্থক আজে-বাজে কথা বলছো। এ স্থানে আলেমগণ استنهفوه শব্দকে খারাপ অর্থে ব্যবহার করেছেন।

এখন প্রশ্ন হলো হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আদেশ করেন, কাগজ কলম নিয়ে এসো আমি লিপিবদ্ধ করে দেবো। এরপর সাহাবায়ে কেলাম মতবিরোধ করেছেন কেন? কোনো কোনো আলেমগণ এর জবাবে বলেন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহকাম প্রবর্তনের ধরণ ছিলো হয় ওয়াজিব হবে, না হয় মুস্তাহাব বা মুবাহ বা জায়য দলিলের সামঞ্জস্যতা বুঝা যাবে। তাই সম্ভবতঃ কোনো কোনো সাহাবায়ে কেলাম হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আদেশকে অত্যাৱশ্যকীয় মনে করেননি। বরং এটা বৈধতাবোধক আদেশ হয়েছে। যার উপর আমল করা না করা ইচ্ছাধীন। আর কোনো সাহাবায়ে কেলাম এরূপ খেয়াল করেন নি। আর এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা জেনে নেওয়া হোক। আর যখন লোকজন মতভেদ করছে তখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত হয়ে যান। কারণ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা লিপিবদ্ধ করা জরুরী মনে করেননি।

আর একথাও হতে পারে যে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র অভিমতকে অধিক যুক্তিসংগত মনে করেছেন। এখানেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র লিপিবদ্ধ করা কেনো অপছন্দ করেছেন। তাই কোনো কোনো আলেমগণ এর প্রত্যুত্তরে বলেন, তিনি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট দেখে ভীত হয়ে পড়েন। আর তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, এ অবস্থায় যেন এরূপ না হয় যে, লিপিবদ্ধ করানোর কারণে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট আরো বেড়ে যায়। এ কারণে তিনি বলেছেন, এখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কোনো কোনো সাহাবায়ে কেলাম বলেন, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র এ বিষয়ে ভীত হয়ে পড়েন যে, যাতে লোকজন অক্ষম হয়ে না যায়। সম্ভবতঃ লোকজন এর উপর আমল করবে না। এর ফলে তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। আর এটা যুক্তিসংগত মনে করেন। এ ধরনের বিষয়সমূহে উম্মাতের ইজতিহাদ করার পার্থক্যমুক্ত থাকে। যাতে তারা চিন্তা-

ভাবনা করে পূণ্যের সহজ পথ নির্ধারণ করে নেবে। আর উম্মাতের জন্য এটা সবচেয়ে বেশী সহজ হবে। কারণ যদি কেউ সঠিক সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারে তাহলে সে দ্বিগুণ পূণ্যের অধিকারী হবে। আর যদি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহলেও পুরস্কার পাবে। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র এ কথা জানতেন যে, শরীয়াত নির্ধারিত। আর দীন সুদৃঢ় মজবুত হয়ে আছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا ۝

-আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন মনোনীত করলাম।^১

আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَوْصِيَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَعِزَّتِي.

-আমি তোমাদের অসিয়ত করছি, আমার পর তোমরা আল্লাহর কিতাব ও আমার আহলে বাইতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।

তাই হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বলেন, حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ 'আমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট।' মূলতঃ হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র যারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে, তাঁদের প্রতিরোধ করেছেন। (নাউযবিলাহ) তিনি কখনো হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী প্রত্যাখ্যান করেননি।

কেউ কেউ বলেন, মূলতঃ হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র ভয় হয়েছে যে, মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা মনগড়া কথা বানানোর সুযোগ পেয়ে যাবে। কারণ এ কথা তো একান্ত গোপনীয়ভাবে লিপিবদ্ধ করা হতো। আর তখন তারা এ বিষয় বিভিন্ন ধরনের ধারা-উপধারার সংযোজন করতো, যেমন রাফিজী মতাবলম্বীরা ওসিয়াত ইত্যাদি দাবী করে।

কেউ কেউ বলেন, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয় পরামর্শ হিসেবে সাহাবায়ে কেলামের মতামত জানতেন চেয়েছেন যে, এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেলাম

^১. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫:৩।

কি অভিমত প্রকাশ করেন। তারা কী ওই বিষয়ে একমত্বে উপনীত হয়, না মতভেদ প্রকাশ করে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে তখন তিনি ওই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন।

একদল আলেম বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো কোনো লোক লিপিবদ্ধ করার কথা বলেছে। তখন তিনি তাদের আবেদনের জবাবে একথা ইরশাদ করেছেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে লিপিবদ্ধ করার কথা বলেননি। তারপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখেন যে, কেউ কেউ এ বিষয়কে উপকরণের উপায় স্থির করে যা আলোচনা করছে তা পছন্দ করেননি। তিনি নীরব হয়ে যান। এর দলিল হলো হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ওই অভিমত, যা তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা নিকট প্রকাশ করেন, 'আমাকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে চলো।' যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমরা বনী হাশেম বংশধরদের পেতে হয়। আমি তা বুঝতে পারবো, তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা অপছন্দ করেন। আর প্রতি উত্তরে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো এরূপ করবো না। আর এর দলিল হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, আমাকে ছেড়ে দাও। কারণ আমি এখন যে অবস্থায় তা অতি উত্তম। অর্থাৎ খিলাফত সংক্রান্ত বিষয়কে যদি এ অবস্থায় ছেড়েদি এবং আল্লাহর কিতাবকে তোমাদের সাথে থাকতে দি তাহলে এটা ওই বিষয় থেকে বেশী উত্তম হবে। যা তোমরা আমার নিকট দাবী করছো। কেউ কেউ বলেন, লোকেরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওই ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, আপনি আপনার পরবর্তী সময়ের জন্য খিলাফত সংক্রান্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করেদিন যে, আপনার পর কে খলিফা নির্বাচিত হবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সপ্তম পরিচ্ছেদ

دِرَاسَةُ أَحَادِيثٍ أُخْرَى

অন্যান্য হাদীসসমূহের পর্যালোচনা

যদি মতভেদ করা হয় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই হাদীস যা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ কী হবে? যে হাদীসে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اللَّهُمَّ إِنَّا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ، يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ وَإِنِّي قَدْ اخْتُذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ نَخْلِفَنَّهُ فَإِنَّا مُؤْمِنُونَ أَذْيَتَهُ أَوْ سَبِيَّتَهُ، أَوْ جَلَدْتَهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

-হে আমার আল্লাহ! নিশ্চয় আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো মানুষই। এক মানুষের মতো কখনো রাগান্বিত হই। আমি তোমার নিকট থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছি- আপনি যার বিপরীত করবেন না যে, যদি আমি কোনো মুসলমানকে কষ্ট দিই বা কোনো মন্দ কথা-বলি বা কাউকে বেত্রাঘাত করি, তাহলে আমার ওই কাজকে ওই ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ও কিয়ামতের মাঠে আমার নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানিয়ে দেবেন।^১

এক বর্ণনা এসেছে যে, فَإِنَّمَا أَحَدٌ دَعَوْتُ عَلَيْهِ دَعْوَةً -যদি আমি কারও জন্য বদদোয়া করি।^২ অপর এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ অথচ সে তার উপযুক্ত নয়। তাহলে এটাও তার জন্য ক্ষতিপূরণ ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানিয়ে দেবেন।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَيْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَصَلَاةً وَرَحْمَةً.

^১. ক) মুসলিম : আস সহীহ, ৪:২০০৮।

খ) আহমদ : আল মুসনাদ, ২:৪৯৩ হাদীস নং ১০৪০৮।

^২. ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ১৪:৪৪৪ হাদীস নং ৬৫১৪।

-আমি যদি মুসলমানদের মধ্যে কাউকে ভালো-মন্দ কিছু বলি, বা অভিসম্পাত করি বা বেত্রাঘাত করি, তাহলে আমার ওই কাজকে তার যাকাত, নামায ও রহমত লাভের কারণ বানিয়ে দেবেন।^১

এখন এখানে প্রশ্ন হলো যে, এটা কী করে সম্ভব হবে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ কোনো ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন, যে অভিসম্পাতের যোগ্য হয়নি। বা এমন ব্যক্তিকে মন্দ বলেছেন, যে এর উপযুক্ত নয় বা এরূপ কোনো ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে যে এ ধরনের শাস্তির উপযুক্ত নয়। তাহলে কী এ ধরনের কাজ রাগান্বিত অবস্থায় করেছেন? কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিষ্পাপ ছিলেন। তাহলে এর প্রতি উত্তর স্মরণ রাখুন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বক্ষকে সত্য উপলব্ধি করার সামর্থ্য দান করুন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ওই ব্যক্তি, যে এর যোগ্য নয়'। তাহলে এর অর্থ হলো এতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নিকট অভ্যন্তরীণ দিক থেকে তার এর যোগ্য না হওয়া। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বাহ্যিক বিষয়ের উপর বিধান কার্যকর করতেন। যেমন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আর তাতে ওই রহস্যও রয়েছে যা আমি উল্লেখ করেছি। (অর্থাৎ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে ওই কারণেই মীমাংসা করতেন, যাতে পরবর্তীতে মানুষ ওই রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখে।)

সুতরাং বাহ্যিক অবস্থা দেখে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিতেন অথবা কঠোরতা আরোপ করে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন অথবা কখনো অভিসম্পাত ও তিরস্কার করতেন। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতের প্রতি অতি দয়ালু ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো জন্যে দোয়াও করতেন, এ ভয়ে যে তাঁর বদদোয়া তার জন্যে কবুল না হয়ে যায়। আর এ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমার বদ-দোয়াকে নেক দোয়ায় পরিবর্তন করে দিন। এখানে উপযুক্ত না হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে শাস্তির অনুপোষিত কোনো মুসলমানের সাথে এরূপ আচরণ করেছেন। আর এ অভিমত হলো সहीহ। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

ওই বাণী, أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ -আমি মানুষের মতো রাগান্বিত হই।^১ এটা বুঝা যাবে না যে, রাগ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো অশোভনীয় কাজে উত্তেজিত করে দিতো। বরং এর মর্মার্থ এটা হতে পারে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাগান্বিত হতেন তখন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই রাগান্বিত হতেন। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত ও মন্দ শব্দে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন। এটাও হতে পারে যে, যদি কোনো ব্যক্তির দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার সম্ভাবনা দেখা দিতো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কর্তৃত্ব ছিল যে, তিনি তাকে শাস্তি দেবেন, অথবা ক্ষমা করে দেবেন। (এ অবস্থায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভাল-মন্দ কিছু না বলে বিবেচনা করে ক্ষমা করে দিতেন)

এ অভিমতের এ অর্থও হতে পারে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের ভয় দেখানো, আর উম্মাতদের ভয়-ভীতি দেখানোর উদ্দেশ্যে এরূপ করতেন যাতে মানুষ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমালংঘন না করে।

এটাও সম্ভব হতে পারে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দোয়া, আর এ ধরনের সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদ-দোয়া অনিচ্ছাকৃত হয়েছে, কেননা এটা আরববাসীদের অভ্যাস ছিলো। আর এর অর্থ এ নয় যে, ওই বদ-দোয়া কবুল হয়ে যাবে, যেমন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কাউকে এরূপ বলা যে, تَرَبَّتْ يَمِينُكَ -তোমার হাত ধূলায় ধূসরিত হোক।^২ وَآلَا -তোমার হাত ধূলায় ধূসরিত হোক। কিংবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক জনৈকা মহিলাকে এরূপ বলা, وَعَقْرِي حَلْقَى -বক্ষ্যা, মোটা, খোপার মতো।^৩ অথবা এ ধরনের বদ-দোয়াসমূহ। কারণ অন্যান্য হাদীসসমূহ যাতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে এ কথা বলা হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্লীলভাষী ছিলেন না।

^১ ক) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ১০:৩৩৯।

খ) আহমদ : আল মুসনাদ, ৩:৪০০ হাদীস নং ১৫৩২৯।

গ) মুসলিম : আস সহীহ, ৪:২০০৭ হাদীস নং ২৬০১।

^২ আহমদ : আল মুসনাদ, ২:২৪৩ হাদীস নং ৭৩০৯।

^৩ ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ১:৭৯ হাদীস নং ৮৭৮।

^৪ ইবনে হিযাম : আস সহীহ, ১৪:৪৪৫।

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

لَمْ يَكُنْ سَبَّابًا وَلَا فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا وَكَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمُعْتَبَةِ مَا لَهُ
تَرَبَّ جَبِينُهُ.

—হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না অশ্লীল কথা বলেছেন, আর না কাউকে গালি দিয়েছেন, না কাউকে অভিশাপ দিয়েছেন। তবে যদি তিনি কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন তখন ইরশাদ করতেন, তার কী হয়েছে? বা তার চেহারা খুলায় ধূসরিত হোক।^১

সুতরাং হাদীসের এ ব্যাখ্যায় গ্রহণ করতে হবে। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা করেন, না জানি আমার বদদোয়া কবুল হয়ে যায়। তাই তিনি স্বীয় প্রভু আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়েছেন যে, আমার বদদোয়া আমার উম্মাতের জন্য রহমত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানিয়ে দেবেন।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কখনো এরূপ ইরশাদ করার কারণ হলো এই যে, কখনো বদ-দোয়ামূলক কথা পবিত্র মুখ দিয়ে বের হওয়ার পর তিনি ভীত হয়ে যেতেন, যেন এই বদদোয়া কার্যকর না হয়। যার জন্য হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ দিয়ে বদদোয়া উচ্চারিত হয়েছে। সে যেনো ভীত ও নিরাশ না হয়। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা ইরশাদ করেছেন।

আবার কখনো এ জন্যই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে মন্দ কোনো কথা বলেছেন বা যুক্তিসংগত শাস্তি দিয়েছেন এর দ্বারা তিনি আশা করেন, কাউকে ভালো মন্দ কিছু বলা, বা শাস্তি দেয়া যেন তার গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়, তার অপরাধ বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর তার দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের ক্ষমা ও মাগফিরাতের ওসীলা হয়। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নিকট উক্ত দোয়া করেছেন। যেমন অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ.

^১. (ক) বুখারী : আস সহীহ, ৮:১৩ হাদীস নং ৬০৩১।

(খ) আহমদ : আল মুসনাদ, ৩:১২৬ হাদীস নং ১২২৯৬।

(গ) বাযযার : আল মুসনাদ, ২:২৭২।

—যে ব্যক্তি ভুলবশতঃ এ ধরনের গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং দুনিয়াতে তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে, ওই শাস্তি তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।^১

আর যদি তোমরা অভিযত প্রকাশ করে বলো যে, হযরত জুবায়ির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই হাদীসের মর্মার্থ কী হবে? যখন তাঁর এক আনসারের সাথে হাররা'র পানিপথ সম্পর্কে ঝগড়া হয়। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেন যে, اسْقِ يَا زُبَيْرُ حَتَّى يَلْغَ الْمَاءُ الْكَعْبَيْنِ, —হে জুবায়ির! তুমি তোমার বাগানে পানি সেচ দাও, যাতে পানি তোমার পায়ের টাখনু পর্যন্ত পৌছে যায়। যখন ওই আনসারী সাহাবী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো যে- হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যেহেতু সে আপনার ফুফাতো ভাই, তাই আপনি তারপক্ষে মীমাংসা করেছেন। একথা শুনে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اخْبِسْ حَتَّى يَلْغَ الْجَذَرُ, —হে জুবায়ির! তুমি পানিপথ থেকে পানি নিয়ে যাও। যাতে পানি যমিনের দেয়াল পর্যন্ত পৌছে যায়।

তাই এর প্রতি উত্তর হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয় থেকে পবিত্র ছিলেন যে, কোনো মুসলমান সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা এমন কথা প্রকাশ পাবে যা সন্দেহের উদ্রেক করবে। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে হযরত জুবায়ির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে পরামর্শ দেন যে, তুমি তোমার পাওনা আদায় করায় সমঝোতার খাতিরে কিছু অংশ ছেড়ে দাও। কিন্তু যখন প্রতিপক্ষ তাতে রাজী না হয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে অযৌক্তিকভাবে অন্যায় কথা বলতে শুরু করে, তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জুবায়ির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে তার পূর্ণ পাওনা বুঝিয়ে দেন।^২

^১. ক) আব্দুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, ৬:৩ হাদীস নং ৯৮১৮।

খ) আহমদ : আল মুসনাদ, হাদীস উবাদা ইবনে সাবিত, ৫:৩২০ হাদীস নং ২২৭৮৫।

গ) দারেমী : আস সুনান, ৩:১৫৯৪ হাদীস নং ২৪৯৭।

ঘ) বুখারী : আস সহীহ, ৫:৫৫ হাদীস নং ৩৮৯২।

^২. মদীনা নগরীতে বাগানের মাঝে পানি প্রবাহের জলধার ছিলো। প্রথম বাগানটি ছিলো হযরত জুবায়ির রাযিয়াল্লাহু আনহু, আর পরের বাগান ছিলো জুনৈদ আনসারীর। যুজাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যদিও সে বংশগত দিক থেকে আনসারি ছিলো, কিন্তু সে ছিলো মুনাফিক। সে আনসারী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মোকাদ্দমা দায়ের করে যে, জুবায়ির প্রথমে তাঁর বাগানে পানি

এ কারণে হাদীস বিশারদ ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ হাদীসের জন্য পৃথক পরিচ্ছেদ রচনা করে এর শিরোনাম করেছেন, **بَابُ إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى** - যখন বিচারক সন্ধি করার ইঙ্গিত করে, আর কোনো পক্ষ যদি তা অস্বীকার করে; তাহলে বিচারক জোরপূর্বক উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দেবে। আর হাদীসের শেষাংশে লিখেছেন- **فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জুবায়ের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হক পূর্ণ করে দেন।^১

মুসলমানগণ এ হাদীসকে বুনিয়াদ স্থির করেছে যে, সব বিষয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণ করা ওয়াজিব। চাই ওই আদেশ রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা প্রফুল্ল অবস্থায় দেয়া হোক। তবুও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচারককে রাগান্বিত অবস্থায় রায় ঘোষণা করতে নিষেধ করেছেন। এর কারণ হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় অবস্থায় (রাগান্বিত ও প্রফুল্ল) নিষ্পাপ ছিলেন। ওই বিষয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

সেচ দেয়। আপনি তাকে বলুন! সে যেনো প্রথমে পানি সেচ দেয়া বন্ধ রাখে। তাহলে আমি আমার বাগানে ভালোভাবে পানি সেচ দিতে পারবো। এরপর জুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাগানে পানি সেচ দেবে। সে সম্পূর্ণ অন্যায় কথা বলে। কারণ হযরত জুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাগানটি প্রথমে ছিলো। সেহেতু তিনি প্রথমে বাগানে পানি সেচ দেয়ার ক্ষেত্রে অধিক হকদার। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বিষয় মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে হযরত জুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, তুমি প্রথমে তোমার বাগানে পানি সেচ দেবে। আর তাৎক্ষণিকভাবে পানি ছেড়ে দেবে। যাতে পানি আনসারীর বাগানে পৌঁছে যায়। একথা শুনে আনসারী বললো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হযরত জুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু আপনার ফুফুতো ভাই, তাই আপনি এরূপ মীমাংসা করেছেন (অর্থাৎ- তিনি আবদুল মোস্তালিবেবের কন্যা হযরত সুফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা পুত্র)। একজন সাধারণ মুসলমান একথা বুঝতে সক্ষম যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমামণ্ডিত শানে এটা কতো বড় ধৃষ্টতা ও বেআদবী। একথা শুনে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্যোতির্ময় চেহারা বিমর্ষ হয়ে যায়। তিনি রাগান্বিত হয়ে আদেশ দেন, হে জুবায়ের! তুমি ওই পর্যন্ত পানি ছাড়বে না যতক্ষণ না তোমার বাগানের পানি তোমার পায়ের টাখনু অথবা বাগানের দেয়াল পর্যন্ত না পৌঁছে। কারণ ওই আনসারী আদালত অবমাননা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে, বর্তমান যুগের কোন অভিযোগকারী যদি আদালত অবমাননা করে, তাহলে অসম্বলিত হওয়া তো দূরের কথা বরং তাকে অবশ্যই আদালত অবমাননা করার কারণে কারাভোগ করতে হবে। সেখানে তো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনসাফপূর্ণ আদালত অমান্য করার প্রশ্নই আসতে পারে না। এ ধরনের লোককে হত্যা করা ওয়াজিব। কিন্তু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু উক্ত আদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি। কারণ তিনি ছিলেন রহমতের মূর্ত প্রতীক, তিনি অত্যাচারী শাসক ছিলেন না।

১. ক) বুখারী : আস সহীহ, ৩:১৮৭ হাদীস নং ২৭০৮।

খ) বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ৮:২৮৪।

ওয়াসাল্লামের রাগান্বিত হওয়া ছিলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে। তিনি নিজের জন্য রাগান্বিত হননি। তা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপ হযরত উকাশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীসে বর্ণিত, যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উকাশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলেছেন “তুমি আমার নিকট থেকে তোমার প্রতিশোধ নিয়ে নাও”। অথচ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে রাগান্বিত অবস্থায় এরূপ ইরশাদ করেন নি। বরং হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত উকাশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরম্ভ করেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছেন, আমি জানি না, তিনি ইচ্ছা করে আঘাত করেছেন, না উটনীকে আঘাত করার ইচ্ছা করেছেন। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا عُكَاشَةُ أَنْ يَتَعَمَّدَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-উকাশা আমি তোমাকে আল্লাহর আশ্রয়ে ছেড়ে দিয়েছি যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ইচ্ছা করে আঘাত করেছেন।^১

অনুরূপ অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, জনৈক বেদুইন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিসাস বা ক্ষতিপূরণ দাবী করে। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি তোমার কিসাস আদায় করে

১. আবু নায়ীম ‘হলিয়া’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। যখন সূরা নসর অবতীর্ণ হয় তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারেন যে, তাঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে মাসজিদে নববীতে সমবেত করে ইরশাদ করেন, যদি আমার নিকট কারো পাওনা থাকে, তাহলে তা পরিশোধ করে নিতে পারো। হযরত উকাশা রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে আরম্ভ করেন, মক্কা বিজয়ের পর মদীনাতে প্রত্যাবর্তনের সময় একবার আপনি লাঠি দ্বারা আঘাত করেন, তখন আমার দেহে সে লাঠির আঘাত লাগে। আমি জানি না সে লাঠি আপনি আমার উপর চালিয়েছেন, না উটনীর উপর চালিয়েছেন। সে যাই হোক এখন আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাৎক্ষণিক ভাবে লাঠি উকাশার হাতে দিয়ে আদেশ করেন, তুমি তোমার প্রতিশোধ নিয়ে নাও। হযরত উকাশা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যখন আমার পিঠে লাঠির আঘাত লেগেছে, তখন আমার পিঠ খালি ছিলো, তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুবারক পিঠ খালি করে দেন। হযরত উকাশা রাযিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র পিঠে চুমো দেন, আর আরম্ভ করেন যে, হে প্রিয় রাসূল! আমি কীভাবে আপনার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো? আমার ইচ্ছা ছিলো আপনার পবিত্র পিঠে চুমো দেবো। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে এ মুহূর্তে আমার বেহেশতের সাথী দেখতে চায় সে যেনো উকাশাকে দেখে নেয়। তখন সাহাবায়ে কেরাম উকাশাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নাও। তখন বেদুইন বললো, আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ঘটনা হলো যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাকে বেত্রাঘাত করেন। যখন সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীকে টানা-হেঁড়া করছিলো। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বার বার নিষেধ করেন। আর ইরশাদ করেন যে, তুমি তোমার পাওনা পেয়ে যাবে। কিন্তু সে উটনীকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করতে থাকে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার নিষেধ করার পর তাকে একবার বেত্রাঘাত করেন। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই কাজ ওই ব্যক্তির জন্য করেছেন যে বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও বিরত হয়নি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সঠিক ও উত্তম হয়েছে। শিষ্টাচারের দাবী ছিলো যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের বিরোধিতা না করা। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন। নতুবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এর চাইতে বেশী শাস্তি দেওয়া যথার্থ ছিলো।

আর ওই হাদীস যা হযরত সাওয়াদ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি একবার মাথায় জাকরান রং মেখে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে^১ পস্থিত হই।^২ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَزَسُّ وَزَسُّ حُطَّ حُطَّ وَغَشِيَّتِي بِقَضِيْبٍ فِي يَدِهِ فِي بَطْنِي فَأَوْجَعَنِي قُلْتُ:

الْقَصَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَشَفَ لِي عَنْ بَطْنِي

-জাকরান লেগে আছে, জাকরান লেগে আছে, তা ফেলে দাও। আর তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে আমার পেটে মৃদু আঘাত করেন। আমি তাতে ব্যাথা পাই। আমি আরব করি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি প্রতিশোধ গ্রহণ

^১. জাকরান রংয়ের এক প্রকার সুগন্ধি ঘাসকে “ওরস” বলা হয়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের এ সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আসওয়াদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)কে এই রং লাগানো দেখেন তখন সতর্ক করার ইচ্ছা করেন। তাকে কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্যে ছিলো না। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিষয় পুরোপুরি অধিকার ছিলো। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন রহমত ও দয়ার মূর্তপ্রতীক। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুভব করেন, হযরত সাওয়াদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কষ্ট অনুভব করেছে। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিকভাবে স্বীয় পবিত্র পেট পেশ করেন।

করতে চাই। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুবারক পেট উন্মুক্ত করে দেন।^৩

মূলতঃ প্রকৃত ঘটনা হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার অপছন্দনীয় বিষয়ের কারণে তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলো তাকে সতর্ক করা। হযরত সাওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন তাতে ব্যাথা পান তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রতিশোধ নেওয়ার আদেশ করেন। যেমনটি আমি পূর্বে আলোচনা করেছি।

^১. ক) আহমদ : আল মুসনাদ, ১৭:৩২৯ হাদীস নং ১১২৩০।

খ) বায়হাকী : আস সুনানুল কুবরা, ৮:৮৭ হাদীস নং ১৬০২০।

অষ্টম পরিচ্ছেদ أَفْعَالُ الدُّنْيَا

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াবী ওই কাজসমূহ

আমি ইতোপূর্বে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াবী ওই কাজসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যা বাহ্যিকভাবে দোষণীয় ছিলো। আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকেও বিরত ছিলেন। তবে ডুলের বৈধতা ও ওই বিষয়ে আমি আলোকপাত করেছি যে, তা নবুওয়াতের মর্যাদার পরিপন্থি ছিলো না। এ সব বিষয় কদাচিৎ সংঘটিত হয়েছে। কারণ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাভাবিক কাজকর্ম সঠিক ও যথার্থ ছিলো। বরং যদি বলা হয় তাহলে অযৌক্তিক হবে না যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব কাজই ইবাদত ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম ছিলো। কারণ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের জন্য শুধু এ জিনিস গ্রহণ করতেন, যা তাঁর জন্য জরুরী হতো, বা যা তাঁর দেহ বা আপন সত্তার জন্য প্রয়োজন হতো, যাতে তিনি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে পারেন, শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, স্বীয় উম্মাতের উপর নিজের আদেশ কার্যকর করতে পারেন। এখন অবশিষ্ট রইলো ওইসব বিষয়ের প্রত্যুত্তর, যা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য মানুষের মাঝে হয়েছে। তাঁর অবস্থা এরূপ ছিলো যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো কথা বলতেন, তখন ভালো কথা বলতেন। বা কাউকে এভাবে দান করতে চাইতেন যে, তাকে ধনী করে দিতেন, অথবা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ভীষণ উত্তম হতো, অথবা তিনি প্রতিপক্ষকে সম্বল করে দিতেন, বা শত্রুদের ধমক দিতেন। অথবা হিংসুকদের আতিথেয়তা করতেন। আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব কাজ তাঁর অন্যান্য উত্তম আমলসমূহের মতো তাঁর ইবাদত ও পবিত্র যিকিরের সাথে মিলিত হতো। আবার কখনো হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পার্শ্ববর্তী কাজে অবস্থার মতবিরোধের কারণে অন্যদের সাথে মতবিরোধ করতেন। আর ভবিষ্যতে সংগঠিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরী প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। যদি তিনি নিকটবর্তী কোনো স্থানে সফর করার ইচ্ছা করতেন তাহলে গাধার পিঠে আরোহণ করতেন। দূরবর্তী স্থানের সফরে উটনীর পিঠে আরোহণ করতেন। আর জিহাদের উদ্দেশ্যে খচ্চরের পিঠে আরোহণ করতেন। এটা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃঢ়তা প্রদর্শনের দলিল। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতেন। বিপদজনক অবস্থায় তাত্ক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্যে প্রস্তুত থাকতেন। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম স্বীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ও দুনিয়াবী কাজেও স্বীয় উম্মাতের যৌক্তিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করতেন। এছাড়া হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোনো উদ্দেশ্যে থাকতো না। তিনি এর বিপরীত কোনো কিছু পছন্দ করতেন না। আবার কখনো কখনো অবস্থা এরূপ হতো যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অভিমতের মুকাবিলায় অন্য অভিমতকে বেশী পছন্দ করতেন। কিন্তু উম্মাতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তা পরিত্যাগ করতেন।

দুনিয়াবী বিষয়েও হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন যে, দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটা গ্রহণ করার ইচ্ছাতির থাকতো। (কিন্তু উম্মাতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতেন না)। যেমন উহুদ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনা ত্যাগ। অথচ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত অভিমত ছিলো যে, মদীনাতে সারিবদ্ধ হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করবেন। অথবা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুনাফিকদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকবেন। অথচ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অবস্থা নিশ্চিত জানতেন। কিন্তু অন্যদের মনতুষ্টির জন্য বা মু'মিনদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে অথবা আরো এক কারণ ছিলো যে, লোকেরা বলবে যে, **إِنْ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ** - মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করেছে। অথবা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হত্যা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেননি, যেমনটি একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও) কাবাগৃহকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের ভিত্তি মোতাবেক পুনঃনির্মাণ করেন নি। যাতে কুরাইশদের মনোক্ষুণ্ণ না হয়। কারণ তারা কাবাগৃহকে ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করা অপছন্দ করতো। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারণা করেন যে, যদি আমি এরূপ করি তাহলে আমার সম্পর্কে কুরাইশদের অন্তরে ঘৃণার উদ্বেক হবে। আর সম্ভবতঃ তাদের মধ্যে সে পুরানো প্রতিহিংসা যা দীন ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ছিলো তা পুনরায় জাগ্রত হয়ে যাবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বলেন,

لَوْلَا حِذْيَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ، لَأَتَمَمْتُ الْبَيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

-যদি তোমার সম্প্রদায় কুফর থেকে নওমুসলিম না হতো, তাহলে আমি অবশ্যই কাবাগৃহ ভেঙ্গে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করতাম।

এরূপ অবস্থাও হতো যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে একধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, কিন্তু পরে তা পরিত্যাগ করতেন। এ কারণে যে, তখন এর চেয়ে আরো উত্তম কোনো বিষয় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে যেতো। যেমন বদরের ওই কূপসমূহ যা কুরাইশদের বেশী দূরে থাকা সত্ত্বেও সেগুলো বাদ দিয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই কূপসমূহের নিকট অবস্থান গ্রহণ করা যা তাদের থেকে বেশী নিকটে ছিলো।^১ অথবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ বলা,

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ أَسْفَتْ هَذَا.

-আমি যে কাজ পরে করেছি ওই কাজ যদি আমি প্রথমে করতাম তাহলে আমি কুরবানীর জন্ত পাঠাতাম না।^২

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমান ও কাফির উভয়ের সাথে হাসিমুখে মিলিত হতেন। যাতে তাদের মন উৎফুল্ল হয়। তিনি অস্ত্র-মুর্খদের ভুলভ্রান্তির ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতেন, আর ইরশাদ করতেন যে,

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ.

-ওই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার অনিষ্টতা ও অত্যাচারের ভয়ে মানুষ সন্ত্রস্ত থাকে।^৩

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের লোকদের উত্তম সম্পদ দান করতেন, যাতে তাঁর শরীয়ত ও আল্লাহর দীন তাদের দৃষ্টিতে প্রিয় হয়ে যায়।

^১. বদর যুদ্ধের সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কূপের নিকট অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন হযরত হাবাব বিন মুন্জির রাদিয়াল্লাহু আনহু অভিমত প্রকাশ করেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে অবস্থান করবেন না। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরামর্শ গ্রহণ করে অন্য কূপের নিকট গমন করেন।

^২. (ক) আবু দাউদ তয়ালাসী : আল মুসনাদ, ৩:২৫৫ হাদীস নং ১৭৮১।

(খ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসনাদ, ৩:৩৩৪ হাদীস নং ১৪৭০৫।

(গ) আহমদ : আল মুসনাদ, ৩:৩২০।

(ঘ) বুখারী : আস সহীহ, বাবু কাওলিন নবী, ৯:৮৩ হাদীস নং ৭২২৯।

(ঙ) নাসায়ী : আস সুনানুল কুবরা, ৪:৩৮ হাদীস নং ৩৬৭৮।

^৩. মালেক : আল মুয়াত্তা, ২:৯০৩ হাদীস নং ৪।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ গৃহে খাদেমের মতো কাজ করতেন। আর যখন ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ নিতেন, তখন এমনভাবে পোশাক পরিধান করতেন যাতে শরীরের কোনো অংশ অনাবৃত না থাকে। আর তাঁর সাথী ও সহচরগণ তাঁর সামনে এমনভাবে আদবের সাথে উপবিষ্ট হতেন, মনে হতো যেনো তাঁদের মাথার উপর বিহঙ্গকুল বসে আছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথী বন্ধুদের সাথে তাঁদের মর্যাদার কথা বলতেন, যা তাঁরা পছন্দ করতেন। তাঁরা যে বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতেন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সে বিষয়ে বিস্মিত হতেন। তাঁরা যে বিষয়ে হাসতেন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সে বিষয়ে হাসতেন। তিনি সকলের সাথে হাসিমুখে ইনসাফের সাথে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছাড়াই কথা বলতেন। তিনি রাগান্বিত হলে সাধারণ লোকদের মতো উত্তেজিত হতেন না। কোনো অবস্থায় তিনি সঠিক সীমারেখা অতিক্রম করতেন না। তিনি তাঁর মনের কথা সাহাবীদের নিকট গোপন করতেন না। তিনি ইরশাদ করেন,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةٌ الْأَعْيُنُ.

-নবীর মর্যাদার জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি চোখের খেয়ানত করবেন।^১

যদি আপনারা বলেন যে, একবার এক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে ইরশাদ করলেন,

بَشَّ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ وَصَحَّكَ مَعَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلَتْهُ

عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ.

-আগমনকারী তার গোত্রের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু যখন সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়, তখন তিনি অত্যন্ত নমনীয় ও প্রফুল্ল মনে তার সাথে কথা বলেন, আর দীর্ঘ সময় তার সাথে হাসিমুখে বাক্যালাপ করেন। কিন্তু সে চলে যাবার পর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলেছেন লোকটি অতি নিকৃষ্ট, তবুও আপনি তার

^১. ইবনে আবী শায়বা : আল মুসনাদ, ৮:৬৯৬।

সাথে অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে কথা বলেছেন। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই ব্যক্তি সর্বাধিক নিকৃষ্ট যার অত্যাচারের কারণ মানুষ তাকে ভয় করে।^১

তাহলে বলুন! এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহ্যিক অবস্থা অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিপরীত হতো? এর প্রত্যুত্তর হলো এই যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খুশি করার জন্য এ কাজ করেছেন। যাতে তার ঈমান নিরাপদ থাকে। আর এর কারণে তাকে মান্যকারীরা ইসলাম গ্রহণ করবে, যখন তারা তাকে দেখবে।

আর যখন সে এ অবস্থা দেখবে তখন তারা এমনিতে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ অর্থাৎ দুনিয়াবী আতিথেয়তার উদ্দেশ্যে দ্বীনের বিষয়ে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা ছিলো। অর্থাৎ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মনোভূষ্টির জন্য এরূপ করতেন, যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ লোকদের দ্বীনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করার জন্যে তাদের অধিক পরিমাণে দান করে খুশি করে দিতেন। কোমল ও নমনীয় ব্যবহার তো এর চেয়ে অতি নিম্ন স্তরের কাজ।

হযরত সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

لَقَدْ أَعْطَانِي وَهُوَ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى صَارَ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيَّ.

—হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এতো অধিক পরিমাণে দান করেন অথচ আমি তাকে সব চেয়ে বেশী অপছন্দ করতাম। কিন্তু তিনি আমাকে দান করতেই থাকেন। এমনকি শেষপর্যন্ত তিনি আমার নিকট সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে যান।

সর্বোচ্চ এটা বলা যায় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারো সম্পর্কে এ কথা বলা যে, এ লোকটি খারাপ। এটা খারাপ নয়, আর না এটাকে পরনিন্দা বলা যায়। কারণ এটা দ্বারা তো অপরিচিত ব্যক্তির হাকীকত জানা যায়। আর সে এরূপ ব্যক্তি থেকে সতর্ক হয়। তার উপর ভরসা করে না। বিশেষ করে যখন সে গোত্রের সর্দার হয়। আর এ ধরনের অভিমত প্রকাশ করা তখন বিশেষ প্রয়োজনে

^১ মালেক : আল মুয়াত্তা, ২:৯০৩ হাদীস নং ৪।

হয়; আর তার উদ্দেশ্য হয় বিপদমুক্ত হওয়া, এটা পরনিন্দা নয় বরং জায়য। আর কোনো কোনো সময় এরূপ করা ওয়াজিব হয়। যেভাবে হাদীস বিশারদগণ হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষত্রুটি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতেন। অথবা সাক্ষ্যদাতার ক্ষেত্রে পবিত্রতা ঘোষণা করা (এটা পরনিন্দা নয়)। বরং এরূপ করা ওয়াজিব। যাতে মানুষ প্রভাবিত না হয়।

আর যদি বলা হয় যে, হযরত বারীরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাদীসে বর্ণিত হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই কথার কী অর্থ হবে, যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বলেছেন। যখন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হযরত বারীরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সম্পর্কে বলেন, হযরত বারীরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা মনিব তাকে ওয়ালার শর্ত ব্যতীত বিক্রয় করতে অস্বীকার করেছে। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَشْتَرِيَهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ.

—তাকে ওয়ালার শর্তে খরিদ করে নাও। তখন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাকে ওয়ালার শর্তে ক্রয় করে নেন।^২

অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণদানের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করেন,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

—লোকদের কী হয়েছে? তারা কেনো লেনদেনে এ ধরনের শর্তারোপ করে, যা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে নেই? এ অবস্থায় যে শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।^৩

^১ হযরত বারীরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ক্রীতদাসী ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা খেদমত করতেন। তাঁর মালিক তাকে বিক্রি করার ক্ষেত্রে এই শর্ত অস্বীকার করে যে, তারা ওয়ালার হাঙ্গাম না করা পর্যন্ত তাঁকে বিক্রি করবে না অর্থাৎ বারীরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবে। তাদের এ শর্ত বাতিল ছিলো। কারণ ওয়ালার তখন কার্যকর হয়, যখন মনিব স্বীয় দাস-দাসীকে আবাদ করে দেয়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, তুমি তাকে খরিদ করে নাও। চাই ওয়ালার শর্ত থাকুক না কেন।

^২ ইসহাক ইবনে রাহভিয়া : ২:৪১২ হাদীস নং ৯৬৮।

^৩ ক) আহমদ : আল মুসনাদ, হাদীস সৈয়দা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, ৬:২১৩ হাদীস নং ২৫৮২৭।

খ) নাসায়ী : আস সুনানুল কুবরা, ১০:৩৭০ হাদীস নং ১১৭৪১।

এখন প্রশ্ন হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে আদেশ করেন, শর্তারোপ করে নাও। আর তারা ওই শর্তে হযরত বারীরাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বিক্রয় করে দেয়।

যদি এ শর্ত না হতো তাহলে তিনি বিক্রিত হতেন না। যেমন শর্তারোপ করার পূর্বে তারা তাকে বিক্রয় করতে অস্বীকার করেছে। এমনকি তারা ওই শর্ত নির্ধারণ করে নিয়েছে। তারপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত শর্ত বাতিল ঘোষণা করেন। অথচ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই মিথ্যা ও প্রতারণাকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

স্মরণ রাখুন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওইসব বিষয় থেকে পবিত্র ছিলেন, যা অজ্ঞলোকদের মনে জাহত হয়। আর জ্ঞানীদের একদল যারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিষ্পাপ মনে করেন তারা বলেন, ওই অতিরিক্ত বৃদ্ধির কথা যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে আদেশ করেছেন “তুমি ওয়ালার শর্তে তাকে ক্রয় করে নাও”- একথা অস্বীকার করেছেন। কারণ এ ধরনের অতিরিক্ত কথা উক্ত হাদীসের অধিকাংশ সূত্রের বর্ণনায় উল্লেখ নেই।

যদি এ অতিরিক্ত অংশকে মেনে নেয়াও হয় যে, এ অতিরিক্ত অংশ যথার্থ হয়েছে। তবুও তাতে কোনো অভিমত আরোপিত হয় না। কারণ لَهُمْ শব্দ عَلَيْهِمْ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এর বিপরীত শর্ত করে নাও। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী-

أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ

-তাদের অংশ হচ্ছে অভিসম্পাতই।^১

এখানেও لَهُمْ শব্দ عَلَيْهِمْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুরূপ অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে-

وَأَن أَسَأْتُمْ فَلَهَا^২

-আর যদি মন্দ-কর্ম করো তবে তাও নিজেদেরই।^২

গ) ইবনে হিষ্কান : আস সহীহ, ১০:৯৪।

^১ আল কুরআন : সূরা রা'আদ, ১৩:২৫।

^২ আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৭।

এ অবস্থায় হাদীসের মর্মার্থ হবে এই যে, তাদের বিপরীতে নিজের জন্য ওয়ালার শর্ত করে নাও। এখন প্রশ্ন হলো যে, তারা নিজের জন্য ওয়ালার অবৈধ শর্তারোপ করেছে।

দ্বিতীয় জবাব হলো এই, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, اِشْتَرَيْتُنِي لَهُمْ-“তার জন্য ওয়ালার শর্ত করে নাও।” এখানে ‘আমার’ আদেশ অর্থে হয়নি, বরং সমতা ও খবর অর্থে হয়েছে, এ শর্ত তাদের জন্য কল্যাণকর হবেনা। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাদের জানিয়ে দেন যে, আজাদকারী ব্যক্তি ওয়ালার মালিক হয়। তাই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে একথা জানিয়ে দেন, চাই তুমি শর্ত করো বা না করো সমান হবে। এ কারণে এ শর্ত তাদের জন্য কল্যাণকর হবে না। দাউদী এ অভিমত সমর্থন করেছেন। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাদের ধমক দান ও তিরস্কার এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, ওই লোকেরা পূর্বে জ্ঞাত ছিলো যে, বিক্রেতা ওয়ালার মালিক হয় না। বরং আজাদকারী ওয়ালার মালিক হয়।

তৃতীয় জবাব হলো এই, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী- তার জন্য শর্ত করে নাও। এর অর্থ হলো তাদের সামনে ওয়ালার হুকুম করে দাও। আর তাদের সামনে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত প্রচার করে দাও যে, ওয়ালার ওই ব্যক্তির জন্য, যে দাস-দাসীকে মুক্ত করে। এরপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা প্রকাশ করা আর তাদের বিরোধিতা করার কারণে দাঁড়িয়ে তাদের ধমক দেন, তাদের ভৎসনা করেন।

এখন যদি অভিমত প্রকাশ করা হয়, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ওই কাজের অর্থ কী হবে, যা তিনি তার ভাইদের সাথে করেন, ভাইদের পাত্র নিজে সম্পদে রেখে তাদের চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। পরে এ ব্যাপারে তাঁর ভাইদের সাথে যা হয়েছে। তারপর তাঁর একথা বলা যে,

إِنِّكُمْ لَسَرِقُونَ

-নিশ্চয় তোমরা চোর।^২ অথচ তারা চোর ছিলো না।

^১ ক) ইসহাক ইবন রাহভিয়া : আল মুসনাদ, ৩:৮৭২ হাদীস নং ১৫৪০।

খ) ইবনে হিষ্কান : আস সহীহ, ১০:১৬৮।

গ) বায়হাকী : সুনানুস সগীর, ৪:২২৬ হাদীস নং ৩৪৮৬

^২ আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:৭০।

আপনারা জেনে নিন। আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, এখানে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের এ কথা আল্লাহ তা'আলার আদেশের অধীন ছিলো। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نُّشَاءُ ۚ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي
عِلْمٍ عَلِيمٌ

-আমি ইউসুফকে এই কৌশল বলে দিয়েছি। বাদশাহী আইনের মধ্যে তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না তার সহোদরকে আটক করা, কিন্তু এ যে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছেন একজন অধিক জ্ঞানী।^১

যখন এ কথা হয়েছে তখন এখানে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশই থাকতে পারে না। উপরন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম স্বীয় ভাইকে পূর্বে বলে দেন যে, আমি “তোমার ভাই। তুমি চিন্তা করো না”। সুতরাং এরপর যা কিছু হয়েছে তা তাঁর ভাইয়ের সম্মুখিতে হয়েছে। আর তাঁর একথা জানা ছিলো যে, এর পরিনাম ফল ভালোই হবে। এখন বাকী রইলো, এরপর কাফেলার লোকদের কেনো বলা হলো-

أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَّرِقُونَ ﴿٧﴾

-হে যাত্রীদল! নিশ্চয় তোমরা চোর।^২

অথচ তারা চোর ছিলো না। এর প্রতি উত্তর হলো, এটা হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের কথা ছিলো না যে, এর জবাব দিতে হবে। এ কথা তাঁর কর্মচারী বলেছিলো। যদি হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম এ ধরনের কথা বলতেন তাহলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হতো।

কেউ কেউ বলেন, যেহেতু হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ভাইগণ এর পূর্বে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সাথে অন্যায় আচরণ করেছে। তারা তাঁকে বিক্রয় করে দিয়েছে। এ কারণে তাদের চোর বলা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ অন্য কথাও বলেন, তবুও আমি আশ্বিয়ায়ে কেরামের সাথে অনর্থক এসব বিষয় সম্পর্কিত করতে চাইনা যে, তাঁরা এ ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছেন। তারপরও তাঁদের নিষ্পাপ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তাদের সে সব অভিমতের জবাব দেয়া হয়েছে। এরপরও যদি কেউ এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তি করে তাহলে তাদের সেই পদস্থলন ধর্তব্য হবে না। কারণ নবীগণ ব্যতীত অন্যরা তো নিষ্পাপ ছিলো না।

^১. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:৭৬।

^২. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:৭০।

حِكْمَةُ الْمَرَضِ وَالْإِتِلَاءِ لَهُمْ

আম্বিয়ায়ে কেরামের রোগব্যাধি ও পরীক্ষার রহস্য প্রসঙ্গে

যদি বলা হয় তাতে কী রহস্য রয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে রোগযন্ত্রণা ভোগ করেছেন? তিনি ছাড়াও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের এ ধরনের অবস্থা হয়েছে। এরপরও কোনো কারণ ছাড়াই আম্বিয়ায়ে কেরামকে বিপদের সম্মুখীন করার হয়েছে। যেমন হযরত আইয়ুব, ইয়াকুব, দানিয়াল, ইয়াহইয়া, জাকারিয়া, ইসা, ইবরাহীম, ইউসুফ আলাইহিমুস সালাম প্রমুখকে কঠিন বিপদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। অথচ ওই মহাত্মাগণ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিজীবের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত পছন্দনীয় ও তাঁর মনোনীত বন্ধু ছিলেন।

স্মরণ্য যে, আল্লাহ তা'আলার সকল প্রকার কাজ ইনসাফের উপর নির্ভরশীল। আর তাঁর সব কথা সত্য হয়। তাঁর বাণীতে কোনো পরিবর্তন হয় না। তিনি বান্দাদের পরীক্ষা করেন। যেমন তাঁদের বলেন,

لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

-আমি তোমাদের আমল দেখতে চাই।^১

যেমন ইরশাদ হয়েছে-

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

-এ জন্য যে, তোমাদেরকে পরীক্ষা করবে, তোমাদের মধ্যে কার কর্ম উত্তম।^২

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا

-আর এভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মু'মিনদের জেনে নেবেন।^৩

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

-আর আল্লাহ দেখবেন কে জিহাদ করে জান দিতে প্রস্তুত আর কে ধৈর্যধারণকারী।^৪^১ আল কুরআন : ইউনুস, ১০:১৪।^২ আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১১:৭।^৩ আল কুরআন : আলে ইমরান, ৩:১৪০।^৪ আল কুরআন : আলে ইমরান, ৩:১৪২।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبَلَّوْا

أَخْبَارَكُمْ

-আর অবশ্য আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো যতক্ষণ না দেখে নেবো তোমাদের জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং তোমাদের সংবাদগুলোরও পরীক্ষা করে নেবো।^১

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত বান্দাদের যে পরীক্ষা নিয়েছেন তাতে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের পদমর্যাদা সমুন্নত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের তাওয়াক্কুল, একাত্তিভে দোয়া করা, বিনয়-নমনীয়তা ও নিজের অপরাগতা প্রকাশ করা, তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি লাভ করা, যাতে তারা বিপদমুখ লোকের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারেন। আর যাতে অন্যরা এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। আর তারা যেনো অন্যের দুঃখ-কষ্টে সমবেদনা দেখিয়ে ধৈর্য ও সাহচর্যের ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করতে পারে। এর পূর্বে তাদের যে পদস্থলন হয়েছে বা অসতর্কতা দেখা দিয়েছে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। যাতে তারা পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হতে পারে। আর তাঁদের প্রতিদান ও সাওয়াব বৃদ্ধি পায়।

হযরত মাস'আব বিন সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সবচেয়ে বেশী বিপদ কাদের উপর এসেছে? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.

-দুনিয়াতে সর্বাধিক বিপদ হযরত আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর এসেছে। এরপর তাঁদের উপর যারা তাঁদের সাথে সাদৃশ্য রেখেছে। মানুষকে তার দীন অনুযায়ী পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। বান্দার উপর সর্বদা বিপদ আসতেই থাকবে, এমন কি তাকে ওই অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয় যে, সে যমীনে বিচরণ করে। আর তার কোন গুনাহ থাকেনা।^২

^১ আল কুরআন : মুহাম্মদ, ৪৭:৩১।^২ ক) আবু দাউদ : আল মুসনাদুত তয়ালীসি, ১:১৭৪ হাদীস নং ২১২।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِثْيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ
﴿٢٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَأَسْرَفَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ
الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٨﴾

-আর কতো নবীই জিহাদ করেছেন, তাদের সাথে অনেকে আল্লাহওয়ালা ছিলো। তারা এতে হীনবল হয়ে পড়ে নি ওইসব বিপদের দরুণ, যেগুলো আল্লাহর পথে তাদের নিকট পৌঁছে ছিল, এবং না দুর্বল হয়েছে আর না দমিত হয়েছে। আর ধৈর্যশীলগণ আল্লাহর নিকট প্রিয়ভাজন। আর তারা কিছুই বলতো না এ প্রার্থনা ব্যতীত, 'হে আমাদের রব! ক্ষমা করো আমাদের গুনাহ এবং যেসব সীমালঙ্ঘন আমরা আমাদের কাজের মধ্যে করেছি। আর আমাদের পদ অবিচল করো এবং আমাদেরকে এই কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করো।' অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কার দিয়েছেন এবং পরকালের সাওয়াবের সৌন্দর্যও, আর পূন্যবান লোকেরা আল্লাহর নিকট প্রিয়।^১

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ
خَطِيئَةٌ.

খ) আহমদ : আল মুসনাদ, ১:১৭৩ হাদীস নং ১৪৯৪।

গ) ইবনে মাজাহ : আস সুনান, বাবু সবলি আলাল বালা ২:১৩৩৪ হাদীস নং ৪০২৩।

ঘ) তিরমিযী : আস সুনান, ৪:১৭৯ হাদীস নং ২৩৯৮।

ঙ) নাসায়ী : আস সুনানুল কুবরা, ৭:৪৬ হাদীস নং ৭৪৩৯।

চ) ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ৭:১৬০ হাদীস নং ২৯০০।

১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৪৬-১৪৮।

-মু'মিনের জ্ঞান-মাল ও সম্মানের উপর বিপদ আসতেই থাকবে। এমন কি সে এভাবে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হবে।^১

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

-আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোনো বান্দার মঙ্গল কামনা করেন। তখন দুনিয়াতে তাকে তার ভুল-ভ্রান্তি ও গুনাহের কারণে তাড়াতাড়ি শাস্তিদান করেন। আর যদি কোনো বান্দার অকল্যাণ কামনা করেন। তখন তার গুনাহের কারণে যে শাস্তি আসার কথা, তা বন্ধ করে দেন। যাতে সে কিয়ামত দিবসে শাস্তি পায়।^২

অপর এক হাদীসে বর্ণিত,

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ لِيَسْمَعَ تَضَرُّعَهُ.

-যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনো বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাকে দুঃখ-দুর্দশায় নিমজ্জিত করেন যাতে তার বিনয় ও আকুতি শুনতে পারেন।^৩

আল্লামা সমরকন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى كَانَ بَلَاؤُهُ أَشَدَّ كَيْ يَبَيِّنَ فَضْلَهُ
وَيَسْتَوْجِبَ الثَّوَابَ.

১. ক) তিরমিযী : আস সুনান, বাবু মা আ'আ ফিস সবরি, ৪:১৮০ হাদীস নং ২৩৯৯।

খ) ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ৭:১৮৭ হাদীস নং ২৯২৪।

গ) বায়হাকী : ত'য়াবুল ইমান, ১২:২৬৪ হাদীস নং ৯৩৭৬।

ঘ) হাকিম : আল মুস্তাদরাক, ৪:৩১৪ হাদীস নং ৭৮৭৬।

২. ক) আহমদ : আল মুসনাদ, ৪:৮৭।

খ) তিরমিযী : আস সুনান, ৪:১৭৯ হাদীস নং ২৩৯৬।

গ) বায়হাকী : ত'য়াবুল ইমান, ১২:২৫৪ হাদীস নং ৯৩৫৯।

৩. বায়হাকী : ত'য়াবুল ইমান, ৭:১৪৫ হাদীস নং ৯৭৮৬।

-যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দরবারে যতো বেশী মর্যাদার অধিকারী হয় তার বিপদ-আপদও ততো কঠিন হয়। যাতে তার মর্যাদা ও ফযিলত প্রকাশ পায়, আর সে সাওয়াবের উপযুক্ততা লাভ করে।

যেমন হযরত লোকমান আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তার স্নেহের পুত্রকে বলেছেন,

يَا بُنَيَّ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يُخْتَبَرَانِ بِالنَّارِ وَالْمُؤْمِنُ يُخْتَبَرُ بِالْبَلَاءِ.

-হে বৎস! স্বর্ণ ও রৌপ্যকে আগুন দ্বারা যেভাবে পরীক্ষা করা হয়, তেমনি মু'মিনকে বিপদ-আপদ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

কথিত আছে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামকে শুধু এ জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে যে, একবার তিনি নামাযরত অবস্থায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম এর প্রতি স্নেহে আকৃষ্ট হন, অথচ তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম ঘুমিয়ে ছিলেন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, একবার তাঁরা পিতা-পুত্র উভয় একটি ভাজা বকরীর গোশত আহার করেন। আর মনে মনে গীষন খুশি হন। অথচ তাঁদের এক ইয়াতীম পড়শি ছিলো, সে গোশতের সুম্মাধ পেয়ে গোশত খাবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠে। কিন্তু সে গোশত না পেয়ে ক্ষোভে-দুঃখে কেঁদে ফেলে। ওই ইয়াতীম ও হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের মাঝে শুধু এক দেয়ালের ব্যবধান ছিলো। কিন্তু হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম এর ওই বিষয়ের কোনো খবরই ছিলো না। এ কারণে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামকে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। আর তাঁকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের শোকে-দুঃখে ব্যথিত হয়ে কাঁদতে হয়েছে, এমনকি বিষণ্ণতার কারণে তাঁর চোখ শুষ্ক বর্ণ ধারণ করে। পরে যখন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম ওই বিষয় জানতে পারেন। তখন থেকে তিনি সারা জীবনের জন্য অভ্যাসে পরিণত করেন যে, খাবার তৈরী হওয়ার পর এক ব্যক্তি তার ঘরের ছাদে আরোহণ করে ঘোষণা করতো, যার ইচ্ছা হয় সে যেন এসে ইয়াকুবের পরিবারবর্গের সাথে খাবার খায়।

আর হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে এমন সব দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করতে হয়েছে, যার বিবরণ পবিত্র কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন তাঁকে কারাগারে অবস্থান করতে হয়েছে।

আবু লাইস সমরকন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের বিপদে পতিত হওয়ার কারণ হলো, তিনি স্বীয় মহল্লাবাসীদের সাথে বাদশাহের নিকট গমন করেন। অন্যান্য লোকেরা বাদশাহের নিকট তাদের উপর অত্যাচার করার অভিযোগ করে। কিন্তু হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম তাঁর ক্ষেত-খামারের ভয়ে নমনীয় আচরণ করেন। তিনি অন্যান্য লোকদের মতো কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেননি। শুধু এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে পাকড়াও করে বিপদে পতিত করেন।

হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামকে যেসব কারণে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়েছে, আমি তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ তাঁর ধারণা ছিলো যে, তাঁর স্বস্তুরের পক্ষ ন্যায়ের উপর রয়েছে। অথবা অজ্ঞাতসারে তাঁর ঘরে কোন পাপ সংঘটিত হয়েছে।

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগের কারণে যে কষ্ট হয়েছে, তার কারণ এই ছিলো যে, তাঁকে পরীক্ষা করা হয়েছে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন,

مَا رَأَيْتُ الْوَجَعَ عَلَى أَحَدٍ أَشَدُّ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-আমি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে আর কাউকে বেশী রোগযন্ত্রণা ভোগ করতে দেখিনি।^১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অসুস্থ অবস্থায় হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করি যে, হযুর আপনার ভীষণ জ্বর। তখন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَجَلٌ إِنِّي أَوْعَكَ كَمَا يُوعَكَ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ
قَالَ أَجَلٌ ذَلِكَ كَذَلِكَ.

১. ক) আহমদ : আল মুসনাদ, হাদীস সৈয়দা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, ৬:১৭২ হাদীস নং ২৫৪৩৭।

খ) নাসায়ী : আস সুনানুল কুবরা, ৬:৩৮৫ হাদীস নং ৭০৫০।

গ) তিরমিযী : আস সুনান, ৪:১৭৯ হাদীস নং ২৩৯৭।

ঘ) ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ৭:১৮১ হাদীস নং ২৯১৮।

-হ্যাঁ, আমার তোমাদের দু'জনের সমান জ্বর হয়। আমি বললাম, তাহলে এর জন্য কী আপনাকে দ্বিগুণ সাওয়াব দেয়া হবে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হ্যাঁ, তাই হবে।^১

হযরত আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক দেহে হাত রেখে বললো, আল্লাহর শপথ, আমার পক্ষে তাঁর মুবারক দেহের হাত রাখা সম্ভব নয়। কারণ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ জ্বরাক্রান্ত হয়েছেন। তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّا مَعْشَرَ النَّبِيِّاءِ يُضَاعَفُ لَنَا الْبَلَاءُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ لَيَتَكَلَّى بِالْقَمَلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ لَيَتَكَلَّى بِالْفَقْرِ وَإِنْ كَانُوا لَيَفْرَحُونَ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُونَ بِالرَّخَاءِ.

-আম্মিয়ায়ে কেরামের মধ্যে আমার উপর দ্বিগুণ বিপদ এসেছে। কোনো কোনো নবীকে তো রোগযন্ত্রণায় এমনভাবে পতিত করা হয়েছে, এমনকি তাতে তাঁদের ওফাত পর্যন্ত হয়ে যায়। কোনো কোনো নবীকে দরিদ্রতার মোকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা দুর্দশায় এমন খুশি হয়েছেন, যেভাবে অন্যরা আরাম-আয়েশে খুশি হয়ে থাকেন।^২

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ أَحَبُّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

-নিশ্চয় উত্তম পুরস্কারসমূহ কঠিন বিপদসমূহের সাথে রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাঁদেরকে

১. ক) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ২:৪৪০ হাদীস নং ১০৮০০।

খ) আহমদ : আল মুসনাদ, মুসনাদু আদিল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু ১:৩৮১ হাদীস নং ৩৬১৮।

গ) বুখারী : আস সহীহ, ৭:১১৫ হাদীস নং ৫৬৪৮।

ঘ) মুসলিম : আস সহীহ, ৪:১৯৯১ হাদীস নং ২৫৭১।

ঙ) দারেমী : আস সুনান, ৯:১৮ হাদীস নং ২৮২৭।

চ) বায়হাকী : শু'আবুল ইমান, ৭:১৪১ হাদীস নং ২৯৩৫।

২. ইবনে বাশরান : আল আমালী, ১:৩২৩ হাদীস নং ৭৪৪।

বিপদে নিমজ্জিত করেন। অতঃপর যে এ অবস্থায় সম্ভট হয়, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সম্ভট হন, আর যে এ অবস্থার উপর অসম্ভট হয়, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি অসম্ভট হন।^১

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا مُجْزٍ بِهِ

-যে ব্যক্তি মন্দকাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে।^২

এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বলেন, মুসলমানদের দুনিয়াতে বিপদে পতিত করে তাদের গুনাহের শাস্তি দেয়া হয়। আর ওই শাস্তি তাদের গুনাহের কাফফারা হয়। হযরত আয়েশা, হযরত উবাই ও হযরত মুজাহিদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে এ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِيبْ مِنْهُ

-আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে বিপদে পতিত করেন।^৩

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় এসেছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشُّرُكَةِ يُشَاكُّهَا

১. ক) ইবনে মাজাহ : আস সুনান, বাবু সবরি আলাল বালায়ি, ২:১৩৩৮ হাদীস নং ৪০৩১।

খ) তিরমিযী : আস সুনান, বাবু মা জা'আ ফিস সবরি, ৪:১৭৯ হাদীস নং ২৩৯৬।

গ) বায়হাকী : শু'আবুল ইমান, ১২:২৩৪ হাদীস নং ৯৩২৫।

ঘ) বাগাবী : শরহু সুন্নাহ, ৫:২৪৫ হাদীস নং ১৪৩৫।

ঙ) আহমদ : আল মুসনাদ, হাদীসু মাহমুদ ইবনে লবীদ, ৩৯:৩৫ হাদীস নং ২৩৬২৩।

২. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১২৩।

৩. ক) আহমদ : আল মুসনাদ, ২:২৩৭ হাদীস নং ৭২৩৪।

খ) বুখারী : আস সহীহ, বাবু মা জা'আ ফিল কাফফারাতিল মরদি, ৭:১১৫ হাদীস নং ৫৬৪৫।

গ) নাসায়ী : আস সুনানুল কুবরা, বাবু তিকি, ৭:৪৫ হাদীস নং ৭৪৩৬।

ঘ) ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ৭:১৬৮ হাদীস নং ২৯০৭।

ঙ) বায়হার : আল মুসনাদ, মুসনাদু আবী হুরায়রা, ২:৪১৮।

-মুসলমানদের উপর যে কোনো দুর্দশা আসুক না কেনো আল্লাহ তা'আলা এটাকে তার গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দেন, চাই সে একটি ক্ষুদ্র কাটাবিদ্ধই হোক না কেনো।^১

হযরত আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় এসেছে,

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصْفٍ وَلَا وَصْبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أذى وَلَا غَمٌّ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُّهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

-মুমিনের যে-কোনো প্রকার কষ্টই হোক না কেনো চাই সেটা চিন্তা-ভাবনা দুঃখ-কষ্টই হোক, এমনকি একটি কাটা বিধ্বং না কেনো, আল্লাহ তা'আলা সেটা দ্বারা তার গুনাহ মোচন করে দেন।^২

হযরত ইবনে মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় এসেছে,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذى إِلَّا حَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا يُحْتُ وَرَقُ الشَّجَرِ.

-কোনো মুসলমান যে-কোনো প্রকার দুঃখ-কষ্টই ভোগ করুক না কেনো, আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তার গুনাহকে এমনভাবে ঝেড়ে ফেলেন যেমন গাছ পাতা ঝেড়ে ফেলে দেয়।^৩

আরো এক হিকমত যা আল্লাহ তা'আলার মুমিনের রোগ-ব্যাধির ধারাবাহিকভাবে একের পর এক দুঃখ কষ্টে পতিত রাখেন, তা হলো, এর কারণে তাঁর প্রবৃত্তির শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। যাতে মৃত্যুর সময় তার রূহ বের হওয়া সহজ হয়ে যায়। আর মৃত্যুযন্ত্রনায় ব্যাধিত ও দুর্বল না হয়। আকস্মিক মৃত্যুর বিপরীত হয়। যেমন মৃত্যুর সময় দেখা যায় যে, কারো প্রাণ অতি সহজে বের হয়ে যায়, আর কারো প্রাণ অতি কষ্টে বের হয়। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

১. ক) আহমদ : আল মুসনাদ, ৬:৮৮ হাদীস নং ২৪৬১৭।

খ) বুখারী : আস সহীহ, বাবু মা জা'আ ফিল কাফফারাতিল মরদি, ৭:১১৪ হাদীস নং ৫৬৪০।

গ) বায়হাকী : আস সুনানুল কুবরা, ৩:৫২২ হাদীস নং ৬৫৩৮।

২. ক) বুখারী : আস সহীহ, বাবু মা জা'আ ফিল কাফফারাতিল মরদি, ৭:১১৪ হাদীস নং ৫৬৪১।

খ) বাগাবী : শরহু সুন্নাহ, ৫:২৩৩ হাদীস নং ১৪২১।

৩. ক) আহমদ : আল মুসনাদ, মুসনাদু আব্দিল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর, ১:৪৪১ হাদীস নং ৪২০৫।

খ) বুখারী : আস সহীহ, বাবু শিদ্দাতিল মরদি, ৭:১১৫ হাদীস নং ৫৬৪৭।

গ) মুসলিম : আস সহীহ, ৪:১৯৯১ হাদীস নং ২৫৭১।

ঘ) তবরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ১৯:৩৫৯।

ঙ) বায়হাকী : শু'য়াবুল ইমান, ৭:১৪১ হাদীস নং ৯৭৭২।

চ) নাসায়ী : আস সুনান, ৪:৩৫২ হাদীস নং ৭৪৮৩।

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ حَامَةِ الزَّرْعِ تُفْسِئُهَا الرِّيحُ هَكَذَا وَهَكَذَا.

-মুমিনের উদাহরণ হলো ক্ষেতের ফসলের কচি চারাগাছের মতো যা বাতাসে এদিক-সেদিক দোল খায়।^১

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় এসেছে,

مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تَكْفُوْهَا فَإِذَا سَكَنْتِ اغْتَدَلَتْ، وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكْفَأُ بِالْبَلَاءِ، وَمِثْلُ الْكَافِرِ كَمِثْلِ الْأَرْزَةِ صَمَاءٍ مُعْتَدِلَةٍ حَتَّى يَقْصِمَهُ اللَّهُ.

-যে দিক থেকে বাতাস আসে সেই দিকে হেলে যায়। আর যখন বাতাস বন্ধ হয়ে যায়, তখন সোজা দাঁড়িয়ে যায়। মুমিনের উদাহরণও ঠিক তাই যে, বিপদ-আপদের সাথে উলট-পালট হয়ে যায়। আর কাফিরের উদাহরণ হলো দেবদারু গাছের মতো যা সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তাকে সমূলে উৎপাটিত করেন।

এর মমার্থ হলো, মুমিন চতুর্দিক থেকে বিপদ-আপদে বেষ্টিত থাকে, রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, আর তাঁরা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত তাকদীরের উপর সমস্ত থাকে। তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণের নির্দেশন হয়। মুমিনের অন্তর আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সন্তোষিত হওয়ার কারণে নমনীয় হয়। তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশে অসমস্ত হয় না। বরং ঠিক ক্ষেতের কচি চারাগাছ যেভাবে বাতাসের অনুসারী হয় যে, বাতাস চারাগাছকে যে দিকে নিয়ে যায়, সেই দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর যখন আল্লাহ তা'আলা মুমিনের উপর থেকে নাযিলকৃত বিপদ-আপদ সরিয়ে নেন তখন সে এক সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ঠিক যেভাবে ক্ষেতের চারাগাছ বাতাস বন্ধ হওয়ার পর সোজা দাঁড়িয়ে যায়। আর যখন মুমিনের বিপদ দূর হয়ে যায় তখন সে আনন্দে উৎফুল্ল হয় না। বরং সে আপন প্রভুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর পরকালের নিয়ামতের প্রতি মনোযোগী হয়। আর তাঁর রহমত ও প্রতিদানের অপেক্ষায় থাকে। আর যখন লক্ষ্যবস্তু এটা তখন তার জন্য মৃত্যুর সময় মৃত্যুর যন্ত্রণা কঠিন মনে হয় না। কারণ সে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করায় অভ্যস্ত হয়েছে। আর সে ভালো করে জানে যে, এতে পুরস্কার রয়েছে। রোগব্যাধি ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে করতে তার নফস দুর্দশা ও দুর্বলতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাফিরের অবস্থা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সে দৈহিক সুস্থতায় উপকৃত হয়। আর দেবদারু গাছের মতো সরুভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এমনকি যে পর্যন্ত আল্লাহ

১. বুখারী : আস সহীহ, বাবু ফিল মাশিয়াতি ওয়ালা ইরাদাতি, ২৪:৩২৪ হাদীস নং ৭৪৬৬।

(৪৫০) আন-শিকা [২য় খণ্ড]
তা'আলা তাকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন। তাকে ধাক্কা দিয়ে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত করে। হঠাৎ তাকে নির্মম ও নির্দয় ভাবে বন্দী করে নেয়। তার মৃত্যু দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক ভীষণ কঠিন মনে হয়। কারণ তার দেহ ও নফস সবল হয়। এই কারণে তার দুঃখ-কষ্টও অনেক বেশী হয়।

তাহাড়া তার জন্য আখিরাতে আরো কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَأَخَذَتْهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.

-অতঃপর আমি তাদেরকে আকস্মিকভাবে তাদের অজ্ঞাতসারে পাকড়াও করেছি।^১

আল্লাহ তা'আলা তাঁর শত্রুদের সাথে এ ধরনের আচরণ করেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ^২ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّبْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا.

-অতঃপর তাদের প্রত্যেককে আমি তাদের পাপের জন্য পাকড়াও করেছি; সুতরাং তাদের মধ্যে কারো উপর পাথর বর্ষণ করেছি এবং তাদের কাউকে ভয়ানক শব্দ ধ্বনি পেয়ে বসেছে। আর তাদের মধ্যে কাউকে ভূ-গর্ভে ধসিয়ে ফেলেছি এবং তাদের মধ্যে কাউকে ডুবিয়ে মেরেছি।^২

আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে আকস্মিক মৃত্যু দিয়ে অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের অসতর্ক অবস্থায় ধ্বংস করে দেন। আর সকাল বেলায় বিনা প্রস্তুতিতে অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করেন।

এ কারণে সলফে-সালেহীন আলেমদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তারা আকস্মিক মৃত্যুকে অপছন্দ করতেন। আর পূর্ববর্তী বুজুর্গদের মধ্যে ইবরাহীম নখরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, সকল আলেমগণ এরূপ পাকড়াও হওয়া

আন-শিকা [২য় খণ্ড] (৪৫১)
পছন্দ করতেন না। কারণ এটা আজাবের সদৃশ; অর্থাৎ তাঁরা আকস্মিক মৃত্যুকে আজাব মনে করতেন।

তৃতীয় হিকমত হলো, রোগব্যাধি মৃত্যুর সংবাদ প্রদানকারী। সুতরাং রোগব্যাধি যতো কঠিন হবে মৃত্যুর ভয় ততো বেশী হবে। যেহেতু রোগব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়। আর সে মনে করে যে আমার প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এ কারণে সে দুনিয়া বিমুখ হয়ে যায়। তার অন্তর আখিরাতে প্রতি ধাবিত হয় যে, তাকে জবাবদিহী করা হবে। সে বিষয়ে ভীত হয়ে যায়। সে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করে দেয়। পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে যা ওসীয়াত করার ওসীয়াত করে নেয়, কার সাথে কি প্রতিশ্রুতি করতে হবে সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে।

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন, তাঁর পূর্বাপর সবকিছু মার্জনা করে দেয়া হয়েছে। ইহজগত ত্যাগের প্রাক্কালে তাঁর উপর দৈহিক ও আর্থিক যার যা পাওনা ছিলো, তিনি তা পুরো করে দেয়ার ইচ্ছা করেন। আর মাল ও দেহের ব্যাপারে যে তাঁর নিকট থেকে কিসাস গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছে, তিনি তাকে কিসাস গ্রহণ করার অনুমতি দেন। যেমনটি ফযিলত ও ওফাত অধ্যায়ের হাদীসে এসম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এরপর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাকালাইন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও স্বীয় পবিত্র পরিবারবর্গ সম্পর্কে ওসীয়াত করেন। আনসারদের সাথে উত্তম আচরণ করার ওসীয়াত করেন। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাগজ-কলম চেয়েছেন ওইসব কথা লিপিবদ্ধ করে দিতে, যাতে তাঁর পর উম্মাত ভ্রষ্টতায় লিপ্ত না হয়। চাই তা খিলাফত সম্পর্কে হোক বা অন্য কোন বিষয়ে হোক (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত)। অথবা এরপর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা লিপিবদ্ধ না করার ইচ্ছা পোষণ করেন। মোটকথা আল্লাহ তা'আলার মু'মিনবান্দা ও মুস্তাকী বন্ধুদের অভ্যাস তো এ রূপই হয়। আর এ সব বিষয় থেকে কাফিররা বঞ্চিত হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবকাশ দেন। যাতে তারা বেশী করে গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে পারে। আর আল্লাহ তা'আলা এভাবে কাফিরদের এমন স্থানে পৌছে দেয় তারা যা অনুমানই করতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿١١﴾

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٢﴾

^১. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:৯৫।

^২. আল কুরআন : সূরা আনকাবুত, ২৯:৪০।

-অপেক্ষা করছে না, কিন্তু একটা বিকট শব্দের, যা তাদেরকে গ্রাস করবে। যখন তারা দুনিয়ার বাগড়ার মধ্যে আটকা পড়ে থাকবে তখন তারা না ওসিয়ত করতে পারবে এবং না আপন ঘরে ফিরে যেতে পারবে।^১

এ কারণে এ ধরনের আকস্মিক মৃত্যুবরণকারী সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

سُبْحَانَ اللَّهِ كَأَنَّهُ عَلَى غَضَبٍ الْمَحْرُومُ مِنْ حُرْمٍ وَصِيَّتُهُ.

-আকস্মিক মৃত্যু যেন আল্লাহর শাস্তি স্বরূপ প্রকৃতার্থে বঞ্চিত হলো যে ওসিয়ত করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

مَوْتُ الْفُجَاءَةِ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ وَأَخْذَةٌ أَسْفٍ لِلْكَافِرِ أَوْ الْفَاجِرِ.

-মুমিনের জন্য আকস্মিক মৃত্যু প্রশান্তিময়^২ আর কাফিরের জন্য আকস্মিক মৃত্যু আক্ষেপ ও হতাশার কারণ হয়।^৩

এরূপ হওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, মুমিনের মৃত্যু যেভাবেই হোক না কেনো সে মনে মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে, আর সর্বদা মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে। এ কারণে তার মৃত্যু সহজ হয়। মৃত্যুর পর মুমিন দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পায়। যেমন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاخٌ مِنْهُ

-মুমিন মৃত্যুর পর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, আর প্রশান্তি দিয়ে যায়।^৪

^১ আল কুরআন : সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৪৬-৫০।

^২ কারণ এই ধরনের মৃত্যুতে কষ্ট কম হয়, কারো সেবা-যত্নের প্রয়োজন হয় না। নীরবে- নিভৃতে আখিরাতের সফরে যাত্রা করা যায়।

^৩ ক) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৩:৩৬৯।

খ) আহমদ : আল মুসনাদ, ২৪:২৫৪ হাদীস নং ১৫৪৯৭।

ক) আব্দুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, ৩:৪৪৩ হাদীস নং ৬২৫৪।

খ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৭:১০৭ হাদীস নং ৩৪৫৫৯।

গ) আহমদ : আল মুসনাদ, ৫:২৯৬ হাদীস নং ২২৫৮৯।

ঘ) বুখারী : আস সহীহ, বাবু সাকরাতিল মউত, ৮:১০৭ হাদীস নং ৬৫১২।

ঙ) মুসলিম : আস সহীহ, ২:৬৫৬ হাদীস নং ৯৫০।

চ) নাসায়ী : আস সুনান, ৪:৩৫০ হাদীস নং ১৯২৯।

ছ) ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ৭:২৭৭ হাদীস নং ৩০০৭।

কাফির এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, কাফির কখনো মনে মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে না। আর না অধিকাংশ সময় সে কঠিন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এর ফলে তার মৃত্যু নিকটবর্তী বলে সে অনুভব করতে পারেনা। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ

يُنْظَرُونَ ﴿١٠﴾

-বরং তা তাদের উপর হঠাৎ করে এসে পড়বে, তখন তা তাদের কে হতভম্ব করে ছাড়বে। অতঃপর না তারা সেটা রোধ করতে পারবে এবং না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে।^১

সুতরাং তাদের মৃত্যু ভীষণ কঠিন হয়। দুনিয়া ত্যাগ করা তাদের নিকট ভয়ানক বিপদজনক হয়। আর তারা হতাশায় একাকার হয়ে যায়। এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ لِقَاءَهُ، وَمُنْكَرُهُ لِقَاءَ اللَّهِ كَرَهُهُ لِقَاءَهُ.

-যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হওয়া পছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে মিলিত হতে চান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হতে অপছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে মিলিত হতে অপছন্দ করেন।^২

^১ আল কুরআন : সূরা আযিয়া, ২১:৪০।

^২ ক) আব্দুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, বাবু ফিতনাতিল কবর, ৩:৫৮৬ হাদীস নং ৬৭৪৮।

খ) আহমদ : আল মুসনাদ, মুসনাদু আবী হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু, ২:৩১৩ হাদীস নং ৮১১৮।

গ) দারেমী : আস সুনান, বাবু ফি হক্কি লিকায়িল্লাহি, ৩:১৮১৩ হাদীস নং ২৭৯৮।

ঘ) বুখারী : আস সহীহ, বাবু মান আহাব্বা লিকায়িল্লাহি, ৮:১০৬ হাদীস নং ৬৫০৭।

ঙ) মুসলিম : আস সহীহ, ৪:২০৬৫ হাদীস নং ২৬৮৩।

চ) ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ২:১৪২৫ হাদীস নং ৪২৬৪।

ছ) তিরমিযী : আস সুনান, ২:৩৭০ হাদীস নং ১০৬৬।

জ) নাসায়ী : আস সুনান, ২:৩৮৪ হাদীস নং ১৯৭৩।

ঝ) ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ৭:২৭৮ হাদীস নং ৩০০৮।

ঞ) তবরানী : আল মু'জামুল আওসাত, ১:১৯৬ হাদীস নং ৬২৪।

চতুর্থ পর্ব

فِي تَصَرُّفٍ وَجُوهِ الْأَحْكَامِ عَلَى مَنْ تَنَقَّصَهُ أَوْ سَبَّهُ ﷺ

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
মর্যাদা হননকারী ও তাঁকে গালিদানকারীর
বিধান

الْمَقْدَمَةُ

ভূমিকা

(কাযী আবুল ফযল আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আল্লাহ তা'আলা সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন। তিনি ইতোপূর্বে কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাতের ঐকমত্যের আলোকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে অধিকারগুলো উম্মাতের উপর ওয়াজিব তা উল্লেখ করেছেন। এখন তিনি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও মর্যাদার বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।)

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে অনুযায়ী তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে হারাম ঘোষণা করেছেন। সমস্ত মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাহানি করবে বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١﴾

-নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে, তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।^১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢﴾

-আর যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।^২

^১ আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৫৭।

^২ আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৬১।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا
أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

-আর তোমাদের জন্য শোভা পায় না যে, আল্লাহ রাসূলকে কষ্ট দেবে এবং না এও যে, তারপর কখনো তাঁর স্ত্রীগণকে বিবাহ করবে, নিশ্চয় এটা আল্লাহর নিকট বড় জঘন্য কথা।^১

আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আকার-ইঙ্গিতে বিদ্রূপ ও ভৎসনা করা হারাম ঘোষণা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نَسْمَعُ
وَلَلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

-হে ঈমানদারগণ 'রা-ইনা' বলো না এবং এভাবে আরম্ভ করো, 'হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন!' এবং প্রথম থেকেই মনোযোগ সহকারে শুনো। আর কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত।^২

কারণ ইহুদীরা বিদ্রূপ করে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতো, رَاعِنَا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আমাদের প্রতি কর্ণপাত করুন।

তারা এ শব্দ দ্বারা الرُّعُوءَةُ বা নিবোধি অর্থের ইঙ্গিত করতো, যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে মর্যাদাহানির অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদ্রূপ করার পথ রুদ্ধ করে দেন। এ ছাড়াও মু'মিনদের নিষেধ করেন এ কারণে যাতে মুনাফিক ও কাফিররা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কটাক্ষ করতে না পারে, আর তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে না পারে।

১. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৫৩।

২. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১০৪।

কোনো কোনো আলেমগণ বলেন, (رَاعِنَا) শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করার কারণ হলো, এটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে এক অর্থ হলো, আমাদের কথা কান দিয়ে শুনুন। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, আমাদের নিকট থেকে ওইসব শুনুন যা উপযুক্ত নয়। ইহুদীরা এ অর্থে ব্যবহার করতো। এ কারণে মুসলমানদের এ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এ শব্দ বেআদবীমূলক। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানের পরিপন্থি। এ কারণে এ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ আনসারদের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় এ শব্দ এ অর্থে ব্যবহার করা হতো رُعْنًا - যদি আপনি আমাদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহলে আমরা আপনার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখবো।

তাহলে এর অর্থ তো এটা হবে যে, 'আমরা আপনার অধিকারের প্রতি মনোযোগী হবো। আপনিও আমাদের অধিকারের প্রতি মনোযোগী হোন।' এটা এক ধরনের বেআদবী ও ধৃষ্টতা। কারণ সর্বাবস্থায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ওয়াজিব। সুতরাং মুসলমানদের এ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এ কারণে মুসলমানদের হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপনামে নিজেদের উপনাম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُوْا بِكُنْيَتِي.

-তোমরা আমার নামে নাম রাখো; কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না।^৩

এই আদেশের মাধ্যমে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সন্তাকে সুরক্ষিত করেছেন এবং কষ্ট থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ এক ব্যক্তি

১. ক) বুখারী : আস সহীহ, ১:৫২ হাদীস নং ১১০।

খ) মুসলিম : আস সহীহ, ৩:১৬৮২ হাদীস নং ২১৩১।

গ) ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ২:১২৩০ হাদীস নং ৩৭৩৫।

ঘ) আহমদ : আল মুসনাদ, ১২:৩৩৩ হাদীস নং ৭৩৭৭।

ঙ) বাযুয়ার : আল মুসনাদ, ১৩:১৪৬ হাদীস নং ৬৫৪৭।

চ) ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ১৩:১৩১।

ছ) তবরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ২:৬২ হাদীস নং ১২৫৪।

আবুল কাসেম বা কাসেমের পিতা বলে ডাকাডাকি করলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করেন যে, তাঁকে আহ্বান করা হচ্ছে। তাই তিনি জবাব দেন। তখন সে লোক বললো, আমি আপনাকে আহ্বান করিনি, বরং আমি অমুক লোককে আহ্বান করেছি। এরপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপনামে নাম রাখতে নিষেধ করেন। যাতে তিনি অযথা কারো ডাকের জবাব দেয়ার কষ্ট থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। যারা তাঁকে ডাকেনি তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে নীরব থাকতে পারেন। মুনাফিকও হাসি তামাশাকারীরা এটাকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া ও বিদ্রূপ করার মাধ্যম বানিয়েছিল। তারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবুল কাসেম বলে ডাকতো। আর কৃপার সিন্ধু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের ডাকে সাড়া দিতেন তখন তারা বলতো, আমরা তো আপনাকে ডাকিনি। আমরা ডেকেছি অমুক ব্যক্তিকে। তাদের এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিলো, যাতে তারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপহাস করে বেআদবী করতে পারে, যেভাবে কৌতুককারী উপহাস করে থাকে। এ অবস্থায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উপনামে নাম রাখতে নিষেধ করেন, নিজেকে সুরক্ষিত রাখতেন।

সত্যপন্থি আলেমগণ বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নিষেধাজ্ঞা তাঁর প্রকাশ্য জীবনে সীমিত সময়ের জন্য ছিলো, ওফাত লাভ করার পর এ নামে নাম রাখা অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছে। এ হাদীস সম্পর্কে আলেমগণ অনেক অভিমত প্রকাশ করেছেন। যা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আমি এখানে এ বিষয় তা উল্লেখ করেছি যা কেবল জমহূর আলেমগণের অভিমত। আর এটাই সঠিক। যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তাতে শুধু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষণ করতে হবে। এরূপ করার বৈধতা আছে। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন নাম রাখতে নিষেধ করেননি। আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নাম ধরে ডাকতে নিষেধ করেছেন। যথা ইরশাদ হয়েছে-

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا^১

-রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করোনা, যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।^১

কিন্তু বিশ্ব মুসলিম হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়া নবী আল্লাহ! বলে আহ্বান করে বা কখনো কখনো আবুল কাসেম উপনামে আহ্বান করে।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, যদি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে নাম রেখে সম্মানহানির ভয় থাকে তবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে নাম রাখা মাকরুহ। তিনি আরো বলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানের নাম রাখবে মুহাম্মদ, এরপর তাকে অভিষাপ দেবে?

বর্ণিত আছে, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কুফাবাসীদের এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, তোমরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কারো নাম রাখবে না। আল্লামা আবু জা'ফর তাবারী এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

আর মুহাম্মদ বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দেখতে পান, মুহাম্মদ নামে এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তি গালি দিচ্ছে। আর তাকে বলছে, হে মুহাম্মদ! খোদা তোমাকে এরূপ করুক। তখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় ভ্রাতৃপুত্রকে সম্বোধন করে বললেন, আমি এটা ভালো মনে করিনা যে, তোমাদের কারণে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়া হবে। আল্লাহর শপথ! আমি যতো দিন জীবিত থাকবো, ততোদিন তোমাকে আর মুহাম্মদ নামে ডাকবো না। পরে তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। অতঃপর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওই বিষয়ে সাধারণ নিষেধাজ্ঞা জারী করেন, যেন কেবল মর্যাদা ও সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে কেউ আশিয়ায়ে কেরামের নামে নাম না রাখে। অথচ পরবর্তী সময় তিনি তাঁর এ সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন। তবে এ বিষয়ে বিশুদ্ধ অভিমত হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর নাম ও উপনামে নাম রাখা উভয় জাযিয়। কারণ সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয় ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন।

জুনৈক সাহাবী তাঁর পুত্রের নাম মুহাম্মদ ও উপনাম আবুল কাসেম রাখেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এই বিষয় অনুমতি দান করেছেন।

আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দেন যে, ইমাম মাহদী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নাম ও উপনাম এটাই হবে। অর্থাৎ নাম হবে মুহাম্মদ আর উপনাম হবে আবুল কাসেম। স্বয়ং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বহু শিগুর এ নাম রেখেছেন। যেমন মুহাম্মদ বিন তালহা, মুহাম্মদ বিন আমর বিন

হাযম, মুহাম্মদ বিন সাবিত বিন কায়িস প্রমুখ। এ ছাড়াও আরো অনেকেরও এ নাম রাখা হয়। তারা বলেছেন আমাদের ঘরে মুহাম্মদ নামে দু'তিনজন থাকায় ক্ষতির কোনো কারণ নেই। এ বিষয় আমি দু'অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।


البَابُ الْأَوَّلُ

প্রথম অধ্যায়

فِي بَيَانِ مَا هُوَ فِي حَقِّهِ سَبٌّ وَنَقْصٌ مِنْ تَغْرِيضٍ أَوْ نَصْرٍ

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
মর্যাদাহানিকর গালি ও ত্রুটি সংযোজনের স্বরূপ

الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فَيَمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَنَقَّضَهُ

হযর  কে গাল-মন্দ কারী ও মর্যাদা হননকারীর বিধান প্রসঙ্গে

স্মরণ রাখুন! আল্লাহ তা'আলা আপনাদের ও আমাকে সৌভাগ্য মঞ্জিত করুন। যে ব্যক্তি হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে (নাউযুবিল্লাহ) বা হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো অভিযোগে অভিযুক্ত করবে, বা কোনো দোষত্রুটি হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাত বা সত্তার সাথে সম্পর্কিত করবে, বা তাঁর বংশ, দীন বা তাঁর কোনো স্বভাব ও অভ্যাসের সাথে সংযোজিত করবে, বা তাঁকে কোনো বস্তুর সাথে উপমা দেবে, বা হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসম্পূর্ণ, মূল্যহীন বলবে, বা তাঁর শান-মান কম মনে করবে বা হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কোনো বাণীর প্রতি দোষারোপ করবে। তাহলে সে হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি প্রদানকারী হিসেবে গণ্য হবে। তার ব্যাপারে এ আদেশ কার্যকর হবে, যা সরাসরি হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাল-মন্দকারীর জন্য প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। আমি এ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা পরিত্যাগ করবো না, আর আলোচনা সংক্ষিপ্তও করবো না।

অনুরূপভাবে (নাউযুবিল্লাহ) যে ব্যক্তি হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অভিসম্পাত করে বা হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বদ-দোয়া করে বা তাঁর ক্ষতি কামনা করে বা হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এরূপ বস্তু সম্পর্কিত করে, যা তাঁর শানের উপযুক্ত নয়; আর এতে তার উদ্দেশ্য হলো হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মন্দ বলা বা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা, বা হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অনর্থক কথা বলা, বা হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মন্দ বলা, বা তিনি মন্দ কথা বলেছেন বলা, বা হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট পরীক্ষা এসেছে, সে বিষয়ে তাঁকে লজ্জা দেয়া বা মানবীয় স্বভাবসুলভ কারণে আকস্মিকভাবে যেসব বিপদ যেমন রোগব্যাদি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ওফাত হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে- ওইসব বিষয়ে হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানহানি করা, এ সব কাজ নাজাযিয় ও হারাম। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে অদ্যাবধি যত আলেম ও মুজতাহিদ অতিক্রান্ত হয়েছেন, সবাই ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন।

আবু বকর বিন মুনজির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

أَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتَلُ.

-সকল আলেম এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন, যে ব্যক্তি হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

মালিক বিন আনাস, লাইস, আহমদ, ইসহাক ও ইমাম শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ এ মতের সমর্থক।

কাযী আবুল ফযল আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাহিমাতুল্লাহু তা'আলা আনহুর অভিমত হলো, তার তাওবাও কবুল হবে না। উপর্যুক্ত আলেমগণও এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন।

ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর সহচরবৃন্দ, সুফিয়ান সাওরী, কুফার ফকীহগণ ও আউযায়ী তাঁর 'মুসলিম' গ্রন্থে বলেছেন, যে ব্যক্তি হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবে, বা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাবে বা তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করবে, সে ধর্মত্যাগীদের বিধানভুক্ত হবে। ওয়ালিদ বিন মুসলিম ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে এ অভিমত বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর সহচরবৃন্দ থেকে ইমাম তাবরানী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাল-মন্দকারীর ব্যাপারে সাহনূনের অভিমত হলো, ذَلِكُ دَلِيلٌ عَلَى كُفْرِهِ -এ ধর্মত্যাগী যিন্দীক বা নাস্তিকের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ আলোকে এবিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, এরূপ ব্যক্তিকে কি তাওবার সুযোগ দেয়া হবে? না সে কাফির সাব্যস্ত হবে? তাকে কী হত্যা করতে হবে, না শরীয়াতের নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে, না শুধু তাকে কাফির বলা যথেষ্ট হবে? আমি ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করবো।

তবে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। সর্বকালের সকল আলেম এ ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন। তাছাড়া অধিক সংখ্যক আলেমগণ এ ধরণের লোকদের কাফির ও তাদের হত্যা করার বিষয় ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন। কোনো কোনো আহলে জাওয়াহির আলেম বলেন, আর ওই আবু

মুহাম্মদ আলী বিন আহম্মদ আল ফারসী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীর কুফরীর বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করেছে। তবে এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ অভিমত হলো যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি।

মুহাম্মদ বিন সাহনুন বলেন,

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ شَاتِمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَقَصِّرُ لَهُ كَافِرٌ،
وَالْوَعِيدُ جَارٌ عَلَيْهِ بِعَذَابِ اللَّهِ لَهُ، وَحُكْمُهُ عِنْدَ الْأُمَّةِ الْقَتْلُ وَمَنْ شَكَّ فِي
كُفْرِهِ وَعَذَابِهِ كَفَرَ.

-আলেমগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কটুক্তিকারী, মর্যাদাহীনকারী কাফির সাব্যস্ত হবে। আর সে আল্লাহ তা'আলার কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হবে। তার ব্যাপারে ইমামদের হুকুম হলো, তাকে হত্যা করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এ ধরনের লোকের কাফির হওয়া ও শাস্তিযোগ্য হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করবে, সে নিজেও কাফির হবে।

ইবরাহীম বিন হুসাইন বিন খালিদ আল ফকীহ এ ব্যাপারে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওই কাজকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি মালিক বিন নুয়াইরাকে শুধু এ জন্য হত্যা করেন, সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমার সাথী বলেছে, (তোমার রাসূল বলেনি)।^১

আবু সূলায়মান খাত্তাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اخْتَلَفَ فِي وَجُوبِ قَتْلِهِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا.

-আমি এমন কোনো মুসলমান পাইনি, যিনি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিদানকারীর হত্যা আবশ্যিক হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন, যদি সে মুসলমান হয়ে থাকে।

^১. মালিক বিন নুয়াইরা বনী তামিম গোত্রের সরদার ছিলো। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সে যাকাত দিতে অস্বীকার করে। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার নিকট প্রেরণ করেন। তখন সে বলছিলো, আমি নামায পড়বো। তবে আমি যাকাত দেবো না, এটা ভুল নয়, তোমার সাথী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলেছেন। হযরত খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী সাথী? সে পুনরায় বললো, হ্যাঁ সাথী। তখন হযরত খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত যিরার বিন আজওয়াজ সে পুনরায় বললো, হ্যাঁ সাথী। তখন হযরত খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত যিরার বিন আজওয়াজ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। কলে তিনি তাকে হত্যা করে ফেলেন। এটা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলে পাকের শানে ভাই, বন্ধু, সাথী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা অবৈধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ।

ইবনে কাসিম ইবনে সাহনূনের রচিত গ্রন্থে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেছেন, এছাড়াও 'মাবসূত ও উতবীয়া' গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে,
مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَبَّ.

-যে মুসলমান হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তার তাওবা গৃহীত হবে না।

ইবনে কাসিম 'উতবীয়া' গ্রন্থে লিখেন,

مَنْ سَبَّ أَوْ شَتَمَهُ، أَوْ عَابَهُ أَوْ تَقَصَّصَهُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، وَحُكْمُهُ عِنْدَ الْأُمَّةِ الْقَتْلُ
كَالزُّنْدِيقِ وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى تَوَقِيرَهُ وَبَرَّهُ.

-যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কলঙ্ক আরোপ করবে, বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমূলক দোষত্রুটি বর্ণনা করবে, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আর উম্মতের ইজমা হলো, তাকে হত্যার বিধান নাস্তিককে হত্যার অনুরূপ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনকে ফরয করেছেন।

ওসমান বিন কিনানা থেকে 'মাবসূত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে,

مَنْ شَتَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قُتِلَ أَوْ صُلِبَ حَيًّا وَلَمْ
يُسْتَبَّ، وَالْإِمَامُ مُحَيَّرٌ فِي صَلْبِهِ حَيًّا أَوْ قَتْلِهِ.

-যে ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে, অথবা তাকে জীবন্ত শূলীতে ছড়াতে হবে, তার তাওবা কবুল হবে না। এটা বিচারকের ইচ্ছাধীন যে, তিনি চাইলে জীবিত শূলীতে ছড়াবেন কিংবা হত্যা করে ফেলবেন।

আবু মাস'আব ও ইবনে আবু ওয়ায়িসের বর্ণনায় এসেছে, তারা বলেন, আমরা ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে বা মন্দ বলবে, বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো দোষত্রুটি সম্পৃক্ত করবে বা তাঁর মর্যাদাহানি করবে, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। চাই সে ব্যক্তি মুসলমান হোক বা কাফির হোক, তার তাওবা গৃহীত হবে না।

মুহাম্মদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা কোন একজন সম্মানিত নবীকে গালি দেবে, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তার তাওবা গৃহীত হবে না। চাই সে মুসলমান হোক বা কাফির।

আসবাগ বলেন, যে-কোনো অবস্থায় হোক না কেন তাকে হত্যা করে ফেলতেই হবে। চাই সে গোপনে বা প্রকাশ্যে গালি দেয়। আর তার তাওবা কবুল করা যাবে না, কারণ তার তাওবার অবস্থা অজ্ঞাত।

আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকাম থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তার তাওবা কবুল করা হবে না। চাই সে মুসলমান হোক বা কাফির।

আল্লামা ত্বাবারী আশবাহ এর সূত্রে ইমাম মালেক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনে ওহাব ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন,

مَنْ قَالَ إِنَّ رِذَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُرْوَى زِرَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَخَّ أَرَادُ بِهِ عَيْبَهُ قُتِلَ .

-যে ব্যক্তি এরূপ বলে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদর বা জামা ময়লা আর দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে। আর এতে তার উদ্দেশ্য হলো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করা- তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

আমাদের কোনো কোনো আলেমের এ অভিমতের উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে ব্যক্তি হযরাত আশিয়া কেরামের মধ্যে যে-কোনো নবীর জন্য শান্তি বা অপছন্দনীয় বিষয় কামনা করবে, তাকে তাওবা ছাড়াই হত্যা করে ফেলতে হবে।

আবুল হাসান কবিসী ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ কথা বলবে যে, **الْحَمْلُ يَتِيمُ أَبِي طَالِبٍ بِالْقَتْلِ** -‘তিনি আবু তালিবের বোঝা বহনকারী’ ইয়াতীম ছিলেন, তাকে হত্যা করে

১. হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক অভ্যাস ছিলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজার থেকে পণ্যক্রয় করে নিজেই বহন করে নিয়ে আসতেন। বিনয় ও নমনীয়তার দরশন তিনি তা কখনো কোনো বহনকারীর দ্বারা বহন করাতেন না।

ফেলতে হবে।’ কারণ সে এ কথা বলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করার ইচ্ছা করেছে।

আবু মুহাম্মদ বিন আবী যায়িদ কায়রাওয়ানী ওই ব্যক্তিকে হত্যা করার ফাতওয়া দিয়েছেন। তিনি কিছু লোককে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবয়ব ও গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেন। ঠিক ওই সময় কুৎসিত আকৃতির এক ব্যক্তি সে স্থান দিয়ে গমন করে, সে বললো, তোমরা তার আকৃতি দেখতে চাও? উপস্থিত লোকজন বললো, হ্যাঁ। তখন কুৎসিত আকৃতির অসংলগ্ন দাড়ি বিশিষ্ট এক ব্যক্তির প্রতি ইশারা করে বলে, সে এরূপই ছিলো (নাউযবিলাহ)। আবু মুহাম্মদ বিন যায়িদ বলেন, এ নিকৃষ্ট ব্যক্তির তাওবা কবুল করা যাবে না। তার উপর আল্লাহ তা‘আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। কারণ সে যা বলেছে, মিথ্যা বলেছে। কোনো প্রকৃত ঈমানদার লোকের পক্ষে এ ধরনের কথা বলা আদৌ সম্ভব নয়।

আহমদ বিন আবু সুলায়মান তাঁর সাহনুন গ্রন্থে বলেন, যে ব্যক্তি এই কথা বলে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক দেহ কৃষ্ণবর্ণের ছিলো তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তিনি ওই ব্যক্তি সম্পর্কেও হত্যা করার ফাতওয়া দেন, যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এটা উচিত হয়নি। সে প্রতি উত্তরে বললো, আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এমন এমন করেছেন। আর এ বলে বিভিন্ন মন্দ কথা বললো। তখন তিনি তাকে বললেন, ওহে আল্লাহর দুশমন! তুমি এ সব কী বলছো? তখন সে বললো, আমি তো ‘রাসূল’ দ্বারা বৃষ্টিককে বুঝিয়েছি। ইবনে আবু সুলায়মানকে যে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিল, তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমার সাথী ও সাক্ষী হয়েছি। সে তাকে হত্যা করে ফেলতে চায়। আর এ কাজে সাওয়াবের অধিকারী হতে চায়।

হাবীব বিন রাবী বলেন, সে বৃষ্টিক বলে উদ্ধতার ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। অথচ যে স্থানে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ থাকে না। যেহেতু সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি, তাই তার রক্তপাত বৈধ হবে।

আবু আবদুল্লাহ বিন আস্তাব জনৈক উশর আদায়কারীকে হত্যার ফাতওয়া দেন। সে উশর আদায় করার সময় এক ব্যক্তিকে বললো, প্রথমে “উশর” আদায় করে

১. সরকারের পক্ষ থেকে উশর আদায় কারীকে ‘আশশার’ বলা হয়।

দাও। তারপর অভিযোগ করতে হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করো। আমি যে উশর দাবী করছি, তা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাবী করেছেন। আর যদি আমি অজ্ঞ হই। (মা'আযাল্লাহ), রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজ্ঞ ছিলেন। তিনিও তো উশর দাবী করেছেন।

স্পেনের ফিকহবিদগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইবনে হাতিম তালায়তালীকে হত্যা ও ফাঁসি দেওয়ার ফাতওয়া দেন। সে এক বিতর্ক অনুষ্ঠানে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়াতীম ও আলীর শ্বশুর বলে উল্লেখ করেছে। আর সে আরো বলেছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ইচ্ছাকৃত ছিলো না বরং যদি তিনি দুনিয়ার সম্পদ লাভ করতে পারতেন, তাহলে তিনি তা ব্যবহার করতেন।

কায়রাওয়ানের ফিকহবিদ ও সাহনূনের সহচরবৃন্দ ইবরাহীম ফাযারীকে হত্যা করার ফাতওয়া দেয়। ইবরাহীম অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা কবি ছিলো। আর সে কাযী আবুল আব্বাস বিন তালিবের বিতর্ক অনুষ্ঠানে যোগদান করতো। তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, সে অনেক কাব্যে আল্লাহ তা'আলা, আম্মিয়ায়ে কেরাম ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কটুক্তি করেছে। তাকে বিচারক ইয়াহইয়া বিন আমিরের আদালতে উপস্থিত করা হয়, ওই সময়ে আদালতে অসংখ্য খ্যাতনামা ফকীহ উপস্থিত ছিলেন। বিচারক তাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে হত্যার আদেশ দেন। সুতরাং তার পেটে ছুরিকাঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়। এরপর তাকে উন্টিয়ে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এরপর তার মৃতদেহ নামিয়ে আশুনে পোড়ানো হয়।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, যখন তাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলানো হয়, তার ফাঁসির রশি এমনিতে ঘুরতে শুরু করে। যখন তার চেহারা কিবলার বিপরীত হয়ে যেতো, তখন ফাঁসির রশি ঘুরা বন্ধ হয়ে যেতো। উপস্থিত লোকজন এটাকে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন মনে করে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করে। এরপর কুকুর এসে তার রক্ত খেয়ে ফেলে। ইয়াহইয়া বিন আমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থই বলেছেন যে لَا يَلْعُ الْكَلْبُ فِي دَمِ مُسْلِمٍ -কুকুর মুসলমানের রক্ত খায় না।

কাযী আবদুল্লাহ বিন মারাবিত রাহিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে এ ধরনের দাবী করবে


যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরাজিত হয়েছেন, তাহলে তাকে তাওবার সুযোগ দিতে হবে, আর তাওবা না করলে হত্যা করতে হবে। কারণ সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাহানি করেছে। অধিকন্তু, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল প্রকার ক্রটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র ছিলেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তির উপর হতো। কারণ আল্লাহ তাঁকে নিষ্পাপ বানিয়েছেন।

হাবীব বিন রাবী আল কারভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এটা ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর সহচরবৃন্দের অভিমত, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে-কোনো প্রকার দোষ ক্রটিকে সম্পৃক্ত করবে, তাকে তাওবার অবকাশ দেয়া ছাড়াই হত্যা করে ফেলতে হবে।

ইবনে আত্তাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ কথা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেবে কোনো মাধ্যমে বা মাধ্যম ব্যতিরেকে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, ইশারা-ইঙ্গিতে, কোনো প্রকার দোষক্রটি সংযোজিত করবে, চাই তা অতি ক্ষুদ্রই হোক না কেনো, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। কারণ এ ধরনের সবকিছুকে আলেমগণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়া ও সম্মানহানির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ওলামায়ে মুতাকাদিমীন ও মুতাআখখিরীন সর্বসম্মতিক্রমে এ ধরনের লোকদের হত্যা করা ওয়াজিব বলে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন। তবে হত্যা কার্যকর করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আমি এবিষয়ে পূর্বে আলোকপাত করেছি। আর এ বিষয় পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো। অনুরূপ কাযী আযায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবজ্ঞা করে, তুচ্ছ মনে করে, বা মেষ চরানোর কারণে তাঁকে রাখাল মনে করে, তাঁর মানবীয় বৈশিষ্ট্যে তাঁর ভুল-বিস্মৃতি প্রকাশ পাওয়া, তাঁর উপর যাদুর প্রভাব বিস্তার করা, যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাতের কারণে আহত হওয়া, তাঁর বাহিনীর পরাজিত হওয়া বা দুশমনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, অথবা তাঁর উপর বিপদ-আপদ নাযিল হওয়া, অথবা নারীদের দ্বারা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা বলে তাঁকে লজ্জা দেবে বা তাঁকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থির করবে, এ সব বিষয়ের মর্ম হলো, এসব কথার উদ্দেশ্য কেবল হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোষক্রটি বর্ণনা করা, তবে এসব বিষয়ের বক্তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। সম্মানিত আলেমগণের এ সম্পর্কিত অভিমত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সামনে এর দলিল প্রমাণ পেশ করা হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

فِي الْحُجَّةِ فِي إِجَابِ قَتْلِ مَنْ سَبَّهُ أَوْ عَابَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

হযরত  কে গালমন্দকারী বা দোষত্রুটি বর্ণনাকারীদের প্রাণবধ করা আবশ্যিক

হযরত দলীল প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ওই ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত করেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেবে। আর আল্লাহ তা'আলা হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া স্বয়ং নিজেকে কষ্ট দেয়া বলে উল্লেখ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে গাল-মন্দ করবে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কোনো মতদ্বৈততা নেই। দ্বিতীয়ত এই অভিসম্পাতের যোগ্য তো ওই ব্যক্তি হয় যে কাফির ও ধর্মত্যাগী। আর তার বিধান হলো তাকে হত্যা করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٧﴾

-নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।^১

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের হত্যাকারী সম্পর্কে এ ধরনের ঘোষণা দিয়েছেন। দুনিয়াতে যদি কাউকে অভিশপ্ত বলে উল্লেখ করা হয় তাহলে তার অর্থ হলো তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

لِّئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُتَنَفِّقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ

فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾ مُلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا

تَقْتِيلًا ﴿٢١﴾

^১. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৫৭।

-যদি মুনাফিক, যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি আছে এবং মদীনায় মিথ্যা রটনাকারীগণ বিরত না হয়, তবে অবশ্য আমি আপনাকে তাদের উপর আধিপত্য দান করবো, অতঃপর তারা মদীনায় আপনার নিকটে অতি স্বল্প দিনই থাকবে অভিশপ্ত হয়ে, যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে তাদেরকে ধরা হবে এবং গুনে গুনে হত্যা করা হবে।^২

অপর এক আয়াতে স্থলদস্যদের শাস্তি বর্ণনা করে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ

خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٤﴾

-যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং রাজ্যের মধ্যে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে গুনে গুনে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের একদিকের হাত ও অপরদিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটা দুনিয়ার মধ্যে তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে।^৩

আর 'কতল' বা 'হত্যা' শব্দটি অভিসম্পাত অর্থেও এসেছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে -

قَتَلَ الْحَزْرَ صُونَ ﴿٢٥﴾

-নিহত হোক মনগড়া কথা রচনাকারী।^৪

আরো ইরশাদ হয়েছে-

قَتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنِّي يُؤْفَكُونَ

-আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! ওরা উল্টো দিকে কোথায় ফিরে যাচ্ছে?^৫

^১. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৬০-৬১।

^২. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫:৩৩।

^৩. আল কুরআন : সূরা যারিয়াত, ৫১:১০।

^৪. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৩০।

অর্থাৎ আল্লাহ তাদের উপর অভিসম্পাত করুক। তবে সাধারণ মুসলমানদের কষ্ট দেয়া আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়ার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। যে ব্যক্তি মু'মিনকে কষ্ট দেবে তাকে মারার ও শাস্তি দেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এর চাইতে অনেক গুরুত্বর অপরাধ, তাই এর শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَتُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

-সুতরাং হে মাহবুব! আপনার পালনকর্তার শপথ, তারা মুসলমান হবে না যতক্ষণ পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না, অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন, তাদের অন্তরসমূহে সে সম্পর্কে কোনো দ্বিধা পাবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে।^১

উক্ত আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যদি কোনো মুসলমান হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালায় সন্তুষ্ট না হয়ে দ্বিধা-সংশয় পোষণ করে, তবে তার অন্তর থেকে ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হবে। তার যেন দীন নেই। আর যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাহানি করলো সে যেন তার ঈমান বিনষ্ট করলো। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا

تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ

أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٧﴾

-হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না ওই অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না। যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো, যেন কখনো তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায় আর তোমাদের খবর থাকবে না।^২

^১. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৬৫।

^২. আল কুরআন : সূরা হুদরাত, ৪৯:২।

একথা তো স্পষ্ট যে, কুফরী কাজের দ্বারা নেক আমল বিনষ্ট ও বাতিল হয়ে যায়।^১ আর কাফিরের বিধান হলো, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ.

-আর যখন আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন এমন বাক্য দ্বারা আপনাকে অভিবাদন জানায় যে শব্দ আল্লাহ আপনার সম্মানের ক্ষেত্রে বলেননি।^২

এরপর ইরশাদ হয়েছে-

حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا^৩ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

-তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা তাতেই বিধ্বস্ত হবে। সুতরাং কতই মন্দ পরিণতি।^৪

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ^৫ قُلْ أُذُنٌ

خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ

ءَامَنُوا مِنْكُمْ^৬ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

-আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা সেই অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবীকে কষ্ট দেয় আর বলে 'তিনি তো কান'।^৭ আপনি বলুন, তিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই কান হোন।^৮ আল্লাহর উপর ঈমান

^১. এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, নবুওয়াতের শানে বিন্দুমাত্র ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যের কারণে সারা জীবনের নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায়।

^২. আল কুরআন : সূরা মুজাদালা, ৫১:৮।

^৩. আল কুরআন : সূরা মুজাদালা, ৫১:৮।

^৪. অর্থাৎ (মুনাফিকদের মতে) কেউ কিছু বলে দিলেই কোন প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই মেনে নেন।

^৫. অর্থাৎ হে মুনাফিকগণ! তিনি সব কথার যাচাই-বাছাই না করাটা তোমাদের জন্য মঙ্গল। যদি তিনি তোমাদের রহস্য ফাঁস করে দিতে অভ্যস্ত হতেন, তবে তোমাদের মঙ্গল হতো না। তিনি তো রহস্য গোপনকারী।

আনেন এবং মু'মিনদের কথায় বিশ্বাস করেন, আর তোমাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের জন্য রহমত। আর যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।^১

এরপর ইরশাদ হয়েছে-

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ
وَأَيَّتِهِمْ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٠﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ
كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ يُغَذِّبُ
طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦١﴾

-আর হে মাহবুব! যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলবে, 'আমরা তো এমনি হাসি-খেলার মধ্যে ছিলাম'। আপনি বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে?' মিথ্যা অজুহাত রচনা করো না! তোমরা মুসলমান হয়ে কাফির হয়ে গেছো। যদি আমি তোমাদের মধ্যে কাউকেও ক্ষমা করে দিই, তবে অন্যান্যদেরকে শাস্তি দেবো, এ কারণে যে তারা অপরাধী ছিলো।^২

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে- 'তোমরা মুসলমান হয়ে কাফির হয়ে গেছো।^৩ তাফসীরবিদ আলেমগণ বলেন, এর মমার্থ হলো, তোমরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদায় অযাচিত কথা বলে কুফরী করেছে।

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মুসলিম উম্মাহর আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণকারী কাফির এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

এখন আসুন এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের প্রতি আলোকপাত করা যাক-

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

^১ আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৬১।

^২ আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৬৫-৬৬।

^৩ আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৬৬।

مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَاقْتُلُوهُ. وَمَنْ أَضْحَايَ فَاضْرِبُوهُ.

-যে ব্যক্তি কোনো নবীকে গালি দেবে তাকে হত্যা করো, আর যে আমার সাহাবীকে গালি দেবে তাকে বেত্রাঘাত করো।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী সরদার কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার নির্দেশ দান করে বলেন,

مَنْ لَكَبَّ بِنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟

-তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করতে পারবে? কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়।^১

এরপর যে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, সে তাকে সুকৌশলে হত্যা করে ফেলে। মুশরিকদের বিপরীতে তাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াতও দেয়নি। কারণ মুশরিকদের প্রথমে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়ার বিধান রয়েছে। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণ উল্লেখ করেছেন যে, 'সে আমাকে কষ্ট দেয়'। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, কা'ব বিন আশরাফকে তার শিরক করার কারণে হত্যা করা হয়নি, বরং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার হত্যা করা হয়েছে।^২

^১ ক) বুখারী : আস সহীহ, বাবু রিহনিস সিলাহ, ৩:১৪২ হাদীস নং ২৫১০।

খ) মুসলিম : আস সহীহ, বাবু কাতলি কা'ব বিন আশরাফ, ৩:১৪২৫ হাদীস নং ১৮০১।

গ) আবু দাউদ : আস সুনান, ৩:৮৭ হাদীস নং ২৭৬৮।

ঘ) নাসায়ী : আস সুনান, ৮:৩৫ হাদীস নং ৮৫৮৭।

ঙ) বায়হাকী : আস সুনানুল কুবরা, ৯:১৩৮ হাদীস নং ১৮১০২।

^২ ইহুদী সরদার কা'ব বিন আশরাফ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করে কবিতা রচনা করতো। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুদেরকে তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্য উৎসাহ দিতো। যখন তার ধৃষ্টতা-সীমা অতিক্রম করে তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দেন যে, কে আছে যে কা'ব বিন আশরাফ হত্যা করতে পারবে? তখন পাঁচজন আনসার দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা প্রস্তুত আছি। ওই পাঁচজনের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার অনুমতি দিয়ে বিদায় দেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এ বিষয়ে অনুমতি নেন যে, আমি কূটনৈতিক প্রয়োজনে আপনার বিরুদ্ধে তার নিকট অভিযোগ করতে পারবো? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করে দেয়া হলো। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অভিযোগ করার অনুমতি দেন। তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে কা'ব বিন আশরাফের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপর যাকাত ধার্য করে আমাকে ভীষণ বিপদে ফেলেছে। সুতরাং আপনি আমাকে কিছু প্রদান করুন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিযোগ শুনে সে ভীষণ খুশি

অনুরূপ ইহুদী সর্দার আবু রাফে'কেও হত্যা করা হয়। হযরত বারা বিন আযিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার সম্পর্কে বলেন,

وَكَانَ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعِينُ عَلَيْهِ.

-সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিতো, আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুদের সাহায্য করতো।

অনুরূপ মক্কা বিজয়ের দিন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে খাতল ও তার দু'দাসীকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেন, যারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে কবিতা আবৃত্তি করতো।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিতো, তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ يَكْفِينِي عَدُوِّي؟ فَقَالَ خَالِدٌ أَنَا، فَبَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ.

-তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমার দুশমনকে হত্যা করতে পারবে? তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরম্ভ করলেন, আমি আছি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রেরণ করেন। তিনি তার নিকট গিয়ে তাকে হত্যা করেন।

অনুরূপ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের একটি দলকেও হত্যার নির্দেশ দেন, যারা তাঁকে কষ্ট দিতো এবং বেশিরভাগ সময় গাল-মন্দ করতো তাদের মধ্যে নদর ইবনে হারিস, ওকবা বিন আবী মু'ঈত নামক কাফিরও ছিলো। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে এদের হত্যা করার প্রতিশ্রুতি নেন। সুতরাং তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। তবে যারা বন্দী হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

হয়ে বললো, তুমি আমার নিকট কোনো জিনিস বন্ধক রাখো। অথবা তোমার স্ত্রী-পুত্রকে আমার নিকট বন্ধক রেখে দাও। অবশেষে অস্ত্র বন্ধক রাখার বিনিময়ে চুক্তি করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী দ্বিতীয় দিন আনসারগণ তাদের অস্ত্রশস্ত্র সাথে নিয়ে যায়। রাতে জ্যোৎস্নার আলোতে কা'ব বিন আশরাফ দুর্গ থেকে বাইরে এসে গল্প শুভবে মগ্ন হয়। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললো, তোমার মাথা থেকে খুব সুঘ্রাণ বের হচ্ছে, আমাকে একটু ঘ্রাণ নিতে দাও। কা'ব বিন আশরাফ কৌশল বুঝতে না পেরে ঘ্রাণ নেয়ার জন্য মাথা ঝুঁকালে মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে।

১. আবু রাফে ইহুদী সর্দার ছিলো, সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোরতর শত্রু ছিলো।

বায়হার বর্ণনা করেন, যখন ওকবা বিন আবু মু'ঈত নিহত হয়। তখন সে চিৎকার করে বলছিলো, হে কুরাইশ সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা দেখতে পাচ্ছে আজ তোমাদের সামনে আমি কীভাবে নিহত হচ্ছি? অথচ তোমরা নীরবে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছো। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

بِكُفْرِكَ وَافْتِرَائِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

তুমি তোমার কুফরী বাক্য ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার দরুণ মৃত্যুমুখে পতিত হতে যাচ্ছ।

আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়, তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ يَكْفِينِي عَدُوِّي؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا فَبَارَزَهُ فَقَتَلَهُ الزُّبَيْرُ.

-কে আছে যে আমার এ শত্রুকে নিঃশেষ করে দেবে? তখন হযরত যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি প্রস্তুত আছি। তারপর তিনি প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যান এবং তাকে হত্যা করেন।^১

বর্ণিত আছে, এক মহিলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিতো, তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ يَكْفِينِي عَدُوِّي؟ فَخَرَجَ إِلَيْهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَتَلَهَا.

-তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে এই মহিলাকে প্রতিরোধ করবে? তখন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বের হয়ে ওই মহিলাকে হত্যা করেন।^২

এটাও বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা অপবাদ দেয়। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী ও হযরত জোবায়ির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে তাকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন, তারা তাকে হত্যা করেন।

১. আবদুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, ৫:২৩৬ হাদীস নং ৯৪৭৭।

২. আবদুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, ৫:৩০৭ হাদীস নং ৯৭০৫।

ইবনে কানে' থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ
أَبِي يَقُولُ فِيكَ قَوْلًا فَبِئْسَ مَا فَتَقَلْتَهُ. فَلَمْ يَشُقْ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.

-একদিন এক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে
উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম! আমি আমার পিতাকে আপনার শানে কটুক্তি করতে শুনি, তা
আমার নিকট অসহনীয় হওয়ার আমি তাকে হত্যা করে ফেলি। তার এ
কথায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসম্ভব প্রকাশ করেন নি।^১

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা'আলা আনহু খিলাফতকালে মুহাজির বিন
উমাইয়া ইয়ামেনের গর্ভনর ছিলেন, তখন ইয়ামেনে ধর্ম ত্যাগের হিড়িক চলে।
ঠিক ওই সময় জনৈক মহিলা কবিতার মাধ্যমে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে গালি দিতো। মুহাজির বিন উমাইয়া এ কথা জানার পর ওই
মহিলার হাত কেটে দেয়, আর সামনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়। হযরত আবু বকর
রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই বিষয় জানার পর বললেন, যদি তুমি তাকে এ
শাস্তি না দিতে তাহলে আমি ওই মহিলাকে হত্যা করার আদেশ দিতাম। কারণ
সম্মানিত নবীগণকে গাল-মন্দ কারীর শাস্তি আর সাধারণ লোকদের গালি দেয়ার
শাস্তি সমান হতে পারে না, বরং ওই ধরনের লোকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা
করতে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হাতমাহ
গোত্রের জনৈক মহিলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ
করতো। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার জন্য
এমন কে আছে যে, এ মহিলাকে নিঃশেষ করে দেবে? তখন সে গোত্রের জনৈক
ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আমি এ কাজ করতে প্রস্তুত। এ কথা বলে সে মহিলাকে
হত্যা করে ফেলে। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَسْطِخُ فِيهَا عَزْرَانِ.

-তাকে তো দু'বকরী শিং মারতো না অর্থাৎ তার রক্তপাত বৈধ।^২

^১ আবু নায়ীম ইস্পাহানী : হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭:১১৩।

^২ ইবনে আবী শায়বা : আল মুসনাদ, ১৫:২৩০।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, জনৈক অন্ধ
সাহাবীর এক ক্রীতদাসী ছিলো। সে অধিকাংশ সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে গাল-মন্দ করতো। তিনি তাকে বহুবার বারণ করা সত্ত্বেও সে
তাতে কর্ণপাত করেনি। বরং কোন এক রজনীতে সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে গাল-মন্দ করতে থাকে। তখন অন্ধ সাহাবী তাকে হত্যা করে এসে
হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরম্ভ করেন, তখন হযুর সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রক্তপাতকে বৈধ ঘোষণা করেন।

হযরত আবু বারযা আসলামী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, একদা আমি হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিকট উপবিষ্ট
ছিলাম। কোনো কারণে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক
মুসলমানের উপর অসম্ভব হন। কাযী ইসমাইল আর অন্যান্য হাদীসবেত্তা বলেন,
সে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে গালি দেয়। ইমাম নাসায়ী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ হাদীসটি তাঁর রচিত 'নাসায়ী শরীফে' লিপিবদ্ধ করেন।
বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন তাকে
ধমক দেয়। সে প্রতি উত্তরে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে
গাল-মন্দ করে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের খলিফা! আমাকে অনুমতি দিন আমি এ ব্যক্তির শিরোচ্ছেদ করি?
প্রতি উত্তরে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি নিরবে
বসে থাকো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত এ অধিকার
আর কাউকে দেয়া হয়নি যে, কাউকে গালি দেয়ার কারণে মানুষের গর্দান উড়িয়ে
দেয়া হবে। অর্থাৎ ওই বিশেষ বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের জন্য নির্ধারিত।

কাযী আবু মুহাম্মদ বিন নসর বলেন, যখন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা
আনহু এ কথা বলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম এর প্রতিবাদ করেননি। ওই
ঘটনাকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করে হাদীসবেত্তা আলেমগণ বলেন, যে ব্যক্তি হযুর
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসম্ভব করে বা সে এমন কাজ করে যা হযুর
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্টের কারণ হয়, বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

ওই দলিলসমূহের মধ্যে এটা একটি দলিল যে, কুফার গর্ভনর হযরত উমর বিন
আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিকট জানতে চান, যে ব্যক্তি হযরত
উমর বিন আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে গালি দেবে তাকে হত্যা করা

যাবে কি? তখন তিনি বললেন, গালি দেয়ার কারণে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা জাযিয় হবে না। তবে যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে তাকে হত্যা করা জাযিয়। যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে তার রক্তপাত বৈধ হবে।

একদা খলিফা হারুন-উর-রশিদ ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করেন, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে তার সাথে কী ধরনের আচরণ করতে হবে? তখন তাকে বলা হয়, ইরাকের ফিকহবিদ ফাতওয়া দিয়েছেন, তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে। তখন ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! যে উম্মত আপন নবীকে গালি দেবে তার শাস্তি আর কী হবে? অর্থাৎ যে হযরাত আমিয়ায়ে কেরামকে গালি দেবে, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে, আর যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেবে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে।

কাযী আবুল ফযল আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ বর্ণনায় ওইরূপই উল্লেখ করা হয়েছে। আর যেসব জীবনীকার হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন, তারা সবাই ওই ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আমি জানিনা যে, ইরাকের কোন ফিকহবিদ যিনি খলীফা হারুন-উর-রশিদকে এরূপ ফাতওয়া দিয়েছিলেন। কারণ ওই বিষয়ে ইরাকী ফিকহবিদদের অভিমত আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এ ধরনের লোকদের হত্যা করে ফেলতে হবে। সম্ভবতঃ ফাতওয়া দানকারী ফিকহী খ্যাতির দিক থেকে অপ্রসিদ্ধ ছিলো বা তিনি এমন ফকীহ, যার ফাতওয়া গ্রহণযোগ্য নয় অথবা তিনি দুনিয়াদার আলেম হবে। এটাও হতে পারে যে, তার নিকট এমন কোনো লোকের সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করা হয়, যার ফাতওয়া নির্ভরযোগ্য ও সন্দেহমুক্ত ছিলো না অথবা তার কথায় গালিগালাজ ছিলো কি না সেই বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি অথবা এটাও হতে পারে যে, সে তার কথা প্রত্যাহার করে নিয়েছে অথবা সে তাওবা করেছে কিংবা খলিফা হারুন-উর-রশিদ ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সঠিক বিষয়ে জ্ঞাত করাতে পারেননি। নতুবা ওই বিষয়ে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, মুসলিম উম্মাহর সকলে ওই বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গালিদাতাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

বিবেক ও জ্ঞানের বিবেচনার চাহিদাও এটাই যে, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে অথবা তাঁর মর্যাদাহানি করবে, তাহলে এর মমার্থ হলো, তার হৃদয় ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে। আর তার অভ্যন্তরীণ দিক কুফরীতে

আচ্ছাদিত হয়ে আছে। এ কারণে অধিকাংশ আলেম এ ধরনের লোককে ধর্মত্যাগী উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মালিক ও ইমাম আওয়ামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা থেকে সিরিয়ার আলেমগণ এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা ও কুফাবাসীদের অভিমতও এটা।

তবে তারা আরেকটি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করা কুফরীর প্রমাণবহ। সুতরাং শরীয়াতের নির্ধারিত হদ বা দণ্ডবিধি অনুযায়ী তাকে হত্যা করতে হবে। তার উপর কুফরীর আদেশ কার্যকর করা যাবে না, কিন্তু যদি সে স্বীয় বেআদবী ও পাপিষ্ট মনোভাবে অবিচল হয়, আর স্বীয় কাজকে মন্দ মনে না করে, আর না তা থেকে বিরত হয়, তাহলে সে কাফির হবে। তার কথায় স্পষ্ট হয়েছে। তখন তার অবস্থা সম্পূর্ণ এরূপ হবে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অথবা সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করেছে। সে জেনে শুনে নিন্দা প্রকাশ করেছে। আর তাওবা করতে অস্বীকার করেছে। তাহলে এর মমার্থ হলো এই যে, সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁর মান-সম্মত বিনষ্ট করা হালাল মনে করেছে। এটা স্পষ্ট কুফরী। সুতরাং এ ধরনের লোক সন্দেহাতীতভাবে কাফির হবে। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

مَخْلُوفَاتٍ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً الْكُفْرِ وَكَفَرُوا
بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ .

—আল্লাহর শপথ করে যে, তারা বলেনি এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তারা কুফরের কথা বলেছে এবং ইসলামের মধ্যে এসে কাফির হয়ে গেছে।^১

তাকসীরবিদগণ বলেন, তার কথা হলো^২ এই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন, তা যদি সত্য হয় তাহলে আমি গাধা থেকেও নিকৃষ্ট হবো। কেউ কেউ বলেছেন যে, তার কথা হলো এই যে, আমার ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

^১ আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৭৪।

^২ মুনাফিকরা এ ধরনের কথা বলতো। তাদের প্রোক্ষতার করা হলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিথ্যারের সামনে এসে তারা মিথ্যা শপথ করতো।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির কথার মতো যে ব্যক্তি বলে যে, তোমার কুকুরকে মোটাতাজা করো একদিন সে তোমাকে খাবে।

অথবা এক মুনাফিক^১ বলেছিলো-

يَقُولُونَ لِنِ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنَّا
الْأَذَلُّ.

-তারা বলে, আমরা মদীনায়ে প্রত্যাবর্তন করলে অবশ্যই যে বড় সম্মানিত সে সেখান থেকে তাকেই বের করে দেবে যে অত্যন্ত লালিত^২।

কেউ কেউ বলেছেন, ওই ধরনের কথা উচ্চারণকারী যদি অপ্রকাশ্যে বলে, তাহলে সে হবে যিন্দীক। আর তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। কারণ সে তার ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলেছে। অর্থাৎ সে ধর্মত্যাগী হয়েছে। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَأَصْرَبُوا عَنْقَهُ.

-যে ব্যক্তি তার দীন (ইসলাম) পরিবর্তন তার গর্দান উড়িয়ে দাও।^৩

এ কারণে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত-সম্মান উম্মতের চেয়ে শতসহস্র গুণ উর্ধ্ব। তাই এই অবস্থা হবে যে, যদি কেউ কোনো মুসলিম উম্মাহকে গালি দেয়, তাহলে ওই ব্যক্তিকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রদান করতে হবে। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিদানকারীর শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা, ইজ্জত, সম্মান, অন্যান্যদের তুলনায় অনেক অনেক সমুন্নত।

^১. মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুল।

^২. আল কুরআন : সূরা মুনাফিকুন, ৬৩:৮।

^৩. (ক) মালেক : আল মুয়াত্তা, ৪:১০৬৫ হাদীস নং ২৭২৬।

(খ) বায়হাকী : আস সুনাউল কুবরা, ৮:৩৩৮ হাদীস নং ১৬৮২১।

(গ) শাফেয়ী : আল মুসনাদ, ৩:২৯০ হাদীস নং ১৬০৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

أَسْبَابُ عَفْوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْضِ مَنْ أَذَاهُ

হযুর ﷺ কর্তৃক কতিপয় কষ্টদানকারীকে ক্ষমার কারণসমূহ

যদি আপনারা অভিমত প্রকাশ করেন, তাহলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ইহুদীকে হত্যা করেন নি কেন, যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে 'السَّامُ عَلَيْكُمْ' অর্থ: তোমার মৃত্যু হোক বলেছে, অথচ এটা হলো বদদোয়া।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না এ ধরনের লোকদের হত্যা করার আদেশ করেছেন, যে ব্যক্তি গনিমতের মাল বন্টনের সময় বললো, এটা এমন বন্টন যাতে আল্লাহ তা'আলার সম্ভটির উদ্দেশ্য নেই, অথচ তার কথায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখ পান। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে,

قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ؟ وَلَا قَتَلَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا

يُؤْذُونَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَخْيَانِ؟

-হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে এর চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। যেসব মুনাফিক তাঁকে অধিকাংশ সময় দুঃখ-কষ্ট দিতো তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দেন।^১

এর জবাব জেনে নিন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আপনাদেরকে নেক কাজের তাওফীক দান করুন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সম্ভষ্ট রাখতেন। এভাবে তাদের নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতেন। তাদের অন্তরে ঈমানবদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যে তাদের ক্ষমা করে দিতেন। আর স্বীয় সহচরবৃন্দকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, إِنَّمَا بُعِثْتُ مُبَشِّرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُنْفِرِينَ, তোমাদের নমনীয়তা প্রদর্শনকারী বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, ঘৃণা প্রকাশকারী হিসেবে নয়।^২

^১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু সবরি আলাল আযা, ১৯:৫৩, হাদিস নং : ৫৬৩৫।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ই'তাযি মুয়াত্তাফাতি কুলুবিহীম, ৫:২৯৩, হাদিস নং : ১৭৬০।

^২. বুখারী : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ২২০।

তিনি মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলতেন,

يَسْرُؤُوا وَلَا تَعْسُرُوا وَاسْكُتُوا وَلَا تُنْفِرُوا.

-নমনীয়তা প্রদর্শন করো, কঠোরতা প্রদর্শন করো না, সাজনা দাও, ঘৃণা করো না।^১

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও ঘোষণা করেন,

لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ.

-মানুষ যাতে একথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদের হত্যা করে ফেলেছে।^২

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফির ও মুনাফিকদের সাথে সুন্দর নমনীয় আচরণ করতেন। তিনি তাদের সাথে হাসিমুখে মিলিত হতেন। তিনি অধিকাংশ সময় তাদের ক্ষমা করে দিতেন। তাদের শত নির্যাতন হাসি-মুখে বরণ করে ধৈর্যধারণ করেছেন। যারা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অত্যাচার করতো হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে নীরবে সহ্য করেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের জন্য তাদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করা জায়েয নয়। তিনি তাদের প্রতি অনুকম্পা করেছেন; তাদের ক্ষমা করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আদেশ করেন-

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ

وَأَصْفَحْ^৩ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

-আর আপনি সর্বদা তাদের একটা না একটা প্রতারণা সম্বন্ধে অবহিত থাকবেন, অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত; সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণগণ আল্লাহর প্রিয় পাত্র।^৪

^১ বুখারী : আস্ সহীহ, ৬৯:৬১২৫; মুসলিম : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ১৭৪৩।

^২ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু কাওলিহি সাওয়াউন আলাইহিম, ১৫:১৯১, হাদিস নং : ৪৫২৫।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফী নসরিল আখি জুলমান, ১২:৪৬৪, হাদিস নং : ৪৬৮২।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ওয়া মিন সূরাতিল মুনাফিকুন, ১১:১৩১, হাদিস নং : ৩২৩৭।

^৪ আল কুরআন : সূরা মায়দা, ৫:১৩।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

أَدْفَعْ بِأَلْيِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ

وَلِيٌّ حَمِيمٌ.

-হে শ্রোতা! মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত করো তখনই ওই ব্যক্তি যে, তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে শত্রুতা ছিলো, এমন হয়ে যাবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু।^১

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মন সম্ভষ্ট করে লোকদের একটি কালিমায় সমবেত করা হয়। আর তা বিশেষ প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু এখন যেহেতু ইসলাম সুদৃঢ় হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য দ্বীনের উপর ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। তাই পূর্ববর্তী আদেশ রহিত হয়ে গেছে। আর এখন যার ধৃষ্টতা সীমা অতিক্রম করে বিধবৎসী আকার ধারণ করেছে তাকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে খাতল ও অন্যান্যদের মক্কা বিজয়ের দিন হত্যা করার আদেশ দান করেন। তারা অতি ফিতনাবাজ ছিলো। অথবা ইহুদী সর্দারদের কৌশলে হত্যা করার আদেশ দান করেন। অথবা যেসব লোক হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুঃখ-কষ্ট দেয়ায় লিপ্ত থাকতো হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর বিজয়ী হন। (তাই তাদের না করেন) স্বভাবতই না তারা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য গ্রহণ করেছে, আর না ঈমান এনেছে। যেমন- কা'ব বিন আশরাফ, আবু রাফি', নদর, ওকবা প্রমুখ।

অনুরূপ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরা ছাড়াও অপর একদল লোকের রক্তপাত বৈধ ঘোষণা করেন। যেমন কা'ব বিন যুহাইর, ইবনুয যাব'আরী প্রমুখ। কারণ তারা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিতো। অবশেষে তারা উপস্থিত হয়ে মস্তক অবনত করে আত্মসমর্পণ করে। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ক্ষমা করে দেন। আর তাদের প্রতি অসংখ্য অনুকম্পা করেন।

এখন অবশিষ্ট রইলো, মুনাফিকদের কথা। নিফাকের সম্পর্ক হলো অভ্যন্তরীণ অবস্থার সাথে। তা গোপন বিষয়। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যিক

^১ আল কুরআন : সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৩৪।

অবস্থার উপর আদেশ জারী করতেন। মুনাফিকদের অধিকাংশ কথা ও কাজ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের পরিপন্থি ছিলো। তারা গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সেই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলে, তারা তা অস্বীকার করতো; আর শপথ করে বলতো যে, আমরা এ ধরনের কথা বলিনি। অথচ তারা কুফরী বাক্য বলতো। এসব কিছু পরও দয়ার সাগর, করুণার আধার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশা করতেন যদি তারা সঠিক অন্তরে ইসলামের পথে এসে যায়, সত্যই যদি তাদের তাওবা নসীব হয়, তবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনর্থক কথাবার্তা কটুক্তি ও অত্যাচার মুখ বুঝে নীরবে সহ্য করেছেন। যেভাবে পূর্ববর্তী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবীগণ ধৈর্যধারণ করেছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ মহিমামণ্ডিত আচরণের কারণে তাদের মধ্যে অসংখ্য লোক অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিকে কুফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে নিষ্ঠাবান হয়ে যায়। এভাবে তাদের অভ্যন্তরীণ দিক বিশুদ্ধ হয়ে যায়, যেভাবে তাদের বাহ্যিক দিক বিশুদ্ধ ছিলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের বহু সংখ্যক লোককে উপকৃত করেন। মুনাফিকদের মধ্যে অনেকে সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামের সাহায্য-সহায়তাকারী পরামর্শকারী হয়েছে। যেমনটি তাদের সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের কোনো কোনো ইমাম এ প্রশ্নের এই জবাব দিয়েছেন।

কেউ কেউ এরূপ জবাবও দিয়েছেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা আমরা ওই মুনাফিকদের যে বিবরণ জানতে সক্ষম হয়েছি তা সঠিক ও নির্ভরযোগ্যতার স্তরে পৌঁছেনি। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। যেমন কোনো শিশু, ক্রীতদাস ও স্ত্রীলোক ওই খবর দিয়েছে। অথবা এক ব্যক্তি তাঁকে খবর দিয়েছে। এ অবস্থায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। কারণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, নারী, ক্রীতদাস ও এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা কোনো লোকের প্রাণনাশ করা বৈধ নয়। বরং প্রয়োজন হলো যে দু'জন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করা। এর উপর ওই ইহুদীর বিষয়ও যুক্তিপ্ৰয়োগ করা যায়, যে ইহুদী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করেছে। সে অস্পষ্ট কথা বলতো, স্পষ্ট বলতো না। তোমরা কী দেখতে পাও না যে, হযরত আয়েশা রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এ বিষয় কীভাবে অবগত হবেন? যদি তারা স্বচ্ছ বলতো, তাহলে শুধু হযরত আয়েশা রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তা জানতে পারতেন না, বরং আরো অনেকই তা জানতে পারতো। এ

কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন, তাদের রীতিনীতি কীরূপ ছিলো তারা কীভাবে মিথ্যা কথা বলে। আর ইসলামে খেয়ানত করে। আর তারা শত্রুতার কারণে মুখ বিমুখ করে এরূপ করে। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: عَلَيْكُمْ.

-যদি কোনো ইহুদী তোমাদিগকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম করে তোমরাও তাকে 'আলাইকুম' বলে জবাব দেবে।'

বাগদাদবাসী কোনো কোনো সহচরগণ বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানা সত্ত্বেও মুনাফিকদের হত্যা করেননি। আর একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি, কারণ তাদের নিফাকের নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ বিদ্যমান ছিলো না। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ছেড়ে দেন। এর আরো এক কারণ এটাও হতে পারে যে, নিফাকের বিষয় তো সম্পূর্ণ গোপন ছিলো, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা মু'মিন ও মুসলমানই ছিলো। তাদের মধ্যে আবার কিছু লোক যিম্মীও ছিলো। যাদের সাথে মুসলমানদের নিরাপত্তামূলক শান্তি চুক্তি ছিলো। এ কারণে তাদের হত্যা করা হয়নি।

এ ছাড়াও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তারা তো মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে। এ কথা সঠিকভাবে জানা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কি পরিমাণ লোক কুফরীর অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে পেরেছে। আর কি পরিমাণ অপবিত্রতায় লিপ্ত ছিলো। তারপর সমগ্র আরবে একথা প্রসিদ্ধ হয়েছে যে, তারা মুসলমান হয়েছে। তাই বাহ্যিকদৃষ্টিতে তাদের নিফাকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর ও দ্বীন ইসলামের সাহায্য সহায়তাকারী মনে করা হতো। এ অবস্থায় যদি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিফাক ও তাদের কথার দ্বারা কখনো তা প্রকাশ হতো, অথবা ওই জ্ঞানের উপর যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অন্তরের খবর জানতে পারতেন, তাহলে অবশ্যই তাদের হত্যা করে ফেলতেন। তাহলে অবশ্যই তাদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণা দেখা দিতো। আর তাদের মুখে যা আসতো তারা তাই বলতো। এর দ্বারা অজ্ঞ লোকেরা সন্দেহে পড়ে

ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফীস্ তাসলীম, ৬:১৩৬, হাদিস নং : ১৫২৯।

খ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফীস্ সালাম, ৬:৪০, হাদিস নং : ১৫১৪।

গ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফীস্ সালাম আলা আহলিয্ যিম্মাহ, ১৩:৪২৭, হাদিস নং : ৪৫৩০।

যেতো, দুশমনরা মিথ্যা কথা বলার সুযোগ পেয়ে যেতো, বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য অর্জন করতে ভয় পেতো। আর মন্দ ধারণাকারীরা মন্দ ধারণা পোষণ করতো। আর অত্যাচারী দুশমনেরা এরূপ ধারণা করতো যে, সম্ভবতঃ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কোনো অপরাধের কারণে বা প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাদের হত্যা করেছে। আমি এ পর্যন্ত যা বর্ণনা করেছি, তা আমার নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনা করিনি বরং এসব আমি হযরত ইমাম মালিক বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছি। এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ.

-আমি এটা চাইনা যে লোকেরা একথা বলুক যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীদের হত্যা করেছেন।^১

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِمْ.

-আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ ধরনের লোকদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।^২

তবে বাহ্যিক আহকাম যেমন ব্যাভিচারের শাস্তি কার্যকর করা, বা হত্যার শাস্তি কার্যকর করা, এরূপ বিধানসমূহ কার্যকর করা হতো। এসব বিষয় এক ও অভিন্ন ছিলো।

মুহাম্মদ বিন মাওয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যদি মুনাফিকরা তাদের কপটতা প্রকাশ করতো, তাহলে অবশ্যই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হত্যা করে ফেলতেন। কাযী আবুল হাসান কাসসারও এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

^১ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু কাওলিহি সাওয়াউন আলাইহিম..., ১৫:১৯১, হাদিস নং : ৪৫২৫।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফী নসরিল আবি জুলমান, ১২:৪৬৪, হাদিস নং : ৪৬৮২।

গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ওয়া মিন সূরাতিল মুনাফিকুন, ১১:১৩১, হাদিস নং : ৩২৩৭।

^২ ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, ৪১৩।

খ) শাফেয়ী : আল মুসনাদ, ১:৩২০।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৫:৪৩২।

হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন-

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ
فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦﴾ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخِذُوا وَقْتِكُمُوهَا
تَقْتِيلًا ﴿٧﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٨﴾

-যদি মুনাফিক, যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি আছে এবং মদীনায় মিথ্যা রটনাকারীগণ, তবে অবশ্যই আমি আপনাকে তাদের উপর আধিপত্য দান করবো, অতঃপর তারা মদীনায় আপনার নিকটে থাকবে না। কিন্তু স্বল্প দিন, অভিশপ্ত হয়ে; যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং গুনে গুনে হত্যা করা হবে। আল্লাহর বিধান চলে আসছে ওইসব লোকদের মধ্যে, যারা পূর্বে গত হয়েছে। আর আপনি আল্লাহর বিধান পরিবর্তিত হতে দেখতে পাবেন না।^১

বলা হয়েছে, এর মর্মার্থ হলো, যদি তারা নিফাক প্রকাশ করে তাহলে তাদের সাথে এরূপ আচরণ করা হবে।

মুহাম্মদ বিন মাসলামা 'মাবসূত' গ্রন্থে যায়িদ বিন আসলাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে ইরশাদ করেন-

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ .

-হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।^২

এ আয়াত প্রথম আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে।

^১ আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৬০-৬২।

^২ আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৭৩।

আমাদের কোনো কোনো শায়খ বলেছেন, ওই ব্যক্তি যে গনিমতের মাল বন্টনের সময় বলেছিলো, هَذِهِ قِسْمَةٌ مَّا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ -এটা এমন বন্টন যাতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য নেই কিংবা غَدْلُ আপনি ন্যায়সঙ্গত বন্টন করুন। সম্ভবতঃ তার সে অভিমতকে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের প্রতি অপবাদ ও ভৎসনা মনে করেননি। বরং হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারণা করেন, ওই ব্যক্তি তার অভিমত প্রকাশ করায় ভুল করেছে। এ ধরনের অনেক অনেক বিষয় দুনিয়ার মোহগ্রস্তদের পক্ষ থেকে দুনিয়াবী বিষয়ে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ ধরনের উজ্জিক্তে গালি মনে করেননি। বরং হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করতেন তারা অনর্থক আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনায়াসে তাদের ক্ষমা করে নীরবে ধৈর্যধারণ করেছেন। এ জন্য তিনি তাদের শাস্তি দেননি। এ ধরনের কথা ইহুদীদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে। যারা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে السَّامُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ 'আপনার মৃত্যু হোক' বলেছে কারণ তাতে স্পষ্ট গালি ও এমন দোয়া রয়েছে যা জরুরী হয়। অর্থাৎ মৃত্যু তো সবার আসবে।

কেউ কেউ বলেছেন তাদের السَّامُ عَلَيْكُمْ শব্দ বলার উদ্দেশ্য মৃত্যু ছিলোনা। বরং এর অর্থ হলো, দুঃখ-কষ্ট ও অপমান। আর ওইসব লোক এ শব্দ বদদোয়া অর্থে ব্যবহার করতো। যারা স্বীয় পূর্ববর্তী ধর্ম ত্যাগ করতো। মোটকথা এটা স্পষ্ট গালি ছিলো না। এ কারণে হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ হাদীস বর্ণনা করে শিরোনাম রচনা করেছেন بَابُ إِذَا عَرَضَ الَّذِي أَوْ غَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ 'ইহুদী ও যিম্মিদের ইশারা-ইঙ্গিতে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়া প্রসঙ্গে'।

আমাদের কোনো কোনো আলেম বলেন, এটা ইশারায় গালি দেয়া নয়, বরং ইশারায় কষ্ট দেয়া। কাযী আবুল ফযল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি পূর্বে আলোচনা করেছি, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি ও কষ্ট দেয়া উভয়ই সমান।

কাযী আবু মুহাম্মদ বিন নসর এ হাদীসের উত্তরে যা বলেছেন, আমি তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এরপরও বলছি যে, উক্ত হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, সেই ইহুদী জিম্মী ছিলো, বা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম হরবী ছিলো। তাই প্রকাশ থাকে যে,

১. এ অমুসলিমকে 'জিম্মী' বলা হয় যার সাথে মুসলমানদের নিরাপত্তার চুক্তি হয়।

সম্ভবতঃ একটি সন্দেহের কারণে এ ধরনের আদেশ পরিত্যাগ করা যায় না। যা নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়।^২

উক্ত কথাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কথা হলো, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মন সন্তুষ্ট ও দীন গ্রহণে ক্ষমার পথ গ্রহণ করেছেন, এ আশায় যে, তারা ঈমান এনে মুসলমান হবে। এ কারণে হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসের পরিচ্ছেদ রচনা করে খারেজী দলের উল্লেখ করে বলেন, -بَابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأْلِفِ وَلَلَّا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ 'খারেজীদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাদের হত্যা করা পরিত্যাগ করা, যাতে মানুষ বিষণ্ণ না হয় প্রসঙ্গে।' এ সম্পর্কে আমি প্রথমে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিস্তারিত অভিমত উল্লেখ করেছি।

ইহুদীরা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করেছে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষ মিশ্রিত খাদ্য দিয়েছে। কিন্তু হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ওই জঘন্য নিন্দনীয় কাজে ধৈর্যধারণ করেছেন। অথচ তাদের ওইসব কর্মকাণ্ড হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়ার চেয়েও গর্হিত ছিলো। কিন্তু পরে যখন আল্লাহ তা'আল। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিজয় দান করেন আর তাকে ওই লোকদের হত্যা করার আদেশ দান করেন। যাদের জন্য সময় নির্ধারিত হয়েছে। তারপর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দুর্গ থেকে বের করে দেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে যার জন্য দেশ হতে বহিস্কৃত হওয়া নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাদের নির্বাসিত হতে হয়েছে। তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘর থেকে বের করেদেন। আর তাদের এমন অবস্থা সৃষ্টি করেদেন যে, তারা নিজের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের হাতে তাদের পরাজিত করে তাদের আবাসস্থল পদদলিত করে ধ্বংসস্বপ্নে পরিণত করে দেন। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সরাসরি ভাল-মন্দ অনেক কথা বলেছেন। তাদের বানর ও শুকরের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। মুসলমানগণ তরবারীর সাহায্যে তাদের ফয়সালা করে দেয়। আর স্বীয় প্রতিবেশীদের ত্যাগ করে চলে যাবার আদেশ দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের তাদের আবাসভূমি ঘরবাড়ি ধন-সম্পদ সবকিছুর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের কালিমা সমুন্নত করে কুফরীকে চিরতরে জন্য পরাভূত করে দেন।

১. এ অমুসলিমদের 'হরবী' বলা হয় যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।

২. তাহলো এই যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি-গালাজকারী হত্যা যোগ্য হয়।

এখন যদি আপনারা প্রশ্ন করেন, হযরত আয়েশা রাঃরাঃ তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে তো বলা হয়েছে,

أَنَّ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ.

-হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারে কারো নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে যদি কেউ আল্লাহ তা'আলার মর্যাদায় আঘাত করতো; তিনি তার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।^১

এর জবাব হলো, এর মর্মার্থ এই নয় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। বরং যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিয়েছে বা কষ্ট দিয়েছে, বা তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছে, এ কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। কেননা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এ ধরনের আচরণ করা মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার মর্যাদাহানি করা। আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রকার সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তবে যদি কেউ কোনো ব্যাপারে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বে'আদবী করতে চায়, কথায় হোক বা কাজে বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খারাপ আচরণের মাধ্যমে বা তাঁর জানমালের সাথে হোক আর তাদের এরূপ করার উদ্দেশ্য মূলতঃ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া ছিলো না বরং তারা স্বীয় স্বভাব ধর্মের কারণে এ ধরনের খারাপ আচরণ করেছে, বা মানবীয় স্বভাব সুলভ আচরণের কারণে এ ধরনের কাজ করেছে। যেমন বেদুইনদের হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে, বা স্বীয় অসংস্ভাবের কারণে অসদাচরণ করেছে বা এমন কাজ যা মানবীয় স্বভাবের অধীনে হয়েছে, তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তাদের ক্ষমা করে দেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এক বেদুইন কর্তৃক হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদর ধরে সজোরে টান দেয়ায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাড় মুবারকে চোট লাগে। অথবা জনৈক বেদুইন থেকে তিনি ঘোড়া খরিদ করে,

^১. (ক) বুখারী : আস সহীহ, বাবু ইকামাতিল হুদু ওয়া ল ইত্তিকাম, ৮:১৬০ হাদীস নং ৬৭৮৬।
(খ) আহমদ : আল মুসনাদ, হাদীসু সৈয়দা আয়েশা রাঃরাঃ আনহা, ৬:২২৩ হাদীস নং ২৫৯১৩।

আর সে তা অস্বীকার করে। তখন হযরত খোয়াইমা রাঃরাঃ তা'আলা আনহা সাক্ষ্য দেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বেদুইন থেকে ঘোড়া ক্রয় করেছেন। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত খোয়াইমা রাঃরাঃ তা'আলা আনহাকে জিজ্ঞেস করেন তুমি কীভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে? কারণ তুমি তো ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উপস্থিত ছিলে না। তখন হযরত খোয়াইমা রাঃরাঃ তা'আলা আনহা জবাব দেন, কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সত্যবাদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা তাঁর কথায় বিনা প্রশ্নে সেহেতু আমি এব্যাপারে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি। তাঁর এই মনোভাবের কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খোজাইমা রাঃরাঃ তা'আলা আনহা প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সাক্ষ্যকে দু'জন সাক্ষীর সমান সাব্যস্ত করেন কিংবা যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'জন পূণ্যবতী স্ত্রীর পরামর্শ হেতু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধু পান না করার শপথ করা কিংবা এরূপ বিষয়সমূহে তাঁর উদারতা প্রদর্শন। আমাদের কোনো কোনো আলেমের অভিমত হলো,

إِنَّ أَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ بِفَعْلٍ مُبَاحٍ وَلَا غَيْرِهِ.

-হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া হারাম। চাই কোনো বৈধ কাজের মাধ্যমে হোক বা অবৈধ কাজের মাধ্যমে হোক।

কিন্তু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে এরূপ বৈধ কাজের দ্বারা কষ্ট দেয়া- যেমন এরূপ কাজ করা কোনো ব্যক্তির জন্য জাযিয় হবে যে তাতে অন্য লোক কষ্ট পায়, তাতে ক্ষতির কিছু নেই। তবে শর্ত হলো ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করা যাবে না। তাদের অভিমতের দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী যাতে এক সাধারণ বিষয় ঘোষণা করা হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾

-নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে, তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত দুনিয়া ও আখিরাতে।^১

^১. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৫৭।

অথবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত ফাতেমা রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সম্পর্কে বলেন,

إِنَّمَا بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِنِي مَا يُؤْذِيهَا أَلَا وَإِنِّي لَا أُحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ. وَلَكِنْ لَا
تَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَبَدًا.

-নিশ্চয় ফাতেমা আমার দেহের অংশ। যে তাঁকে কষ্ট দেবে সে আমাকে কষ্ট দেবে। মনে রেখো! আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন। আমি তা হারাম করিনি। তবে আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ও আল্লাহ তা'আলার দূশমনের কন্যা এক ব্যক্তির নিকট বিবাহের মাধ্যমে একত্রিত হতে পারে না।^১

অথবা এ ধরনের আরো অনেক ঘটনায় কাফিররা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম গ্রহণের আশায় তাদের ক্ষমা করে দেন। অথবা যে ইহুদী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষ প্রয়োগ করেছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ইহুদীকেও ক্ষমা করে দেন। যে ইহুদী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করেছে অথবা ওই বেদুইন যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে অথবা যে ইহুদী মহিলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষ প্রয়োগ করেছে, তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে কেউ কেউ বলেছেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করেছেন।^২

আর আহলে কিতাব ও মুনাফিকরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ অনেক ধরনের কষ্ট দিয়েছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ক্ষমা করে দেন, যাতে অন্যদের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ সম্পর্কে আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। মহান আল্লাহ তা'আলা ই হলেন তাওফীক দাতা।

^১ বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদিস ৩৭১৪। একবার হযরত আলী রাডিয়াল্লাহু আনহু আবু জাহলের কন্যাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা জানার পর মিথ্যারে আরোহণ করে একথা বলে ভাষণ দান করেন। তখন হযরত আলী রাডিয়াল্লাহু আনহু তাকে কঠোরভাবে ওই মনোভাব ত্যাগ করেন।

^২ খাইবার সফরের সময় জনৈক ইহুদী রমনী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষ প্রয়োগ করে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করে ফেলেন। কারণ তার বিষ মিশ্রিত খাদ্য খেয়ে হযরত বশির বিন বারা রাডিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসাস স্বরূপ তাকে হত্যা করে ফেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

حُكْمُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ دُونَ قَصْدٍ أَوْ إِغْتِيَادٍ

অনিচ্ছাকৃতভাবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানহানির বিধান

কাযী আবুল ফযল আয়ায রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ইতোপূর্বে আমি ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যে ইচ্ছাকৃত হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে, বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তুচ্ছ তাক্ষিল্য করবে, অথবা কোনো স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক বিষয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিযুক্ত করবে, এর বিধান সুস্পষ্ট হয়েছে। তাতে কোনো প্রকার জড়তা ও জটিলতা নেই।

দ্বিতীয় বিষয় হলো যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করা হয় বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানহানি করার চেষ্টা করা হয়, বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে (নাউযবিলাহ), হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিশাপ দেয়, বা গালি দেয়, বা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, বা এমন সব বিষয়কে তাঁর সাথে সম্পর্কিত করে যা তাঁর শানে জায়য নয় কিংবা এমন বিষয় নিষেধ করে যা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকা জরুরী। এগুলো এমন বিষয় যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মান-মর্যাদার জন্য ক্ষতিকর। যেমন কোনো কবির গুনাহকে তাঁর সাথে সম্পর্কিত করা। অথবা এরূপ বলা যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিধান প্রবর্তন করায় বা দীন প্রচারে অলসতা করেছেন (নাউযবিলাহ)। অথবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও মর্তবা কম, বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ পরম্পরা সম্পর্কে কুমন্তব্য করে অথবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞানের পরিধি স্বল্প বলে বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তিকে উপেক্ষা করে তাঁর সমুন্নত গুণাবলী যার সাথে তিনি সর্বাত্মক পরিচিত ওই গুণাবলীসমূহকে মিথ্যা বলে আর ওই খবরসমূহ যা মুতাওয়াতির (ধারাবাহিক সূত্রে) প্রমাণিত হয়েছে। সেগুলোকে মিথ্যা বলে, খবরে মুতাওয়াতিরকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করে, বা নির্বোধের মত কথা বলে, বা খারাপ কথা বলে, অথবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে এমন কথা বলে যাতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়া অবধারিত হয়।

যদি এ সব কাজ ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে না বলে, আর বক্তার উদ্দেশ্যে যদিও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়া না হয় বা সে অজ্ঞতা ও

স্বভাবগত ক্রটি-বিচ্যুতি বা নেশাখস্ত হওয়ার কারণে এরূপ বলে বা উদ্ধৃত্য প্রকাশ করে, বা কথাবার্তায় নিয়ন্ত্রণ না রাখার কারণে এ ধরনের কথা বলে, বা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে বা অহংকারবশতঃ সে এ ধরনের কথা বলে- এ বিষয়সমূহের বিধান প্রথম প্রকার বিধানের অনুরূপ। অর্থাৎ এ ধরনের উক্তি প্রকাশকারীদেরকে হত্যা করে ফেলতে হবে। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে কোনো প্রকার নীরবতা বা মৌনতা অবলম্বন করা যাবে না। কারণ এটা কুফরী কাজ। আর কুফরী কাজে অজ্ঞতা, মুখের ভাষায় ভুল করা বা ওইসব কথা যা আমি উল্লেখ করেছি ধর্তব্য হবে না। আর ওইগুলোকে ওজর আপত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। যদি তার স্বভাব নির্মল স্বচ্ছ হয় তবে এ অবস্থায় ওটাকে ওজর হিসেবে মেনে নেয়া হবে, যখন কেউ তাকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করে কিন্তু তার অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় থাকে।

স্পেনের আলেমগণ ইবনে হাতিম সম্পর্কে এ ফাতওয়া দিয়েছেন, যখন সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুহদ বা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তিকে অস্বীকার করে। আমি এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করেছি।

মুহাম্মদ বিন সাহনুন ওই ব্যক্তিকেও হত্যা করার ফাতওয়া দেন, যে ব্যক্তি দুশমনের হাতে বন্দী ছিলো, আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিয়েছে। যদি প্রমাণিত হয় যে, জোরপূর্বক তাকে দিয়ে গালি দেয়ানো হয়েছে বা সে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে গেছে, তখন তাকে হত্যা করার আদেশ দেওয়া যাবে না।

আবু মুহাম্মদ বিন আবি যারিদ থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমাননাসূলভ কথাকে ভুল হয়েছে বলে আপত্তি করা যাবে না।

আবুল হাসান কাবেসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওই ব্যক্তিকে হত্যা করার ফাতওয়া দিয়েছেন, যে ব্যক্তি নেশাখস্ত অবস্থায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে। কারণ এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে ধারণা করতে হবে যে, সে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে এ কাজ করেছে। তারা স্বজ্ঞানেও এরূপ করবে। দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে, এ ধরনের লোকদের হত্যা করা শরীয়াতের বিধান। আর নেশাখস্ত হওয়ার কারণে শরীয়াতের বিধান রহিত হয় না। যেমন ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ, হত্যা ও অন্যান্য শাস্তির বিধান নেশার কারণে রহিত হয় না। কারণ নেশাখস্ত হওয়া সে নিজেই গ্রহণ করেছে। কারণ নেশা সেবনকারী জানে যে, নেশা সেবন করলে জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাবে, আর তার দ্বারা এমন মন্দ কাজ সংঘটিত হবে। তাই এরূপ ব্যক্তির উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো, যে স্বেচ্ছায় এ

কাজ করবে। এ কারণে তার উপর তালাক বা ক্রীতদাস মুক্ত করার বা হত্যার বিনিময়ে হত্যা ও শরীয়াতের নির্ধারিত শাস্তি অবধারিত করে দিয়েছি।^১

হযরত হামযা রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীস দ্বারা এখানে দ্বিমত প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। যখন তিনি নেশাখস্ত অবস্থায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন যে, আপনি আমার পিতার গোলাম। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পেরেছেন যে, সে নেশাখস্ত হয়েছে। তাই তিনি উক্ত স্থান ত্যাগ করে চলে আসেন। কারণ তখন পর্যন্ত মদ হারাম করা হয়নি। এ কারণে তখন মদ পানে গুনাহ ছিলো না। সুতরাং মদ্য পানের কারণে যা প্রকাশ পায়, তা ক্ষমাযোগ্য ছিলো। অনুরূপভাবে নবিজ্ব বা অনুরূপ কোনো ঔষধ সেবনের পর যা প্রকাশ হয় তাতে ক্ষতির কোনো কারণ নেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

^১ অর্থাৎ যদি কেউ নেশাখস্ত অবস্থায় স্ত্রী তালাক দেয় বা ক্রীতদাস মুক্ত করে, বা কাউকে হত্যা করে বা এ ধরনের কোনো অপরাধ করে তার উপর শরীয়াতের নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা ওয়াজিব হবে। তাই নেশাখস্তের স্ত্রী তালাক দেয়া হত্যার বিনিময়ে হত্যা ও শরীয়াতের নির্ধারিত শাস্তি রহিত হবে না। বরং সকল প্রকার শাস্তি তার উপর কার্যকর হবে। তাহলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বে'আদবী করার শাস্তি কেনো কার্যকর হবে না।

حَقِيقَةُ قَائِلِ ذَلِكَ هَلْ هُوَ كَافِرٌ أَوْ مُرْتَدٌّ

হযরত  এর প্রতি মিথ্যারোপকারীর প্রকৃতি

তৃতীয় প্রকার হলো, ওই বিষয় যাতে একধাঙ্গমূহকে মিথ্যা বলার চেষ্টা করা হবে, যা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন বা যা নিয়ে তিনি ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেছেন বা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও রিসালাতকে অস্বীকার করা বা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক সন্তাকে অস্বীকার করা বা যে-কোনো প্রকার কুফরী করা, চাই অন্য দ্বীন গ্রহণ করুক বা না করুক, সর্বসম্মতিক্রমে ওই ধরনের লোককে কাফির বলা হয়েছে। আর তাকে হত্যা করা ওয়াজিব বলা হয়েছে। তারপর দেখতে হবে যে, সে এসব কথা স্পষ্ট বলেছে কী না? এ অবস্থায় তার হুকুম মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীর হুকুমের মতোই হবে।

এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তাকে তাওবা করাতে হবে কী হবে না? আর তাওবা করার কারণে তার হত্যার আদেশ রহিত হবে কী হবে না?

এ বিষয়ে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো, তাওবা করার কারণে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক রহিত হবে না। তবে যদি সে এমন কোনো মিথ্যা কথা বলে যার কারণে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ক্রটি-বিচ্যুতি আরোপিত হয়, আর সে নিজের কথা গোপন করে, তাহলে তার হুকুম হবে যিন্দীকের হুকুম অনুরূপ। আমাদের মতে, তাওবা করার কারণে তার হত্যার আদেশ রহিত হবে না। আমি এবিষয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর সাধীদের অভিমত হলো, যে ব্যক্তি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করে বা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। তার রক্তপাত বৈধ হবে, যদি না সে তার কথা প্রত্যাহার করে নেয়।

হযরত ইমাম মালেক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছাত্র ইমাম ইবনে কাসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে মুসলমান একথা বলে যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী ছিলেন না, বা আল্লাহর রাসূল ছিলেন না, বা তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়নি বরং এগুলো 'তাঁর মনগড়া কথা', তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও তাঁর মুবারক সন্তাকে অস্বীকার করে, আর সে যদি নিজেকে মুসলমান বলে তাহলে সে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হবে। আর অনুরূপ ওই ব্যক্তি যে প্রকাশ্যে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলে এরূপ ব্যক্তিকে তাওবা করাতে হবে। আর এ হুকুম ওই ব্যক্তিরও হবে যে নিজেকে নবী বলে দাবী করে এবং ধারণা করে যে, তার নিকট ওহী আসে। সাহনুন এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ইবনে কাসিম বলেন, এ ধরনের লোক চাই গোপনে বা প্রকাশ্যে লোকজনকে তার প্রতি আহ্বান করে, সে মুরতাদ হবে।

ইবনে আসবাগও বলেন, সে মুরতাদই। কারণ সে আল্লাহর কিতাবের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে।

আশহাব ওই ইহুদীর সম্পর্কে বলেন, যে নবুওয়াতের দাবী করে বলে যে, তাকে রাসূল হিসেবে মানুষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে, বা সে যদি বলে যে, এ নবীর পর আরো নবী আসবেন, তবে ওই ব্যক্তির সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি সে প্রকাশ্যে এ রূপ দাবী করে, তাহলে তাকে তাওবা করাতে হবে। যদি সে তাওবা করে তাহলে তো ভালো নতুবা তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। কারণ সে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীকে মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে যে, لَا نَبِيَّ بَعْدِي - 'আমার পর অন্য কোনো নবীর আগমন হবে না।' আর সে নিজে নবুওয়াতের দাবী করে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হয়েছে।

মুহাম্মদ বিন সাহনুন বলেছেন, যে ব্যক্তি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আনীত বিষয়সমূহে এক বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ পোষণ করে সে কাফির ও অবিশ্বাসী হবে।

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেবে মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে।

সাহনুনের ছাত্র আহমদ বিন আবু সুলায়মান বলেন, যে ব্যক্তি বলে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারক কৃষ্ণ বর্ণের ছিলো, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। কারণ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারক কৃষ্ণ বর্ণের ছিলো না।

অনুরূপ অভিমত আবু ওসমান হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বৃদ্ধি করে বলেন, যদি কেউ বলে যে, দাড়ি উঠার পূর্বে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে গেছে, অথবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের পশ্চিমাঞ্চলের তাহারতাবাসী ছিলেন না, তিনি মক্কার তিহামার অধিবাসী ছিলেন, এ ব্যক্তিকেও হত্যা করে ফেলতে হবে। কারণ এটাও এক প্রকারের অস্বীকৃতি।

হাবীব বিন রবী বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমাম্বিত সিফাত ও সমুন্নত মর্যাদার পরিবর্তন করা কুফরী। আর এর প্রচারকারী কাফির। তাকে তাওবা করাতে হবে। যদি সে এটা গোপনে বলে, তাহলে সে যিন্দীক হবে। তাকে তাওবা না করিয়ে হত্যা করে ফেলতে হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْكَلَامُ يَحْتَمِلُ السَّبَّ وَغَيْرَهُ

গাল-মন্দের সম্ভাবনাময় কথা হযুর ﷺ এর সাথে সম্পৃক্ত করার বিধান চতুর্থ প্রকার হলো, অগোছালো কথা বলা বা অনুরূপ কোন জটিল কথা বলা যাতে দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। তন্মধ্যে একটির অর্থ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা সংশ্লিষ্ট হতে পারে, কিংবা অপরটির অর্থ নির্ধারণ করায় সন্দেহ হতে পারে, সরাসরি অপছন্দনীয় নয় এমন কথা। এ বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে। আর মুকাল্লিদগণ দায়িত্বমুক্ত হয়েছেন যে, যাতে হত্যাযোগ্য ব্যক্তিদের ব্যাপারে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করা হয়েছে।

এক হলো, এ ধরনের লোক যার মধ্যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত-সম্মানের প্রভাব ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর সে তা যে-কোনো অবস্থায় সংরক্ষণ করতে চায়। সে বলে যে, এ ধরনের লোককে হত্যা করে ফেলতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো, ওই লোক যারা মানুষের রক্তের সম্মান সংরক্ষিত রাখতে চায়, তাদের ধারণা হলো, সন্দেহের কারণে শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি রহিত হয়ে যায়। যেহেতু এ ধরনের কথায় দ্বিতীয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু তাকে হত্যা করার ফাতওয়া দেয়া যাবে না।

আমাদের ইমামগণ এ ধরনের লোক সম্পর্কে মতভেদ প্রকাশ করেছেন। যেমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকে ঋণের কারণে পাওনাদার জ্বালাতন করার পর বলা যে, তুমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করো। তাতে সে ত্রুদ হয়ে বলে ফেললো যে, তাঁর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমত না করুন?

এ সম্পর্কে সাহনুনকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ওই ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কী অভিমত, যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় বা ফিরিশতাদের গালি দেয়, আর তাঁর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে?

প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, না। কারণ সে উত্তেজিত অবস্থায় এরূপ কথা বলেছে। আর সে গালি দেয়াকে নিজের অন্তরে গোপন করে রাখেনি।

আবু ইসহাক আল বারকী ও আসবাগ বিন ফারাজ বলেন, এ ধরনের লোকদের হত্যা করা যাবে না। কারণ যদিও সে তার কথায় গালি দিয়ে থাকে, তবুও সে

লোকদের গালি দিয়েছে, না হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিয়েছে তার পার্থক্য করা যায় না। এ কথা একরূপ, যা সাহনুন বলেছেন। সাহনুন বলেছেন, যে উত্তেজিত অবস্থায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাল-মন্দ করে সে মাজুর বা অক্ষম ধর্তব্য হবে না। বরং এর কারণ হলো, তার কথায় সন্দেহ রয়েছে, সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিয়েছে, না অন্য লোকদের গালি দিয়েছে তা স্পষ্ট নয়। আর বাহ্যিকদৃষ্টিতে এ ধরনের কোনো নিদর্শন নাই যে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা ফিরিশতাদের গালি দিয়েছে। এর না ধারাবাহিকতায় কোনো কথা রয়েছে। বরং যদি বলা হয় যে, সে লোকদের এ ধরনের কথা বলেছে। কারণ অন্য লোকেরা তাকে বলেছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করো। সুতরাং এ অবস্থায় ওই গালি ওই ব্যক্তির জন্য বুঝাবে। এ অভিমত সাহনুনের উভয় ছাত্র বারকী ও আসবাগের অভিমত অনুরূপ হয়েছে।

হারিস বিন মিসকিন কাযী ও অন্যান্য লোকদের ধারণা হলো, এ ধরনের লোককে হত্যা করতে হবে।

আবুল হুসাইন কবিসী এ ধরনের লোকের হত্যার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেন। আর যারা এ কথা বলে যে, প্রত্যেক সরাইখানার মালিক দাইয়ুস হয়, চাই সে প্রেরিত নবীই হোক না কেনো। আবুল হুসাইন তাকে বন্দী করে তার উপর কঠোরতা আরোপ করার আদেশ দান করেন। যাতে তার উচ্চারিত শব্দের অর্থ জানা যায় যে, সে বর্তমান সময়ে সরাইখানার মালিক কী না, তা প্রকাশ হয়ে যায়। আর একথা তো সবার জানা যে, কবিসীর সময় কোনো নবী ছিলো না। এ অবস্থায় তার কথায় তত কঠোরতা হবে না। কবিসী বলেন, যেন প্রকাশ্য শব্দে তো পূর্বাপর সব দাইয়ুসদের বুঝানো হয়েছে। আর পূর্ববর্তী যুগে আশিয়া কেরাম অতিক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা ধন-সম্পদ উপার্জন করেন। কিন্তু প্রমাণ ব্যতীত কোনো মুসলমানের প্রাণ হরণ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতে হবে, এবং বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার পর মীমাংসা করতে হবে।

আবু মুহাম্মদ বিন আবু যায়িদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ তা'আলা আরববাসীদের প্রতি অভিসম্পাত করুন, বনী ইসরাঈলের প্রতি অভিসম্পাত করুন, আদম সন্তানদের প্রতি অভিসম্পাত করুন। তারপর যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে জবাব দেয়, আমার উদ্দেশ্য আশিয়ায় কেরাম নন। বরং আমি জালিমদের উদ্দেশ্যে এ

কথা বলেছি। তখন তিনি বললেন, এ ধরনের লোকদের বিশেষভাবে সতর্ক করতে হবে, আর বাদশাহ যেকোন সতর্ক করা ভাল মনে করেন, তাকে সেভাবে সতর্ক করা হবে।

অনুরূপ তিনি ওই ব্যক্তি সম্পর্কে ফাতওয়া দিয়েছেন, যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ তা'আলা নেশা হারামকারী ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত করুন। আর যে বলে, নেশা হারাম করেছে কে? তা আমার জানা নেই। বা একরূপ ব্যক্তি যে বলে, 'আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত করুন। এ কথা বলে, لَا يَبِغِ حَاضِرٌ لِّبَادٍ -শহরবাসী গ্রামবাসীর নিকট কোনো জিনিষ বিক্রয় করবে না অথবা যে ব্যক্তি এ হাদীস বর্ণনা করেছে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করুন।

যদি সে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ হাদীস না জানার কারণে একরূপ বলে, তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে। তবুও তাকে সতর্ক করে দিতে হবে। এজন্যই যে, সে প্রকাশ্যে আল্লাহ তা'আলা ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়ার ইচ্ছা করেনি বরং সে নিজের ধারণানুযায়ী নেশা হারামকারীকে গালি দিয়েছে। সাহনুন ও তাঁর ছাত্রগণ এ ব্যাপারে এ ফাতওয়া দিয়েছেন।

অনুরূপ যে অজ্ঞ ব্যক্তি কোনো সময় বলে যে, ওহে একহাজার শুকরের বংশধর। বা হে এক হাজার কুকুরের পুত্র! যদি দেখা যায় যে, তার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে আশিয়ায় কেরাম ছিলেন, আর এ ধারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৌঁছে। তাহলে অবশ্যই এ ধরনের বাক্য উচ্চারণকারীকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিতে হবে। তার অজ্ঞতা প্রকাশ করে দিতে হবে। আর যদি জানা যায় যে, বাক্য উচ্চারণকারী তার পিতৃপুরুষদের গালি দেয়ার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে আশিয়ায় কেরামকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে।

অনুরূপ যদি কেউ কোনো হাশিমী বংশধরকে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা বনী হাশেমের বংশধরদের প্রতি অভিসম্পাত করুন। আর বলে, আমার এ কথার উদ্দেশ্য হলো অত্যাচারী লোক বা ওই ধরনের লোক যার বংশধারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হয়েছে। কেউ একরূপ খারাপ কথা বলে, যাতে তার পূর্বপুরুষগণ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর সে লোক বলে যে, আমি জেনে শুনে যাকে এ কথা বলেছি সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর। এ অবস্থায় তার প্রতি কঠোরতা আরোপ করতে হবে। তবুও স্পষ্ট কোনো নিদর্শন বিদ্যমান নেই। এ কারণে তার পূর্ব পুরুষদের মধ্য থেকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাদ দিতে হবে। আর তার কথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে।

সম্মানিত গ্রন্থকার বলেন, আমি আবু মুসা ইসা ইবনে মানাসকে দেখেছি, তাকে এক ব্যক্তি ওই লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, যে ব্যক্তি কাউকে বলেছে, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত অভিসম্পাত করুন। তখন তিনি বললেন, যদি এটা প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমাদের মাশায়েখগণ ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কঠোর মতভেদ প্রকাশ করে বলেছেন, যে ব্যক্তি এরূপ সাক্ষীকে যে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার পর তাকে বলে, তুমি কী আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে? আর সে জবাবে বলে, নবীদেরকে তো মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে, তাতে তোমার কী হয়েছে? শাইখ আবু ইসহাক বিন জা'ফর বলেন, এ ধরনের লোককে হত্যা করে ফেলতে হবে। কারণ এ শব্দ প্রকাশ্যে অতি নিকৃষ্ট। আর কাযী আবু মুহাম্মদ বিন মনসুর এ ধরনের লোকদের হত্যার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কারণ এশব্দে এ সন্দেহ রয়েছে, শব্দ ব্যবহারকারী এ বিষয়ের সংবাদ দিয়েছে, কাফিররা আশিয়ায়ে কেরামকে মিথ্যা অপবাদ দিতো। কর্ডোভার কাযী আবু আবদুল্লাহ বিন ইবনুল হাজ্জও এ ফাতওয়া দিয়েছেন।

কাযী আবু মুহাম্মদ এ ধরনের লোককে দীর্ঘ সময় বন্দী করে রাখার ও কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করার আদেশ দান করেছেন। তারপর তাকে শপথ করানো হয় যে, সে তার বিরুদ্ধে যা বলেছে তা সব মিথ্যা। কারণ তার সাক্ষ্য দুর্বল হয়েছে তারপর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

আমি আমার শিক্ষক কাযী আবু আবদুল্লাহ বিন ইসার নিকট তাঁর কাযীর পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে বসা ছিলাম। তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হয়, সে মুহাম্মদ নামীয় এক ব্যক্তিকে নিরর্থক কথা বলে, আর তাকে কুকুরের সাথে উপমা দেয়। আর পা দিয়ে তাকে আঘাত করে বলে যে, মুহাম্মদ দাঁড়াও! ওই ব্যক্তি এ অভিযোগ অস্বীকার করে, কিন্তু একদল লোক তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়। তখন কাযী তাকে বন্দী করার নির্দেশ দেন। আর তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন যে, সে এমন লোকদের সান্নিধ্যে ছিলো কিনা যাদের আকীদা (ধর্মবিশ্বাস) সন্দেহযুক্ত যখন এটার প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তখন তাকে বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দেয়া হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

حُكْمٌ مَنْ وَصَفَ نَفْسَهُ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْأَنْبِيَاءِ رَفَعًا لِسَانِهِ أَوْ اسْتِغْفَارًا لِلشَّامِ
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

নবীগণের গুণাবলীকে তুচ্ছজ্ঞান করে কারো সাথে উপমা দেয়ার বিধান প্রসঙ্গে পঞ্চম প্রকার হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোষারোপ করার ইচ্ছা না করা, আর না তাঁকে অভিযুক্ত করা, আর না তাঁকে গালি দেয়া, কিন্তু তাঁর কোনো কোনো গুণাবলীর উল্লেখ করা বা তাঁর এমন কোনো কোনো অবস্থাকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করা যা উদাহরণ হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছে, তারপর তাঁকে নিজের সাথে কিংবা অন্য ব্যক্তির সাথে তুলনা ও দলীলস্বরূপ পেশ করা বা তাঁর প্রতি জুলুম করা হয়েছে বা তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে ওইরূপ কোনো বিষয় নিজের বা অন্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করার মানসে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদাহরণ পেশ করা। তার উদ্দেশ্যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা বৃদ্ধি না করা। বরং তার উদ্দেশ্য হাসি-ঠাট্টা করা। বা কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে এরূপ কথা বলা। যেমন কোনো ব্যক্তি বলে, যদি আমার দোষ বর্ণনা করা হয়, তাহলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোষও বর্ণনা করা হলো অথবা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়, তাহলে সম্মানিত নবীগণকেও মিথ্যাবাদী বলা হবে বা এইরূপ বলা যে, যদি আমি গুনাহ করি তবে আশিয়ায়ে কেরামও তো গুনাহ করেছেন, তাহলে বলুন! আমি মানুষ হয়ে এবিষয় থেকে নিরাপদ থাকবো কি করে, যেখানে আশিয়ায়ে কেরাম নিরাপদ থাকতে পারেননি। অথবা এরূপ বলা, আমি সেভাবে ধৈর্যধারণ করেছি যেভাবে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসূলগণও ধৈর্যধারণ করেছেন। অথবা আমি হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের মতো ধৈর্যধারণ করেছি অথবা এরূপ বলা যে, আল্লাহর নবীও কী এর চাইতে বেশী ধৈর্যধারণ করেছেন আমি যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছি? যেমন কবি মুতানাব্বী বলেছেন-

أَنَا فِي أُمَّةٍ تَذَارِكُهَا.....اللَّهُ غَرِيبٌ كَصَالِحٍ فِي ثَمُودٍ.

-আমি এই উম্মাতের মধ্যে আল্লাহ থেকে এরূপ অজ্ঞাত হয়েছি, যেমন হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালাম সামূদ গোত্রের নিকট অজ্ঞাত ছিলেন।

এরূপ ওই কবিদের কাব্য যা সীমালঙ্ঘন করেছে। আর তারা উদ্ধৃত্য প্রকাশ করেছে। যেমন আল মা'আররির এ কবিতা-

كَتَبْتُ مُوسَى وَاقْتَهُ بِنْتُ شُعَيْبٍ ... غَيْرَ أَنْ لَيْسَ فِيكُمَا مِنْ فَقِيرٍ.

-তুমি মুসা তোমার নিকট হযরত শূয়াইবের কন্যা এসেছে। তবে কথা হলো যে, তোমাদের উভয়ের কেউ মুখাপেক্ষী ছিলো না।^১

এ কবিতার দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে আপত্তিজনক। কারণ উক্ত পঙ্ক্তিতে আল্লাহর নবীকে অপমান করা হয়েছে। আর অন্যকে তার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

لَوْلَا انْقِطَاعُ الْوَحْيِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ... قُلْنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِيهِ بِدِيلٍ

مَوْثِقُهُ فِي الْفَضْلِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِهِ بِرِسَالَةٍ جَزِيلٍ.

-যদি না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী আগমন বন্ধ হতো, তবে আমি বলতাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতা মুহাম্মদের সাথে বদল হয়েছে।^২ সে মর্যাদার দিক দিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতই, তবে তার নিকট হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম রিসালতের বাণী নিয়ে আগমন করে নি।

তার প্রথম কবিতায় অত্যন্ত অশালীন উক্তি করা হয়েছে যে, সে কবি তার কবিতায় নবী ব্যতীত অন্যকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদায় অংশীদার করেছে।

আর দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে দু'টি আপত্তি রয়েছে। এক তো তার প্রিয় ব্যক্তিকে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকক্ষ করেছে (নাউযুবিল্লাহ)। সে শুধু নবুওয়াত লাভ করার বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পিছপা হয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো, (মা'আযাল্লাহ) নবুওয়াত লাভ করা না করায় কোনো পার্থক্য নেই। যদিও কবির প্রিয় ব্যক্তি নবুওয়াত লাভ করতে পারেনি। তবুও সে সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত (আসতাগফিরুল্লাহ) এটা প্রথম পঙ্ক্তির চেয়েও অশালীন ও ধৃষ্টতাপূর্ণ হয়েছে।

^১ হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম যখন মিশর ত্যাগ করে মাদায়েনে গিয়ে গাছের নীচে বিশ্রাম নেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন, হে আমার প্রভূ! তুমি আমার প্রতি যা কিছু কল্যাণকর তা অবতীর্ণ করো। আমি তোমার মুখাপেক্ষী। এখানে এ কবিতায় সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

^২ কবি মা'আররি এ কবিতায় মুহাম্মদ নামক এক উল্লুববীর প্রশংসা করে। তার প্রশংসায় এতো অতিরিক্ত করেছে যার ফলে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বে'আদবী করে বাসেছে।

এ ধরনের আরো এক কাব্যমালা রয়েছে-

وَإِذَا مَا رُفِعَتْ رَايَاتُهُ ... صَفَقَتْ بَيْنَ جَنَاحَيْ جَزِيرٍ.

-যখন তার পতাকা উত্তোলন করা হতো, তখন সে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এর উভয় পাখার মাঝে নড়াচড়া করতো।

সমসাময়িক এক কবি বলেছে-

قَرَّ مِنَ الْخُلْدِ وَاسْتَبْجَارَ بِنَا ... فَصَبَّرَ اللَّهُ قَلْبَ رَضْوَانَ.

-সে বেহেশত থেকে পলায়ন করে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের রক্ষক রিদওয়ানের অন্তরে ধৈর্য দান করেন।

যেমন স্পেনীয় কবি হাসসান মিসীসীর কবিতা। সে মুহাম্মদ বিন আব্বাদ আল মু'তামিদ নামে খ্যাত ছিলো, সে তার উজির আবু বকর বিন যায়দুনের প্রশংসায় বলেছে-

كَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَبُو بَكْرٍ الرِّضَى ... وَحَسَّانَ حَسَّانٌ وَأَنْتَ مُحَمَّدٌ.

-যেনো তোমার উজির আবু বকর, আবু বকর রিদা অর্থাৎ হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আর হাসসান কবি হাসসান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসাকারী, আর তুমি মুহাম্মদ হয়েছে।

এ ধরনের আরো অনেক কবিতা রয়েছে। এ ছাড়া আমি এ ধরনের অন্যান্য কবিতা উল্লেখ করা অপছন্দ করি। কিন্তু এখানে এই কবিতাগুলো উল্লেখ করার কারণ হলো, মানুষ এ কবিতার প্রশংসা করে। অধিকাংশ লোক এ কবিতার গুরুত্ব জানতে পারেনি, তাই আমার উদ্দেশ্য তাদের বোঝা হালকা করে দেয়া। অথচ তারা এটা জানে যে, এটা কত বড় গুনাহের কাজ। মানুষ বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে এ ধরনের কথা বলছে। আসলে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই। আর স্বীয় অজ্ঞতার কারণে এটাকে অতি তুচ্ছ মনে করে। অথচ আল্লাহ তা'আলার নিকট এটা বিরাট গুনাহের কাজ। বিশেষ করে কবিদের মধ্যে কেউ কেউ তো প্রকাশ্যে এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ কবিতা রচনা করে চলছে। স্পেনের ইবনে হানী ও ইবনে সুলায়মান মা'আররির কবিতা তো ক্রটি-বিচ্যুতি ও অবমাননার সীমালঙ্ঘন করে সরাসরি কুফরীর সীমায় পৌঁছে গেছে। আমরা এর প্রত্যুত্তর দিয়েছি।

আর এ অধ্যায়ে এ ধরনের উপমাসমূহের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, যদি আমরা এটা না বলি যে, এ কথা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গালির অন্তর্ভুক্ত হয়নি, আর না এর মাধ্যমে ফিরিশতাদের সাথে দোষ-ত্রুটি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর আমাদের উদ্দেশ্যে মা'আররির দু'টি কাব্যের শেষাংশ নিয়ে নয়। আর না আমরা এ কথাও বলছি যে, বজ্রা ইচ্ছাকৃত সম্মানহানির চেষ্টা করেছে। তবুও আমরা এ কথা অবশ্যই বলবো যে, কবিদ্বয় তাদের কবিতায় নবুওয়াতের প্রতি সম্মান পোষণ করেনি। আর না তারা রিসালাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে। আর না তারা আশিয়ায়ে কেরামের ব্যক্তিসত্তার সাথে সম্পৃক্ত মযাদার ও মহত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে, না ত্রুক্ষিপ করেছে। কবি পুরস্কার লাভের আশায় স্বীয় প্রশংসিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা উপমা দিয়েছে। চাই তারা আশিয়ায়ে কেরাম বা ফিরিশতামণ্ডলী হোক না কেনো। তারা ধারণা করেছে যে, যদি আমরা উপমা দিই, তাহলে মজলিশে সমাবেত লোক খুশি হবে। অথবা যদি প্রশংসিত ব্যক্তির প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করি, তাহলে তাদের কবিতা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন হবে। কিন্তু তারা এমন লোকদের সাথে উপমা দিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন, এমন কি তাঁদের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলাও নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং এ ধরনের লোক শাস্তিযোগ্য। যদিও তাকে হত্যা করা না হয়। তবে কমপক্ষে তাকে কঠোর নির্দেশের মাধ্যমে সতর্ক করে দিতে হবে, তাকে কারাবন্দী করতে হবে। তারপর দেখতে হবে তার কথায় কী পরিমাণ বোকামি রয়েছে। সে কি স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী এ ধরনের কথা বলে বা মাঝেমধ্যে এ ধরনের অর্থহীন কথা বলে? বা তার কবিতার উদ্দেশ্য কী? সত্যই কী সে নিজে নিজের কথার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে? এরপর যে অবস্থা হবে সে অনুযায়ী তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যে ব্যক্তি এ ধরনের কথা বলবে মোতাকাদিমীন আলেমগণ তার সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছেন। যেমন আবু নাওয়াস আব্বাসী খলিফা হারুন রশিদ সম্পর্কে এ কবিতা রচনা করার পর তাকে ত্রুক্ষিত করা হয়। কবিতাটি হলো এই—

فَإِنْ يَكُ بَاقِي سِحْرِ فِرْعَوْنَ فَيَكُمُ ... فَإِنْ عَصَا مُوسَى بِكَفِّ خَصِيبٍ.

—যদি তোমাদের মধ্যে ফিরাউনের যাদুর অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান থাকে তাহলে নিশ্চিত হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর হাতের লাঠিও বিদ্যমান রয়েছে।

এ কবিতা শোনার পর খলিফা হারুন-উর-রশিদ আবু নাওয়াসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে নষ্ট নারীর সন্তান! তুমি হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের হাতের

লাঠি নিয়ে তামাশা করেছে? এ বলে সৈন্যবাহিনীকে রাতের মধ্যে তাকে মিশর থেকে বের করে দেয়ার আদেশ করেন।

আর কাতবী উল্লেখ করেন, এ ছাড়াও আবু নাওয়াসকে আরো জবাবদিহী করতে হয়েছে। তাকে কাফির বা কাফিরের নিকটবর্তী পৌছেছে বলে মন্তব্য করা হয়। যখন সে মুহাম্মদ আমীনকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপমা দিয়ে বলেছিলো—

تَنَازَعُ الْأَخْمَدَانِ الشُّبَّةَ فَاشْتَبَهَا ... خَلَقًا وَخُلُقًا كَمَا قَدْ الشَّرَّكَانُ

—উভয় আহমদ সাদৃশ্যতায় ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। আর তারা চারিত্রিক দিক থেকে সাদৃশ্য হয়ে পড়েছে। যেভাবে জুতার দু'টি ফিতা এক সমান করে কাটা হয়।

আর তার এই কবিতার নিন্দাও করা হয়।

كَيْفَ لَا يُذْنِبُكَ مِنْ أَمَلٍ ... مَنْ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ نَفَرِهِ

—কেন তিনি তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারবেনা, যার আত্মীয়তায় স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রয়েছেন।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মযাদার হক হলো, কোনো বস্তুকে তাঁর দিকে সম্পর্কিত করা যাবে। কিন্তু তাঁকে কোনো বস্তুর সাথে সম্পর্কিত করা যাবে না। এ ধরনের উপমাসমূহেরও ওই একই হুকুম। যেমন এ সম্পর্কে আমি ইমাম মালিক বিন আনাস রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর শিষ্যদের ফাতওয়া ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

‘নাওয়াদির’ গ্রন্থে ইবনে আবী মারযাম থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে গরীব হওয়ার কারণে লজ্জা দেয়। তখন সেই ব্যক্তি বললো, তুমি আমাকে গরীব হওয়ার কারণে লজ্জা দিচ্ছে, অথচ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মেষ চরিয়েছেন। ‘ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ ব্যক্তি অনুপযুক্ত স্থানে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করেছে। আমি তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করি। তিনি আরও বলেন, গুনাহগারদের জন্য একথা শোভনীয় নয় যে, যখন গুনাহ প্রকাশ করার কারণে তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়, তখন সে একথা বলবে যে, আমার পূর্বে তো আশিয়ায়ে কেরাম গুনাহ করেছেন।

হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক ব্যক্তিকে বললেন, আমার জন্য এমন এক আরব বংশধর সেক্রেটারী খোঁজ করো, যার পিতা আরবী হবে। তখন তাঁর এক সেক্রেটারী বললো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা তো অমুসলিম ছিলেন। তখন হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে বললেন তুমি তাঁর উদাহরণ দিচ্ছে? তুমি ভীষণ বে'আদবী করেছো। একথা বলে তাকে পদচ্যুত করে বললেন, তুমি আগামীতে আর কখনো আমার নিকট চাকুরীর জন্য আসবেনা।

বিস্ময় প্রকাশ করার সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা ইবনে সাহনুন দোষনীয় মনে করেন। তবে যদি সাওয়াব ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে পাঠ করে, তাহলে তার মতে ক্ষতিকর নয়। তবে সর্বদা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ আদেশ করেছেন।

কাবিসীকে এ ধরনের এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যে ব্যক্তি এক কুখ্যাত আকৃতির লোক দেখে বলেছে যে, এই লোকের চেহারা যেনো নকীরের চেহারার মতো।^১ আর এক চিন্তিত লোক সম্পর্কে বললো, এই লোকটির চেহারা যেন তুফুর ফিরিশতার চেহারার মতো।^২ তখন কাবিসী বললেন, তার এরূপ বলার উদ্দেশ্যে কী? নকীরকে দেখে যেভাবে ভীত হয় এই লোককে দেখে সেভাবে ভীত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু যদি তার উদ্দেশ্য হয় কুখ্যাত চেহারা। তাহলে এটা হবে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা। কারণ এভাবে সে এক ফিরিশতার আকৃতিকে দোষনীয় করেছে যা ফিরিশতার অবমাননা করার নামান্তর। এ জন্য তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যদিও এ কথা বলার মাধ্যমে সে সরাসরি ফিরিশতাকে গালি দেয়নি। মূলতঃ তাতে সে সম্বোধনকারীকে গালি দিয়েছে। তবুও আমরা মনে করি এ ধরনের নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকদেরকে বেত্রাঘাত করা ও আদব শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে ত্রুটি করার জরুরী।

অনুরূপভাবে মালিক তথা জাহান্নামের ফিরিশতার সাথে উপমাদানকারীকেও শাস্তি দিতে হবে। এক ব্যক্তির বিমর্ষতার কারণে তাকে মালিকের সাথে উপমা দেয়া অপরাধ। যদি ওই চিন্তিত ব্যক্তি বিচারক হয় আর বক্তা তার চিন্তাযুক্ত চেহারা দেখে ভীত হয়ে একথা বলে যে, সে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে মালিকের মতো

^১. মুনকার ও নকীর তো ওই দু'ফিরিশতার নাম যারা মৃত ব্যক্তির ইমান পরীক্ষা করার জন্য কবরে আগমন করেন।

^২. দোযখের দারোগার নাম।

ক্রোধ প্রকাশ করছে। তাহলে এটা হবে অতি সাধারণ কথা। এর জন্য তাকে জবাবদিহী করতে হবে না। কিন্তু যদি সে ওই ক্রোধান্বিত ব্যক্তির প্রশংসা করে। আর এর জন্য তুচ্ছ ক্রোধান্বিত চেহারাকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করে, তাহলে সেটা হবে চরম ধৃষ্টতা। আর এর জন্য অবশ্যই তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যদি বক্তার উদ্দেশ্য ফিরিশতাকে অপমান ও অবজ্ঞা করা না হয়। আর যদি সে ফিরিশতাকে অবজ্ঞা ও অপমানের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কথা বলে, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

আবুল হুসাইন এক যুবক সম্পর্কে বলেন, যাকে কোনো এক ব্যক্তি বললো যে, চূপ করো, কারণ তুমি উম্মী। আর সে ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বললো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উম্মী (নিরক্ষর উদ্দেশ্য করে) ছিলেন না? তখন তাকে ধিক্কার দেয়া হয়। লোকজন ওই যুবককে কাফির বলতে শুরু করে। তখন সে ভীত হয়ে তার এ কথার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে।

তখন আবুল হুসাইন বললেন,

أَمَّا إِطْلَاقُ الْكُفْرِ عَلَيْهِ فَخَطَأٌ لَكِنَّهُ مُخْطِئٌ فِي اسْتِشْهَادِهِ بِصِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَوْنُ النَّبِيِّ أُمِّيًّا آيَةٌ لَهُ، وَكَوْنُ هَذَا أُمِّيًّا نَقِصَةٌ فِيهِ وَجْهًا لَهُ.

-মোটকথা তাকে কাফির বলা তো বৈধ হবে না। তবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমাম্বিত সিফাত উম্মী হওয়াকে স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ দলীল হিসেবে পেশ করা গুনাহ। কারণ উম্মী হওয়া ছিলো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা। আর এ যুবকের নিরক্ষর হওয়া হলো তার জন্য ত্রুটি ও অজ্ঞতা।

তাই সে তার নিরক্ষর হওয়ার কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমাম্বিত গুণাবলীকে দলিল হিসেবে পেশ করেছে। তবুও সে তাওবা করেছে এবং নিজের গুনাহ স্বীকার করে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। তাই তাকে ছেড়ে দেয়া যায়। কারণ তার কথা সীমালঙ্ঘন পর্যন্ত পৌঁছেনি যে, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। যেহেতু এরূপ বাক্য উচ্চারণকারী স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে। তারপর তাকে শাস্তি দেয়া ঠিক হবে না।

অনুরূপ স্পেনের কাযীদের মধ্যে আমার শিক্ষাগুরু আবু মুহাম্মদ বিন মনসুরও ছিলেন। তাকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা হয়, যে ব্যক্তি অন্যকে অভিযুক্ত করেছে। আর সে জবাবে বলে যে, তুমি আমাকে অভিযুক্ত করছো, আমি

তো মানুষ, আর মানুষের তো দোষত্রুটি থাকবেই। এমন কি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা থেকে মুক্ত নন (নাউযুবিল্লাহ)।

তখন আমার উস্তাদ ফাতওয়া দেন যে, তাকে দীর্ঘ সময় কারাগারে বন্দী করে রাখতে হবে, আর কঠোর শাস্তি দিতে হবে। যদিও সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়ার ইচ্ছা করেনি। আর স্পেনের কোনো কোনো ফিকহবিদ তাকে হত্যার ফাতওয়া দেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

حُكْمُ النَّاقِلِ وَالْحَاكِمِ هَذَا الْكَلَامُ عَنْ غَيْرِهِ

কুফরী বক্তব্য বর্ণনা ও উদ্ধৃতকারীর বিধান

ষষ্ঠ প্রকার হলো, আলোচকের অপমানজনক আলোচনাকে অন্য কারো নিকট থেকে উদ্ধৃত করা। এ অবস্থায় আলোচকের বর্ণনাও মূলবর্ণনাকারীর বাচনভঙ্গি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তাদের বক্তব্যের মতভেদের উপর ভিত্তি করে বিধানের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবে। এ অবস্থায় চার প্রকার বিধান কার্যকর হবে। যথা ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মাকরুহ ও হারাম।

যদি আলোচক মূল বক্তার কথার সাক্ষ্য প্রদান করে তার কথা হুবহু উদ্ধৃত করে, আর তা অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে হয়। লোকদের তাকে ঘৃণা করার জন্যেও তাকে অপমান করার উদ্দেশ্যে এরূপ বলে, তাহলে তার কথা মেনে নিতে হবে। আর তার এ পদক্ষেপের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে।

অনুরূপ যদি সে ওই বর্ণনাকে তার গ্রন্থে উল্লেখ করে বা কোনো সভায় তা প্রত্যাখানের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে। আর তার উদ্দেশ্য হয়, এ ধরনের লোকদের প্রতিবাদ করা। বা তার সম্পর্কে যে ফাতওয়া দেওয়া হয়েছে, তা বর্ণনা করে। এ রূপ করা তার জন্য ওয়াজিবই হবে।

কোনো কোনো অবস্থায় বর্ণনাকারীও (অপমানজনক কথা উচ্চারণ করে) আলোচকের পক্ষ থেকে তা বলা মুস্তাহাব হবে। যেমন আলোচকের এ ধরনের লোক হওয়া যে, মানুষ তার নিকট জ্ঞান অর্জন করে। যেমন তার শিক্ষক বা মুফতী হওয়া বা হাদীস বর্ণনাকারী হওয়া বা সরকারের পক্ষ কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকা বা শরীয়াতের কোনো মাসায়ালায় তার পক্ষ থেকে ফাতওয়া দেয়া হয়। (আর সে যদি কোনো আশালীন কথা বলে) তাহলে তার কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রয়োজন। যাতে মানুষ তার নিকট থেকে সতর্ক হতে পারে। আর এ অবস্থায় মুসলমান বিচারকের নিকট তার কথার সাক্ষ্য দিতে হবে। আর মুসলমান বিচারকদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ লোক সম্পর্কে এরূপ কথা জানতে পারে তার উপর ওয়াজিব হলো, তার কথা অস্বীকার করে তার কুফরী প্রকাশ করা। এছাড়া তার অশালীন কথার ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করা। যাতে এ ধরনের লোকদের দ্বারা মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে। আর তাতে সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক আদায় হবে।

এই হুকুম ওই ব্যক্তির সম্পর্কেও প্রযোজ্য হবে, যার দ্বারা এরূপ কথা প্রকাশ হয়। আর সে ব্যক্তি জনসাধারণে মাঝে ওয়াজ-নসীহত করে বা শিশুদের শিক্ষা দেয়। কারণ যে ব্যক্তি এ ধরনের অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়, তার অন্তর সর্বদা অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়। তার ব্যাপারে সর্বদা এ বিষয়ে সন্দেহ হয় যে, সে সব সময় মানুষের মনে এ ধরনের কথা জাগিয়ে দিতে পারে। সুতরাং হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও তাঁর শরীয়তের হক সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ ধরনের লোকদের মন্দ ও ভ্রষ্টতা প্রচার করা অতীব জরুরী।

উপরে যা আলোচনা করা হয়েছে (যা এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে) যদি ওই ধরনের না হয়, তবুও হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের হক বহাল রাখার উদ্দেশ্যে জোর প্রচেষ্টা চালানো একান্ত জরুরী ও অত্যাৱশ্যক কর্তব্য। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সংরক্ষণ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ওয়াজিব। তাঁর মুবারক হায়াত ও ওফাতের পরও সর্বাবস্থায় যদি কেউ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করে, তাহলে তার বিপরীতে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। যদি এ কাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এমন কোনো লোক দাঁড়িয়ে যায়, যার মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, আর তিনি বিরোধ মীমাংসাকারী ও মধ্যস্থতাকারী হন, তাহলে সাধারণ মুসলমান এ ফরয দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। তবুও এ পরিস্থিতিতে ওয়াজিব হলো হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে অসদাচারণ করবে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়া। আর তাকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বিচারকে সাহায্য করা। হাদীসের বর্ণনায় মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্ত ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করার বিষয়ে পূর্ববর্তী আলেমগণ ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন। তাহলে বলুন এরূপ ব্যক্তি ধৃষ্টতা প্রকাশ করায় কী হতে পারে যে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা পোষণ করে?

আবু মুহাম্মদ বিন আবি যারিদকে ওই ধরনের এক সাক্ষীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার শানে এ ধরনের অসৌজন্যমূলক কথা বলতে শুনেছে। তার জন্য এ বিষয় বিচারকের সামনে একথা বর্ণনা করার কোনো অবকাশ আছে কী? তখন তিনি বললেন, যদি আশা করা যায় যে, বিচারক শরীয়তের বিধান প্রবর্তন করবেন, তাহলে অবশ্যই সাক্ষ্য দেবে। অনুরূপ সে যদি জানে যে বিচারক এ মোকাদ্দমায় অপরাধীকে হত্যার আদেশ দেবে না। তাকে তাওবা করিয়ে সতর্ক করে ছেড়ে দেবে, তবুও তাকে বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দিতে হবে।

উপর্যুক্ত দুটি উদ্দেশ্যের আলোকে আলোচকের শিষ্টাচারহীনতা ও ভ্রষ্টতার ধ্যান ধারণা প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেয়া সঠিক হবে। কিন্তু এছাড়া যদি কেউ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে মানহানিকর কথা বলে, তাহলে তা ব্যাপক আকারে প্রচার করা বা বার বার তার পুনরাবৃত্তি করা জাযিয় হবে না। কারণ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত-আবরু ও মান-সম্মম নিয়ে হাসি তামাশা করার কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোষ মুখে উচ্চারণ করো (চাই তা কারো উক্তি নকল করা হোক না কোনো) এগুলো শর'ই কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া পুনরাবৃত্তি করা কারো জন্য জাযিয় হবে না।

তবে আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যেসব উদ্দেশ্যের উল্লেখ করেছি, সে আলোকে এ বিষয়সমূহ আলোচনা করা ওয়াজিব বা মুস্তাহাবের মাঝামাঝি হবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে এ ধরনের ধৃষ্টতামূলক অপবাদের বিষয় উল্লেখ করেছেন। কাফির ও মুশরিকরা সাধারণতঃ আশিয়ায়ে কেরাম বিশেষ করে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দোষারোপ করেছে। তারপর তাদের এ সব অভিমত প্রত্যাখ্যান করে তাদের কুফরী সম্পর্কে তাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। তারপর তাদের এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজের জন্য তাদের কঠোর শাস্তির প্রতিশ্রুতি শুনানো হয়েছে। এ রূপ কথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর পূর্বাপর সকল আলেম এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন, এসব কাফির ও ভ্রষ্টদের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তিসমূহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা ও হাদীস বর্ণনার মজলিশে আলোচনা করা নাজাযিয় নয়। এভাবে ওইগুলো বর্ণনা করে তাদের প্রতিহত করতে হবে। আর তাদের কথার ব্যাখ্যা করে দিতে হবে।

যদিও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এরূপ কোনো কোনো কথা বর্ণনা করার কারণে হারিস বিন আসাদের সমালোচনা করেছেন।^১ কিন্তু শেষে তিনি জাহামীয়া মতাবলম্বী^২ ও ওই সবলোক যারা কুরআন সৃষ্ট বস্তু ধারণা করতো,

^১ হারিস বিন আসাদ মুহাসিবী নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। সে মুতাবিলা ও অন্যান্য বাতিল মতাবলম্বীদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অভিমত প্রকাশ করেন, ওই ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের কথা আমাদের গ্রন্থে উল্লেখ করা যাবে না। কারণ তাতে তাদের ভ্রান্ত মতামত আমাদের গ্রন্থের মাধ্যমে উম্মাতের নিকট পৌঁছে যাবে।

^২ জাহামীয়া মতাবলম্বীদের প্রতিষ্ঠাতা হলো জাহাম বিন সাফওয়ান, তার উপাধি ছিলো আবু মাহরাজ সমরকন্দি, সে জাহামিয়া মতবাদের প্রবক্তা ছিলো। তাবে তাবিঈনদের যুগে এ মতবাদ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সে যে আকাঈদ ও ইমানের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে এমন বর্বর ও নিষ্ঠুর নিদর্শন রেখেছে যে, এক শতাব্দী পর্যন্ত তার নিষ্ঠুরতার নিদর্শন বিদ্যমান ছিলো। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মানুষকে সম্পূর্ণ অন্ধম, জ্ঞানাত ও জাহান্নাম ধ্বংসশীল বলতো। (আল 'ইয়াযুবিহা)

তাদের প্রতিহত করার ব্যাপারে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেননি। সুতরাং এ ধরনের ভ্রান্ত-মতবাদ প্রকাশকারীদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সমালোচকদের বর্ণনা আলোচনা করা জাযিয়।

কিন্তু এ অবস্থা ছাড়া হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়ার কথা উল্লেখ করে সম্মানিত রিসালাতের মর্যাদা অভিযুক্তকারী ঘটনাসমূহ বর্ণনা করা ও বিপদগামীদের মনগড়া কাহিনীসমূহ সুন্দর ও প্রাজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করে লোকদের সাথে রং তামাশা করা বা নির্বোধ লোকদের মতো অতি বিস্ময়কর আশ্চর্যজনক রূপকথার গল্প বলা বা এরূপ অর্থহীন আঘাতে গল্পে মগ্ন থাকা। এগুলোর মধ্যে কোনো কোনো কথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর কোনো কোনো কথা সম্পূর্ণ অপছন্দনীয়, বরং শাস্তিযোগ্য ও অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

যদি কোনো ব্যক্তি এসব কথা উদ্দেশ্যহীনভাবে বর্ণনা করে বা সে যে কথা উদ্ধৃত করেছে, অথচ তার জানা নেই যে, সে কী বলছে বা সে কিরূপ কঠিন কাজ করেছে, অথবা সে কি ধরনের ভ্রান্ত কথা বর্ণনা করেছে। এটা তার অভ্যাস নয়। অথবা সে স্বীয় ধারণা অনুযায়ী বক্তব্য খারাপ মনে করে না। আর তাতে বর্ণনাকারী আলোচকের দোষ-গুণ কিছুই প্রকাশ পায় না। তাহলে এ ধরনের লোকদের সতর্ক করে দিতে হবে। যাতে তারা আগামীতে আর এরূপ কথা বর্ণনা না করে। বরং এজন্য তাকে লঘু শাস্তি দান করে সংশোধন করতে হবে। যাতে সে এ ধরনের সহজতর শাস্তি পেয়ে সতর্ক হয়ে যায়। যদি তার বর্ণনা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, যে কুরআন মাজীদকে সৃষ্টবস্তু মনে করে। তখন তিনি বললেন, সে কাফির, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

লোকটি বললো- আমি অপর এক ব্যক্তির কথা আপনাকে শুনিয়েছি। হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, কিন্তু আমি তো এখন তোমার মুখ থেকে শুনেছি।

হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লোকটিকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছেন। আর নকলকারীর উপর হত্যার ফাতওয়া জারী করেননি।

যদি এধরনের ঘটনায় বর্ণনাকারী নিজের ঘটনা বর্ণনায় সন্দিহান হয় যে, সে নিজের থেকে বানিয়ে বলছে, না তা অন্যের সাথে সম্পর্কিত করেছে। অথবা জানা

যায় যে, তার স্বভাব এমন যে, এরূপ কথা বর্ণনায় সে আনন্দবোধ করে, বা এ ধরনের ঘটনা বর্ণনা করাকে সে সাধারণ বিষয় মনে করে, বা এ ধরনের ঘটনা শুন্যর জন্য সে আগ্রহী থাকে বা সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কটুক্তিমূলক ও বিদ্‌পাত্মক কবিতা শুন্যর জন্য এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। তাহলে তার হুকুম হলো গালিদাতার হুকুমের অনুরূপ। তাকে তার নিজের কথার জন্য গ্রেফতার করা হবে। আর তখন যদি সে বলে, আমি এরূপ করিনি। বরং আমি অমুক ব্যক্তির কথা উদ্ধৃত করেছি। তাহলে তার এরূপ বলা তার নিজের জন্য কোনো উপকার বয়ে আনবে না। তাকে কালবিলম্ব না করে হত্যা করে হাবীয়া দোযখে পাঠিয়ে দিতে হবে।^১ বা তাকে তাড়াতাড়ি তার মায়ের নিকট পাঠিয়ে দিতে হবে।^২

আবু উবায়িদ কাসিম বিন সালাম এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কতিপয় বিদ্‌পাত্মক কবিতা মুখস্থ করেছে, তাকে কাফির বলেছেন।

আর এ ধরনের এক আলেম যে ইজমা সম্পর্কে এক গ্রন্থ রচনা করে, স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছে যে, এ মাসয়ালায় উম্মাতের আলেমদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বিদ্‌পাত্মক কবিতা আবৃত্তি কিংবা লিপিবদ্ধ করা, আর তা ধ্বংস না করে ছেড়ে দেয়া হারাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গ যারা উচ্চুত্তরের মুত্তাকী ও দ্বীনের সংরক্ষক ছিলেন (আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দয়া করুন)। তারা যুদ্ধবিগ্রহ ও ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে এ ধরনের কাহিনী উল্লেখ করা পরিহার করেছেন। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে এ ধরনের ঘটনা উল্লেখই করেননি। তবে তারা এ ধরনের অনেক ঘটনা যেগুলি অতি নিকৃষ্ট নয়, সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন, যাতে সেগুলোর বর্ণনাকারীদের শাস্তি দেয়া হয়। তারপর তাঁরা এ ধরনের ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছেন, যাতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের আল্লাহ তা'আলা কীভাবে তাদের পাপের শাস্তির জন্য পাকড়াও করবেন।

আবু উবায়িদুল কাসিম বিন সালাম আরববাসীদের বিদ্‌পাত্মক কবিতাসমূহ উপমা হিসেবে অনুসন্ধান করে একত্র করেন, তবে তিনি তাতে এতো সতর্কতা অবলম্বন

^১ হাবীয়া জাহান্নামের এক গর্তের নাম।

^২ এখানে تَذَكُّرٌ مَّارِيَةٌ - সে ধ্বংসকারী কোলে অবস্থান করবে (সূরা কারিয়াহ, আয়াত-৯) আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

করেন নি, তিনি বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনাকারীদের নাম উল্লেখ করা পছন্দ করেন নি। বরং তিনি বিশেষ সতর্কতা ও খোদাভীরুতার দরুণ তাদের ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। সরাসরি কোনো বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনাকারীর নাম উল্লেখ করে ওই কবিদের নাম প্রচারে অংশগ্রহণ করেননি। ব্যাস! তাহলে বলুন কোনো ঈমানদার লোকের পক্ষে এটা কী করে আশা করা যায় যে, সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মান-সম্মতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা করতে পারে।

নবম পরিচ্ছেদ

ذِكْرُ الْحَالَاتِ الَّتِي تَجُوزُ عَلَيْهِ ﷺ عَلَى طَرِيقِ التَّعْلِيمِ

শিক্ষার উদ্দেশ্যে হযুর ﷺ এর যেসব বিষয় বর্ণনা বৈধ

সপ্তম প্রকার হলো, ওই বিষয়সমূহ যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বলা হয়। আর ওইগুলো বলা জাযিয হওয়া, বা জাযিয না হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। বা ওই মানবীয় বিষয়সমূহকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্কিত করা, যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বা ওই কাজসমূহ উল্লেখ করে তাঁর সাথে সম্পর্কিত করা সম্ভব হয় বা ওই কাজসমূহ দ্বারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করা হয়েছে, বা দুশমনদের দেয়া দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর তা'আলা সম্বন্ধি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করেছেন বা ওই বিপদ-আপদ, যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শৈশবে সহ্য করতে হয়েছে। বা স্বীয় জীবনে কালিমা সমুন্নত করার জন্য যেসব বিপদ-আপদ সহ্য করেছেন। ওইসব বিষয় বর্ণনা করা জ্ঞানার্জনের দিক থেকে হোক আশিয়ায়ে কেরাম নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে হোক, এ আলোচনা পূর্বোল্লিখিত ষষ্ঠ প্রকার থেকে ব্যতিক্রম। কারণ তাতে না দোষের কিছু আছে, আর না তাতে ক্ষতিকর কোনো কিছু আছে। না তাতে অপমান ও অবহেলা করার মতো কোনো কিছু রয়েছে। তবে ওইধরনের আলোচনা জ্ঞান অর্জনকারী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মজলিশে করা উচিত। তাহলে তারা আলোচনার উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হবে। আর তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। যারা এটা বুঝতে সক্ষম নয় তাদের সামনে ওই বিষয় আলোচনা করা যাবে না। কারণ এ সব ঘটনা তাদের না বুঝার কারণে ফিতনা-ফ্যাসাদে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে সলফে-সালেহীন আলেমগণ এতে সতর্কতা অবলম্বন করেন, সেজন্য তারা নারীদের সূরা ইউসুফ পাঠ করা দোষনীয় মনে করতেন। কারণ উক্ত সূরায় এমন ঘটনা রয়েছে যা সম্ভবতঃ তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও অনুভূতির অপরিষ্কারতার দরুণ তারা সন্দেহে পতিত হতে পারে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, স্বয়ং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি বাল্যকালে ছাগল চরিয়েছি। তিনি আরও ইরশাদ করেন, ۱۶ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَفَدَ رَعَى الْغَنَمِ -এমন কোনো নবী অতিবাহিত হননি, যিনি মেঘ চরাননি।^১ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, হযরত মুসা

আলাইহিস্ সালামও এ কাজ করেছেন। সুতরাং যদি কেউ এর আলোকে ওইসব কথা বর্ণনা করে, তাহলে তাতে ক্ষতির কিছুই নেই। কারণ এটা আরবদের অভ্যাস ও সামাজিকতার অংশ বিশেষ। আশিয়ায়ে কেরামের দ্বারা ওইসব কাজ করানোর মধ্যে অনেক হিকমত নিহিত রয়েছে। কারণ ওইকাজ করানোর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তাঁদের মর্যাদা উন্নত করা হয়েছে। আর তাঁদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যে, এভাবে আপনাদের স্ব-স্ব উন্নতির উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।^১

মেষ চরানোর কারণে তাদের মর্যাদায় কোনো পার্থক্য হয়নি। তাঁদের ওই মর্যাদা ও বুজুর্গী আদিকাল থেকেই লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইয়াতীম হওয়া ও কষ্টের সাথে জীবনযাপন করার উল্লেখ করেছেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন। তা উল্লেখ করে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বিবরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যদি কোনো বর্ণনাকারী হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসনীয় গুণাবলীসমূহ ওই ভঙ্গিতে বর্ণনা করে বলে বে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শৈশবকালে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি এভাবে অনুগ্রহ করেছেন, এভাবে ওই বিষয়সমূহ বর্ণনা করা যাতে অপমান বা অবজ্ঞার কোন অবকাশ না থাকে। বরং এগুলো আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁর কামালাত ও পূর্ণতা প্রকাশ করা। তারপর আল্লাহ তা'আলা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরবের সর্দার ও চরম শত্রুদের উপর বিজয় দান করেছেন। তাঁর শাসন ক্ষমতা প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তাদের ধন-সম্পদের চাবিগুচ্ছ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ন্ত্রণে এনে দেন। আরবদেশ ছাড়াও পাশ্চাত্য দেশসমূহকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে এনে দেন। আল্লাহ তা'আলার অসীম সাহায্য সহায়তায় তিনি সকলের উপর বিজয়ী হন। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তাঁর জন্য আত্মোৎসর্গকারী সাহায্যকারী বানিয়ে দেন।

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে তাদের অন্তরকে আলোকিত করে দেন। বিশেষ নিদর্শনধারী ফিরিশতাদের দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছেন। কেমন চমৎকারভাবে তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ করা হয়েছে যে, যদি তিনি কোনো রাজপুত্র হতেন কিংবা তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী থাকতো, তখন হয়তো নির্বোধ

^১. প্রমাণিত হয়েছে যে, ছাগল চরানো দোষের কাজ নয়, বরং এটা এক প্রকারের প্রশিক্ষণ, ছাগল এক ধরনের বিচরণশীল প্রাণী। মূলত আশিয়ায়ে কেরামকে ছাগল চরানোর মাধ্যমে অবাধ্যতা সহ্য করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

লোকেরা বলতো, এদের সাহায্যে তিনি বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু এসব তো এজন্য হয়েছে যে, তিনি সত্য নবী ছিলেন।

আরো এক কারণ হলো, যখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলো কী? কারণ যদি কোনো বাদশাহ থেকে থাকে, তাহলে আমরা ধরে নেবো যে, তিনি এমন ব্যক্তি। যিনি নবুওয়াতের দাবীর অন্তরালে স্বীয় পূর্বপুরুষদের রাজত্ব ফিরে পেতে চান। কিন্তু আবু সুফিয়ান না বোধক জবাব দেয়ার পর রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস বললেন, আমি নিশ্চিত যে, তিনি সত্য নবী। আর আশিয়ায়ে কেরামের দ্বারা সমাপ্তকারী।

ইয়াতীম হওয়া তো হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমান্বিত সিকাত ও ফযিলতের অন্যতম এক ফযিলত। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে তাঁর যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ইয়াতীম হওয়া। সুতরাং আসমানী গ্রন্থে এটাও উল্লেখ ছিলো।

আর ইবনে যি-ইয়াযান^১ আবদুল মোস্তালিব থেকে আর বুহায়রা পাদ্রী আবু তালিবের নিকট থেকে এটা বর্ণনা করেছেন।^২

অনুরূপ যদি কোনো বর্ণনাকারী তাঁর মহিমান্বিত গুণাবলীর প্রশংসা করে তাঁর উম্মী হওয়ার কথা আল্লাহ তা'আলা যেভাবে আলোচনা করেছেন, সেভাবে আলোচনা করে। তাহলে তা হবে তাঁর প্রশংসিত গুণাবলী বর্ণনা করা। আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরনের ফযিলত বর্ণনা করা যা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। বরং এরূপ ফযিলত বর্ণনা করার কারণে পবিত্র কুরআন মাজীদ তাঁর এক

^১. ইবনে যি-ইয়াযান ইয়ামেনের বাদশাহ ছিলো, সে হাবশীদের পরাজিত করে ইয়ামেনের শাসনভার গ্রহণ করে। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতামহ আবদুল মোস্তালিব যখন তাকে স্বাগতম জানায়, তখন তিনি বললেন, মহিমান্বিত নবী আবির্ভূত হবেন, তবে তিনি পিতৃহীন হয়ে ধরাধামে তাসরীফ আনবেন।

^২. আবু তালিব সিরিয়া সফরের সময় হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে নিয়ে যায়। পথিমধ্যে বুহায়রা পাদ্রীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। বুহায়রা পাদ্রী আবু তালেবকে জিজ্ঞেস করে, এ শিশু আপনার কী হয়? আবু তালিব বললেন, আমার পুত্র। তখন বুহায়রা বললো, এটাতো হতে পারে না। কারণ আমাদের কিতাবে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তার মধ্যে নবুওয়াতের আলামত বিদ্যমান পাওয়া যায়। আমি দেখেছি, আকাশের মেঘমালা তাঁর মাথায় ছায়া দান করছে। কিন্তু আমাদের কিতাবে আছে, ওই নবী ইয়াতীম হয়ে আবির্ভূত হবেন, আর আপনি বলছেন, আপনার পুত্র। এটা কী করে সম্ভব হতে পারে? তখন আবু তালিব বললেন, তিনি আমার ভাতিজা। তবে আমি তাকে আমার পুত্রদের চেয়েও অধিক ভালবাসি।

বিস্ময়কর মুজিয়া হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ কুরআন মজীদ হলো ইলম ও মারিফতের অফুরন্ত ভাণ্ডার। আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ অপূর্ব নিয়ামত দান করা হয়েছে। এ ছাড়া ও আরো অন্যান্য ইলম তাঁকে আরো অধিক পরিমাণে দান করা হয়েছে। আমি এ বিষয় পূর্বে আলোকপাত করেছি। আর এ ধরনের জ্ঞান একরূপ ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যিনি বাহ্যিক কোনো বিদ্যালয়ে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যা শিক্ষা করেননি। বা তিনি জ্ঞানীপুণী লোকদের সমাবেশে যোগদান করেন নি। কারো শিষ্যত্বও গ্রহণ করেন নি, না কারো নিকট লেখা শিখেছেন, তাহলে এটা বিস্ময়কর হবে না তো কী হবে? এটা হলো তাঁর মুজিয়া। যে-কোনো ব্যক্তি এভাবে এসব বিষয় বর্ণনা করে তাহলে ক্ষতির কিছুই নেই। এ কারণে জ্ঞানপিপাসু লোকদের উদ্দেশ্য হলো ইলম ও মারিফাত লাভ করা। বাহ্যিক লেখাপড়া শেখা হলো ওসীলা মাত্র। সুতরাং যে ব্যক্তি ওই অফুরন্ত দৌলতের এমনিতে মালিক হয়ে যায়, সে প্রভাবিত উপায়ে ওই মহামূল্যবান সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অন্যদের অশিক্ষিত হওয়া ঘটতির কারণ হয়। কারণ এটা তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার দলিল হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ব্যাপারটি অন্যদের চেয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম করে দিয়েছেন। আর যে বিষয়সমূহ তাঁর মহিমাম্বিত বুয়ুগীর আঁধার হয়েছে। অর্থাৎ উম্মী হওয়া তা অন্যদের জন্য ক্ষতিকর হয়। অনুরূপ এমন আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলোতে রয়েছে তাঁর জীবন। কিন্তু অন্যদের জন্য সেগুলো মৃত্যুর কারণ হয়। যেমন বক্ষ বিদীর্ণ করে তা থেকে মাংসপিণ্ড বের করে ফেলে দিয়ে তাঁর মুবারক হৃদয়কে পূর্ণ জীবন ও ক্ষমতা আত্মশক্তি দান করা হয়েছে। আর এভাবে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দৃঢ়তা ও অবিচলতার শক্তি-সামর্থ্য ও সহনশীলতার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। কিন্তু ওইসব বিষয় অন্যদের জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর কারণ স্বরূপ।

এর উপর অন্যান্য কাজসমূহ অনুমান করুন। যেমন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা হলো একরূপ, তিনি দুনিয়াবী নিয়ামতসমূহ অতি অল্প মাত্রায় গ্রহণ করতেন। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার, যানবাহন, সব কিছুতেই ছিলো সরলতা ও অনাড়ম্বরতার বহিঃপ্রকাশ। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমাম্বিত স্বভাব ছিলো বিনয়ের আঁধার। তিনি নিজের হাতে কাজ করতেন, এমন কি গৃহস্থালির কাজও তিনি স্বহস্তে সম্পন্ন করতেন। তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত। তিনি দুনিয়ার ছোট-বড় সব বস্তুকে এক সমান মনে করতেন। আর ধারণা করতেন, এই দুনিয়ার সব কিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর প্রতিনিয়ত দুনিয়ার নিয়ামতসমূহের

মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটছে। এ সবকিছুই তাঁর ফযিলত ও মাহাত্ম্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

যদি কেউ এ বিষয়সমূহ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফাযায়িল ও কামালতের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে তাহলে ভালই, অবশ্যই তা বর্ণনা করা যাবে। কিন্তু যদি কেউ অসত্য বিষয়সমূহ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান ও অবজ্ঞা করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে, তাহলে তাকে ওই সমস্ত লোকদের মধ্যে গণ্য করতে হবে, যাদের শাস্তির কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি।

অনুরূপ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য আশিয়ায়ে কেরামের কোনো কোনো অবস্থা যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর বাহ্যিক শব্দে দ্বিমত রয়েছে। আর তা থেকে বাহ্যিক যে মর্মার্থ বের করা হয়, তা কখনো আশিয়ায়ে কেরামের মহিমাম্বিত মযাদীর বিপরীত হয়ে থাকে। সেজন্য প্রয়োজনে সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হবে। তাই আমি এখানে সহীহ হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসসমূহ উল্লেখ করিনি। আমি শুধু এখানে ওই হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছি, যেগুলোতে ওই বিষয়ের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি ওই হাদীসসমূহ বর্ণনা করা যেগুলো মানুষের মাঝে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে, সেগুলো বর্ণনা করা অপছন্দনীয় বলেছেন। অবশেষে এটা কোন ধরনের উৎসাহ যে, ওই ধরনের হাদীসসমূহ বর্ণনা করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে। তাঁকে বলা হয়, ইবনে আজলান এ ধরনের হাদীসসমূহ বর্ণনা করেন। তখন তিনি বললেন, তিনি তো ফকীহ নন। আফসোস! যদি মানুষ এধরনের হাদীস বর্ণনায় ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে তাকে সহায়তা করতো। কারণ এগুলো কার্যকর হাদীস নয়।

পূর্ববর্তী আলেমগণের একদল বলেন, একরূপ হাদীসসমূহ বর্ণনা না করায় ক্ষতির কোনো কারণ নেই। আসল কথা হলো, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরনের হাদীসসমূহ আরববাসীদের সম্মুখে বর্ণনা করেছেন। আরববাসীরা ওই বর্ণনাসমূহের মর্মার্থ বুঝতো, তারা কথার বাস্তবতা ও রূপকতা বুঝতো, অর্থের ভাষা অলংকরন, বাচনভঙ্গি, সথক্ষিপ্তকরণ ও রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত ছিলো। এ কারণে তারা অতি সহজে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী বুঝতে পারতো। অতঃপর ওই লোকদের আগমন হয়েছে যাদের মধ্যে অনারবীয়তার প্রভাব ছিলো, তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক অজ্ঞ মূর্খ ছিলো। যারা আরবদের ভাষার মর্মার্থ বুঝতে অক্ষম ছিলো। এ কারণে তারা ওই হাদীস ব্যাখ্যা

বিশ্লেষণ করতে বা বাহ্যিক অর্থ নির্ণয় করতে মতভেদ করা শুরু করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো এইরূপ ছিলো, তারা নিমিষেই এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতো। আবার কেউ কেউ এগুলোর সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। কিন্তু আমার ধারণা, ওই হাদীসসমূহের যেগুলো সহীহ নয় সেগুলো উল্লেখই না করা চাই। আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে কিংবা আশিয়ায়ে কেরামের শানে ওই ধরনের হাদীস সমূহে বর্ণনা না করা উচিত। ওইগুলোর অর্থ সরাসরি বর্ণনা করাও উচিত নয়। তবে উত্তম হলো ওই হাদীসসমূহ পরিত্যাগ করা। আর মানুষের উচিত এগুলোর পিছনে পড়ে না থাকা। তবে এটা বলা যায়, ওই হাদীসসমূহের বর্ণনাকারী দুর্বল কিংবা সনদ বিহীন।

হাদীসবেস্তাগণ আবী বকর ইবনে ফওরাক সম্পর্কে অভিযোগ করেন, তিনি ওই ধরনের জটিল অর্থবোধক ও দুর্বল ভিত্তিহীন হাদীস কিংবা আহলে কিতাবদের ওই বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করেছেন। আর তার অভ্যাস হলো হককে বাতিলের সাথে একত্রিত করে বর্ণনা করা। ইবনে ফওরাকের উচিত ছিলো ওই হাদীসসমূহ পরিত্যাগ করা। এ সম্পর্কে তার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিলো যে, এগুলোর দুর্বলতার ব্যাপারে সতর্ক করা, কারণ জটিল হাদীসসমূহ আলোচনা করায় যে সন্দেহের উদ্বেক হয় তা দূর হয়ে যাবে। প্রকাশ্য থাকে যে, এ ধরনের হাদীসসমূহ অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করা উচিত।

এ বিষয়ে উত্তম হলো অনর্থক এগুলো বর্ণনা করে এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করা।

দশম পরিচ্ছেদ

الْأَدَبُ اللَّازِمُ عِنْدَ ذِكْرِ أَخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযুর ﷺ এর বাণীমালা বর্ণনার প্রাক্কালে আবশ্যকীয় শিষ্টাচার প্রসঙ্গে

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীমালা বর্ণনাকারীদের কর্তব্য হলো, ওই বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেয়া যা তাঁর সম্পর্কে বলা বৈধ আর যা কিছু বলা বৈধ নয়, বা তাঁর অবস্থা আলোচনা করার ক্ষেত্রে এটা আবশ্যিক যে, তাঁর উত্তম বিষয়সমূহ পারস্পরিক শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে আলোচনা করা। আর তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজের ভাষা সংযত রাখা। আর জবানকে লাগামহীন ছেড়ে না দেয়া। আর এটাও জরুরী, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক সত্তা ও বাণীমালার আলোচনার সময় শিষ্টাচারিতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য পথে আহ্বান করার কারণে যেসব দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছেন সে সব বিষয়ে আলোচনার সময় তাঁর প্রতি সহমর্মিতা ও ভালবাসা প্রকাশ করবে। তাঁর শত্রুদের প্রতি বিদ্বেষমূলক ভাব প্রকাশ করবে। আর এরূপ মনোভাব রাখতে হবে, সম্ভব হলে যেনো আত্মবিসর্জন দিয়ে হলেও তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকা। আর যখন তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার কথা আলোচনা করবে, বা তাঁর বাণী ও কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবে। তখন একান্ত শিষ্টাচারিতায় ও স্পষ্ট ভাষায় আলোচনা করবে যথাসম্ভব দৃষ্টিকটু, অশোভনীয় শব্দ উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকবে। যেমন মিথ্যারোপপূর্ণ, নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাপ্রকাশক গুনাহের শব্দাবলী পরিহার করবে।

আর যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণীসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করবে তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ ও ওই খবরসমূহ যা তিনি প্রদান করেছেন সেগুলোর বিপরীত যদি কোনো ঘটনা ঘটান সম্ভাবনা থেকে থাকে, বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাহানির ইঙ্গিতসূচক শব্দাবলী ও মিথ্যা ভাবের ব্যবহার করবে না। যেমন মূর্খতা, মিথ্যা, পাপ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে। তাঁর বাণীমালা নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও লক্ষ্য রাখবে যে, পূর্ববর্তী আলেমগণ এমন বর্ণনায় কোন পদচ্যুতির সম্মুখীন হয়েছে কিনা। আর এতে কোন ক্ষেত্রে মিথ্যার সংশয় থাকলে তা বর্জন করবে।

অনুরূপ যখন তাঁর ইলম সম্পর্কে আলোচনা করবে, তখন বলবে, এটা বলা কী জায়গায় হয়েছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই বিষয়সমূহ জানতেন যা

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে জানানো হয়েছে? সম্ভবতঃ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো বিষয় তখন পর্যন্ত অবগত হননি, যতক্ষণ না তাঁকে ওহীর মাধ্যমে তা জানানো হয়েছে। এখানে অজ্ঞতা শব্দ ব্যবহার করবে না। কারণ এটা নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় শব্দ।

অনুরূপ যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ-কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করবে, তখন বলবে, এটা কি জায়েয হয়েছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো প্রদত্ত আদেশ-নিষেধের বিপরীত আমল করেছেন, বা তাঁর দ্বারা সগিরা গুনাহ হয়েছে? এটা একথা থেকে অতি উত্তম হলো এভাবে বলা, এটা কীভাবে সম্ভব হবে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করবেন বা গুনাহের কাজ করবেন বা এমন এমন গুনাহ করবেন। কারণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের মাপকাঠি হলো, তাঁর সম্পর্কে পরিপূর্ণ আদবের সাথে আলোচনা করতে হবে। আমি কোনো কোনো আলেমগণকে দেখেছি, তারা ওই বিষয়সমূহের প্রতি কোনো গুরুত্ব না দিয়ে বরং কোনো কোনো সময় বেপরোয়াভাবে নিকৃষ্ট শব্দ উল্লেখ করেছে, যা শুনতে অনেক বেশী শ্রুতিকটু মনে হয়। আমি নিজেও এ বিষয়টি অপছন্দ করি।

আমি কোনো কোনো যালিমদের দেখেছি তারা কতিপয় আলেমদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে বসে, আর এর কারণ হলো তারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান বর্ণনায় নিজেদের কথার ভারসাম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে নি। আর এজন্য ঠাট্টা-বিত্রপ ও উপহাস করতে শুরু করে। অথচ তারা বে'আদবী করা অস্বীকার করে। তারপর সেই অত্যাচারীরা ওই আলেমকে কাফির বলে। অথচ ওই আলেমদের বে'আদবী করার ইচ্ছা ছিলো না। আর আলোচকের ইচ্ছার বিপরীত তাদের কাফির বলা বা বিদ্রপ ও উপহাস করা ভীষণ অন্যায় ও বাড়াবাড়ি। তবে বর্ণনায় সর্বদা আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

সমাজে কথা বলার সময় যদি সর্বদা সংযত আচরণের উপর লক্ষ্য রাখতে হয়, তাহলে বলুন! হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করার সময় কেন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে না? এ বিষয়টির ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ দেয়া হয়েছে।

মুখের ভাষা এমন জিনিষ যার সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্যের কারণে যে-কোনো বিষয় ভাল বা মন্দ বলে স্বীকৃতি পেয়ে যায়, তা লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। আর সঠিক করাও কোনো কথাকে উত্তম বানিয়ে দেয় বা তার বক্তব্য তাকে নিকৃষ্ট করে দেয়। এ

কারণে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لَسِحْرًا** -নিশ্চয় কোনো কোনো বক্তব্যে রয়েছে যাদুর পরশ।^১

যদি কোনো বর্ণনায় কোনো বিষয় নিষেধ করায় বা এর দ্বারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তাতে ক্ষতির কিছু নেই। যেমন এরূপ বলা যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা মিথ্যা প্রকাশ হয়েছে, বা তিনি কবীরা গুনাহ করেছেন বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যায় করা সঠিক হয়নি। আমরা যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এমন কারো বক্তব্য আলোচনা করবো, তখন তাঁর আযমত ও সম্মানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এভাবে সর্বদা তাঁর সম্পর্কে অতি উত্তম ধারণা পোষণ করতে হবে। এ বিষয়ে আরো বেশী সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

পূর্ববর্তী আলেমদের অবস্থা এরূপ ছিলো যে, তাঁরা যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত আলোচনা করতেন তখন আদবের কারণে তাদের অবস্থা অতি গাষ্ট্রীর্ণ হয়ে যেতো। আমি এ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

কোনো কোনো পূর্ববর্তী আলেম কুরআন মাজীদে আয়াতসমূহ তিলাওয়াতের সময় ভীষণ ভীত হয়ে পড়তেন। বিশেষ করে ওই আয়াতসমূহ যাতে আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমন ও ওইসব লোকদের সমালোচনা করেছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। তারা এ বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে খুব ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতেন। যাতে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয় এবং কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যে ভীতি প্রকাশিত হয়।

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ইন্না মিনাল বয়ানি লা সিহরান, ১৮:৬১, হাদিস নং : ৫৩২৫।

খ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা ইয়াকুরাহ মিনাল কলাম, ৬:১১৮, হাদিস নং : ১৫৬৪।

গ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফীল মাশদুক, ১৩:১৯৪, হাদিস নং : ৪৩৫৪।

الْبَابُ الثَّانِي

দ্বিতীয় অধ্যায়

فِي حُكْمِ سَابِّهِ وَشَانِيهِ وَمُتَنَقِّصِهِ وَمُؤْذِيهِ وَعُقُوبَتِهِ وَذِكْرِ

اسْتِثْنَائِهِ وَوَرَائَتِهِ

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিদান,
বিদ্বেষপোষণ, মানহানি, কষ্টদান ও শাস্তিদানকারীর
তাওবা ও উত্তরাধিকার সম্পদের বিধান প্রসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

الْأَقْوَالُ وَالْأَعْرَاءُ فِي حُكْمِ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ تَنَقَّضَهُ

হযুর ﷺকে গালিদান ও মানহানিকারীর বিধান সংক্রান্ত মন্তব্যসমূহের

পর্যালোচনা

আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি, যারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মন্দ কথা বলে, আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়- এ সম্পর্কে উম্মতের আলেমগণ ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন, এ ধরনের লোককে হত্যা করতে হবে। আর এ বিষয়টি ইমামের ইচ্ছাধীন রয়েছে যে, তাকে হত্যা করবে, না ফাঁসি কাঠে ঝুলাবে। আর এর দলীলও উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তাঁর শিষ্যবর্গ, পূর্ববর্তী আলেমগণ ও অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো, এ ধরনের লোককে বা শরীয়তের নির্ধারিত দণ্ডবিধি অনুযায়ী হত্যা করতে হবে। কুফরীর জন্য নয়। যদিও সে তাওবা করার কথা প্রকাশ করুক না কেনো। কারণ তাঁদের মতে, ওইধরনের লোকদের তাওবা কবুল করা হবে না। আর তার নিজের কথা প্রত্যাহার করে নেয়াটাও কোনো উপকারে আসবে না। যেমনটি এ সম্পর্কে আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এ ধরনের লোকদের হুকুম যিন্দীকের হুকুমের মতো হবে। আর যারা নিজেদের অন্তরে কুফরী গোপন করে রাখে, তাদের মতো হবে। এ ধরনের লোকদের বন্দী করার পর বা এ বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করার পর তাওবা করে, বা নিজে নিজেই তাওবা করে। মোটকথা তার উপর হদ বা দণ্ডবিধি কার্যকর হবেই। কারণ তাওবা করার কারণে হদ বাতিল হয় না।

শায়খ আবুল হাসান কাবিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যদি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাল-মন্দ করার কথা স্বীকার করার পর তাওবা করে, আর তাওবার নিদর্শন তার মধ্যে বিদ্যমান পাওয়া যায়, তবুও গালি দেয়ার কারণে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। কারণ এটা শরীয়াতের নির্ধারিত হদ।

আবু মুহাম্মদ বিন আবু যায়িদও এ অভিমতের সমর্থক। তবে তিনি এ কথাও বলেন, তার তাওবার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নিকট উপকারী হতে পারে।

ইবনে সাহনুন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অভিমত হলো, তাওবীদে বিশ্বাসীদের মধ্যে যে-কেউ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়ার পর তাওবা করে, তাওবা করার কারণে তার হত্যার আদেশ বাতিল হবে না।

অনুরূপভাবে যিন্দীকের ব্যাপারে তাওবা করার কারণে হত্যার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কাযী আবুল হাসান ইবনে কাসসার এ বিষয়ে দু'টি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, আমার উস্তাদদের কেউ কেউ একথা বলেন, যদি সে তার কথা স্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। কারণ যদি সে ইচ্ছা করতো তাহলে সে তার নাস্তিক্য ও কুফরী গোপন করতে পারতো। কিন্তু যখন সে স্বীকার করেছে তখন আমি মনে করি, সে স্বীয় ভ্রষ্টতা প্রকাশ পাওয়ায় ভীত হয়ে পড়েছে। আর সে স্বীকৃতি প্রদানে অগ্রসর হয়েছে।

আর কোনো কোনো উস্তাদ একথা বলেন, আমরা তার তাওবা গ্রহণ করবো, এজন্য সে নিজে উপস্থিত হয়ে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, এতে প্রমাণিত হয়েছে, তার অভ্যন্তরে যে বক্রতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা সে ঠিক করে নিয়েছে। এভাবে সম্ভবতঃ আমরা তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হয়েছি, ওই ব্যক্তির বিপরীতে, সাক্ষী প্রমাণে যার অপরাধী হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। কাযী আবুল ফযল আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আসবাগও এ অভিমত প্রকাশ করেন।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাল-মন্দ করার বিষয় অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাতে দ্বিমত পোষণ করা যাবে না, কারণ এটা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমাম্বিত মর্যাদার কারণে এটা উম্মতেরও হক। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হক তাওবা করার কারণে বাতিল হবে না। অন্যান্য অধিকারসমূহেরও একই হুকুম। তবে যিন্দীক প্রেফতার হওয়ার পর যদি তাওবা করে, তাহলে হযরত ইমাম মালিক, লাইস, ইসহাক ও ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের মতে তার তাওবা কবুল করা হবে না। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।^১

ইবনে মুনিযির হযরত আলী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তাকে তাওবা করাতে হবে।

ইবনে সাহনুন বলেন, যদি কোনো মুসলমান হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়ার পর তাওবা করে তাহলে তার হত্যার আদেশ বাতিল হবে না। কারণ সে তো মুরতাদ বা ধর্মান্তরিত নয়^২, বরং সে এমন কথা বলেছে,

^১. তাঁদের অভিমত হলো, যদি প্রেফতার করার পূর্বে যিন্দীক তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি প্রেফতার হওয়ার পরও তাওবা না করে তা হলে তার তাওবা কবুল হবে না।

^২. মুরতাদের হুকুম হলো তাওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অপরাধ মার্জিত হয়।

যার শাস্তি হলো একমাত্র মৃত্যুদণ্ড, এ বিষয়ে কারো ক্ষমা নেই। যেমন যিন্দীক। কারণ সে তো এক বাহ্যিক অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় প্রত্যাবর্তনকারী হয়নি।

কাযী আবু মুহাম্মদ বিন নসর সুবকী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দাতার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না বলে এ দলীল পেশ করেন, তার মধ্যে এবং ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেয় তার তাওবা প্রসিদ্ধ অভিমতে গ্রহণযোগ্য হবে। পার্থক্য হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ। আর মানুষ এমন এক জাতি যার দ্বারা দোষত্রুটি হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুওয়াত ও রিসালাতের সমুন্নত মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছেন। তাঁর অবস্থা সাধারণ মানুষের মতো নয় যে, কারো দ্বারা তাঁর ক্ষতি হবে। আরো প্রকাশ থাকে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়া ইরতিদাদ বা স্বধর্মত্যাগের মতো নয়, যে তার তাওবা কবুল করা যাবে। কারণ ধর্মত্যাগ এমন এক গুনাহ যা শুধুমাত্র একজনের সাথে সম্পৃক্ত। তাতে অন্য কোনো ব্যক্তির হক অন্তর্ভুক্ত থাকেনা। এ কারণে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় সে তো এমন গুনাহ করেছে যাতে এক ব্যক্তির হক অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।^১ আর সে ওই মুরতাদের মতো হয়েছে, যে মুরতাদ হওয়ার সময় কাউকে হত্যা করছে বা কোনো পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্ত করেছে। যদি এ ধরনের কোনো মুরতাদ তখন তাওবা করে তাহলে তাওবা করার কারণে তার যিম্মায় যে রক্তপণ বা কিসাস প্রবর্তিত হয় তা কী রহিত হয়ে যাবে? আর এ মাসয়ালাও অনুরূপ যে, যদি মুরতাদ তাওবা করে নেয় তাহলে তার চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তি রহিত হয় না। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গালিদাতাকে কুফরী করার কারণে হত্যা করতেই হবে। সে তো হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মান-সম্মানের উপর আঘাত হেনেছে। তাই সে আঘাত দূর করা অতি জরুরী। তার তাওবা তার শাস্তিকে রহিত করতে পারবে না।

^১. আমি বলছি যে, এটা এক লোকের হক নয়, বরং তাতে লক্ষ কোটি মানুষের হক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কারণ তিনি এমন এক মহান সত্তা যাকে দুনিয়ার পুন্যাত্মা ও পাপিষ্ঠ সকলই নিজের জীবনের চেয়েও বেশী প্রিয় মনে করে। যার নামে বিগত শতাব্দী থেকে গুরু করে আজ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিতে কৃষ্ঠাবোধ করেনি। তাঁর নামে যদি কোনো দুর্ভাগা, অভিশপ্ত গালি দেয় তাহলে সে কী শুধু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে? কখনো নয়, বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সবাইকে কষ্ট দেয়। বরং সে বিশ্ব মুসলিম সবাইকে যেন হত্যা করেছে। তাই এ ধরনের লোক হত্যাযোগ্য হয়েছে। সুতরাং তার তাওবা কবুল হওয়ার প্রশ্নই আসতে পারে না।

কাফী আবুল ফযল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমত হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়া শুধু কুফরী নয় বরং গালিদাতার উদ্দেশ্য তাকে কলঙ্কিত করা, তাঁর মর্যাদা ও সম্মান ক্ষুণ্ণ করা। এখন যেহেতু সে তাওবা করে স্বীয় অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে, তাই তার কুফরী রহিত হয়ে গেছে। আমি তার বাহ্যিক অবস্থার আলোকে তাকে কাফির বলবো না, তার ভিতরের অবস্থা কী তা তো আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। তবুও গালি দেয়ার হুকুম এখনো তার উপর বলবৎ রয়েছে। এ কারণে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

আবু ইমরান কাবিসীর অভিমত হলো, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে তারপর স্বধর্ম ত্যাগ করবে, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তাকে তাওবা করানো যাবে না। কারণ গালি দেয়া মানুষের হকের মধ্যে গণ্য, এটা মুরতাদ হওয়ার কারণে কোনো অবস্থায় রহিত হবে না। মোটকথা হলো, আমার মাশায়েখগণের অভিমতের ভিত্তি হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিদাতাকে কুফরীর কারণে নয় বরং গালিদানের দণ্ডবিধি অনুযায়ী হত্যা করে ফেলতে হবে।^১ এর জন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

ওয়ালীদ বিন মুসলিম ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য আলেমগণ থেকে যা বর্ণনা করেছেন। তাতে দেখা যায় যে, আলেমদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়াকে ইরতিদাদ বা ইসলাম ত্যাগ বলেছেন, তাকে তাওবা করাতে হবে। যদি সে তাওবা করে, তাকে শাস্তি দিতে হবে। আর যদি সে তাওবা করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। এ অভিমত অনুযায়ী তার হুকুম মুরতাদের হুকুম হবে। কিন্তু আমি প্রথমে যে অভিমতের উল্লেখ করেছি তা অতি প্রসিদ্ধ।

এখন আমি ওই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো, যারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়া ইরতিদাদ বা স্বধর্মত্যাগ মনে করেন না কিন্তু তারা এটাকে শরীয়তের নির্ধারিত হদ অনুযায়ী হত্যা করা ওয়াজিব মনে করেন। আমি এটা দু'অবস্থায় বর্ণনা করবো।

^১ অর্থাৎ তাকে স্বধর্ম ত্যাগের কারণে হত্যা করতে হবে তা নয় বরং সেতো আমাদের আকায়ে নামদার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমামণ্ডিত প্রশংসিত নাম কলঙ্কিত করেছে। এ কারণে মুসলিম সমাজের কোথাও তার বাঁচার অধিকার নেই। যদি এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা না হয়, তাহলে আল্লাহ না করুন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সন্তা এ ধরনের অবিশ্বাসীদের নিকট খেলনার পায়ে পরিণত হয়ে যাবে। এ কারণে আমি গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত অভিমত, এ ধরনের লোকদের যে-কোনো অবস্থায় হোক হত্যা করেই ফেলতে হবে, এদের বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

এক অবস্থা হলো এভাবে যে, সে তো এ বিষয় অস্বীকার করতে পারে। আর মানুষ তার সম্পর্কে বিপরীত সাক্ষ্য দিতে পারে। অথবা সে যদি তার নিজের কথা প্রত্যাহার করে নিয়ে তাওবা করার কথা প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো, আমি তাকে শরীয়তের নির্ধারিত হদ অনুযায়ী হত্যা করাবো, কারণ তার উপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে কুফরী বাক্য বলা ও তাঁকে অপমান করার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মর্যাদা ও সম্মানদানের আদেশ করেছেন। আমি এ ধরনের লোকদের পরিত্যক্ত সম্পদের ব্যাপারে ওই অভিমত প্রকাশ করেছি, যা যিন্দীকের হুকুম অনুরূপ, এ অবস্থায় যখন তার নাস্তিক্য প্রকাশ পাবে, আর সে তা অস্বীকার করে বা তাওবা করে নেয়।

যদি এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে বলা হয় যে, আপনারা তার প্রতি কুফরী কীভাবে প্রমাণ করেছেন? অথচ তার ব্যাপারে কুফরীর সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। তাই যখন তার ব্যাপারে কুফরীর সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। তারপর তার উপরে কুফরী বা স্বধর্মত্যাগের বিধান কার্যকর করা হয় না কেনো। অর্থাৎ তাকে তাওবা করাতে হবে? এর প্রত্যুত্তরে আমরা বলবো, যদি তাকে হত্যা করার ব্যাপারে তার প্রতি কুফরীর হুকুম কার্যকর করা হয় কিন্তু তার প্রতি নিশ্চয়তা আরোপ করা যাবে না। এ জন্য যে, সে তো তাওহীদ ও নবুওয়াত স্বীকার করেছে। তাছাড়া সাক্ষীগণ যে অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে সে তা অস্বীকার করেছে। অথবা তার ধারণা হয়েছে যে, তার ভুল ও অপরাধ হয়েছে। আর তার ধারণা হয়েছে, তার দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হয়েছে। এজন্য সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে। আর তাতে তো ক্ষতির কিছুই নেই যে, কোনো কোনো ব্যক্তির উপর কুফরীর কোনো বিধান প্রমাণিত হয়, যদিও তার উপর কুফরীর সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রমাণিত না হয়। যেমন নামায পরিত্যাগকারীর হত্যা। (তার উপর কুফরী প্রমাণ হওয়ার পরও ইসলামের অনেক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিদ্যমান পাওয়া যায়।) তবে যদি কারো সম্পর্কে জানা যায় যে, সে আকীদার দিক থেকে হালাল মনে করে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিয়েছে, তাহলে তার কুফরী করার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

গালি দেয়ার বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা (নাউযবিল্লাহ)। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করা (নাউযবিল্লাহ) বা এ ধরনের কোনো কথা বলা, যাতে কোনো প্রকার জড়তা না থাকে, এ ধরনের লোক যদি তাওবাও করে, তবুও আমরা তাদের হত্যা

করে ফেলবো। কারণ আমরা তার তাওবা গ্রহণ করবো না। তাওবা করার পর ও শরীয়তের হদ অনুযায়ী আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো। কারণ সে এমন কথা বলেছে যার শাস্তি একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারেনা। এরপর তার ব্যাপার আল্লাহর সাথে হবে। যিনি সঠিক অর্থ জানেন, তার তাওবা সঠিক হয়েছে কি হয়নি, অন্তরের খবর তো একমাত্র তিনিই জানেন।

এ হুকুম ওই ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য হবে, যে বাহ্যিকভাবে তাওবা করে না। আর তার বিরুদ্ধে (কুফরী বাক্য বলার) যে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, সে তা স্বীকার করেছে। আর তাতে অবিচল রয়েছে। সুতরাং এধরনের লোক তার নিজের কথা অনুযায়ী কাফির। তাছাড়া সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও সম্মানহানি করার কারণেও কুফরী বাক্য বলার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। সুতরাং তাকে কোনো প্রকার মতভেদ ছাড়াই কাফির সাব্যস্ত করে হত্যা করে ফেলতে হবে।

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী সম্মানিত আলেমগণের অভিমত বুঝার আর তাঁদের বিভিন্ন বর্ণনাসমূহকে এ বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করে দলীল হিসেবে পেশ করতে হবে। আর সে অনুযায়ী উত্তরাধিকারের বিষয়ে বর্ণনাকারীদের মতভেদ হবে। যদি আপনারা এ মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাহলে সম্মানিত আলেমগণের বর্ণনার মর্মার্থ স্পষ্ট হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

حُكْمُ الْمُرْتَدِّ إِذَا تَابَ

মুরতাদের তাওবার বিধান

মুরতাদের তাওবা গ্রহণ করার বিষয়েও মতভেদ পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী আলেমগণ মুরতাদের তাওবা ওয়াজিব হওয়ার সময় ও পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো, মুরতাদকে তাওবা করাতে হবে।

ইবনে কাসসার বলেন, তার তাওবা গ্রহণ করার ব্যাপারে হযরত উমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর গৃহীত পদ্ধতি সম্পূর্ণ সঠিক হয়েছে। কারণ ওই ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত উমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুরতাদকে তাওবা করান। সাহাবায়ে কেরামের কেউ তাঁর বিরোধিতা করেননি। হযরত উসমান, হযরত আলী, ইবনে মাস'উদ, আতা বিন আবী রিবাহ, নাখয়ী, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম মালিক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ এ অভিমত সমর্থন করেছেন। তাছাড়া আরযায়ী, ইমাম শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক, আসহাবে রায় আলেমগণ প্রমুখের অভিমতও তাই।

আর তাউস, ওবায়দ বিন উমায়ির ও হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম থেকে এক বর্ণনায় বর্ণিত, মুরতাদকে তাওবা করানো যাবে না। আবদুল আযীয বিন আবি সালমা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও এ অভিমত সমর্থন করেন।

সাহনুন হযরত মু'য়ায রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এর অস্বীকৃতিমূলক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। ইমাম তাহাবী, ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটা হলো আহলে জাওয়াহিরের অভিমত। তারা বলেছেন, মুরতাদের তাওবা আল্লাহ তা'আলার নিকট তার জন্য উপকারী হতে পারে। কিন্তু তাওবা করার কারণে আমরা তার হত্যাদেশ রহিত করবো না, কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

—যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করবে, তাকে তোমরা হত্যা করো।^১

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু লা ইয়াযযাবু বি আযাবিল্লাহ, ১০:২১১, হাদিস নং : ২৭৯৪।

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফীল মুরতাদ, ৫:৩৭৯, হাদিস নং : ১৩৭৮।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুল হুকমি ফীল মুরতাদ, ১২:৪১৯, হাদিস নং : ৩৯৯১।

হযরত আতা রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকেও এ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। যদি মুরতাদ মুসলমান হয়, তাহলে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে না। বরং তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আর যদি সে প্রথমে কাফির ছিলো পরে মুসলমান হয়েছে, তারপর পুনরায় মুরতাদ হয়ে গেছে, তাহলে তাকে তাওবা করাতে হবে। আর জমহুর আলেমগণের অভিমত হলো, মুরতাদ নারী ও পুরুষ উভয়ের হুকুম এক ও অভিন্ন।

তবে হযরত আলী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, মুরতাদ মহিলাকে হত্যা করা যাবে না। বরং তাকে দাসী বানানো হবে। হযরত আতা ও কাতাদা রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এ অভিমতের সমর্থক।

হযরত ইবনে আব্বাস রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা অভিমত হলো, যদি মহিলা মুরতাদ হয়, তবে তাকে হত্যা করা হবে না। হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ ব্যাপারে স্বাধীন, ক্রীতদাস নারী ও পুরুষ সকলেই সমান অর্থাৎ প্রত্যেককে হত্যা করে ফেলতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো মুরতাদকে অবকাশ দেয়া প্রসঙ্গে। এ বিষয়ে হযরত উমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, তাকে তিন দিন পর্যন্ত গ্রেফতার করে তাওবার সুযোগ দিতে হবে। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এক অভিমতে এরূপ বলেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা এর অভিমতও তাই। হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই অভিমত পছন্দ করে বলেন, অপেক্ষা ও বিলম্ব করতে হবে।

শায়খ আবু মুহাম্মদ বিন আবু ইয়াযিদে মতে বিলম্ব করার অর্থ ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অভিমত হলো, তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে মুরতাদ সম্পর্কে আমি এটা কার্যকর করি যা হযরত উমর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, **يُجَسُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ** -তাকে তিন দিন বন্দী করে রাখতে হবে। আর প্রতিদিন তাকে তাওবা করার কথা বলতে হবে। যদি সে তাওবা করে তাহলে তো ভাল। নতুবা তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

আবুল হাসান কাসসার বলেন, তিন দিন অপেক্ষা করার ব্যাপারে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ তা কী ওয়াজিব হবে, না

মুস্তাহাব হবে? আসহাবে রায় আলেমগণের মতে তিনদিন পর্যন্ত বিলম্ব করা হবে। আর তাকে অবকাশ দেয়া উত্তম ও মুস্তাহাব।

হযরত আবু বকর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে এক বর্ণনায় বর্ণিত, তিনি এক মুরতাদ মহিলাকে তাওবা করার আদেশ করেন। সে তাওবা না করায়, তিনি তাকে হত্যা করে ফেলেন।

হযরত ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে মুরতাদকে একবার তাওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা না করে তাহলে সেখানে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ অভিমতকে মুযনী সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

يُذْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ.

-মুরতাদকে তিনবার ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও যদি সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

হযরত আলী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, **دُيِّنَ** দুই মাস পর্যন্ত তাকে তাওবা করতে বলা হবে।

আর ইমাম নাখরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সর্বদা তাকে তাওবা করতে বলতে হবে। সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও এ অভিমত সমর্থন করেন। তিনি আরও বলেন, যতো দিনে তাওবা করার আশা করা যায়। ততো দিন তাকে তাওবা করতে বলা হবে।

ইবনে কাসসার হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করে বলেন, মুরতাদকে তিন দিনের মধ্যে তাওবা করাতে হবে। অথবা তিন জুমা পর্যন্ত। অর্থাৎ তাকে প্রতি জুমায় একবার করে তাওবা করতে বলা হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিতাবে আবুল কাসিম থেকে বর্ণিত আছে, মুরতাদকে তিনবার ইসলাম গ্রহণ করার আদেশ করতে হবে। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

এ বিষয় মতোভেদ রয়েছে, তাকে তাওবা করানোর দিনসমূহে ভয়-ভীতি দেখাতে হবে, আর তাওবা করার জন্য তার প্রতি কঠোরতা আরোপ করা যাবে কী না? হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি বুঝতে পারছি না যে

তাকে তাওবা করার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রাখতে হবে কী না। বরং আমার ধারণা হলো, তাকে ক্ষতিকর নয় এমন খাদ্য দিতে হবে। আসবাগ বলেন, তাওবা করানোর দিনে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিতে হবে এবং পুনরায় ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে হবে।

আর আবুল হাসান কবিসীর গ্রন্থে রয়েছে, অপেক্ষা করার সময় তাকে উপদেশ দেয়া হবে। বেহেশতের নিয়ামতের প্রতি উৎসাহী করতে হবে, জাহান্নামের শাস্তির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করতে হবে।

আসবাগ বলেন, তাকে কারাগারে বন্দী করে তথায় শক্ত করে বেঁধে রাখতে হবে। চাই তাকে একাকী রাখা হোক বা অন্যান্য বন্দীদের সাথে রাখা হোক। যদি সন্দেহ হয় যে, সে তার সব ধন-সম্পদ নষ্ট করে দেবে, তাহলে তার জন্য খরচ করা বন্ধ করে দিতে হবে। আর তার ধন-সম্পদ তাকে পানাহার করিয়ে শেষ করে ফেলতে হবে। তাকে তাওবা করিয়ে স্বধর্মত্যাগ করানোর ধারাবাহিকতা চালিয়ে যেতে হবে। হযুর সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম নাবহানকে চার পাঁচ বার মুরতাদ হওয়ার পরও তাওবার সুযোগ দিয়েছেন। ইবনে ওয়াহাব বলেন, ফিরে আসা পর্যন্ত যথাসম্ভব তাওবার সুযোগ দিতে হবে। এটা ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আল্লাইহিমার বক্তব্য, ইবনে কাসিমও এ অভিমত সমর্থন করেন।

ইমাম ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আল্লাইহি বলেন, চার বারের পর মুরতাদকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

আসহাবে রায়ের অভিমত হলো, মুরতাদ যদি চারবারের পরও তাওবা না করে তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। যদিও সে তাওবা করে নেয়, তবুও তাকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে এবং ক্ষুধার্ত রাখতে হবে, যে পর্যন্ত না তার পক্ষ থেকে তাওবার ব্যাপারে নমনীয় ভাব প্রকাশ পায়, আর ততদিন তাকে কারাগার থেকে ছেড়ে দেয়া যাবে না।

ইবনে মুনিয়ির রাহমাতুল্লাহি আল্লাইহি বলেন, আমি এ ধরনের কোনো লোককে দেখিনি যিনি মুরতাদকে প্রথমবার মুরতাদ হওয়ার কারণে শাস্তি দিয়েছেন। এ অভিমত ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আল্লাইহিমা সমর্থন করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

حُكْمُ الْمُرْتَدِّ إِذَا اشْتَبَهَ ارْتِدَّادَهُ

সন্দেহজনক মুরতাদের বিধান

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যার মুরতাদ হওয়া তার অস্বীকার বা নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা নিশ্চিত প্রমাণিত হয়েছে।

এ অধ্যায়ে ওই ধরনের মুরতাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, যার মুরতাদ হওয়ার বিষয়ে সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে বা অনির্ভরযোগ্য সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে। তাতে তার মুরতাদসূলভ উক্তিসমূহ সন্দেহযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তার কথায় তার মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়নি। অথবা সে তার মুরতাদসূলভ উক্তি প্রত্যাহার করে তাওবা করেছে। ওই হযরতগণের অভিমত- যারা মুরতাদের তাওবা কবুল করার পক্ষপাতী হয়েছে এ ধরনের লোকের হত্যা স্থগিত করতে হবে। আর তার উপর বিচারকের অভিপ্রায় কার্যকর করতে হবে। তার ব্যাপার যা নির্ভরযোগ্য হবে, এর প্রচার ও প্রসার কি রূপ হবে? তার বিরুদ্ধে দেয়া সাক্ষীগণের ভিত্তি কি হবে? অর্থাৎ তাতে সাক্ষ্য কী নির্ভরযোগ্য হয়েছে না দুর্বল হয়েছে? সে অধিকাংশ সময় ওই ধরনের মুরতাদসূলভ কথা বলে কিনা? তার বাহ্যিক অবস্থা কি রূপ হয়েছে, অর্থাৎ সে দ্বীনের বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হয়েছে কি হয়নি? কখনো সে নির্বোধ-পাগল ও হাসি-তামাশাকারী হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে কি? এরপর যার অবস্থা সন্দিহান হবে বিচারক তাকে কঠোর শাস্তি দেবে। যেমন তাকে কারাগারে এমনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে, যেখানে অপরাধীদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা হয়। আর সেখানে তাকে সহযোগ্য শাস্তি দিতে হবে। প্রয়োজনে দাড়াতে নিষেধ করা যাবে না। অনুরূপ তাকে নামায আদায়ে বাঁধা দেয়া যাবে না।

ওই আদেশ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত সকল অপরাধীর ব্যাপারে গৃহীত হবে। কিন্তু এ অপরাধীর হত্যা স্থগিত রাখতে হবে। আর তার ব্যাপারে বিলম্ব করতে হবে। কারণ তাতে জটিলতা রয়েছে। অবস্থা অনুযায়ী শাস্তির ব্যাপারে কঠোরতা বা নমনীয়তা দেখাতে হবে। ওয়ালীদ ইমাম মালিক ও আওয়ামী রাহমাতুল্লাহি আল্লাইহিম থেকে বর্ণনা করেন, এটা হলো স্বধর্মত্যাগ। সুতরাং এ ধরনের লোক যদি তাওবা করেও তবু তাকে শাস্তি দিতে হবে।

‘আতবিয়া’ গ্রন্থে আশহাবের বর্ণনা মোতাবেক যা তিনি ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আল্লাইহি থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি মুরতাদ তার মুরতাদসূলভ আচরণ থেকে

তাওবা করে, তাহলে তাকে কোনো প্রকার শাস্তি দেয়া যাবে না। সাহনুন এ অভিমত সমর্থন করেছেন।

আবু আবদুল্লাহ বিন আততাব ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে, আর তন্মধ্যে একজন সাক্ষী বিশ্বস্ত ছিলো- এ ফাতওয়া দিয়েছেন যে, তাকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে এবং দীর্ঘ সময় বন্দী করে রাখতে হবে। যাতে তার দ্বারা তাওবা করার ভাব প্রকাশ হয়।

কাবিসীও এ রূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বাড়িয়ে বলেন, যদি কোনো ব্যক্তির এ রূপ অবস্থা হয় যে, সে হত্যার যোগ্য হয়, তারপর তার হত্যার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা এসে যায়, যার ফলে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে দ্বিমত দেখা দেয়, তাহলে তাকে বন্দী করে রাখতে হবে। তাকে এমনভাবে শিকল পরাতে হবে, যা সে বহন করতে পারে।

অনুরূপ তিনি ওই ব্যক্তি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন, যাকে হত্যার বিষয়টি জটিল ও কঠিন হয়, তাকে কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। আর কারাগারে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যে পর্যন্ত তার অবস্থা জানা যায় যে, তাকে হত্যা করা (হত্যা বা শাস্তি) ওয়াজিব হয়েছে কিনা। অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ও তিনি বলেন, স্পষ্ট মুরতাদসূলভ নিদর্শন ব্যতীত তাকে হত্যার আদেশ দেয়া যাবে না। তবে নির্বোধদের জন্য বেত্রাঘাত ও বন্দী করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আর কোনো অবস্থায় এ ধরনের লোকদের কঠোর শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, যার বিরুদ্ধে দু'জন সাক্ষী ব্যতীত তৃতীয় কোনো সাক্ষী পাওয়া না যায় আর অপরাধী যদি উক্ত সাক্ষীদ্বয়কে তার প্রাণের দূশমন প্রমাণ করতে পারে বা ওই ধরনের কোনো ত্রুটি দেখা দেয়, যাতে ওই সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় আর অবস্থা এতো কঠিন হয় যে, ওই দু'জন সাক্ষী ব্যতীত তৃতীয় কোনো সাক্ষী অপরাধী সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য কোনো অভিমত গুনেনি। তাহলে এরূপ অপরাধীর বিষয়টি হালকা হয়ে যাবে। তার উপর থেকে মুরতাদের আদেশ রহিত হয়ে যাবে। তার অবস্থা হবে ওই ব্যক্তির মত যার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষীই সাক্ষ্য দেয়নি। কিন্তু যদি অবস্থা এরূপ হয় যে, সাক্ষী হয়েছে আর সাক্ষী দেয়ার যোগ্যও বিবেচিত হয়েছে, কিন্তু সাক্ষীর সাথে অপরাধীর শত্রুতা প্রমাণিত হওয়ার কারণে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। তাহলে ওই অবস্থায় যদিও মুরতাদ হওয়ার মীমাংসা রহিত হবে না। (শত্রুতার কারণে যে

ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে) তাতে সাক্ষীর সত্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না।^১ এ অবস্থায় বিচারকের জন্য অনুমতি রয়েছে যে, তিনি স্বীয় বুদ্ধিবিবেচনা অনুযায়ী এ ধরনের অপরাধীর যে শাস্তি নির্ধারণ করে দেবে তাই কার্যকর করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সত্য সঠিক পথের দিশা দানকারী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

^১. সাক্ষীর জন্য শর্ত হলো, অপরাধীর সাথে তার কোনো প্রকার শত্রুতা থাকতে পারবে না। যদি অপরাধী প্রমাণ করতে পারে যে, তার সাথে সাক্ষীর পূর্ব শত্রুতা রয়েছে আর এ কারণে সে অপরাধীর বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, তাহলে সাক্ষীর সাক্ষ্য বাতিল করে দিতে হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ حُكْمُ الذِّمِّيِّ فِي ذَلِكَ

যিম্মী কর্তৃক মর্যাদাহানির বিধান

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মুসলমানদের বিধান আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু যদি কোনো যিম্মী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে বা আকার-ইসিতে অপমান ও অসম্মান করে বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। অথবা ওই কারণসমূহ ছাড়া সে তার কুফরীর কারণে অস্বীকার করে,^১ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অন্য কোনো প্রকার কলঙ্কের কালিমা লেপন করে, তাহলে আমাদের ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। তবে শর্ত হলো, যদি সে তাওবা করে মুসলমান হতে রাজী না হয়। কারণ মুসলমান তার যে হিফায়তের দায়িত্ব নিয়েছে। তার অর্থ এই নয়, সে সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। এ অভিমত জমহুর আলেমগণের। ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম ও তাদের কৃষ্ণী সহচরবৃন্দের অভিমত হলো, তাকে হত্যা করা যাবে না। কারণ সে তো পূর্ব থেকে মুশরিক হয়ে আছে। আর সে তো এমনিতে বড় গুনাহে লিপ্ত রয়েছে। তাদের ধারণা হলো, তাকে রাষ্ট্রে প্রচলিত শাস্তি দিতে হবে।

আমাদের কোনো কোনো শিক্ষাগুরু তাকে হত্যা করার ব্যাপারে উক্ত আয়াত দলীল হিসেবে পেশ করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

^১ ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক যে জিম্মিয়া কর দানে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তাকে যিম্মী বলা হয়। যিম্মির জীবন ধন-সম্পদ, ইচ্ছিত-সম্মান সংরক্ষণ করার দায়িত্ব মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের উপর ন্যস্ত।

^২ যদি কোন মুসলমান হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী মেনে না নেয়, তবে এ কারণে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কোনো যিম্মী বলে যে, আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বলে স্বীকার করি না, কারণ তার নবুওয়াত শুধু আরবের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো (নাউযবিলাহ), তাহলে এজন্য তাকে হত্যা করা গুনাহিব হবে না। কারণ এটা তার জাতিগত বিশ্বাস। তা পরিবর্তন করার জন্য তার উপর বল প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মী হিসেবে বসবাসকারী প্রত্যেক অমুসলিমের এ অধিকার রয়েছে যে, তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সাথে তাদের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে। কিন্তু যথেষ্ট বলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এমন কোনো মন্তব্য করবে, যাতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমাবিত্ত গুণাবলী ও মর্যাদায় আঘাত লাগে, এ বিষয় কখনো তাকে অনুমতি দেয়া যাবে না। যেমন এরূপ বলা যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস্তাকী ছিলেন না (নাউযবিলাহ)।

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ
فَقَتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.

—আর যদি চুক্তি করে নিজেদের শপথসমূহ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, তবে কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো! নিশ্চয়, তাদের শপথসমূহ কিছুই নয়, এ আশায় যে, হয়তো তারা ফিরে আসবে।^১

তাদের আরো দলীল হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'ব বিন আশরাফ প্রমুখকে হত্যার আদেশ দেন। আর তা এ জন্যই যে, আমরা না তার সাথে এরূপ কোনো চুক্তি করেছি, আর না এ বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়েছি যে, সে এ ধরনের নিন্দনীয় আচরণে করতে থাকবে। আমাদের জন্য এরূপ করা বৈধ হবে না। তাই তারা যখন এ ধরনের আচরণ করবে, যে ব্যাপারে তাদের সাথে আমাদের কোনো চুক্তিপত্র নেই, সেহেতু তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। তাই তারা হরবী^২ কাফিরদের মতো হয়ে গেছে। তাদেরকে তাদের কুফরীর কারণে হত্যা করা যাবে।

এখানে আরো একটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষণীয় তা হলো, যিম্মী হওয়ার কারণে চুরি করার পর তার হাত কাটার শাস্তি রহিত হয় না। আর না হত্যা করার পর কিসাস বা রক্তপণ তার উপর থেকে রহিত হয়। তাই তাদের ধর্মমতে সেই হত্যা বৈধও হোক না কেনো। অনুরূপ যদি সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাহানি করে তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

আমাদের কোনো কোনো আসহাবে জাওয়াহির আলেম থেকে এ অবস্থায় যখন যিম্মীর কারণসমূহ বর্ণনা করে, যে কারণে সে ইসলাম গ্রহণ করেনি, সেই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। ইবনে কাসিম ও সাহনূনের অভিমত অধ্যয়ন করার পর আপনারা এ মতভেদ সম্পর্কে অবগত হবেন। আবুল মাস'আব বিষয়টি তার মদীনার সাথীদের মতভেদ উল্লেখ করেছেন।

যখন এক ব্যক্তি কাফির অবস্থায় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাহানি করে পরে ইসলাম গ্রহণ করে, কেউ কেউ বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার

^১ আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১২।

^২ যুদ্ধরত অমুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাদেরকে হরবী বলা হয়।

পর তাকে হত্যা করা যাবে না। কারণ ইসলাম গ্রহণ করা তার পূর্ববর্তী কুফরী বাতিল করে দিয়েছে।

কিন্তু যদি কোনো মুসলমান মর্যাদাহানি করে পরে তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা তার হত্যাকে রহিত করবে না। কারণ কাকির সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত জানি যে, সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। আর তার অন্তরে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে মর্যাদাহানিকর ধ্যান-ধারণা থাকতে পারে। আমরা তাকে তার ওই ভ্রান্ত ধারণা সরাসরি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছি। এখন তার দ্বারা শুধু অতিরিক্ত এটা হয়েছে যে, সে ওই আদেশের বিরোধিতা করেছে, আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। যখন সে নিজের দীন পরিত্যাগ ইসলামের আওতায় এসে পড়েছে, তাই তার পূর্ববর্তী মতবাদ এমনিতে বাতিল হয়ে গেছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

-আপনি কাকিরদেরকে বলুন, যদি তারা বিরত থাকে, তবে যা অতীতে গত হয়েছে তা তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।^১

মুসলমানের অবস্থা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। যদি কোনো মুসলমানের এই অবস্থা হয় তাহলে আমরা তার অভ্যন্তরীণ অবস্থার (ইমানের) উপর তার বাহ্যিক অবস্থার মীমাংসা করেছি। সুতরাং যদি তার বিপরীত কিছু প্রকাশ হয়, তাহলে তার প্রত্যাবর্তন ধর্তব্য হবে না। এ অবস্থায় আমরা তার অভ্যন্তরীণ দিকের উপর নির্ভর করবো না। যেহেতু তার অভ্যন্তরীণ দিক তো প্রকাশ হয়ে পড়েছে। উপরন্তু তার উপর যেসব বিধান রয়েছে তা এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। আর বাতিলকারী কোনো জিনিস তখন ইসলাম গ্রহণ করা অবশিষ্ট থাকে নি।^২

কেউ কেউ বলেন, যদি কোনো যিম্মী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানহানিকর কটুক্তি করার পর ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার ইসলাম গ্রহণ তার হত্যাকে বাতিল করবে না। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে। এজন্য যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক তার উপর ওয়াজিব ছিলো। কারণ সে হযুর

^১. আল কুরআন : সূরা আনকাল, ৮:৩৮।

^২. সুতরাং যদি কোন মুসলমান হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে সরাসরি বে'আদবী করার পর তাওবা করে, ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতানুযায়ী তার তাওবা গৃহীত হবে না। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে এবং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কলঙ্ক আরোপ করার ইচ্ছা করেছে। সুতরাং এরপর যদিও সে ইসলামের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে, তবুও সে এতো জঘন্য অপরাধ করেছে যে, তার ইসলাম গ্রহণ তার হত্যা রহিত করবে না। এ মাসয়ালা এভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যেমন সে কাকির অবস্থায় কাউকে হত্যা করে অথবা কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তিকে ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্ত করে, তাহলে কী তার ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সেই হত্যা ও ব্যাভিচারের অভিযোগ ক্ষমা হয়ে যাবে? তা কখনো হবে না। কারণ তার উপর এক মুসলমানের হক রয়েছে। যা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে রহিত হয় না। তাহলে এখন বলুন! হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক কীভাবে ক্ষমা হবে?

তাছাড়া হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হকের ব্যাপারে আমরা যখন মুসলমানের তাওবা গ্রহণ করিনা, তাহলে কাকিরের তাওবা তো আরো উত্তমরূপে গ্রহণ করবো না।

হযরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইবনে হাবীবের 'মাবসূত' কিতাবে আর ইবনে কাসিম, ইবনুল মাজ্জিন, ইবনে আবদুল হাকাম ও আসবাগ বলেছেন, যে-কোনো লোক, চাই সে মুসলমান হোক বা যিম্মী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আশিয়ায়ে কেরামের মধ্যে কোনো নবীর শানে বে'আদবী করবে, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তবে যদি যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না।

আতবীয়া গ্রন্থে ইবনে কাসিম এ বর্ণনা উল্লেখ করেন, ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও সাহনুন এ অভিমত ব্যক্ত করেন। সাহনুন ও আসবাগ বলেন, সেই যিম্মীকে তাওবা করার কথা বলা যাবে না। তুমি ইসলাম গ্রহণ করো এ বলে তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করাও যাবে না। কিন্তু যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার ইসলাম গ্রহণ তার তাওবার স্থলাভিষিক্ত হবে।

ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তিনি বলেন, আমি ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সহচরদের থেকে শুনেছি,

مَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيَّرَهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَبَبْ.

-যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বে'আদবী করবে, বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কোনো নবীর শানে বে'আদবী করবে, চাই সে মুসলমান হোক বা কাফির তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তার তাওবা গৃহীত হবে না।

কিন্তু ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে যে বর্ণনা আমি জানতে সক্ষম হয়েছি, তাতে বলা হয়েছে- যদি কাফির ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না।

ইবনে ওয়াহাব, হযরত ইবনে উমর রাহিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক পাদ্রী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মন্দ কথা বলেছে, হযরত উমর রাহিয়াল্লাহু আনহু তা জানার পর বললেন, -تُؤْمِنُ بِهِ فَهَذَا قَتْلُهُ- তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে না কেনো?

ইসা বিন কাসিম ওই যিম্মী সম্পর্কে বলেন, যে বলে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট নবী হিসেবে আগমন করেননি। তিনি তোমাদের জন্য নবীরূপে আগমন করেছেন। আমাদের নবী হলেন হযরত মূসা ও ইসা আলাইহিসসালাম। তিনি বলেন এ জন্য তাকে কোনো প্রকার জবাবদিহী করতে হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাকে এভাবে কুফরীর মধ্যে বদ্ধমূল রেখেছেন (নাউযবিলাহ)। যদি সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় বা বলে তিনি নবী বা রাসূল কিছুই নন বা তার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়নি বরং এটা হলো তার মনগড়া কথা বা এ ধরনের অযাচিত ও ধৃষ্টতামূলক কথা বলে (নাউযবিলাহ) তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

ইবনে কাসিম বলেন, যদি কোনো খ্রিষ্টান বলে, আমাদের দীন তোমাদের দীন থেকে উত্তম। তোমাদের দীন তো গাধার দীন বা এ ধরনের মন্দ কথা বলে, অথবা মুয়াযযিনকে যখন. أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) বলতে শুনে; তখন বলে যে, তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমন রাসূল দান করেছেন, তাহলে এ ধরনের লোকদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। আর তাদের দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখতে হবে। কিন্তু যদি সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্পষ্ট ভাষায় গালি দেয় তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে, যদি না সে মুসলমান হয়ে যায়। এ কথা ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একাধিকবার বলেছেন। তবে তিনি তাকে তাওবা করাতে হবে এ কথা বলেন নি।

ইবনে কাসিম বলেন, তার মতে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অভিমতের অর্থ হলো, যদি সে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না।

সুলায়মান বিন সালিম এ ধরনের এক ইহুদী সম্পর্কে হযরত ইবনে সাহনুনকে জিজ্ঞেস করেন, যে ব্যক্তি আযানে শাহাদাত বাক্য পাঠ করার সময় মুয়াযযিনকে বলে, 'তুমি মিথ্যাবাদী'। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, তাকে দীর্ঘদিন বন্দী করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

'নাওয়াদির' গ্রন্থে সাহনুন থেকে বর্ণিত,

مَنْ شَتَمَ الْأَنْبِيَاءَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي بِهِ كَفَرُوا ضُرِبَتْ عَنْقُهُ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ.

-যে ইহুদী ও খ্রিষ্টান আশিয়ায়ে কেরামকে অকারণে গালি দেয়, আর সে গালি যদি তাদের কুফরী বিশ্বাস অনুযায়ী না হয়, তাহলে তার ঘাড় উপড়ে দিতে হবে। যদি তারা মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে হত্যা করা হবে না।

মুহাম্মদ বিন সাহনুন বলেন, যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়ার কারণে ইহুদিকে হত্যা করছো কেনো বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়া বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলা তো তাদের দীন।

তখন এর প্রত্যুত্তরে আমরা বলবো, এক অমুসলিম যার সাথে আমাদের চুক্তিপত্র হয়েছে। (যিম্মী বানানোর) এর অর্থ কখনো এ নয় যে, তারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে আর আমরা বসে বসে তামাশা দেখতে থাকবো। অথবা তারা আমাদের হত্যা করবে বা আমাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করবে। আর আমরা চুক্তিপত্রের কারণে নীরবে বসে থাকবো। এটা হবে না, বরং তারা যদি আমাদের কাউকে হত্যা করে তাহলে আমরাও রক্তপণ হিসেবে তাদের হত্যা করবো। আর তারা যদি অবৈধভাবে আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে, তাহলে আমরা তাদের নিকট থেকে আমাদের লুণ্ঠিত মালামাল ছিনিয়ে আনবো। যদিও তারা বলে যে, তোমাদের হত্যা করাও তোমাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা আমাদের ধর্ম মতে জাযিয়। তাহলে এখন বলুন, যদি কেউ আমাদের আকা মাওলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জতসম্মান ক্ষুণ্ণ করবে, চাই সে স্বীয় ধর্মীয় আকীদাবিশ্বাস অনুযায়ী তা করে, তাহলে আমরা কীভাবে তা সহ্য করবো? সাহনুন

আরো বলেন, যদি কোন হরবী কাফির আমাদের সাথে এ শর্তে জিযিয়া কর দিতে রাজী হয় যে, আমরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমাদের যা খুশি তা বলবো। তাহলে বলুন, আমাদের জন্য তার নিকট জিযিয়া কর আদায় করা জায়য হবে কী? কখনো জায়য হবে না।

অনুরূপ যে-কেউ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে, যদিও সে চুক্তিপত্র নিজেই বাতিল করে দিয়েছে, এ অবস্থায় তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে। তারপরও আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেভাবে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কোনো লোকের জন্য এটা বৈধ হয় না যে, সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিতে থাকবে, অনুরূপভাবে জিযিয়া কর দেয়ার পর তাকে গালি দেয়ার অনুমতি দেয়া যাবে না।

সম্মানিত গ্রন্থকার কাযী আবুল ফযল আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইবনে সাহনুন তার নিজের ও তার পিতার পক্ষ থেকে যা বলেছেন তা ইবনে কাসিমের বর্ণনার বিপরীত। কারণ ইবনে সাহনুনের বর্ণনা অনুযায়ী যিম্মীর শাস্তি তার কাফির হওয়ার কারণে হালকা হতে হবে। এ অভিমত মদীনাবাসীদের বর্ণনারও বিপরীত।

আবু মাস'আব যুহরী বলেন, আমার নিকট জনৈক খ্রিষ্টানকে হাজির করা হয়। সে বলে যে, ওই খোদার শপথ যিনি হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তখন আমার নিকট অনেক আলেম উপস্থিত ছিলো, তারা তাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে মতভেদ করে। কিন্তু আমি উঠে তাকে এমন প্রহার করি, যার ফলে একদিন পর সে মারা যায়। আমি এক ব্যক্তিকে বললাম, তারপর ধরে তাকে আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে এসো। লোকটি তাই করে। পরে কুকুর এসে তার মৃতদেহ খেয়ে ফেলে।

আবু মাস'আবকে জনৈক খ্রিষ্টান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, সে বলে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পয়দা করেছেন (নাউযবিলাহ)। প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

ইবনে কাসিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَأَلْنَا مَالِكًا عَنْ نَضْرَانِيٍّ بِمَضْرَ شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: مَسْكِينٌ مُحَمَّدٌ. يُخْبِرُكُمْ

أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ! مَا لَهُ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسَهُ إِذْ كَانَتْ الْكِلَابُ تَأْكُلُ سَاقِيَهُ! لَوْ قَتَلُوهُ

اسْتَرَاخَ مِنْهُ النَّاسُ.

-আমি ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করি, মিশরের জনৈক খ্রিষ্টান সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, সে বলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসকিন (নাউযবিলাহ)। তিনি তোমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বেহেশতে যাবেন, বলো! তার কী অবস্থা হবে, তিনি তো নিজেই নিজের উপকার করতে পারেন না (নাউযবিলাহ)। কারণ কুকুর তার পায়ে গোছা খেয়ে ফেলেছে, যদি লোকেরা তাকে হত্যা করে তাহলে তারা শাস্তি পাবে। একথা শুনে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, أَرَى أَنْ نُضْرَبَ عُنُقَهُ -তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হোক। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, আমি মনে করি আমি চুপ থাকবো। কিন্তু আমি চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না।

‘মাবসূত’ গ্রন্থে ইবনে কিনানাহ বলেন, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে, চাই সে ইহুদী হোক কিংবা খ্রিষ্টান, আমি বিচারককে পরামর্শ দেবো, তাকে যেন আগুনে পোড়ানো হয়। যদি বিচারক ইচ্ছা করেন তাহলে তাকে প্রথমে হত্যা করে পরে তার মৃতদেহ আগুনে পুড়াবে। অথবা যদি ইচ্ছা করে জীবিত আগুনে পুড়ে ফেলতে পারবে, যখন সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে সরাসরি অশালীনভাবে কটুক্তি করে।

এ মাসায়ালা ও ইবনে কাসিমের রায় সম্পর্কে মিশর থেকে লোকজন ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট পত্র লেখে, তিনি চিঠি পেয়ে ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পত্রের উত্তর লেখার নির্দেশ দিয়ে বললেন, লিখে দাও যে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে এবং তার ঘাড় উড়িয়ে দিতে হবে।

ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি তাকে লিখেছি আর ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললাম, হে আবদুল্লাহর পিতা! এই কথা কি লিখে দেবো যে, এরপর তার লাশ আগুনে পুড়ে ফেলতে হবে? ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নিশ্চয়, সে এর উপযুক্ত হয়েছে। সুতরাং আমি এ কথাও লিখেছি। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন এ বিষয়ে কোনো প্রতিবাদ করেন নি। এভাবে আমি পত্র লেখা সমাপ্ত করি। ওই পত্র অনুযায়ী সেই খ্রিষ্টানকে প্রথম হত্যা করা হয় এবং পরে তার মৃতদেহ আগুনে পোড়ানো হয়।

আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া ইবনে লুবাবাহ ও আমাদের স্পেনের অনেক আলেম এক খ্রিষ্টান মহিলাকে হত্যা করার ফাতওয়া দেয়, যে প্রকাশ্যে আল্লাহ তা'আলার রুবুবীয়াত ও হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের নবুওয়াত অস্বীকার করে এবং

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তবে এ কথা বলার পর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার হত্যা রহিত হবে।

অধিকাংশ মুতাআখখিরীন আলেমগণ তাদের মধ্যে কবিসী ও ইবনুল কাতিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন। আবুল কাসিম বিন জাল্লাব তার রচিত গ্রন্থে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে, চাই সে মুসলমান হোক বা কাফির তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আর তার তাওবা কবুল করা হবে না।

কাযী আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওই যিম্মী সম্পর্কে বলেন, যে প্রথমে গালি দেবে তারপর ইসলাম গ্রহণ করবে, তার সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে এক অভিমত হলো, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার হত্যা রহিত করে দেয়া হবে।

কিন্তু ইবনে সাহনুন বলেন, মিথ্যা অপবাদের অভিযোগ ও অনুরূপ বান্দার হকসমূহ যখন ইসলাম গ্রহণ করার কারণে রহিত হয় না, তবে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তিসমূহ রহিত হবে কীভাবে?

অনুরূপ দেখতে হবে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করার পর তা কীভাবে রহিত হবে? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবাদ দেয়ার কারণে ওই শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে যা সাধারণ লোককে অপবাদ দেয়ার কারণে প্রয়োগ করা হয়। বা তার চেয়ে অধিক শাস্তি দেয়া হবে। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও মর্যাদা সর্বোচ্চ। এ কারণে তার শাস্তি হবে হত্যা। অথবা এটা হতে পারে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে হত্যা রহিত হয়ে যাবে, তবে তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হবে। এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

فِي مِيرَاثٍ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কটুক্তির দায়ে নিহত ব্যক্তির মিরাস ও দাফন কাফন প্রসঙ্গে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কটুক্তির কারণে নিহত ব্যক্তির মিরাসের ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে।

সাহনূনের অভিমত হলো, তার পরিত্যক্ত সম্পদ মুসলমানদের দিয়ে দিতে হবে। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাল-মন্দ করা কুফরী। আর এ কুফর নাস্তিক্যের কুফরীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আসবাগ বলেন, তার পরিত্যক্ত সম্পদ তার মুসলমান উত্তরাধিকারী পাবে। তবে শর্ত হলো, যদি সে তার ভ্রাতৃ ধ্যান-ধারণা গোপন করে। আর যদি সে প্রকাশ্যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বে'আদবী করে, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ মুসলমানদের অর্থাৎ বায়তুলমালে জমা দিতে হবে। মোটকথা তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আর তাকে তাওবাও করানো যাবে না।

আবুল হাসান কবিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যদি সে তার বিরুদ্ধে মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে দেয়া সাক্ষ্য অস্বীকার করে, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদের হুকুম তার বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ তার উত্তরাধিকারীদের দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তিকে কোনো শাস্তির কারণে হত্যা করা হয়, তার পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে শরীয়ত কোনো প্রকার মতভেদ করেনি।

অনুরূপ যদি সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়ার কথা স্বীকার করার পর তাওবা করে, তাহলেও তাকে শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি অনুযায়ী হত্যা করা হবে। তবুও তার পরিত্যক্ত সম্পদের হুকুম অন্যান্য ইসলামী হুকুম অনুযায়ী কার্যকর হবে।

আর যদি সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়ার কথা স্বীকার করে এর উপর অবিচল থাকে। আর তাওবা করতে অস্বীকার করে। এ কারণে তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে তাকে কাফির গন্য করা হবে। আর মুসলমানরা তার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবে, তাকে না গোসল দেয়া যাবে, না তার জানাযার নামায পড়া হবে, না তাকে কাফন পরানো হবে, না তার সতর আবৃত করা হবে। কাফিরদের যেভাবে মাটি চাপা দিয়ে দাফন করা হয় তাকেও ঠিক সেভাবে মাটি চাপা দিয়ে দাফন করতে হবে।

১. অর্থাৎ তার মিরাস বায়তুল মালে জমা দিতে হবে।

শায়খ আবুল হাসানের অভিমত হলো, প্রকাশ্য কুফরকারী ও ওই কুফরীর উপর হঠকারিতা সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করা প্রকাশ হয়েছে। আর তাতে কোনো মতভেদ নেই। এজন্য সে কাফির মুরতাদ হয়েছে। না সে তাওবা করেছে, না স্বীয় অভিমত প্রত্যাহার করেছে। এধরণের অভিমত আসবাগও বর্ণনা করেছেন।

ইবনে সাহনুন তার গ্রন্থে ওই যিন্দীক সম্পর্কে এ অভিমত প্রকাশ করেন, যে নিজ কুফরীর উপর অবিচল থাকে। এরূপ হুকুম ইবনে কাসিম 'আতবীয়া' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সহচরবৃন্দ ইবনে হাবীবের গ্রন্থে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, যে তার কুফরীর বিষয় প্রকাশ্যে ঘোষণা করে।

ইবনে কাসিম বলেন, তার হুকুম হলো মুরতাদের হুকুম। তার পরিত্যক্ত সম্পদ না মুসলমান পাবে। না ওইসব লোক পাবে যারা ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে। আর না তার ওসীয়াত কার্যকর হবে। না তার আযাদকৃত গোলাম মুক্ত হবে। আসবাগও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। যখন তাকে স্ব-ধর্ম ত্যাগের কারণে হত্যা করা হবে বা মুরতাদ অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যু হবে।

আবু মুহাম্মদ বিন যায়িদ বলেন, এরূপ যিন্দীকের পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যে প্রকাশ্যে তাওবা করে, কিন্তু তার তাওবা গ্রহণ করা হবে না, তাকে হত্যা করা হবে, কিন্তু যে যিন্দীক স্বীয় কুফরী উপর অবিচল থাকে আর তাকে হত্যা করা হয় তার পরিত্যক্ত সম্পদের ব্যাপারে তো কোনো মতভেদই নেই। তার পরিত্যক্ত সম্পদ কেউ পাবে না। বরং তা বায়তুল মালে জমা দিতে হবে।

আবু মুহাম্মদ বলেন, যে ব্যক্তির আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেয়ার পর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যও দেয়া হয়েছে, কিন্তু ওই সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সত্যতা পর্যবেক্ষণ করা হয়নি, তাহলে তার জানাযার নামায পড়তে হবে।

'ইবনে হাবীব' গ্রন্থে আসবাগ ইবনে কাসিম থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে বা প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে, তার পরিত্যক্ত সম্পদ মুসলমানদের দেয়া হবে। আর তিনি এ বিষয়ে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনা উল্লেখ করেন, মুরতাদের পরিত্যক্ত সম্পদ মুসলমানদের দেয়া হবে। অর্থাৎ বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। তার উত্তরাধিকারীদের দেয়া যাবে না।

ইমাম শাফেঈ, রবীয়া, আবু সাওর ও ইবনে আবি লায়লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম এ অভিমত প্রকাশ করেন। হযরত ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি বর্ণনায় এ অভিমতের বিরোধিতা করেছেন।

হযরত আলী, ইবনে মাস'উদ, ইবনুল মুসায়্যিব, হাসান বসরী, শাবী, উমর বিন আবদুল আযীয, হাকাম, আওয়াযী, লাইস, ইসহাক ও ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখের অভিমত হলো, তার মুসলমান উত্তরাধিকারী তার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। এরূপ এক বর্ণনা রয়েছে, তার মুরতাদ হওয়ার পূর্বে অর্জিত সম্পদের ব্যাপারে এ বিধান কার্যকর হবে। আর মুরতাদ অবস্থায় অর্জিত সম্পদ উত্তরাধিকারীরা পাবে না। তা মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে।

গ্রন্থকার বলেন, আবুল হাসান এ মাসয়ালা সম্পর্কে যে ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন তা যথার্থ হয়েছে। আর তা আসবাগের বর্ণনা মোতাবেক হয়েছে, তবে তা সাহনুনের অভিমতের বিপরীত হয়েছে। আর ওই হযরতগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উভয় অভিমত অনুযায়ী যিন্দীকের পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কখনো তার মুসলমান উত্তরাধিকারীকে সেই মুরতাদের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। তার বিপরীতে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হোক না কেনো। সে তা স্বীকার করুক, বা অস্বীকার করুক না কেনো আর সে তাওবা করুক না কেনো। আসবাগ, মুহাম্মদ বিন মাসলামা ও তাঁর অনেক ছাত্র উক্ত অভিমত সমর্থন করেছেন। আর এ ব্যাপারে তাদের মনোভাব হলো, সে ইসলাম প্রকাশ করেছে আর গালি দেয়া অস্বীকার করেছে, অথবা তা থেকে তাওবা করেছে, তার হুকুম হবে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মদীনার মুনাফিকের হুকুমের অনুরূপ।

আর ইবনে নাফি, ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে 'আতবীয়া ও মুহাম্মদ' গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করেন, ওই যিন্দীকের পরিত্যক্ত সম্পদ মুসলমান পাবে। কারণ তার সম্পদ তার রক্তের অনুসারী হবে। ইমাম সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একদল ছাত্র এ অভিমত সমর্থন করেছেন।

আশহাব, মুগীরা, আবদুল মালিক, মুহাম্মদ, সাহনুনের এ অভিমতকে ইবনে কাসিম 'আতবীয়া' গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। তিনি আরো বৃদ্ধি করে বলেন, যদি সে তার বিপক্ষে দেয়া সাক্ষ্য সমর্থন করে, তাওবা করে, আর তার তাওবা কবুল না হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ তার উত্তরাধিকারীরা পাবে না। আর যদি সে তার বিরুদ্ধে দেয়া সাক্ষী অস্বীকার করে,

আর ওই অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যায়, বা তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

ইবনে কাসিম বলেন, এ আদেশের আলোকে ইসলামী উত্তরাধিকার নীতি অনুযায়ী তার পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টিত হবে। আবুল কাসিম বিন কাতিবকে এরূপ এক খ্রিষ্টান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যাকে হযুর সালাহুদ্দীন আল্লাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়ার কারণে হত্যা করা হয়েছে। তার পরিত্যক্ত সম্পদ তার মতবাদে বিশ্বাসী লোকজন পাবে, না মুসলমান পাবে? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, তার পরিত্যক্ত সম্পদ মুসলমান পাবে। তবে এটা পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে পাবে না। কারণ তার পরিত্যক্ত সম্পদ পৃথক দুই মতবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে ভাগ হবে না। বরং ওই সম্পদ মুসলমানদের গণিমতের মাল হিসেবে দেয়া হবে। কারণ ওই খ্রিষ্টান প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। এটা হলো ইবনে কাসিমের অভিমতের সারমর্ম।

الْبَابُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অধ্যায়

فِي حُكْمِ مَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَكُتُبَهُ وَآلَ
النَّبِيِّ ﷺ وَزَوْاجَهُ وَصَحْبَهُ

আল্লাহ তা'আলা, ফিরিশতা, আশ্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের
পরিবারবর্গ ও সহচরদের গাল-মন্দের বিধান প্রসঙ্গে

حُكْمُ سَابِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمُ اسْتِثَابِهِ

আল্লাহ তা'আলাকে গাল-মন্দকারী ও তাঁর বিধান প্রসঙ্গে

উক্ত মাসয়ালায় কোনো মতভেদ নেই যে, কোন মুসলমান আল্লাহ তা'আলাকে গালি দিলেই কাফির হবে। আর তার রক্তপাত বৈধ হবে। তবে তাকে তাওবা করানোর বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, তাকে তাওবা করানো যাবে কী, যাবে না। ইবনে কাসিম 'মাবসূত' গ্রন্থে বলেন, আর ইবনে সাহনুন 'মুহাম্মদ' গ্রন্থে, ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনে কাসিম ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন,

مَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَبَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اقْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ بِإِزْدَادِهِ إِلَى دِينِ دَانَ بِهِ وَأَظْهَرُهُ فَيُسْتَبَّ. وَإِنْ لَمْ يُظْهَرُهُ لَمْ يُسْتَبَّ.

-যে মুসলমান আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেবে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তাকে তাওবা করানো যাবে না। তবে যদি সে আল্লাহ তা'আলাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ইসলাম ত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে তাকে তাওবা করানো হবে। যদি সে স্বীয় কুফরী গোপন রাখে, তাহলে তাওবা করানো যাবে না।

'মাবসূত' গ্রন্থে মুতাররিফ ও আবদুল মালিক থেকে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। মাখযুমী, মুহাম্মদ বিন মাসলামা ও ইবনে আবি হাযিম বলেন, যদি মুসলমান আল্লাহ তা'আলাকে গাল-মন্দ করে, তবে তাকে তাওবা করতে বলতে হবে। তাওবা করতে না বলা পর্যন্ত তাকে হত্যা করা যাবে না। অনুরূপ যদি ইহুদী ও খ্রিষ্টান আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেয় তাহলে তাকেও তাওবা করাতে হবে। যদি সে তাওবা করে, তা হলে তার তাওবা কবুল করা হবে। নতুবা তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তাকে তাওবা করানো জরুরী, কারণ এ ব্যক্তিও মুরতাদের মতো। কাযী ইবনে নাসির এ অভিমতকে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

আবু মুহাম্মদ বিন যায়িদকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা হয়, যে ব্যক্তি কারো প্রতি অভিসম্পাত দেওয়ার সাথে সাথে (নাউযবিলাহ) আল্লাহ তা'আলার প্রতিও অভিসম্পাত দেয়, অতঃপর বলে যে, আমার ইচ্ছা ছিলো শয়তানকে অভিসম্পাত করা, কিন্তু আমার মুখ বিচ্যুতিতে এরূপ হয়েছে। প্রত্যুত্তরে আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তার বাহ্যিক ভাষা অনুযায়ী

তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তার কোনো প্রকার ওজর আপত্তি গৃহীত হবে না। তবে এটা তার ও আল্লাহ তা'আলার ব্যাপার, এখানে সে মা'যুর বা অক্ষম।^১

কর্ডোবার ফিকহবিদগণ, হারুন বিন হাবীবের^২ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। সে আব্দুল মালিকের ভাই ছিলো। চরিত্রহীন নির্দয় ও ধৈর্যহীন লোক ছিলো। তার বিরুদ্ধে এরূপ অনেক সাক্ষী ছিলো। তন্মধ্যে এটাও এক অভিযোগ ছিলো যে, সে একবার অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়ার পর বলে, আমি রোগে এতো বেশী কষ্ট ভোগ করেছি, যদি আমি হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হত্যা করে ফেলতাম তাহলেও এতো কষ্ট ভোগ করতে হতো না। ইব্রাহিম বিন হুসাইন বিন খালিদ তাকে হত্যা করার আদেশ করেন। কারণ সে এ কথার মধ্যে অত্যাচার ও কষ্টকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। পক্ষান্তরে তার কথায় এ ধরনের ইঙ্গিত রয়েছে যাতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। তার ভাই আবদুল মালিক বিন হাবীব ইব্রাহিম বিন হুসাইন বিন আসেম ও কাযী সাঈদ বিন সুলায়মান তাকে হত্যা থেকে অব্যহতি বলে ফাতওয়া দেয়। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও তাকে বন্দী করে কঠোর শাস্তি দেয়া শ্রেয় মনে করেন। যাই হোক, তার বক্তব্যে সম্ভাবনা ছিলো যে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ধরা যেতে পারে।

যে ব্যক্তি এ কথা বলে, আল্লাহ তা'আলা যে গালি দেয় তাকে তাওবা করাতে হবে। তাদের মতে এরূপ করা কুফরী ও ধর্মান্তরিত হওয়া। আর তাতে বান্দার হক সম্পৃক্ত নয়। সুতরাং এ কাজ অনিচ্ছাকৃত আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেয়ার সাদৃশ্য হয়েছে। এর দ্বারা ইসলামের বিপরীত কোনো দীন গ্রহণ করা প্রমাণিত হয় না।

যারা বলে যে, তাকে তাওবা করাতে হবে না, বরং তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তাদের যুক্তি হলো, যখন একবার সে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার ইসলাম প্রকাশ করেছে, আমরা তার ইসলাম গ্রহণ তার প্রতি কপটতার কোনো অভিযোগ আরোপ করিনি। তাই আমাদের ধারণা হলো, সে যা বলেছে, তার নিজস্ব আকীদা

^১ অর্থাৎ তার পরকালীন ব্যাপারটি নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল হবে। যদি সত্যই সে ভুলবশতঃ এরূপ বলে, তাহলে সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু শরীয়তের বিধান বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের উপর কার্যকর হয়।

^২ সে বসরার অধিবাসী ছিলো। তার অভ্যাস ছিলো, সে সর্বদা কুরআন মাজীদে দ্বৈত অর্থবোধক আয়াতসমূহ আলোচনা করে নিজে পঞ্চদ্রষ্ট হতো আর অন্যদেরও পঞ্চদ্রষ্ট হতে উৎসাহ দিতো। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ খবর জানার পর তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন, তাকে দীর্ঘদিন কারাগারে বন্দী করে রাখেন। তারপর জনসাধারণকে তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করার নির্দেশ দেন। সুতরাং বসরাবাসীরা তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করে তার সাথে কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দেয়।

বিশ্বাস অনুযায়ী বলেছে। কারণ এটা এমন এক বিষয় যে, এর সম্পর্কে সামান্য পরিমাণ শৈথিল্য দেখানো যাবে না। তারপরও যদি সে আল্লাহ তা'আলাকে গালি দিয়ে সরাসরি ইসলামের বিরোধিতা করে, তাহলে আমরা তার উপর যিন্দীকের হুকুম আরোপ করবো। এ কারণে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে না। তারপর যখন সে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়েছে আর তার গালিকে ধর্মাস্তরের নিদর্শন হিসেবে প্রকাশ করেছে, তাতে সে সম্ভবতঃ এ কথা প্রকাশ করেছে যে, তার নিজের গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে দূরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। সুতরাং তার শাস্তি হত্যা ব্যতীত আর কী হতে পারে।

তবে যদি কোনো ব্যক্তি, ইসলামী বিধানের অনুসারী হওয়ার পর কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার হুকুম মুরতাদের হুকুম হবে। অধিকাংশ প্রসিদ্ধ আলেমদের মতে তাকে তাওবা করাতে হবে। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর অনুসারীদের এই অভিমত। যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং এ সংক্রান্ত মতভেদের কথাও উল্লেখ করেছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

حُكْمُ إِضَافَةِ مَا لَا يَلِيْقُ بِهِ تَعَالَى عَنْ طَرِيقِ الْإِجْتِهَادِ وَالْخَطَا

গবেষণার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার শানে অশোভনীয় গুণাবলী সম্পৃক্তের বিধান যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার শানে এরূপ গুণাবলী সম্পৃক্ত করে, যা আল্লাহ তা'আলার মহান শান নয়। কিন্তু এ সম্পর্ক না গালি দেয়ার ইচ্ছায় করে যে, তার স্বধর্মত্যাগ প্রমাণিত হয়, আর না এটা প্রকাশ হয় যে, সে কুফরের ইচ্ছা করেছে, বরং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সে ভুলবশতঃ এ রূপ করেছে। আর এ কথা প্রকাশ পায়, সে প্রবৃত্তি অনুসারী ও বিদ'আতের বশবর্তী হয়ে এরূপ করেনি। যেমন আল্লাহ তা'আলাকে এমন কোনো বস্তুর সাথে উপমা দেয়া অথবা এ রূপ বলা যে, আল্লাহ তা'আলার অমুক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। অথবা আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ কোনো গুণ অস্বীকার করা ইত্যাদি। এরূপ আকীদা পোষণকারীদের কাফির বলার ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ মতভেদ স্বয়ং ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর ছাত্রদের মাঝেও পরিলক্ষিত হয়। যদি এ ধরনের আকীদা পোষণকারী নিজেরা পৃথক কোনো সমর্থক বা দল গঠন করে, তাহলে তাদের হত্যার ব্যাপারে সকলে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, তাদের তাওবা করাতে হবে। যদি তারা তাওবা করতে অস্বীকার করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তবে একক আকীদা পোষণকারীকে হত্যা করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর অধিকাংশ অনুসারীদের অভিমত হলো, তাদের কাফির বলা যাবে না। আর না তাদের হত্যা করা হবে। বরং তাদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দিতে হবে। আর দীর্ঘদিন কারাগারে বন্দী করে রাখতে হবে। যে পর্যন্ত এরূপে আকীদা পোষণকারী তাওবা প্রকাশ হয় আর তাদের দুর্গ ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাবীগদের সাথে করেছেন।

মুহাম্মদ বিন মাওয়ায খারিজীদের^১ ব্যাপারে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর এ অভিমত আবদুল মালিক বিন মাজ্জিন ও সাহনুন সকল ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের সম্পর্কে বলেছেন।^২

^১ প্রবৃত্তি অনুসারী অর্থাৎ বিদ'আতী দল সমূহ, যেমন- খারেজী, কদরীয়া, জবরীয়া, নাসিরিয়া ও খাড়াবীয়া ইত্যাদি।

^২ তারা এক ভ্রান্ত মতাবলম্বী দল ছিলো। তারা প্রথমে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সাখী ছিলো। পরে তারা বিদ্রোহী হয়ে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কাফির বলে। মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তারা হযরত ওসমান, তালহা, যুযায়ির ও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কাফির বলতে শুরু করে (নাউয়িবুল্লাহ)। তাদের আকীদা হলো, যে কোনো সগিরা ও

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বচনে তাঁর দাদা ও হযরত উমর বিন আবদুল আযীযের উদ্ধৃতি দিয়ে তার দাদা ও চাচা থেকে যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তাতে কদরীয়া^১ মতাবলম্বী সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তাহলো, তাকে তাওবা করাতে হবে। যদি সে তাওবা করে তাহলে ভাল, নতুবা তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

ঈসা বিন কাসিম বলেন, ভ্রাতৃ মতাবলম্বীদের আবাদীয়া ও কদরীয়াগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরোধী কুরআন মাজীদে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধন করে। তাদের তাওবা করাতে হবে। চাই তারা নিজদের আকীদা গোপন করুক বা প্রকাশ করুক। যদি তারা তাওবা না করে, তাহলে তাদের হত্যা করে ফেলতে হবে। আর তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। এ অভিমত ইবনে কাসিম 'মুহাম্মদ' গ্রন্থে কদরীয়াদের সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি আরো বলেন, তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃ আকীদা থেকে প্রত্যাবর্তন করে সঠিক পথে চলে এসো।

'মাবসূত' গ্রন্থে আবাদীয়া, কদরীয়া ও সব ভ্রাতৃ মতাবলম্বীদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, কারণ তারা তো মুসলমান হয়েছে। তাদেরকে তো তাদের ভ্রাতৃ আকীদার কারণে হত্যা করা হতো। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর উপর আমল ছিলো।

ইবনে কাসিম বলেন, যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলেননি, তাকে তাওবা করাতে হবে। যদি সে তাওবা করে তাহলে ভাল, নতুবা তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

ইবনে হাবীব ও তার মতো আরো অনেক আলেমগণ, তাছাড়া আমাদের অনেক আলেমগণ খারিজী, কদরীয়া ও মুরজীয়াদের^২ কাফির বলেছেন।

কবীরা ওনাহ করার কারণে মানুষ কাফির হয়ে যায়। কাল পরিক্রমায় এ ভ্রাতৃ দলটি বিভিন্ন নাম ধারণ করে। যেমন- কওমী, খারেজী, ওয়াহাবী ইত্যাদি।

১. খারিজীদের এক উপদলের নাম, তাদের প্রতিষ্ঠাতা হলো আবদুল্লাহ বিন আযায আমীমি। বনি উমাইয়্যার সর্বশেষ শাসক মারওয়ান বিন মুহাম্মদের শাসন আমলে এদের উদ্ভব হয়। অবশেষে আবদুল্লাহ বিন আযায নিহত হয়। তারা তাদের বিরোধীদের মুশরিক মনে করতো।

২. এ দল আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ কুদরতে অবিশ্বাসী ছিলো। তারা মানুষ একক ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে। তাকদীর বিশ্বাস করতো না। বর্তমানে এদলটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৩. তারা এক ভ্রাতৃ মতাবলম্বী। তাদের আকীদা হলো যে, ঈমানের উপর আমলের কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। আর এ উম্মাতের ওনাহগারদের আল্লাহ তা'আলা কোনো শাস্তি দেবেন না।

সাহনুন থেকেও এ কথা বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি বলে, কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার বাণী নয়, সে কাফির হয়ে যাবে। এ বিষয় ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বিভিন্ন বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। সিরিয়াবাসী আবু মাসহার ও মারওয়ান বিন মুহাম্মদ তাতেরীর বর্ণনায় আছে, তিনি তাদের কাফির বলেছেন, তার সাথে কদরীয়াদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করা হলে, তিনি বললেন, তাকে বিবাহ করো না, কারণ আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ .

-আর মুসলমান ক্রীতদাস মুশরিক অপেক্ষা উত্তম।^১

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে এক বর্ণনায় এটাও বর্ণিত, সব ভ্রাতৃ মতাবলম্বীরা কাফির। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একথা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সিফাত বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলার হাত কান বা চোখ স্থির করে, তার সে অঙ্গসমূহ কেটে ফেলতে হবে, সে যে অঙ্গ আল্লাহ তা'আলার জন্য স্থির করেছে। কারণ সে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ তা'আলার সাথে উপমা দিয়েছে।

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মতে, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ সৃষ্টকল্প মনে করে, সে কাফির হবে এবং তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আর ইবনে নাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে একথাও বর্ণিত, তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে। আর তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখতে হবে যতক্ষণ না সে তাওবা করে নেয়।

আর বিশর বিন বকর আত তানীসী ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে, আর তার তাওবা কবুল করা যাবে না।

কাযী আবু আবদুল্লাহ আল বরনাকানী, কাযী আবু আবদুল্লাহ তাসতারী যারা ইরাকী ফকীহদের অন্যতম ছিলেন, তারা এ মাসায়ালার প্রতি উত্তরে একাধিক অভিমত প্রকাশ করে বলেন, যদি সে ব্যক্তি আলেম হয় এবং লোকদের এ মতবাদের প্রতি আহ্বান করে, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। এ মতভেদের উপর তার অভিমত হলো যে, যদি তার পিছনে নামায আদায় করা হয়, তাহলে নামায পুনরায় পড়তে হবে।

১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:২২১।

ইবনে মুনিয়র ইমাম শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন, কদরীয়াদের তাওবা কবুল করা যাবে না। অধিকাংশ পূর্ববর্তী আলেমের অভিমত হলো, সে কাফির। তাদের মধ্যে যে ইমাম এ অভিমতের সমর্থন করেছেন তাঁর নাম লাইস, ইবনে উয়াইনা, ইবনে লুহাইয়া, আর তাদের থেকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে এ অভিমত বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদকে সৃষ্টবস্তু বলে।

ইবনুল মুবারক, আওদী, ওয়াকী, হাফস বিন গিয়াস, আবু ইসহাক ফাজারী, হাশিম ও মুতাআখখিরীন আলেমদের মধ্যে আলী বিন আসিম, অধিকাংশ হাদীসবেত্তা, ফকীহ আলেম ও মুতাকাল্লিমিনগণ এই মত প্রকাশ করেছেন।

তাদের এ অভিমত খারিজী, কদরীয়া ও সকল ভ্রান্ত মতাবলম্বী ও বিদ'আতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিয়াল্লাহু আনহুও উক্ত ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীদের সম্পর্কে এ অভিমত প্রকাশ করেন। ওইসব খ্যাতনামা আলেমগণ যারা এই নীতিসমূহ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে তাদের সম্পর্কে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

আর যারা ওই সকল ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের কাফির উল্লেখ করেন নি, তাঁরা হলেন হযরত আলী ইবন আবী তালেম, ইবনে উমর, হাসান বসরী রাহিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ। সূন্মদর্শী ফিকহবিদ ও মুতাকাল্লিমিন আলেমগণও এ মতের সমর্থক। তাদের দলিল হলো, সাহাবা তাবিঈনগণ হারুরা'বাসী খারিজী ও কদরীয়াদের মৃত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের উত্তরাধিকারীদের দিয়েছেন আর মৃত ব্যক্তিদের মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করেছেন। আর তাদের উপর ইসলামী বিধান কার্যকর করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তারা খারিজী ও কদরীয়াদের কাফির উল্লেখ করেন নি।

কাযী ইসমাইল বলেন, ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কদরীয়া ও সকল প্রকার ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের সম্পর্কে এ কথা বলেছেন যে, তাদেরকে তাওবা করাতে হবে। যদি তারা তাওবা করে তাহলে ভাল নতুবা তাদের হত্যা করে ফেলতে হবে। কারণ তারা যমীনে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। আর তাদের হুকুম হলো বিদ্রোহীদের হুকুম। যদি রাষ্ট্রপ্রধান অনুমতি দেয় তাহলে তাদের হত্যা করে

ফেলতে হবে। যদিও তারা কাউকে হত্যা করেনি। তাছাড়া বিদ্রোহী রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর ও পার্শ্ব বিপদের কারণ। যা পার্শ্ব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। যদি কখনো তাদের ফিতনার প্রতিক্রিয়া ধর্মীয় কাজে প্রতিবন্ধক হয় যেমন হজ্জ ও জিহাদ কঠিন হয়ে যেতে পারে, তবুও তাদের ফিতনা-ফ্যাসাদের বিশেষ প্রতিক্রিয়া ধর্মীয় কাজে প্রতিবন্ধক হতে পারে। কিন্তু বিদ'আতীদের ফিতনা শুধু ধর্মীয় বিষয়ে হয়। যা বিদ্রোহ থেকেও অধিক ক্ষতিকর হয়। যেমন কখনো কখনো বিদ'আতীরা মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করে দেয়।

^১. হারুরা কুফা নগরী থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত এক স্থান। সেখানে খারিজীরা সমবেত হয়ে হযরত আলী রাহিয়াল্লাহু আনহু বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারা সংখ্যায় ৩০ হাজার ছিলো। হযরত আলী, হযরত ইবনে আব্বাস আলী রাহিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের সাথে সমঝোতার জন্য প্রেরণ করেন। তখন দশ হাজার লোক তাওবা করে। অবশিষ্ট বিশ হাজার নাহরাওয়ানে হযরত আলীর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়। তাদের দলনেতা ছিলো ইবনে লকওয়া।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

فِي تَحْقِيقِ الْقَوْلِ فِي إِكْفَارِ الْمُتَأَوِّلِينَ

অপব্যাখ্যাকারীদের কুফরী প্রসঙ্গে

আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পূর্ববর্তী আলেমদের অভিমতসমূহ উল্লেখ করেছি। যারা বিদ'আতী ও অপব্যাখ্যাকারী ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের কাফির বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যাখ্যাকারী অর্থ দ্বারা ওইসব লোকদের বুঝানো হয়েছে, যারা এমন কথা বলে যা তাদেরকে কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যায়, কিন্তু যদি ওই উক্তিকারীরা এ কথা জানতো যে, এ কথার দ্বারা কুফরী অবধারিত হয়ে যায়। তাহলে সম্ভবত তারা এ ধরনের কথা বলতো না। আর এ কারণে তাদের কাফির বলার ব্যাপারে তর্কশাস্ত্রবিদদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ তাদের কাফির বলেছেন। আর এটা অধিকাংশ পূর্ববর্তী আলেমগণের অভিমত। আর কেউ কেউ তাদের কাফির বলেন নি। আর তাদের মুসলমানদের দল থেকে বের করে দিতে রাজি হন নি। অধিকাংশ ফিকহবিদ ও তর্কশাস্ত্রবিদ আলেমগণ এই অভিমতের সমর্থক। তারা বলেন, এরা অবশ্যই ফাসিক, গুনাহগার ও পথভ্রষ্ট। কিন্তু ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাননি। কারণ আমরা তাদের মুসলমানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি দানে, তাদের উপর ইসলামী বিধান কার্যকর করি। এ কারণে সাহনুন বলেন, যদি তাদের পেছনে নামায পড়া হয়, তাহলে সেই নামায পুনরায় পড়া জরুরী নয়। তিনি বলেন, এ অভিমত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর সহচরবৃন্দের। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন মুগীরা, ইবনে কেনানা ও আশহাব। সাহনুন বলেন, গুনাহগার গুনাহ করার কারণে ইসলামের সীমা বহির্ভূত হয় না। এ কারণে আমরা তাদের মুসলমান মনে করি।

অন্যান্য মনীষীগণ এ বিষয়ে চিন্তিত ও সন্দেহ প্রবণ হয়েছেন। আর তাদের কুফরী ও মুসলমান থাকার বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে দুটি ব্যতিক্রমধর্মী অভিমত বর্ণিত হয়েছে। আর তিনি তাদের পেছনে নামায পড়ার পর সেই নামায পুনরায় পড়ার বিষয়েও নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

কাযী আবু বকর যিনি মুজতাহিদ ইমাম ও সত্যপন্থি ইমামদের শিরোমণি, তিনিও এ অভিমতের সমর্থক। তিনি বলেন এটা অত্যন্ত কঠিন বিষয়, কারণ ওই সমস্ত লোক স্পষ্ট কুফরী করেনি, তবে অবশ্যই এমন কথা বলেছে যা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। সম্ভবত এ বিষয়ে তাঁর কথাও ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে সন্দেহপ্রবণ। এমন কি কাযী সাহেব বলেন, ওই লোকদের অভিমত অনুযায়ী যারা এসব বিদ'আতীদেরকে কাফির বলেছে, তাদের সাথে

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়। তাদের জবেহকৃত পশু ভক্ষণ করা বৈধ হবে না। তাদের জানাযার ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। উপরন্তু তিনি আরো বলেন, আমি তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের উত্তরাধিকারীদের দেয়ার পক্ষপাতী। তবে তাদের মুসলমানদের উত্তরাধিকারী বানানো যাবে না। এসকল বিষয়ে কাযী সাহেবের অভিমত হলো ওই বিষয়ের প্রতি তাদেরকে কাফির বলা যাবে না। এ অভিমত তাঁর শিক্ষাগুরু শায়খ আবুল হাসান আশ'আরীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও প্রকাশ করেন, তাদের কাফির বলা যাবে না। কারণ কাফির তো ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ হয়। একবার তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ধরনের আকীদা পোষণ করে যে, আল্লাহ তা'আলার দেহ রয়েছে বা আল্লাহ তা'আলা মসীহ হয়েছেন বা রাস্তায় যার সাথে দেখা হবে সে আল্লাহ তা'আলা- এ ধরনের লোক আরিফ নয় বরং কাফির।

হযরত আবুল মায়ালী আবু মুহাম্মদ আবদুল হকের প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন, তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর তাতে তিনি এ আপত্তিও পেশ করেন, কাফির বলা, না বলা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ কোন কাফিরকে মুসলিম মিল্লাতে প্রবেশ করানো বা কোন মুসলিমকে মিল্লাতের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়ার বিষয়টি অত্যন্ত জটিল।

আর সত্যপন্থি আলেমগণ বলেন, ব্যাখ্যাকারীদের কাফির বলা থেকে বিরত থাকা জরুরী। কারণ যেসব লোক তাওহীদে বিশ্বাসী হবে তাদের কাফির বলে তাদের রক্তপাত বৈধ করে দেয়া অত্যন্ত বিপদজনক বিষয়। ভুল করে হাজার কাফিরকে মুসলমান বলে ছেড়ে দেয়া যায়। তাই বলে এ কথা অতি সহজ যে, এক মুসলমানকে কাফির নির্ধারণ করে তার রক্তপাত বৈধ করে দেয়া।^১

^১ প্রকাশ থাকে যে, কোনো মুসলমানকে কাফির বলা কঠিন যিম্মাদারীর কাজ। এ বিষয় আল্লাহ তা'আলার গজবকে ডয় করতে হবে। শরহ ফিকহুল আকবর গ্রন্থে মোল্লা আলী কারী হানাফী লিখেছেন, যদি কোনো বিষয়ে নিরানব্বই বিষয় কুফরীসূলভ হয় আর শুধু যদি একটি মাত্র বিষয় ইসলামী হয়। তাহলে কাযী ও মুফতীর তাকে কাফির বলা উচিত হবে না। কারণ ভুলবশতঃ এক হাজার কাফির মুসলমান বাকী থেকে যায়, তা এক মুসলমানকে কাফির বলা থেকে অতি সহজ ও উত্তম। (মোল্লা আলী কারী হানাফী : শরহ ফিকহুল আকবর, পৃষ্ঠা - ১৯৯ মুজাতাবায়ী সংকলন)।

আল্লামা ইবনে নুজাইম হানাফী 'বাহরুর রাযিক' গ্রন্থে লিখেন, কোনো মাসায়ালায় কুফরী নিশ্চিত হওয়ার অনেকগুলো কারণ থাকে, কিন্তু যদি কুফরীর বিপরীতে মাত্র একটি কারণ থাকে, তখন মুফতীর উচিত হলো কাফির না বলা। কারণ মুসলমান সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করতে হবে। (আল্লামা ইবনে নুজাইম হানাফী : বাহরুর রাযিক, পৃষ্ঠা - ৫০৪ মিশরে মুদ্রিত)।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, হাদীস শরীফ বর্ণিত, 'কুফর প্রবর্তিত হয়'। অর্থাৎ যদি কেউ কোনো ব্যক্তিকে কাফির বলে, আর যদি সে প্রকৃত কাফির না হয়। তাহলে সেই কুফর কাফির উচ্চারণকারীর প্রতি প্রবর্তিত হবে।

হাদীসসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করার বিষয় বর্ণিত হাদীসসমূহে যে শব্দসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। সে গুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে। কোনো কোনো হাদীসসমূহে কদরীয়াদের কুফরীকে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একরূপ ইরশাদ করা যে, **لَا سَهْمَ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ**

কেউ জানেনা যে, তার মৃত্যু ইমানের সাথে হবে, কি হবে না। সুতরাং অন্যকে কাফির বলার চেয়ে নিজের ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার জন্য দোয়া করতে হবে। কারণ অবস্থা একরূপও তো হতে পারে, আলোচক যাকে কাফির বলেছে তার মৃত্যু ইমানের সাথে হতে পারে। আর স্বয়ং কুফরী বাক্য ব্যবহারকারী ইমানহারা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারে।

হযরত সুলতান বায়েজীদ বুত্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে অতি প্রসিদ্ধ এক ঘটনা বর্ণিত, তাঁর প্রতিবেশীর মধ্যে এক বে-দীন বৃদ্ধার এক ছাগল ছিলো। সে অধিকাংশ সময় সুলতান বায়েজীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে উপহাস করে বলতো 'হে বায়েজীদ বলো। আমার ছাগলের দাড়ি উত্তম না তোমার দাড়ি উত্তম। সুলতান বায়েজীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিনয়ের সাথে বলতেন বোন! এখন তো এ ব্যাপারে কিছুই বলা যাবে না। যদি ইমানের সাথে মৃত্যু হয় তাহলে আমার দাড়ি তোমার ছাগলের দাড়ি থেকে উত্তম হবে। আর আল্লাহ না করুন যদি ইমানের সাথে মৃত্যু না হয়, তাহলে নিশ্চিত বায়েজীদে দাড়ি থেকে তোমার ছাগলের দাড়ি উত্তম হবে।

সম্মানিত পাঠক মজলী বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন। সুলতান বায়েজীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যাকে আল্লাহ তা'আলার ওলীদের মুকুট বলা হয়। তিনি সদাসর্বদা কীরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন যে, ইমানের সাথে মৃত্যু হয় কী না হয়? আর আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে এতো বেশী নির্ভীক যে, আমরা নির্বিঘ্নে বিনা বাধায় অন্যদের সরাসরি কাফির বলে জাহান্নামে পৌঁছে দিচ্ছি। এর মমার্থ হলো, আমরা আমাদের সম্পর্কে এক'শ ভাগ নিশ্চিত যে, আমাদের মৃত্যু ইমানের সাথে হবে।

কুরআনে মজীদে ইরশাদ করা হয়েছে-

وَإِذْ أَنتَمُ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ

أَتَى ۝

-সুতরাং নিজেদেরকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বলো না; তিনি ভালভাবে জানেন যারা বোদা ভীরু।'

সাবধান! নিজেকে পবিত্র মনে করো না, কারণ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন কে প্রকৃত মুমিন। মূলতঃ মুখে মিষ্টি পিঠা কাটলে কিছুই হবে না। বরং সত্য কথা হলো এই যে, প্রেমিক যাকে ইচ্ছা করেন সে-ই প্রিয়তর হয়।

আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ এক, আর আমি তার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল! তাহলে তার জ্ঞান মাল আমার হাত থেকে নিরাপদ হয়ে গেল। কিন্তু যদি সে হত্যার যোগ্য হয়ে যায়' তখন তার হিসাব আল্লাহ তা'আলার যিম্মায় ন্যস্ত হবে।' জানা গেলে যে ব্যক্তি এমন কথার সাক্ষ্য দেবে তার জীবিত থাকা নিশ্চিত। আর না এ আদেশ রহিত হতে পারে। আর না তার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার পদক্ষেপ বৈধ হতে পারে। তবে যদি নির্ভরযোগ্য দলীল প্রমাণের দ্বারা কুফরী প্রমাণিত হয় আর শরীয়ত ও যুক্তি প্রয়োগ তার পরিপন্থি না হয়, তাহলে ওই অবস্থায় এ আদেশ রহিত হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

-ইসলামে তাদের কোনো অংশ নেই। অথবা রাফিজীদের মুশরিক বলা, তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা। অথবা খারিজী ও অন্যান্য ভ্রান্তমতাবলম্বীদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে। তাদের কাফির উল্লেখকারীগণ এগুলো দলীল হিসেবে পেশ করে। কিন্তু অপরপক্ষ এর প্রত্যুত্তরে বলেন, এ ধরনের শব্দসমূহ তো কাফির ছাড়া কোনো কোনো গুনাহগার মুসলমানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু একরূপ বলার মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য হলো, ওইসব লোকদের সতর্ক করা ও ভয়-ভীতি দেখানো। এর অর্থ কখনো এ নয় যে, প্রকৃতই তারা কাফির হয়েছে। এদের কুফর তাদের থেকে নিম্নস্তরের। আর এদের শিরক তাদের শিরক থেকে নিম্নস্তরের। এ ধরনের কথা লৌকিকতা, মাতাপিতা ও স্বামীর অবাধ্যতা, মিথ্যা, জুলম ও অন্যান্য আরো অনেক গুনাহের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আর যখন এ ধরনের অবস্থা দেখা দেবে, তখন দু'টি বিষয়ের সম্ভাবনা হতে পারে। তন্মধ্যে কোনে এক বিষয়ে নির্ভরযোগ্য দলীল প্রমাণ ব্যতীত নিশ্চিত হওয়া যাবে না।

আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **هَمٌّ مِنْ شَرِّ الْبَرِيَّةِ** -খারিজীরা নিকৃষ্ট সৃষ্টি। আর এ বৈশিষ্ট্য কাফিরদের। অথবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

شَرُّ قَبِيلٍ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، طَوَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ أَوْ قَتَلُوهُ.

-আকাশের নীচে এরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট দল, ওই ব্যক্তি অতি সৌভাগ্যবান যে তাদের হত্যা করবে, বা যে তাদের হাতে নিহত হবে।'

অথবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারিজীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন, **فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ قَتْلَ عَادٍ**.

-তোমরা তাদের যেখানে পাবে সেখানে হত্যা করে ফেলবে, যেভাবে আদ সম্প্রদায়কে হত্যা করা হয়েছে।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীসমূহকে সম্পূর্ণ দলীল হিসেবে পেশ করেন, যারা খারিজীদের কাফির উল্লেখ করে। কিন্তু যারা তাদের কাফির বলে উল্লেখ করে না তাদের অভিমত হলো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাদের হত্যা করার আদেশ করার কারণ ছিলো, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ক) আহমদ : আল মুসনাদ, ৫:২৫৬, হাদীস নং: ২২২৬২।

খ) ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১:৬২, হাদীস নং ১৭৬।

গ) তাবরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ৮:২৬৮, হাদীস নং ৮০৩৬।

করার জন্য তৈরী হয়েছে, আর তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এ কথা প্রমাণ ওই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ.

-তারা মুসলমানদের হত্যা করে ফেলবে।^১

এর দ্বারা বুঝা যায়, এখানে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা এ কারণে নয় যে, তারা কাফির হয়ে গেছে। বরং তারা এমন জঘন্য অপরাধ করেছে যার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। অর্থাৎ তারা নির্বাচিত খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আর হাদীসে তাদের আদ সম্প্রদায়ের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। শুধু এটা প্রকাশ করার জন্য তাদের হত্যা করা বৈধ বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা হলো, যে ব্যক্তিকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, এর অর্থ এ নয় যে, সে কাফির হয়ে গেছে। আর হযরত খালিদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কথ্য ও এর বিপরীত, যা হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত খালিদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করেন,

دَعْنِي أَضْرِبُ عُقَّةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُصَلِّي.

-হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, যেন আমি তাদের গর্দান উড়িয়ে দিতে পারি। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আশা করা যায় এরা নামায আদায়কারী হবে।^২

যারা খারিজীদের কাফির বলে, তারা যদি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীকে খারিজীদের সম্পর্কে দলীল হিসেবে উল্লেখ করে যে,

১. ক) বুখারী : আস সহীহ, বাবু কাওলিল্লাহি আযযা ওয়া জাল্লা, ৪:১৩৭ হাদীস নং ৩৩৪৪।

খ) মুসলিম : আস সহীহ, বাবু যিকরিল খাওয়ারিজ, ২:৭৪১ হাদীস নং ১০৬৪।

গ) আবু দাউদ : আস সুনান, ফি কিতালিল খাওয়ারিজ, ৪:২৪৩ হাদীস নং ৪৭৬৪।

ঘ) নাসায়ী : আস সুনানুল কুবরা, ৩:৭০ হাদীস নং ২৩৭০।

ঙ) বায়হাকী : আস সুনানুল কুবরা, ৬:৫৫২ হাদীস নং ১২৯৪৫।

২. সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে। জুলখোয়াইসারা নামে এক ব্যক্তি সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ভবিষ্যৎ বাণী করেন, সে ব্যক্তি খারিজীদের মতো আচরণ করবে। তখন হযরত খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবেদন করেন। আর সহীহ বোখারী শরীফের অপর এক বর্ণনায় এসেছে হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলে অনুমতি না দিয়ে বললেন। সম্ভবতঃ সে নামায আদায়কারী। এর দ্বারা জানা যায় যে, সে খারিজী হওয়া সত্ত্বেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাফির বলেন নি।

يَقْرُؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ.

-তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে পৌঁছবে না।^১

আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন,

أَنَّ الْإِيمَانَ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ.

-ইমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না।

অনুরূপ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বর্ণনা করেন,

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ.

-তীর যেভাবে ধনুক থেকে বের হয়ে যায়, তারাও দীন থেকে ঠিক সেভাবে বেরিয়ে যাবে। অতঃপর তারা দ্বীনের প্রতি কখনো ফিরে আসবে না অধিকন্তু তীর ধনুকের প্রতি ফিরে আসে।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

سَبَى الْفَرْتِ وَالْدَّمَ.

-যেভাবে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে চলে যায়।^২

এ বর্ণনাসমূহ দ্বারা তারা প্রমাণিত করে যে, ইসলামের সাথে খারিজীদের কোনো সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয় দল যারা খারিজীদের কাফির বলে না, তারা এর জবাবে বলে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ -কুরআন তাদের

১. ক) আবু দাউদ : আল মুসনাদ আত তয়লাসী, ১:১৪০ হাদীস নং ১৬৩।

খ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসনাদ, ১০:৫৩৬।

গ) আহমদ : আল মুসনাদ, ১:১৩১।

ঘ) ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ১৩:৩০২।

ঙ) বুখারী : আস সহীহ, ৪:১৬৭।

চ) নাসায়ী : আস সুনানুল কুবরা, ২:৪৬ হাদীস নং ২৩৫৯।

ছ) মালেক : মুয়াত্তা বির রিওয়াতাইন, ৩:৩১৮ হাদীস নং ৮৬৪।

২. বায়হাকী : দালায়িলুন নবুওয়াত, ৫:১৮৭।

কঠিনালীর নিচে পৌছবে না।^১ এর মর্মার্থ হলো, তাদের অন্তরে কুরআনের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে পৌছবে না। আর না কুরআন তাদের বক্ষ প্রশস্ত করে দেবে। আর না তারা কুরআনের উপর আমল করবে। উপরন্তু তারা আরো বলেন, তাদের সম্পর্কে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা ইরশাদ করেন, তাদের কারো সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে, সত্যই কী তীর তাদের দেহ ভেদ করতে পেরেছে, না পারে নি? এ বাক্যে সন্দেহ রয়েছে?^২ খারিজীদের কাফির উল্লেখকারীগণ যদিও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে, যাতে বলা হয়েছে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ** -এ উম্মাহর মধ্য থেকে বেরিয়ে যাবে। আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত 'উম্মাত' শব্দ দ্বারা প্রকাশ হয়েছে, তারা উম্মাতের মধ্যেই হবে। আর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামতো এটা ইরশাদ করেননি যে, **مِنْ هَذِهِ** তারা উম্মাত থেকে বের হয়ে যাবে।

হযরত আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ 'শব্দের' ব্যাখ্যাও করেছেন, আর তাদের নিরাপদ রেখেছেন। তা ছাড়া হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনায় এ কথা কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, খারিজীরা এ উম্মাতের মধ্যে হবে না। হাদীসে বর্ণিত **مِنْ** (বা থেকে) যে শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে, তা দলের আর্থিক বুঝানোর উদ্দেশ্যে এসেছে। এছাড়াও ওই বর্ণনা যা হযরত আবু যর, আলী, আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, **يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي وَ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي** -আমার উম্মাত থেকে এমন লোক বের হবে কিংবা অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে থেকে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটবে। যদি এ দিক থেকে দেখা হয়, তাহলে দেখা যায়, হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনার বিষয়বস্তু একই আর তাদের মতভেদের কোনো কারণ প্রকাশ পায় নি যে, তারা খারিজীদের **فِي** (মধ্যে) শব্দ দ্বারা উম্মাত থেকে খারিজ করেছেন। আর **مِنْ** (মধ্যে) শব্দের দ্বারা উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও **فِي** (মধ্যে) শব্দ দ্বারা সতর্ক করার ইচ্ছা করে অতি উত্তম কাজ করেছেন। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে,

^১ বায়হাকী : দালায়িনুন নবুওয়াত, ৫:১৮৫।

^২ অর্থাৎ ছড়ান্ত নিশ্চয়তার সাথে তাদের ব্যাপারে কুফরীর মীমাংসা করা যাবে না। বরং হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বানী অনুযায়ী তাদের ইমান সন্দেহযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম, ফিকহ'র অর্থের ব্যাখ্যা, মর্মার্থ, শব্দের গঠনের যথার্থতা নিরূপণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের যোগ্যতায় ব্যাপক জ্ঞান রাখতেন। আমি এ যাবৎ খারিজীদের সম্পর্কে যা আলোচনা করেছি তা হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রসিদ্ধ দলের দৃষ্টিভঙ্গি। এ ছাড়াও অন্যান্যদল (শিয়া ও মু'তাযিলা মতাবলম্বী) সম্পর্কে তাদের অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গি বিভ্রান্তিকর ও পরস্পর বিরোধপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

মু'তাযিলা মতাবলম্বীদের মধ্যে জাহম ও মুহাম্মদ বিন শাবীবের অভিমত কিছুটা বোধগম্যের নিকটবর্তী। যেমন এ রূপ বলা যে, আল্লাহ তা'আলার কুফরীর মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অবগত না হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের অবস্থার উদ্ভব না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে কাফির বলা সঠিক হবে না।

আবু হুযায়িল বলেছে,^১ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সৃষ্টজীবের সাথে উপমা দেবে, অথবা আল্লাহ তা'আলার কোনো কাজকে জুলুম বলবে, অথবা আল্লাহ তা'আলার কোনো খবরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। আর যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো বস্তুকে অনুরূপ অনাদি-অনন্ত মনে করে^২ যেভাবে আল্লাহ তা'আলা অনাদি ও অনন্ত, সে কাফির হয়ে যাবে।

কোনো কোনো তর্কশাস্ত্রবিদ আলেম বলেন, যদি সে ওই স্তরের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়, যারা কুরআন হাদীস সম্পর্কে অবগত হয়, আর সে স্বীয় আকীদার ভিত্তি কুরআন সুন্নাহের উপর রাখে আর সৃষ্টজীবের সাথে ওইসবগুণাবলী সম্পৃক্ত করে যা আল্লাহ তা'আলার সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে ওই স্তরের হয় (এ মাত্র যাদের আলোচনা করা হয়েছে) তাদের সাথে সম্পৃক্ত না হয়, তাহলে সে হবে ফাসিক। তবে শর্ত হলো, সে ধীনের রীতিনীতি অর্থাৎ কুরআন হাদীস সম্পর্কে অবগত না হয়, এরূপ লোকদের সম্পর্কে বলা হবে যে, তারা গুনাহগার।

ওবায়িদ উল্লাহ বিন হাসান আনবারীর অভিমত হলো, বিশ্বাসগত বিষয়সমূহে যদি কোন মুজতাহিদ ইজতিহাদ করেন, যদি তার সে ইজতিহাদ কুরআন হাদীসের বিপরীত হয়, তাহলে যদি সম্ভব হয় তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে। তবেই

^১ তাকে মু'তাযিলাদের ইমাম বলা হতো সে বসরার অধিবাসী ছিলো। তার আকীদা ছিলো জাম্নাত জাহান্নাম ধ্বংসশীল বস্তু। ২২৬ হিজরীতে বসরার তার মৃত্যু হয়।

^২ বা অনাদি ওই বস্তুকে বলা হয়, যা সর্বদা স্থায়ী থাকে। প্রকাশ থাকে যে, সৃষ্টি জীবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো এরূপ অস্তিত্ব নেই।

সেই ইজতিহাদকে সঠিক বলা যেতে পারে। আনবারী এ বিষয়ে উম্মাতের সব আলেমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে একথাপ সামনে অগ্রসর হয়েছে। কারণ উম্মাতের আলেমগণ এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, দ্বীনের মৌলিক (বিশ্বাসগত) বিষয়ে শুধুমাত্র একটি হক হয়। সুতরাং যদি কোনো মুজতাহিদ এ হক ত্যাগ করে নতুন কোনো আকীদার উদ্ভব করে, তাহলে সে গুনাহগার ও ফাসিক হবে। তবে তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, সে কাফির হবে কি, হবে না?

কাযী আবু বকর বাকিল্লানী, আবদুল্লাহ বিন হাসানের মতো অভিমত দাউদ ইম্পাহানী থেকেও বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, একদল উল্লেখিত ব্যক্তির সম্পর্কে এ কথা উদ্ধৃত করেছে যে, তারা উভয় এমতের সমর্থক হয়েছে যে, যে সত্যের অনুসারী হয় চাই সে আমাদের মুসলিম মিল্লাতের সাথে সম্পর্কিত হোক বা অন্য মিল্লাতের সাথে সম্পর্কিত হোক। যদি দ্বীনের মূলনীতি ও আকাইদ সম্পর্কে ইজতিহাদ করতে চায় তাহলে তার ইজতিহাদ করার অনুমতি রয়েছে। এ ধরনের কথা জাহিয়^১ ও সুমামাহ^২ বলেছেন, এমন কি তারা এ কথাও বলেন, সাধারণ লোক, মহিলা, নির্বোধ, অজ্ঞ ॥ ইহুদী খ্রিস্টানদের মুকাল্লিদদের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিতই হয় নি। কারণ তাদের জ্ঞান এরূপ নয় যে, এর সাহায্যে কোনো মাসায়ালা ও আকীদার উপর দলিল প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাঁর রচিত 'আত তাফরিকাহ' গ্রন্থে এ আকীদার সমর্থক মনে হয়।^৩ কিন্তু সত্য কথা হলো, এ রূপ আকীদা পোষণকারী

^১ জাহিয় খাতনামা সাহিত্যিক ও আলেম ছিলেন। কিন্তু মু'তাবিলা মতাবলম্বী ছিলেন। ২৫৫ হিজরীতে বসরায় তার মৃত্যু হয়।

^২ সেও মু'তাবিলা মতাবলম্বীদের বড় আলেম ছিলো। তার আকীদাহ ছিলো মুকাল্লিদ আহলে কিতাব ও প্রতিমা পূজারীরা জাহান্নামে যাবে না। বরং মৃত্যুর পর এসব লোক মাটি হয়ে যাবে।

^৩ সম্ভবত সম্মানিত গ্রন্থকার ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'আত তাফরিকাহ' গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয়ের প্রতি গভীর মনযোগী হতে পারেন নি। কারণ উক্ত গ্রন্থে ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবিষয়ে আলোকপাত করে বলেন, এমন লোক যার নিকট হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি। আর না সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ইমান আনতে সক্ষম হয়েছে।

সে ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না। বরং মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যাবে। অনুরূপ ওই ব্যক্তিরও হাশর হবে, যে ব্যক্তি শুধু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুবারক নাম শুনেছে। কিন্তু ওই ধরনের কোনো লোকের মুখ থেকে মৌখিকভাবে শুনেছে, যে তাঁর বিরোধী ছিলো। সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুবারক নাম বলার সাথে সাথে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে ভুল কথা বলেছে। যা শুনে শ্রোতা সে ভুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তারপর সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকে বুঝার চেষ্টা করে নি। সম্মানিত গ্রন্থকার কাযী আযায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি

কাফির। কারণ এ বিষয়ে উম্মাতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে কাউকে কাফির, অথবা যে ব্যক্তি মুসলমানের দ্বীন পরিত্যাগ করে, বা ইহুদী খ্রিস্টানদের কাফির বলার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে বা তাদের কাফির বলার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে স্বয়ং সে কাফির হয়ে যাবে।

কাযী আবু বকর বলেন, এর কারণ হলো, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কুফরীর বিষয় শরীয়ত ও উম্মাতের ঐকমত্যে উভয় একমত হয়েছে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি এ কথা মান্য করার জন্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দাবি করে। তাহলে সম্ভবত সে নস বা স্পষ্ট দলিল ও শরীয়তকে মিথ্যা বলে, আর সে শরীয়ত ও ইজমা মিথ্যা বলে অস্বীকার করে বা সে বিষয় মান্য করায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দাবী করে অথবা তাতে শাখাগত সন্দেহ করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলাইহি এ অভিমতের প্রতি গভীর মনোযোগী না হয়ে বলেন, ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও জাহিয় ও সুমামাহ মু'তাবিলা মতাবলম্বীর মতো অভিমত প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে, জাহিয় ও ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমতে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

فِي بَيَانِ مَا هُوَ مِنَ الْمَقَالَاتِ كُفْرٌ وَمَا يُتَوَقَّفُ أَوْ يُخْتَلَفُ فِيهِ وَمَا لَيْسَ بِكُفْرٍ

কুফরী ও অকুফরী বাক্যসমূহের ব্যাপারে পর্যালোচনা, মতবৈতন্য প্রসঙ্গে

স্মরণ রাখতে হবে, উক্ত অধ্যায়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সন্দেহ দূরকারী বিষয় হলো শরীয়ত। এ বিষয়ে জ্ঞানবোধের কোনো প্রবেশাধিকার নেই। এ বিষয়ে স্পষ্ট কথা হলো, এরূপ বাক্য যাতে পরিষ্কার রুবুবিয়াত বা প্রভূত ও একত্ববাদকে নিষেধ করা হয়েছে বা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়, তাহলে তা কুফরী। যেমন দাহরীয়াদের^১ অভিমতসমূহ আর ওইসব দল যারা দুই খোদার বিশ্বাসী। যথা দিসানিয়া^২, মানুবিয়া^৩, সাবিরীনদের^৪ মধ্যে খ্রিষ্টান ও অগ্নিউপাসক বা প্রতিমাপূজারী লোক বা ফিরিশতামণ্ডলী, শয়তান, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র পূজারী বা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যান্যদের ইবাদতকারী বা আরবের অংশীবাদীরা বা ভারত, চীন ও সুদানের অংশীবাদীগণ যাদের নিকট কোনো আসমানী কিতাব নেই। অনুরূপ কারামিতা^৫ হালুলী^৬ আর ওইসব গোপনদলসমূহ

^১ যুগবাদী যারা সবকিছুতে যুগের পরিবর্তনকে প্রাধান্য দেয়।

^২ দিসান অগ্নি উপাসকদের খ্যাতনামা আলেম ছিলো। সে দুই খোদায় বিশ্বাসী ছিলো। এক আলো, দুই অন্ধকার বা এক খালিকি খাইর বা ইয়াজদান (কল্যাণের) দুই মন্দের স্রষ্টা (আহরামান শয়তান)।

^৩ হাকীম মানীর অনুসারীদের বলা হয়। মানী ইরানের বাদশাহ শাবুর বিন ইদরীসের সময় হযরত ইসা আলাইহিস্ সালাম এর পর বাদশাহ হয়। সেও দুই খোদার বিশ্বাসী ছিলো।

^৪ নক্ষত্র পূজারী বা ফিরিশতাদের পূজারী ছিলো।

^৫ ইমাম জা'ফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পুত্র ইসমাইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুসারী ছিলো। মূলত; তারা ইহুদীও অগ্নিউপাসক ছিলো। তারা ইসলামের বিজয় দেখে মুসলমান হয়। কিন্তু তারা ইসলামের মৌলিক ভিত্তি নড়বড়ে করার ইচ্ছা করে। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা হলো হামদান বিন কারামিতা। কারামাত কুফার মধ্যবর্তী অঞ্চলের এক গ্রাম। এ কারণে এই দল কারামিতা নামে পরিচিতি লাভ করে। ২৭০ হিজরীতে কুফা নগরীতে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কারামিতা নিজে ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী করে। সে ফজরের চার রাক'আতের দু'রাক'আত সুন্নাত ও দু'রাক'আত ফরয কমিয়ে দুই রাক'আত করে দেয়। অনুরূপ মাগরিবের নামায দু'রাক'আত নির্ধারণ করে। রমজানের একমাস রোজা রাখা বাতিল করে বছরে মাত্র দু'দিন রোযা নির্ধারণ করে। একদিনের রোজা মেহেরজানের জন্য আর দ্বিতীয় দিনের আলোর জন্য নির্ধারণ করে। কা'বার স্থলে বায়তুল মোকাদ্দাসকে কিবলা নির্ধারণ করে। এ দলটি বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমবেত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করে। আব্বাসী খলিফা মুকতাদির বিদ্রোহের সময়ে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সুলায়মান বিন হাসান। সে পবিত্র মক্কা নগরীতে এসে কা'বা গৃহের গিলাফ ছিন্ন করে ফেলে। আর হাজরে আসওয়াদ উঠিয়ে নিয়ে যায়। পবিত্র হারাম শরীফে অসংখ্য হাজীকে হত্যা করে। পবিত্র হাজারে আসওয়াদ ২২ বছর তাদের দখলে ছিলো। ৩১৭ হিজরীতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তাদের রাজত্ব প্রায় ৮০ বছরের বেশি সময় সিরিয়া ও মিশরে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দেয়।

যারা মৃত্যুর পর আত্মার দেহ পরিবর্তনে বিশ্বাসী^৭ বা রাফিজীদের তাইয়্যারা দল^৮ যারা আল্লাহ তা'আলার জাত ও একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়েছে। কিন্তু তাদের আকীদা হলো (নাউযবিলাহ) আল্লাহ তা'আলা জীবিত নহেন। বা তিনি কাদীম বা অনন্ত অনাদি হয়েছেন বা তিনি ধ্বংসশীল হয়েছেন। অথবা আল্লাহ তা'আলা আকৃতি ধারণকারী অথবা আল্লাহ তা'আলার পুত্র কন্যা, স্ত্রী ও মাতা-পিতা রয়েছে। বা তিনি কোনো বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। তার মতো অন্য কোনো বস্তুও আদিকাল থেকে অনাদি হয়ে আছে। বা তার সৃষ্টি জগতে অন্য আরো একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। আর তার আইন শৃঙ্খলা পরিচালনাকারী আছে। এসবই কুফরী আকীদা। এ বিষয়ে উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এরূপ আকীদা পোষণকারী সকলে কাফির। দার্শনিক, নক্ষত্র পূজারী ও পঞ্চদষ্ট বিজ্ঞানীরা এরূপ আকীদা পোষণকারী। অনুরূপ ওই ব্যক্তিও কাফির, যে এ কথা দাবী করে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার সাথে ওই মজলিসে বসেছি। বা আমি কথা বলার উদ্দেশ্যে তার দিকে অগ্রসর হয়েছি। অথবা আমি তার সাথে আলোচনা করেছি। বা তিনি অমুক বস্তুর

^৭ ওই দল এই আকীদা পোষণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো সৃষ্টি জীবের দেহে অনুপ্রবেশ করেন। যার দেহে আল্লাহ তা'আলা প্রবেশ করেন, সে আল্লাহ তা'আলার আওতার বা পবিত্রাত্মা হয়ে যায়। এটা হলো সরাসরি কুফরী আকীদা।

^৮ পুনর্জন্মকে তানসিখ বলা হয়। অর্থাৎ তাদের আকীদা হলো, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা খালি থাকে না। বরং স্বীয় কর্মফল অনুযায়ী এক নতুন মানুষ বা জীবের আকৃতি ধারণ করে প্রকাশ পায়। গ্রীক দার্শনিক ও ভারতের হিন্দুরা এ আকীদায় বিশ্বাসী। এটাও সম্পূর্ণ কুফরী আকীদা।

^৯ 'আশ শিফা' গ্রন্থের কোনো কোনো সংস্করণে তাইয়্যারার সাথে সাথে জানাহীয়া, বায়াহীনা ও গারাবীয়াদের উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে রাফিজীদের ওইদল সমূহের আলোচনা করা হবে। যার আলোকে তাদের কাফির বলা হয়েছে। জানাহীয়ারা নিজেদের হযরত জাফর তাইয়্যার রাযিয়াল্লাহু আনহু সাথে সম্পর্কিত করে। এ দলের অপর নাম হলো তাইয়্যারা। তাদের আকীদা হলো আল্লাহ তা'আলা আযিয়ায়ে কেরামের দেহে অনুপ্রবেশ করেন। এই ধারাবাহিকতা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু খিলাফত পর্যন্ত বহাল ছিলো। তাদের ধারণা (নাউযবিলাহ) আল্লাহ তা'আলা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু দেহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন।

বায়ানীরা শিয়াদের এক উপদল। তাদের আকীদাহ হলো, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু পর আল্লাহ তা'আলার রূহ হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়ার মধ্যে প্রবেশ করে।

গারাবীয়াদের আকীদা হলো, নবুওয়্যাত মূলত; হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু জন্য নির্ধারিত ছিলো। কিন্তু হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম ভুল করায় হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত সালাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেনি। তাই ভুল করে নবুওয়্যাত হযরত সালাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছেন। (নাউযবিলাহ)

আরবী ভাষায় কাককে 'গোরাব' বলা হয়। যেহেতু এক কাক অপর কাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। এ কারণে তাদের আকীদা অনুযায়ী সাদৃশ্যতার কারণে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম নবুওয়্যাত দান করার ব্যাপারে ভুল করেছেন। এসব দল কাফির। তারা শুধু সুন্নীদের মতে নয় বরং শিয়া ইসনা আশারীয়া বা শিয়াদের বার দলের মতেও কাফির।

মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন। যেমন কোনো কোনো সূফী পরিচয়দানকারী অজ্ঞ বা বাতেনীয়া বা কারামিতা বা খ্রিষ্টানদের আকীদা।

অনুরূপ আমরা ওইসব লোকদের নিশ্চিত কাফির মনে করি যারা একথা বলে যে, সৃষ্টজীব অনাদি বা সর্বকাল বিদ্যমান থাকবে কিংবা মৃত্যুর পর যারা আত্মারদেহ পরিবর্তনে বিশ্বাসী। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, আত্মা সর্বদা এক ব্যক্তির দেহ থেকে অপর ব্যক্তির দেহে স্থানান্তরিত হতে থাকে। তাদের পাপ ও পুণ্য অনুযায়ী তাদের শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করা হবে বা তারা সাওয়াব পাবে।

যদিও অনুরূপ ওই ব্যক্তিও কাফির, যে আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্ব ও একত্ববাদে বিশ্বাস করে, কিন্তু আম নবুওয়্যাত বা আমাদের নবী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাত অস্বীকার করে বা আশিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে-কোনো নবীর নবুওয়্যাত অস্বীকার করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওই ব্যক্তি এসব জেনে শুনে স্বেচ্ছায় অস্বীকার করে, যেমন ব্রাহ্মণ ও অধিকাংশ ইহুদী। আরুসীয়া^১ বা রাফিজীদের মধ্যে গারাভীয়া তারা এ আকীদা পোষণ করে যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে হযরত আলী রাহিয়াল্লাহু আনহুর নিকট নবুওয়্যাত নিয়ে প্রেরণ করা হয়। যেমন মু'আতলাহ^২ কারামিতা, ইসমাইলীয়া, আনবারীয়া, রাফিজীদের ও শিয়াদের উপদল আবদীয়া^৩ মতাবলম্বীরা। এরা সকলে কুফরীতে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

অনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপক নবুওয়্যাত স্বীকার করে তবুও অন্যান্য আশিয়ায়ে কেরাম যারা ওহী নিয়ে আগমন করেছেন তাদের সম্পর্কে এরূপ আকীদা পোষণ করে যে, তারা মিথ্যা বলেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। তাই তারা এরূপ বলে যে তারা যুক্তিসংগত মিথ্যা বলেছেন। এরূপ আকীদা পোষণকারী সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। যেমন কোনো কোনো দার্শনিক বাতেলী লোক, কোনো কোনো কট্টর অজ্ঞ সূফী ও আবাহীয় লোক আকীদা পোষণ করে।^৪ মূলতঃ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো যে, বাহ্যিক শরীয়ত আর অধিকাংশ ওই বার্তাসমূহ যা আশিয়ায়ে কেরাম নিয়ে এসেছেন আর

^১. এরা খ্রিষ্টানদের এক উপদল।

^২. অর্থাৎ এই দল বলে যে, এই পৃথিবীর কোন নির্মাতা নেই। আর বাস্তবে এই সৃষ্টি জীবের কোনো অস্তিত্ব নেই। এসব স্বপ্ন ও ভ্রান্ত ধারণা।

^৩. এরা শিয়াদের এক উপদল ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে যে, প্রয়োজনে এ বিষয় পরিবর্তন করা যেতে পারে।

^৪. এই দলকে বলা হয়, যারা বলে যে, যে ব্যক্তি কামিল হয়ে যায়। সে যদি কোনো হারাম কাজও করে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

আগামীতে সংঘটিতব্য বিষয়সমূহ, যেমন আখিরাতে কার্যাবলী, হাশর, কিয়ামত, বেহেশত দোষ সম্পর্কে আশিয়ায়ে কেরাম যেরূপ বর্ণনা করেছেন, সে রূপ হবে না। আর তাদের বাহ্যিক আলোচনায় বুঝা যায়। বরং আশিয়ায়ে কেরাম যুক্তিসংগত কারণে ওই বিষয়সমূহ এভাবে বর্ণনা করেছেন। কারণ রাসূলগণের পক্ষে এর প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা সম্ভব ছিলো না যে, তারা আসলে হাকীকত বর্ণনা করতেন। যদি ওই অজ্ঞ লোকদের কথা মেনে নেয়া হয় তাহলে এর মমার্থ হবে, সব শরীয়াত বাতিল প্রমাণিত (নাউযুবিল্লাহ)। আদেশ ও নিষেধ অকার্যকর ঘোষিত হবে। রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা হবে। আর তারা যে চিরন্তন সত্যবাদিতা নিয়ে আগমন করেছেন তা সন্দেহপ্রবণ হয়ে যাবে। এ কারণে এরূপ আকীদা পোষণকারীদের সর্বসম্মতিক্রমে ইজমার ভিত্তিতে কাফির বলা হয়েছে।

যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালত ও দীন প্রচারে তাঁর সাথে মিথ্যাকে সম্পৃক্ত করে বা তাঁর সত্যবাদিতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাহানি করে বা এরূপ কথা বলে যে, তিনি শরীয়তের আহকাম সঠিকভাবে পৌঁছাননি বা তিনি শুধু হাসিঠাট্টা করেছেন বা কোনো নবীকে কলঙ্কিত করেছেন, তাঁদের হত্যা করেছেন বা তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন- তারা সবাই সর্বসম্মতিক্রমে কাফির।

অনুরূপ আমরা ওইসব লোকদেরও কাফির বলবো যারা এরূপ আকীদা পোষণ করে যে, জীব-জন্তুদের মধ্যে ভীতিপ্রদর্শনকারী আরো নবীর আগমন ঘটেছে। অর্থাৎ বানর, শুকর চতুর্ষ্পদ জন্তু ও কীট-প্রতঙ্গ সকলের নিকট নবীর আগমন হয়েছে। আর তারা আল্লাহ তা'আলার এ বাণী কে দলীল হিসেবে পেশ করে-

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٨﴾

-আর যে-কোনো সম্প্রদায়ই ছিলো, সবটির মধ্যে একজন সতর্ককারী গত হয়েছে।^১

কারণ যদি এ কথা মেনে নেয়া হয়, তাহলে ওই মর্যাদার আশিয়ায়ে কেরামকে মন্দ দোষের সাথে সম্বোধন করতে হবে। তাতে সম্মানিত মর্যাদায় কলঙ্কের দাগ লেগে যাবে। এর বিরুদ্ধে মুসলমানদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এরূপ মন্তব্যকারী মিথ্যাবাদী।

^১. আল কুরআন : সূরা ফাতির, ৩৫:২৪।

অনুরূপ আমরা ওই ব্যক্তিকেও কাফির বলবো, যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতে বিশ্বাসী হয়েছে কিন্তু এ কথা বলে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুৎসিত ছিলেন বা দাড়ি গজ্ঞানোর পূর্বেই তাঁর ওফাত হয়েছে অথবা তিনি মক্কা ও হিজাজে জন্মগ্রহণ করেন নি অথবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বংশধর ছিলেন না (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে এসব কথা বলা, যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমাম্বিত গুণাবলীর পরিপন্থি বা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করা ও মিথ্যা বলার সমান।

অনুরূপভাবে আমরা ওই ব্যক্তিকেও কাফির বলবো যে বলে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়াও অন্য নবী বিদ্যমান ছিলো। অথবা তাঁর পরেও অন্য কোনো নবীর আগমন হতে পারে। যেমন ইহুদীদের মধ্যে আইসুবীয়া উপদল, তারা বলে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত শুধু আরববাসীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো অথবা খারামীয়ারা বলে, ধারাবাহিকভাবে রাসূলের আগমন হতে থাকবে।^১ কোনো কোনো রাফিজীরা বলে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রিসালতের মধ্যে হযরত আলী রাডিয়াল্লাহু আনহুও অংশীদার ছিলেন। এরপর তাদের আকীদা অনুযায়ী ইমাম নবুওয়াত ও হুজ্জাতে নবীর স্থলাভিষিক্ত হয়। যেমন কোনো কোনো বাজিইয়্যা^২ ও বায়ানীরা আকীদা পোষণ করে। কারণ তাদের আকীদা মোতাবেক ইমাম নবুওয়াত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কোনো কোনো দার্শনিকও অজ্ঞ সূফী এরূপ আকীদা পোষণ করে।

অনুরূপ আমরা ওই ব্যক্তিকেও কাফির বলবো, যে নবুওয়াতের দাবী করে বলে, আমার নিকট ওহী আগমন করে। আমি আসমানে গমন করি। বেহেশতে প্রবেশ করি, বেহেশতের ফল ভক্ষণ করি। বেহেশতের হ্রদের সাথে আলিসন করি।

এরা সবাই কাফির এজন্য যে, এরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলে। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

-আমি নবুওয়াতের ধারা সমাপ্তকারী। আমার পর আর কোনো নবীর আগমন হবে না।^৩

^১ বর্তমানে কাদিয়ানীরা গোলাম আহমদকে নবী মান্য করে, ফলে তারা সবাই কাফির।

^২ এরা উভয় দলই রাফিজী মতাবলম্বী, তাদের আকীদা হলো আল্লাহ তা'আলা ইমামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন (নাউযুবিল্লাহ)। এ সব লোক ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের থেকেও বড় কাফির।

^৩ আবু নায়ীম ইস্পাহানী : দালায়িলুন নবুওয়াত, ১:৫৩৭ হাদীস নং ৪৬৪।

আর উম্মাতের এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এ বাক্য স্বীয় বাহ্যিক অবস্থার উপর ধর্তব্য হবে। এ বাক্যের কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা নির্দিষ্টকরণের কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং তাদের সকলের কাফির হওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত ইজমা ও শরীয়তের অকাট্য দলিলে কোনো প্রকার দ্বিধা-সংশয় নেই।

অনুরূপ আমরা ওই ব্যক্তিকেও কাফির বলবো, যে কুরআনের আয়াত অস্বীকার করে বা নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোনো হাদীস নির্দিষ্ট করতে শুরু করে যে বর্ণনার উপর উম্মাতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ওই ইজমাকে সর্বসম্মতিক্রমে বাহ্যিক অর্থের উপর ধর্তব্য হবে। যেমন প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা অস্বীকার করার কারণে খারিজীদের কাফির বলা হয়েছে। আর এ কারণে আমরা ওই ব্যক্তিকেও কাফির বলবো, যে ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীনের অনুসারীদের কাফির বলতে অস্বীকার করে। বা তার কুফরীর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে। বা তার কাফির হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে। বা তাদের মতবাদ সঠিক বলে মনে করে। চাই সে নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিক কিংবা একথাও বলে যে, ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য সব মতবাদ বাতিল।

অনুরূপ আমরা ওইসব লোকদেরও কাফির বলবো, যারা এ রূপ কথা বলে যে, সব উম্মত পথভ্রষ্ট ও সাহাবায়ে কেরামের কাফির হওয়ার উপক্রম হয়েছে। যেমন রাফিজীদের কামালিয়া উপদল, যারা বলে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সমস্ত উম্মত কাফির হয়ে গেছে (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ উম্মতের লোকেরা তখন হযরত আলী রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে খিলাফতের জন্য নির্বাচন করেনি। তাদের মতে হযরত আলী রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খিলাফতের জন্য সব চাইতে বেশী যোগ্য ছিলেন। এ দল ওই কারণে হযরত আলী রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কাফির উল্লেখ করেছে (মা'আযাল্লাহ)। তারা বলে যে, হযরত আলী রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রাপ্য খিলাফত লাভ করেন নি কেন। এ দল কয়েক দিক থেকে কাফির হয়েছে। প্রথমতঃ তারা এ কথা বলে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সব উম্মত কাফির হয়ে গেছে। শরীয়তের ধারাকে বাতিল স্থির করেছে। আর শরীয়তের ধারাবহনকারী ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। এ কারণে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর দু'টি অভিমতের এক অভিমতে তাদের হত্যা করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

দ্বিতীয়ত হলো, তারা এভাবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মন্দ বলেছে যে, তারা বলে এবং ধারণা করে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত

আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে খলিফা হওয়ার জন্য ওসীয়াত করেছেন। অথচ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও জানতেন যে, তাঁর ওফাতের পর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর প্রাপ্য অধিকার লাভ করতে পারবে না। আর খিলাফতের অধিকার লাভে বঞ্চিত ব্যক্তি তাদের আকীদা অনুযায়ী কাফির। তাহলে তাদের এ কথার মমার্থ হলো হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কাফিরের পক্ষে খিলাফত লাভের ওসীয়াত করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের এসব আকীদা ভ্রান্ত। এরূপ ভ্রষ্ট আকীদা পোষণকারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত হোক।

অনুরূপ আমরা এরূপ কাজ করার কারণেও কাফির উল্লেখ করবো, যাদের সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এরূপ কাজ কাফির ছাড়া কোনো মুসলমানের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে না। যদি কর্তা এরূপ কাজ করার সাথে সাথে তার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে, যেমন নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, ত্রুস, আগুনকে সাজদা করা ইহুদী ও নাসারাদের উপাসনালয়ের দিকে তাদের সাথে মিলে মিশে একত্রে দৌড়ে অগ্রসর হয়। তাদের চাল-চলন ধারণা করে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে। যেমন হিন্দু ব্রাহ্মণদের মতো গলায় ফৈতা ধারণ করা। মাথার মাঝখানের চুল মুণ্ডিয়ে ফেলা। বিশ্ব মুসলিম সকলে এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, এ ধরনের আমলকারী কাফির। কারণ এ সব কাজ কুফরীর নিদর্শন।

অনুরূপ ওই ব্যক্তির কুফরী সম্পর্কে মুসলমানদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হত্যা বা ব্যভিচার অথবা আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজ হারাম করেছেন, ওইসব কাজ হালাল মনে করে, এ কথাও জানে যে, এসব কাজ হারাম যেমন মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী কারামিতা দল, বা কোনো কোনো কট্টরপন্থি সূফীসম্প্রদায়।

অনুরূপ আমরা ওই ব্যক্তির কাফির হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত, এসব কাজ যা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির বা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে, শরীয়তের নিয়মাবলীর আলোকে ওইসব কাজ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ওই বিষয় ধারাবাহিকভাবে উম্মাতের ইজমায় প্রচলিত হয়ে আসছে, কিন্তু তারা ওই গুলোকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে। যেমন পাঁচ ওয়াস্ত নামায, দৈনিক ফরয নামাযের রাকা'আতের সংখ্যা, নামাযের রুকু সাজদাকে অস্বীকার করে, আর বলে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদ আমাদের উপর মুতলক বা সাধারণ নামায ফরয করেছেন। নামাযের সংখ্যা পাঁচ হওয়া নামাযের ওইসব নিয়ম পদ্ধতি ও শর্তাবলী মানি না। কারণ কুরআন মাজীদে এ সবার কোনো উল্লেখ নেই। আর এ সম্পর্কে হাদীসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে তার মর্যাদা খবরে ওয়াহিদ বা একক বর্ণনার চেয়ে বেশী নয়।

অনুরূপ ওই ব্যক্তির কাফির হওয়া সম্পর্কেও উম্মাতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো কোনো খারিজীদের মতো বলে যে, নামায শুধু দিনের দুই অংশে ফরয করা হয়েছে।^১

অনুরূপ ওই বাতেনীয়া মতাবলম্বীদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে উম্মাতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যারা বলে, ফরায়িজের অর্থ হলো ওই লোক যাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আর খিয়ানতের অর্থ হলো ওইসব লোক যাদের থেকে দূরে থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে।^২

কোনো কোনো সূফী মতাবলম্বীদের এ কথাও কুফরী যে, ইবাদত ও রিয়াজতের প্রয়োজন শুধু ওই সময় পর্যন্ত থাকে, যে যাবত মানুষের প্রবৃত্তি পবিত্র ও শুদ্ধ না হয়। যখন মানুষের প্রবৃত্তি পবিত্র হয়ে যায়, তখন ইবাদত ও রিয়াজতের প্রয়োজন রহিত হয়ে যায়। আর তখন ওই ব্যক্তির জন্য সব কিছু বৈধ হয়ে যায়। তখন ওই ব্যক্তির উপর শরীঈ জিম্মা বা দায়িত্ব অবশিষ্ট থাকে না।^৩

অনুরূপ যদি কোনো ব্যক্তি মক্কা মুয়াযযমা বায়তুল্লাহ, মসজিদে হারাম বা হজ্জের রীতি-নীতিকে এ কথা বলে অস্বীকার করে, আমি স্বীকার করি, কুরআনের আলোকে হজ্জ ফরয হয়েছে, আর কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করা ফরয করা হয়েছে। কিন্তু এর পরিচিত আকৃতির উপর হজ্জ হওয়া অথবা এ স্থান মক্কা বা বায়তুল হারাম হয়েছে, আমি তা মানি না। সম্ভবতঃ উদ্ধৃতকারীগণ হজ্জের বর্ণনা বা কিবলা সম্পর্কিত যে বর্ণনা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন তাতে তাদের ভুল হয়েছে, তারা এ বিষয়ে সন্দেহে পতিত হয়েছে, এ রূপ কথা উচ্চারণকারী কাফির। আর তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। তবে শর্ত হলো, যাদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা হয় যে, এরা ইসলামের হাকীকত সম্পর্কে অবগত আছে। আর মুসলমান সমাজে বসবাস

^১ এ আকীদা কোনো কোনো খারিজী মতাবলম্বীদের। তাদের ধারণা হলো শুধু ফরয ও মাগরিব নামায ফরয করা হয়েছে। এর নিয়ম হলো ফজরের সাথে জোহর ও আসর, আর মাগরিবের সাথে ইশা একত্রে আদায় করতে হবে।

^২ ফরযসমূহ যথা নামায ও রোজাকে তাঁরা ইবাদত মনে করে না। বরং তাদের আকীদা হলো ফরজের অর্থ হলো, যা হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইমামের উপর ন্যস্ত। এ সবই ভ্রান্ত ধারণা।

^৩ অনেক অজ্ঞ, পথভ্রষ্ট, প্রতারক যারা নিজেদেরকে সূফী দাবী করে, এ দাবীও করে বসে যে, আমাদের নামায রোজার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ ওইসব ইবাদতের উদ্দেশ্যে হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া, অথচ তিনি আমাদের সাথে একাকার হয়ে গেছেন। এ ধরনের কিছু মূর্খ, অসাধু নাম সর্বস্ব সূফী প্রকৃত তাসাউফের চিন্তাধারাকে মানুষের কাছে বিকৃত করে উপস্থাপন করছে, অধিকন্তু ইসলামে শরীয়তের পাশাপাশি তরীকতের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে।

করছে। কিন্তু যদি তারা নও মুসলিম হয় তাহলে তাদের বলে দিতে হবে, তোমরা তো এখনো ইসলামের প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হতে পারো নি। এ কারণে তোমরা ওইসব বিষয়ে সাধারণ মুসলমানদের জিজ্ঞেস করো, তাহলে তোমরা জেনে নিতে পারবে, ওইসব বিষয় সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। দীর্ঘদিন থেকে পূর্ববর্তী আলেমগণ এ বিশেষ দিকসমূহের সাথে এই ইবাদতসমূহ সম্পৃক্ত করে আসছে। মক্কা ওই মক্কা, আর বায়তুল্লাহ সে বায়তুল্লাহই যেখানে কা'বা ও কিবলা বিদ্যমান রয়েছে। যার প্রতি মুখ করে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ নামায আদায় করেছেন। তাই মুসলমান হজ্জ ও তাওয়াফ করছে। আর হজ্জে যে আকৃতি গ্রহণ করা হয়, এটা হলো প্রকৃত পদ্ধতি ও ইবাদত। আর এটার মূল পরিপ্রেক্ষিতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমান এ পদ্ধতিতে হজ্জ আদায় করছেন। নামাযও অনুরূপ যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমান আদায় করে আসছে। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উদ্দেশ্যও তাই।

আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আমলের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করেছেন, আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায়ের ব্যাখ্যাও তাই। সুতরাং তোমাদের ওই হাকীকতসমূহের জ্ঞান লাভ করতে হবে। যেভাবে সব মুসলমানের রয়েছে। তোমরা এ বিষয়সমূহে সন্দেহ করো না।

যে ব্যক্তি বাদানুবাদ করে, আর মুসলমানদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা শর্তেও এ বিষয়সমূহ অস্বীকার করে, সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যাবে। তখন তার এ আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না যে, আমি ওই বিষয়সমূহ জানিনা। কারণ সে বাহ্যিকভাবে স্বীয় মিথ্যাকে পর্দাবৃত করার অপচেষ্টা করেছে। তার জন্য এ কথা সম্ভব হবে না, সে মুসলমান সমাজে বসবাস করার পরও এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত নয়। উপরন্তু যখন সে উম্মতের নকলকৃত বিষয়সমূহকে নিছক ব্যক্তিগত ধারণা ও ভুল বলা থেকে পিছপা না হয়। যেখানে উম্মত ওই বিষয় ঐকমত্যের উপর চলে আসছে এবং ওইসব বিষয় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কাজে প্রমাণিত হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত অভিপ্রায়ের ব্যাখ্যা হয়েছে। সে যেন শরীয়তের বিষয় সন্দেহ পোষণ করেছে। এ কারণে পূর্ববর্তী আলেমগণই হাদীসসমূহ ও কুরআন উদ্ধৃতকারী হয়েছেন। এভাবে তো দ্বীনের মৌলিক ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে যাবে। এরপর এ ধরনের লোকের কাফির হওয়ার ব্যাপারে আর কী বলার থাকতে পারে?

অনুরূপ ওই ব্যক্তিও কাফির যে কুরআন অস্বীকার করে বা পুরো কুরআন অস্বীকার করে বা কুরআনের একটি বর্ণও অস্বীকার করে। বা ওই ব্যক্তি যে কুরআন পরিবর্তন করতে চায়। বা কুরআনে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বৃদ্ধি করতে চায়। যেমনটি বাতেনীয়া ও ইসমাইলীয়া সম্প্রদায় করেছে। আর তারা বলে যে, কুরআন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দলীল নয়। অথবা এ কুরআন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দলীল ও মু'জিয়া নয়। যেমন হিশাম ফাওতী ও মা'আমার যমীরি বলেছে, (নাউযবিলাহ) কুরআন আল্লাহ তা'আলাকে প্রমাণ করে না, আর না কুরআনে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কোনো দলীল রয়েছে, আর না কুরআন পুরস্কার বা শাস্তির প্রমাণ করেছে। তারা নিজেদের এ দু'অভিমতের কারণে নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে গেছে। আর আমরা তাদের উভয়কে এ কারণে কাফির উল্লেখ করছি, তাদের মতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিয়াসমূহের মধ্যে তাঁর কোনো দলীল প্রমাণ নেই। অথবা আসমান ও যমীনসমূহের সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোন দলীল প্রমাণ নেই। তাদের এ অভিমতসমূহ উম্মতের ঐকমত্য ও ধারাবাহিক বর্ণনার পরিপন্থি। কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সব বিষয়কে দলীলরূপে উল্লেখ করেছেন। আর কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছে।

অনুরূপ যে ব্যক্তি এ বিষয় অস্বীকার করে, যে বিষয়ে কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, আর জানে যে, এ বিষয়সমূহ কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। মানুষের নিকট লিখিত কুরআন প্রকৃত বিদ্যমান রয়েছে। তবুও সে এ বিষয় সম্পূর্ণ নির্বোধ অজ্ঞ হয়, আর না সে নও মুসলিম। তারপরও দলীল হিসেবে বলে যে, কুরআন সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অথবা তার নিকট সহীহ কুরআন পৌঁছেনি। তাই আমরা এরূপ ব্যক্তিকে উপরোল্লিখিত দু'টি বিধানের আলোকে কাফির নির্ধারণ করেছি। কারণ এরূপ কথার মাধ্যমে সে কুরআন ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলেছে। আর নিজের প্রকৃত ধ্যান-ধারণা গোপন করার চেষ্টা করেছে।

অনুরূপ আমরা ওই ব্যক্তিকেও কাফির বলবো, যে ব্যক্তি জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর-নশর, হিসাব-কিতাব ও কিয়ামত অস্বীকার করে। কারণ এসব বিষয়ের উপর উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথবা কুরআন উদ্ধৃতকারী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে।

অনুরূপ ওই ব্যক্তিও কাফির, যে এ বিষয়সমূহ স্বীকার করে, কিন্তু বলে যে, জ্ঞানাত-জাহান্নাম, হাশর-নশর, পুরস্কার-শাস্তির ওই অর্থ নয়, যা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়। বরং ওইগুলোর অর্থ হলো এটা ব্যতীত অন্য কিছু রূহানী স্বাদ ও গোপনীয় অর্থ উপভোগ করা। যেমন খ্রিষ্টান কোনো কোনো দার্শনিক, বাতিনীয়া ও কোনো কোনো সূফীবাদীদের অভিমত। তাদের ধারণা হলো, কিয়ামত শব্দের অর্থ হলো শুধু মৃত্যু বা ধ্বংস হওয়া বা আকাশসমূহের বর্তমান আকৃতির বিলুপ্তিঘটা ও পঞ্চ উপাদানে ঘটিত বস্তুর গঠন প্রণালী বিনষ্ট হওয়া। যেমনটি কতিপয় দার্শনিকের মত রয়েছে।

অনুরূপ আমরা ওই কটর রাফিজীদেরও কাফির বলবো, যাদের অভিমত হলো, إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ الْأَفْضَلَ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ - ইমামগণ সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস সালাম থেকেও উত্তম।

কিন্তু যে ব্যক্তি এ ধারাবাহিক খবর ও প্রসিদ্ধ শহরসমূহ অস্বীকার করে, যা দ্বারা শরীয়ত বাতিল হওয়া অবধারিত না হয় আর না তাতে দ্বীনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অস্বীকার করা হয়, যেমন তাবুক যুদ্ধ, মুতার যুদ্ধ বা হযরত আবু বকর ও উমর রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা অস্তিত্ব অস্বীকার করে বা হযরত উসমান রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাহাদাত ও হযরত আলী রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খিলাফত অস্বীকার করে বা এমন কোনো বিষয় অস্বীকার করে যার দ্বারা শরীয়ত বুঝা যায় না, তাই এরূপ কোনো বিষয়ের অস্বীকৃতি বা কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা অস্বীকার করার কারণে কুফরী অবধারিত হয় না। কারণ এ ধরনের অস্বীকৃতিকে আমরা হয়তো বা মিথ্যা অপবাদ ও মিথ্যারোপ বলতে পারি। যেমন হিশাম ও আব্বাদের উষ্ট্রের যুদ্ধ অস্বীকার করা। বা ওই যুদ্ধসমূহ যা হযরত আলী রাডিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর বিরোধীদের মধ্যে সংগঠিত হয়েছে। তবে যদি কোনো অবিশ্বাসী ওই ঘটনাসমূহকে এ কারণে অস্বীকার করে যে, ওই ঘটনাসমূহের বর্ণনাকারীগণ অনির্ভরযোগ্য আর তারা এভাবে মুসলমানদের সন্দেহে পতিত করার যোগ্য বিবেচিত হয় তাহলে এখন আমরা তাদের কাফির উল্লেখ করবো। কারণ তাদের এরূপ অস্বীকৃতি সামনে অগ্রসর হয়ে শরীয়তের বিষয়সমূহকে বাতিল করার কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।

যে ব্যক্তি এ ধরনের ইজমা অস্বীকার করে, যা ধারাবাহিকভাবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি তবে অধিকাংশ মুতাকাল্লিমীন, ফিকহ ও বিচক্ষণ আলেমগণের মতে তারা কাফির। কারণ সে এমন এক ইজমা অস্বীকার করেছে, যার মধ্যে ইজমার সব শর্তাবলী বিদ্যমান পাওয়া গেছে, আর তা সর্ব

সাধারণের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর তাদের দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

مَصِيرًا

-আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এরপরে যে, সঠিক পথ তার সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়েছে এবং মুসলমানদের পথ থেকে আলাদা পথে চলে, আমি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেবো এবং তাকে দোযখে প্রবেশ করাবো। আর তা প্রত্যাবর্তন করার কতই মন্দ স্থান।^১

আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَيَدْ شِرْ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

-যে ব্যক্তি এক বিগত পরিমান মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করলো সে যেনো ইসলামের বন্ধনকে তার নিজের উপর থেকে ছিন্ন করে ফেললো।^২

আর যে ব্যক্তি ইজমার বিরোধিতা করে তার কুফরী সম্পর্কিত ইজমার উল্লেখ করা হয়েছে। অপর একদল আলেমের অভিমত হলো, এ ধরনের লোকদের কাফির বলার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। যারা এরূপ ইজমার বিরোধিতাকারী হবে, যা আলেমগণ বিশেষভাবে উদ্ধৃত করেছেন। কোনো কোনো আলেমগণ বলেন, এরূপ ব্যক্তির কুফরীর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে যারা কিয়াসের মাধ্যমে সংঘটিত ইজমা অস্বীকারকারী হয়েছে। যেমন ইজমা অস্বীকার করার কারণে ইসলামের নিয়াম বা শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে। সে পূর্ববর্তী আলেমগণের ইজমা অস্বীকার করে। অথচ পূর্ববর্তী আলেমগণের ইজমা দলীল হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে।

^১ আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১১৫।

^২ ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী মিসলিস সালাত, ১০:৮৯, হাদিস নং : ২৭৯০।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসীল আশ'আরী, ৩৫:৩২, হাদিস নং : ১৬৫৪২।

গ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ইমারা ওয়াল কুদায়া, পৃ. ৩৪১, হাদিস নং : ৩৬৯৪।

কাফী আবু বকর বলেন, আমার মতে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, আল্লাহ তা'আলার কুফরী হলো তাঁর মহান সত্তা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া। আর তাঁর উপর ঈমান আনা হলো তার মহান সত্তা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। আর কোনো ব্যক্তিকে তার কোনো কথা বা অভিমত দ্বারা কাফির নির্ধারণ করা যাবে না, যতক্ষণ না এটা প্রমাণিত হয় যে, সে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। আর যদি সে তার কথা বা কাজের মাধ্যমে এমন কোনো বিষয় অস্বীকার করে যা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে আর সব মুসলমান ইজমা বা ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, এ ধরনের বিষয়ে অস্বীকৃতি কাফির ব্যতীত কেউ করতে পারে না, বা এ কথা ও কাজে সে কাফির প্রমাণিত হবে। তার কথা ও কাজের কারণে সে কাফির হবে না। বরং তার কাফির হওয়ার দলীল হলো তার কথা ও কাজ যা কুফরকে অবধারিত করে। সংক্ষিপ্ত কথা হলো যে, কুফর তিন কথার এক কথার কারণে অবধারিত হয়।

প্রথমত, ওই ব্যক্তির আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া।^১

দ্বিতীয়ত, তার দ্বারা এ ধরনের কোনো কথা বা কাজ হওয়া, যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর দিয়েছেন, বা মুসলমানগণ ইজমা বা ঐকমত্য স্থির করেছেন যে, তা কোনো কাফিরের দ্বারা সম্ভব হতে পারে। যেমন মূর্তিকে সাজদা করা। ফৈতা বেঁধে কাফিরদের উপাসনালয়ের দিকে তাদের উৎসব ও রথযাত্রায় খোঁগদান করা।^২

^১. আবু দাউদ শরীফে এক হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে জিহাদ করে। অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সমান বলে। তাই সে স্বীয় কৃতকর্মের কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য এক হাবশী ক্রীতদাসীকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির করে বলে, আমি তাকে মুক্ত করতে চাই। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ক্রীতদাসীর দ্বারা কাজ হবে না। বরং মুসলমান ক্রীতদাসী মুক্ত করতে হবে। তখন সে বললো, এ ক্রীতদাসী মুসলমান। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাসীকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ তা'আলা কোথায়? উত্তরে ক্রীতদাসী আসমানের প্রতি ইশারা করে। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, আমি কে? ক্রীতদাসী বললো, আপনি আল্লাহর রাসূল, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সিফাত সম্পর্কে যে আকীদা রয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করে তার ঈমানের সমর্থন করেন।

^২. সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি কাফন চোর ছিলো। মৃত্যুর সময় সে তার ছেলের গুসীয়াত করে, মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহ আগুনে পুড়ে ছাই করে ফেলবে। তারপর যে দিন প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত হবে, তখন অর্ধেক ছাই নদীতে ও বাকী অর্ধেক ছাই উন্মুক্ত মাঠে উড়িয়ে দেবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করে কঠিন আযাবে শ্রেষ্টতার করতে পারবেন না। সুতরাং তার ছেলেরা তার গুসীয়াত কার্যকর করে। কিন্তু সে আল্লাহর কুদরত থেকে রক্ষা পাবে কীভাবে? আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত ছাই একত্রিত করে তাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কেনো এরূপ করতে বলেছো? তখন সে বললো, আমি আপনার ভয়ে

তৃতীয়ত, এরূপ কথা ও কাজ যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া প্রমাণিত হয়। শেষোক্ত দু'টি বিষয় এরূপ যে, যদিও তাদের সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না যে, আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে এরূপ হয়। তবুও এ বিষয়ের নিদর্শন তো অবশ্যই রয়েছে যে, এই কাজ সম্পাদনকারী কাফির। আর ঈমানের চিহ্ন তার মধ্যে বিদ্যমান নেই।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর মধ্যে কোনো এক গুণকে জেনে শুনে স্বজ্ঞানে অস্বীকার করে বলে যে, তিনি আলীম, কাদীর ইচ্ছাপোষণকারী ও বাক্য উচ্চারণকারী নন (নাউয়বিলাহ) অথবা এভাবে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ গুণাবলীর অস্বীকার করে, যা আল্লাহ তা'আলার জন্য জরুরী- তাই এ বিষয় আমাদের ইমামদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এমন ব্যক্তি কাফির। এ সম্পর্কে হযরত সাহনূনের অভিমত হলো, যে ব্যক্তি এ কথা বলে, আল্লাহ তা'আলার কোনো কালাম নেই, সে কাফির হবে।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অভিমত হলো, ব্যাখ্যাকারীরকে কাফির বলা যাবে না। যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি।

তবে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহের মধ্যে কোনো সিফাত সম্পর্কে অজ্ঞ হয়। আর সে তা অস্বীকার করে। তার সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো আলেমগণ তাকে কাফির উল্লেখ করেছেন। আবু জা'ফর তাবারী প্রমুখ আলেম এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর প্রথমে একবার আবুল হাসান আশয়ারী এ বিষয় অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর একদল আলেমের অভিমত হলো, এরূপ ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না। আর পরে আশ'আরী এ অভিমতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন। আর তার অভিমত হলো, যেহেতু এ ধরনের লোক স্বীয় আকীদায় চূড়ান্ত বিশ্বাসী হয়নি। আর না তারা নিজেদের দীন ও ঈমান বুঝতে সক্ষম হয়েছে। এ কারণে এদের কাফির বলা যাবে না। তবে যে ব্যক্তি এ বিষয় হঠকারিতা করে বলে যে, তার আকীদা সঠিক, তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে। তারা দলীল হিসেবে আবিসিনীয় ক্রীতদাসীর হাদীস উল্লেখ করে, তাকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তাওহীদ স্বীকার করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন।

এরূপ করতে বলেছি। আল্লাহ তা'আলা তাকে এরূপ ভীত হতে দেখে ক্ষমা করে দেন। আলেমগণ এ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণ করেন, যদিও সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও ইখতিয়ার সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলো না। তবুও আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন।

অনুরূপ তারা এ হাদীসকেও দলিল হিসেবে পেশ করে যে হাদীসে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি বলেছিলো যে, যদি আল্লাহ তা'আলা শাস্তি কমাতে সক্ষম হতেন, (নাউযবিল্লাহ)। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সম্ভবতঃ আমি আল্লাহ তা'আলা থেকে গোপন হয়ে যেতে পারবো। অতঃপর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, যদি অধিকাংশ লোককে আল্লাহ তা'আলার সিফাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে এ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত অতি অল্প সংখ্যক লোক পাওয়া যাবে।

যারা আল্লাহ তা'আলার সিফাত অমান্যকারীকে কাফির উল্লেখ করে, তারা ওই হাদীসের এই জবাব দেয় যে, আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত “لَنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ” (অর্থাৎ যদি আল্লাহ তা'আলা সক্ষম হন) “قَدَرَ” (শাস্তি হ্রাস করার) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ওই ব্যক্তি মৃত্যুকে দ্বিতীয়বার জীবিত করার বিষয়ে সন্দেহ পোষণকারী ছিলো না। বরং তার সন্দেহ ছিলো পুনরুত্থান ও হাশর সম্পর্কে। যা শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা ব্যতীত জানা অসম্ভব। সম্ভবতঃ এটাও হতে পারে যে, তার নিকট তখনো এ রূপ কোনো শরীয়ত আসেনি। যার দ্বারা সে এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে পারবে। এ কারণে তার সেই বিষয় সন্দেহ পোষণ করা কুফুরী ছিলো না। আর ওই বিষয়সমূহ যেগুলোতে শরীয়তের স্পষ্ট কোনো আদেশ না থাকে, তাতে চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দেয়ার অনুমতি রয়েছে। অথবা এ কথা বলা যায়, হাদীসে قَدَرَ হ্রাস করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সে যা বলেছে তার নিজের ধারণা অনুযায়ী বলেছে যে, সে অনেক গুনাহ করেছে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তার উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। সুতরাং তার এ কাজকে নির্বোধের কাজ মনে করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, সে ব্যক্তির উপর এতো বেশী পরিমাণ ভীতি প্রবল হয়েছে যে, যাতে তার অনুভূতিতে ভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় সে উদ্ভট কথা বলেছে। তার নিজের কথার উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। এ কারণে তাকে কোনো প্রকার জবাবদিহী করা হয়নি। আর তার মাগফিরাত হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলেন, এটা ওই সময়ের ঘটনা, যখন ওহী আগমনের ধারা বন্ধ ছিলো। সুতরাং ওই সময় মুতলক বা সাধারণ তাওহীদই যথেষ্ট ছিলো।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা আরববাসীদের প্রবাদ-বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যার বাহ্যিক আকৃতিতে তো সন্দেহ হয়, কিন্তু অর্থের দিক থেকে তা নিশ্চিত হয়।

এটাকে অজ্ঞতা ও নিবুদ্ধিতা বলা হয়। আর আরববাসীদের প্রচলিত বাক্যে এর অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বানী-

لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَوْ تَحْشَىٰ.

-এ আশায় যে, সে মনোযোগ দেবে অথবা কিছুটা ভয় করবে।^১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَأَنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَّيْ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

-আর নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা হয়তো সৎপথে স্থির আছি অথবা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পতিত।^২

আর যেসব লোক আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা প্রমাণ করে, আর সিফাত নিষেধ করে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, আমি এই কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার কোনো জ্ঞান নেই। তাঁকে আমি বজ্র মান্য করি, কিন্তু তিনি কথা বলতে পারেন না। আর অনুরূপ, যে আল্লাহ তা'আলার সব সিফাত সম্পর্কে এরূপ আকীদা পোষণ করে। যেমন মু'তায়িলা মতাবলম্বীগণ, এখন যে সকল সুন্নী, ওই আকীদার পরিণতি চিন্তা করে তারা ওই কারণে তাদের কাফির উল্লেখ করে যে, যখন কোনো সত্তা থেকে তার জ্ঞান নিষেধ করে দেয়, তখন সে যেনো আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানকে নিষেধ করে। কারণ যার জ্ঞান আছে তাকে জ্ঞানী বলা হয়। অনুরূপ তারা ওইসব দলের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীদেরকে কাফির বলে উল্লেখ করেছে। আর যারা এ বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে। যেমন কদরীয়া প্রমুখ। আর যেসব সুন্নী এ আকীদার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না, তাদের উপর (মু'তায়িলাদের) এ আকীদা প্রয়োগ করে না। যা সিফাত নিষেধ করার কারণে অবধারিত হয়েছে। আর তারা এদের কাফির বলে না। কারণ যখন তাদের বলা হয় যে, সিফাত নিষেধ করার কারণে তো এটা অবধারিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানী নন (নাউযবিল্লাহ)। তাহলে মু'তায়িলা মতাবলম্বীগণ তাৎক্ষণিক এরূপ জবাব দেবে যে, আমরা এ কথা বলছি না যে, আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানী নন। আর আমরা এ কথার পরিণতি নিষেধ করছি, যা তোমরা আমাদের প্রতি অবধারিত করছো। বরং তোমাদের ও আমাদের উভয়ের আকীদা হলো, এরূপ ধারণা পোষণ করা কুফুরী। বরং আমরা বলছি যে, আমাদের দৃষ্টিতে সিফাত নিষেধ করার পরিণতি প্রকাশ হয়

^১. আল কুরআন : সূরা ছোয়া-হা, ২০:৪৪।

^২. আল কুরআন : সূরা সাবা, ৩৪:২৪।

না তোমরা যা বলছো। উল্লেখিত বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করে আলেমগণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারীদের কাফির উল্লেখ করার ব্যাপারে মতোবিরোধ করেছেন। আর যখন তোমরা ওই বুনিয়াদসমূহ বুঝতে পারবে, তখন তোমাদের নিকট এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ বিষয়ে কী কারণে মতভেদ করা হয়েছে?

কিন্তু আমাদের মতে সঠিক ধারণা হলো, তাদের কাফির না বলা। আর তাদের উপর চূড়ান্তভাবে ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়ার আদেশ দেয়া থেকে বিরত থাকা। চাই কিসাস, উত্তরাধিকার রীতি, বৈবাহিক বন্ধন, রক্তপণ, তাদের জাণাযার নামায, মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয় তাদের উপর ইসলামী বিধান প্রবর্তন করা হবে। তবে এজন্য তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। শুধু তাই নয় বরং তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। যাতে তারা নিজেদের বিদ'আতী আকীদা পরিত্যাগ করে সঠিক আকীদায় ফিরে আসে।

প্রাথমিক যুগের মুসলমান বিদ'আতীদের সাথে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা কদরীয়া, খারিজী ও মু'তাজিলাদের সাথে এ ধরনের আচরণ করেছেন। তাঁরা তাদের কবরস্থান পৃথক করে দেননি। আর না তাদের মুসলমানদের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে। বরং তারা সামাজিক আদান প্রদান বন্ধ করে দেয়ার নীতি গ্রহণ করেছেন। কখনো কখনো তাদেরকে দেশান্তরিত করেছেন। আর যখন পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে তখন তাদের হত্যা করতে কুষ্ঠাবোধ করেননি। কারণ এসব লোক ওই সত্যপন্থি আলেমগণ যারা তাদের কাফির বলেননি। তারা পথভ্রষ্ট, পাপাচারী, অবাধ্য ও কবীরা গুনাহকারী ছিলো। তবে কোনো কোনো আলেমগণ ওই সত্যপন্থি আলেমদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেনি। (আর তারা এদের কাফির বলে উল্লেখ করেছেন)। আল্লাহ তা'আলা সঠিক ও সত্যকথা মান্য করার তাওফীকদাতা।

কাযী আবু বকর বলেন, প্রতিশ্রুতি, ভীতি-প্রদর্শন আল্লাহ তা'আলার দীদার, বান্দার কাজ-কর্ম, অমনোযোগীতার স্থায়ীত্ব ও জন্মদান এরূপ সূক্ষ্ম বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকারীদের কাফির না বলা উত্তম। কারণ এসব বিষয়ের অজ্ঞতা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞতা বুঝায় না। আর না ওইসব লোক কুফর কি তা জানে না। আর তারা এটাও জানে না যে, আলেমগণ ইজমা প্রতিষ্ঠা করেছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আর এ সম্পর্কিত মতভেদ সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। এর চেয়ে বেশী আলোচনা করা নিম্প্রয়োজন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

حُكْمُ الذَّمِّيِّ إِذَا سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى

আল্লাহর প্রতি কটুক্তিকারী বন্দীর বিধান প্রসঙ্গে

আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ওই মুসলমানদের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলাকে গাল-মন্দ করেছে। কিন্তু যদি কোনো বন্দী এ ধরনের গর্হিত আচরণ করে, তার সম্পর্কে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, একবার এক জিম্মী তাঁর সম্মুখে এমন কথা বললো, যা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা ও সম্মানের পরিপন্থি, আর তা স্বয়ং তার দ্বীনের পরিপন্থি ছিলো, সে যে দ্বীনের অনুসারী ছিলো। তারপর সে এ বিষয়ে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিকট দলীল পেশ করতে শুরু করে। তখন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তরবারী বের করেন। কিন্তু সে পলায়ন করে আত্মগোপন করে। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে অনেক অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি।

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ইবনে হাবীব' ও 'মাবসূত' গ্রন্থদ্বয়ে, আর 'ইবনে কাসিম' 'মাবসূত', 'মুহাম্মদ' ও 'ইবনে সাহনুন' গ্রন্থদ্বয়ে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে,

مَنْ شَتَمَ اللَّهَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي كَفَرَ بِهِ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَبَبْ.

-ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেয়ার কারণে কাফির হয়েছে তাদেরকে হত্যা করে ফেলতে হবে এবং তাদের তাওবা গৃহীত হবে না।

ইবনে কাসিম বলেন, যতক্ষণ না সে মুসলমান হয়ে যায়, তাকে তাওবা করাতে হবে। 'মাবসূত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যতক্ষণ না সে স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়।

আসবাগ বলেছেন, যে মৌলিক বিশ্বাসের কারণে সে কাফির হয়েছে তা তার ধর্ম। উদাহরণ হলো, সে আল্লাহ তা'আলার জন্য স্ত্রী, পুত্র, কন্যা অংশীদার স্থির করে আর তার সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, সে স্বীয় আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু তার সাথে এরূপ প্রতিশ্রুতি করা হয়নি যে, সে মিথ্যা কথা বলবে আর গালি দিতে থাকবে। সুতরাং যদি সে এরূপ কাজ করে তাহলে তা হবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, ফলে সে হত্যার যোগ্য হবে।

ইবনে কাসিম 'মুহাম্মদ' গ্রন্থে বলেন,

وَمَنْ شَتَمَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْأَدْيَانِ اللَّهَ تَعَالَى بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ فِي كِتَابِهِ
قُتِلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ.

-ভিন্ন ধর্মের যে ব্যক্তি তার বিকৃতগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে অকারণে আল্লাহ তা'আলাকে গাল-মন্দ করে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে, যদি না সে মুসলমান হয়ে যায়।

আর মাখযুমী 'মাবসূত' গ্রন্থে ও মুহাম্মদ বিন মাসলামা ও ইবনে আবি হাযিম বলেন, তাকে হত্যা করা যাবে না। বরং তাকে তাওবা করাতে হবে। চাই সে মুসলমান হোক বা কাফির। যদি সে তাওবা করে তাহলে ভাল, নতুবা তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আর মুতাররিফ, আবদুল মালিক ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এ অভিমত সমর্থন করেছেন।

আর আবু মুহাম্মদ বিন আবু যায়িদ বলেন, যে ব্যক্তি অকারণে আল্লাহ তা'আলাকে গালি দিয়ে কাফির হয়েছে তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে, যদি না সে মুসলমান হয়ে যায়।

এ বিষয়ে আমি ইবনে জাল্লাবের অভিমতও উল্লেখ করেছি। আর আমি উবায়দুল্লাহ, ইবন লুবাবাহ ও স্পেনের ওলামা মাশায়িখ খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, সে ফাতওয়াও উল্লেখ করেছি। কারণ সে এ কারণ ছাড়া যে কারণে কাফির ছিলো আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের মর্যাদার বিপরীত করেছে। এ বিষয়ে আলেমগণ একমত উপনীত হয়েছেন। আর সেই মহিলা হত্যাযোগ্য ঘোষিত হয়েছে।

অনুরূপ যদি কেউ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে এ কারণ ছাড়া যে কারণে সে কাফির হয়েছে বে'আদবী করে, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। কারণ গাল-মন্দের বিধান আল্লাহ তা'আলা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। কারণ আমরা ওই অমুসলিমদের নিকট থেকে তাদেরকে জিম্মী করার সময় এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছি যে, তারা আমাদের সম্মুখে তাদের কুফর প্রকাশ করবে না। আর না তারা আমাদের সামনে প্রকাশ্যে তাদের আকীদা বর্ণনা করে শুনাবে। যাতে কোনো কথা আল্লাহ তা'আলা ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানের পরিপন্থী হবে। সুতরাং যদি তারা এরূপ করে তাহলে তা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী হবে। যার শাস্তি মৃত্যু।

ওই জিম্মী যে নাস্তিক হয়েছে, তার সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক, মুতাররিফ, ইবনে আবদুল হাকাম ও আসবাগ বলেন, তাকে হত্যা করা যাবে না। কারণ সে তো এর চেয়ে বেশী কিছু করেনি যে, সে এক কুফর থেকে অপর কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে।

কিন্তু আবদুল মালিক বিন মাজিউন বলেন, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। কারণ নাস্তিক্য এমন এক পন্থা যার উপর সে কোনো মুসলমানের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়নি। আর না এর জন্য তার নিকট থেকে জিজিয়া কর গ্রহণ করা হয়। ইবনে হাবীব বলেন, আমি জানি না এছাড়া এ পর্যন্ত তার সম্পর্কে কেউ আর কোনো কথা বলেছে কিনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

حُكْمُ ادِّعَاءِ الْإِلَهِيَّةِ أَوْ الْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ عَلَى اللَّهِ

খোদায়ী দাবী কিংবা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ ও অপবাদের বিধান প্রসঙ্গে

আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ওই ব্যক্তির বিধান আলোচনা করেছি যে ব্যক্তি সরাসরি আল্লাহ তা'আলার শানে অসদাচারণ করে বা তাঁর প্রতি এমন কাজ সম্পৃক্ত করে, যা তাঁর সত্তা ও প্রভুত্বের মর্যাদার পরিপন্থি। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে বা খোদায়ী দাবী করে বা রিসালাতের দাবী করে, বা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সৃষ্টি করেননি, না তিনি আমার পালনকর্তা। অথবা বলে যে, আমার কোনো প্রভুই নেই। অথবা এমন কথা বলে যার কিছুই বুঝে আসে না, আর যে ব্যক্তি নেশাখস্ত বা উন্মাদ অবস্থায় অযাচিত কথা বলে। তাহলে এরূপ লোকের কুফরী সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের সুস্থতার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে প্রসিদ্ধমত অনুযায়ী তাকে তাওবা করাতে হবে। যদি সে তাওবা করে তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে। তার তাওবা এ দিক থেকে তার জন্য উপকারী যে, সে হত্যা থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে, তবে সে কঠোর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না, আর না তার শাস্তি হ্রাস করা হবে। যাতে অন্যরা এ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে নিজেকে সতর্ক করে নিতে পারে। আর সে ব্যক্তিও সতর্ক হয়ে যাবে যে, আগামীতে আর কুফরী ও মূর্থতার দিকে প্রত্যাভর্তন করবেনা। আর যদি এটাকে অতি সাধারণ বিষয় বলে মনে করে, তাহলে এ কথা প্রমাণিত হবে যে, ওই ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ দিক বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। আর সে যে বার বার তাওবা করছে, মিথ্যা তাওবা করছে। এ অবস্থায় তার হুকুম হবে নাস্তিকের হুকুমের মতো। আমরা তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপর নির্ভর করবো না। আর না তার তাওবা কবুল করবো। এ ব্যাপারে তার হুকুম হবে মাদকাসক্ত ও অচেতন ব্যক্তির মতো।

তবে যে ব্যক্তি উন্মাদ হয়ে জ্ঞান-বুদ্ধিহীন হয়ে যায়, তার কথা বুঝার চেষ্টা করা হয় যে, সে যে কুফরী বাক্য বলছে তা উন্মাদ অবস্থায় বলছে, না জ্ঞান বুদ্ধিহীন অবস্থায় বলছে, তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি সে উন্মাদ অবস্থায় বলে, তাহলে তাকে কোনোরূপ পাকড়া করা হবে না। কিন্তু যদি সচেতন অবস্থায় বলে, চাই তখন তার জ্ঞান বুদ্ধি ঠিক না থাকে, আর সে শরীয়াতের দায়বদ্ধ না থাকে, তাহলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। যাতে সে আগামীতে এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকে। যেভাবে তাকে অন্য মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য শাস্তি দেয়া হয়, বা জীব-জন্তুকে বদ-অভ্যাসের কারণে শাস্তি দেয়া হয়, যাতে তাকে সংশোধন করা হয়।

যে ব্যক্তি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে খোদা বলেছে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই ব্যক্তিকে জীবিত আগুনে পুড়ে ফেলেন।^১

অনুরূপ আবদুল মালিক বিন মারওয়ান নবুওয়াতের দাবীদার হারিছ মোতানাকীকে^২ শূলীতে ছড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেন। অনুরূপ নবুওয়াতের দাবীদারদের ব্যাপারে খলিফা ও মুসলিম নৃপতিগণ এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সেই সময়কার আলেমগণ তাদের এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। আর তাদের গৃহীত পদক্ষেপ জাযিয় ঘোষণা করেছেন। তারা এভাবে এ বিষয় ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, যারা এ ধরণের লোকদের কাফির বলবে না তারাও কাফির। বাগদাদের মালিকী মতাবলম্বী ফিকহাবিদ তাদেরও প্রধান বিচারপতি আবু উমর মালিকী মনসুর হাল্লাজের^৩ ফাঁসি ও হত্যার ব্যাপারে ঐকমত্য ঘোষণা করেছেন।

^১ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আজাদকৃত ক্রীতদাস নাসির, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খোদা বলে সম্বোধন করে। তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জীবিত আগুনে পোড়ানোর নির্দেশ দান করেন। যখন সে আগুনে জ্বলছিলো, তখন বলেছিলো, এখন আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আপনি আমার খোদা। কারণ আগুনে পোড়ানোর শাস্তি দেয়ার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। এরপর যারা তার আকীদায় বিশ্বাসী হয়, তাদের নাসিরীয়া বলা হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, প্রথমে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে আগুনে পোড়ানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু পরে যখন তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মৌখিক এ বর্ণনা অবগত হন যে, যিনি সৃষ্টজীবের স্রষ্টা একমাত্র তিনিই আগুনে পোড়ানোর শাস্তি দিতে পারেন। তখন তিনি আগুনে পোড়ানোর আদেশ রহিত করে নাসীরকে দেশ থেকে বহিস্কার করে দেন।

^২ হারিসের পুরা নাম ছিল হারিস বিন সাঈদ কাক্বাব, সে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের সময়ে নবুওয়াতের দাবী করে। তখন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেন।

^৩ হুসাইন বিন মনসুর হাল্লাজ ইরানের বায়যা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইরাকের ওয়াসিতে লালিত-পালিত হন। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী, আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার মতো আউলিয়া কেরামের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। হাল্লাজ উপাধীতে ভূষিত হওয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, একদিন তিনি কোনো এক বিশেষ প্রয়োজনে এক তুলো ধুন্যারিকে বলেন, তুমি অমুক স্থানে গিয়ে আমার এ কাজ করে দাও। ধুনকর অপরাগতা প্রকাশ করে বলে আমি এখন যেতে পারবো না। এখন আমি তুলা ধুন্য ব্যস্ত রয়েছি। হুসাইন মনসুর বললেন, তুমি আমার কাজ করে দাও, আমি তোমার তুলা ধুনে দেবো। তখন ধুনকর অল্প সময়ের জন্য সেখানে গিয়ে ফিরে আসে। অথচ দশজন লোক ওইসময়ে একসাথেও যদি তুলা ধুনতো, এরপরও এতো তুলা ধুনা সম্ভব হতো না, তখন থেকে হুসাইন মনসুরের উপাধী হয় হাল্লাজ বা তুলা ধুন্যারি।

হাল্লাজ বাল্যকাল থেকে আলেম ও সুফীদের নিকট বিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন। হফযাজী 'নাসীমুর রিয়াজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হাল্লাজের পিতা ছিলো অগ্নি উপাসক। তিনি বাল্যকালে জুনায়েদ বাগদাদী, আবু বকর শিবলী ও সিররি সাকতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ খ্যাতনামা ওলীদের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। তিনি নিজেও খ্যাতনামা ইবাদতকারী ও দুনিয়াবিমুখ সুফী ছিলেন। মোল্লা আলী ক্বারী 'শরহে শিফা' গ্রন্থে লিখেন, হাল্লাজ ফানার মঞ্জিল অতিক্রম করে যখন বিসাল বা মিলনের মাকামে উপনীত হন। যেখানে বান্দা ও খোদার মধ্যবর্তী অচেনার পর্দা উঠে যায়। তখন বান্দা আনাল হক, 'আনাল

কারণ (তাদের কথা) হাদ্জা খোদায়ীত্বের দাবী করেছে। এছাড়া সে হুলা বা আত্মায় প্রবিশ্ট হওয়ার আকীদায় বিশ্বাসী ছিলো। সে 'আনাল হক' বলা সত্ত্বেও বাহ্যিক শরীয়তের অনুসারী ছিলো। তবুও আলেমগণ তার অভিমতের আলোকে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব উল্লেখ করেছেন এবং তাওবার অযোগ্য বলেছেন।

অনুরূপ হুসাইন বিন হাদ্জাজের পর ইবনে আবুল গারাকীদও হাদ্জাজের মতবাদ গ্রহণ করেছিলো। তখন আব্বাসী খলিফা রাজী বিল্লাহর খিলাফত ছিলো। আর বাগদাদের প্রধান বিচারপ্রতি ছিলো আবুল হুসাইন বিন আবু উমর মালিকী। তিনি ইবনে আবুল গারাকীদকে হত্যা করার আদেশ জারী করেন।

ইবনে আবদুল হাকাম 'মাবসূত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, مَنْ تَبَا قُل - যে ব্যক্তি নবুওয়্যাতের দাবী করবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

হক' অর্থাৎ আমি সত্য, আমি সত্য, বলতে শুরু করে। শরীয়তের আলেমগণ যেহেতু বাহ্যিক শব্দ ও বাহ্যিক অবস্থার উপর শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের জিম্মাদার। এ কারণে তাঁরা হাদ্জাজকে ফাঁসী দেয়ার ফাতওয়া জারী করেন। আর আব্বাসী খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর খিলাফত কালে ৭ যিলকদ ৩০৯ হিজরীতে তাঁকে এক হাজার বেদাঘাত করার পর ফাঁসিতে ঝুলানো হয়।

কথিত আছে, তাঁর রক্ত যমীনের যে স্থানে পড়েছে, সে স্থানে আল্লাহ শব্দের নকশা অঙ্কিত হয়ে যায়। কুতুবে রস্বানী হযরত গাউসুল আযম সাইয়্যেদ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যখন হাদ্জাজের এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তখন এমন কেউ ছিলো না যে তাদের হাত ধামিয়ে দেবে। আমি যদি হাদ্জাজের সময় পৃথিবীতে অবস্থান করতাম তাহলে অবশ্যই আমি তাদের হাত ধামিয়ে দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করতাম। কথিত আছে, যখন হাদ্জাজকে ফাঁসিকাঠে ঝুলানো হয়। তখন তাঁর কতিপয় অনুসারী তাঁকে জিজ্ঞেস করে, যারা আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার ফাতওয়া দিয়েছে তাদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? তখন হাদ্জাজ বললেন, তাদের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। তারা জানে যে আমি আল্লাহর ওলী, তাই শরীয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তারা আমার উপর এ শাস্তি আরোপ করেছে। এরূপ কথার কারণে শরীয়তের আদেশ কার্যকর করতে হয়।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার বলেন, আমার ধারণা হলো এই, হাদ্জাজের ব্যাপারে সর্বকথা অবলম্বন করতে হবে। আর তাঁর সম্পর্কে ওই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে, যার প্রতি হযরত সাইয়্যেদ আলী হাজ্বিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যিনি দাতা গণ্ডেববশ নামে খ্যাত। তিনি তাঁর 'কাশফুল মাহজুব' গ্রন্থে ইঙ্গিত করেন, হযরত হাদ্জাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমার অতি প্রিয় ব্যক্তি। কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করা যাবে না। অর্থাৎ হাদ্জাজকে গালি দেয়ার লক্ষ্যস্থল স্থির করা যাবে না। কারণ তিনি অপারগ ছিলেন। আর ওইসব ফিকহবিদ ও আলেমগণকেও গালমন্দ করা যাবে না, যারা শুধু শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শাস্তি প্রয়োগ করেছেন। কারণ যদি এভাবে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে কটর প্রতারক, প্রবৃত্তি পূজারীগণ সরাসরি বলতে শুরু করবে 'আমি আল্লাহ'। যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে শরীয়ত কোথায় থাকবে? আর শরীয়তের মর্যাদা কোথায় থাকবে? দ্বিতীয়তঃ আরো এক বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শরীয়তের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে সমুন্নত। কারণ এটা এমন আমানত, যা হযর সালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতের উপর সোপর্দ করেছেন। তাই উম্মত হলো শরীয়তের রক্ষক, আর শরীয়ত হলো উম্মতের রক্ষক।

ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর শিষ্যদের অভিমত হলো,
مَنْ جَحَدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقُهُ أَوْ رِيَّةُ أَوْ قَالَ: لَيْسَ لِي رَبٌّ فَهُوَ مُرْتَدٌّ.

-যে ব্যক্তি একথা অস্বীকার করে, আল্লাহ তা'আলা তার স্রষ্টা ও তার প্রভু নয়, কিংবা বলে যে, আমার কোনো প্রভু নেই, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

ইবনে কাসিম 'ইবনে হাবীব' গ্রন্থে আর মুহাম্মদ 'আতবীয়া' গ্রন্থে বলেন, যে ব্যক্তি নবুওয়্যাত দাবী করে তাকে তাওবা করাতে হবে। চাই সে প্রকাশ্যে দাবী করুক বা গোপনে দাবী করুক। তার হুকুম হলো মুরতাদের হুকুমের অনুরূপ। সাহনুনসহ ও প্রমুখ আলেমগণ এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এক ইহুদী নবুওয়্যাত দাবী করে, তখন আশহাব বলেন, যদি সে প্রকাশ্যে দাবী করে, তাহলে তাকে তাওবা করাতে হবে, যদি সে তাওবা করে তাহলে ভাল, নতুবা তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

আবু মুহাম্মদ বিন ওবাই বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি অভিসম্পাত করে (নাউযবিলাহ), তারপর বলতে শুরু করে যে, আমার ডুল হয়ে গেছে। মূলতঃ আমি শয়তানের প্রতি অভিসম্পাত করার ইচ্ছা করেছি, তাহলে তাকে এ ধরনের কুফরীর কারণে হত্যা করে ফেলতে হবে। তার কোনো ওজর আপত্তি গ্রহণ করা যাবে না। এটা তাঁর দ্বিতীয় অভিমত অনুযায়ী হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, তার তাওবা কবুল করা যাবে না।

আবুল হাসান কাবিসী নেশাথ্রস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে মাতাল অবস্থায় বলে, اَللّٰهُ اِلٰهٌ اِلٰهٌ 'আমি খোদা, আমি খোদা' তাকে তাওবা করাতে হবে এবং তাওবা করানোর পরও তাকে শাস্তি দিতে হবে। দ্বিতীয়বারও যদি এরূপ বলে, তাহলে তার সাথে ওইরূপ ব্যবহার করতে হবে, যা নাস্তিকের সাথে করা হয়। কারণ এরূপ আচরণ ওইসব লোক করে, যাদের এরূপ করার উদ্দেশ্য হলো শরীয়াতের বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

حُكْمٌ مِّنْ تَعَرَّضَ بِسَاقِطِ قَوْلِهِ وَسَخِيفِ لَفْظِهِ لِحُلَاكِ رِيٍّ دُونَ قَصْدٍ

অনিচ্ছাকৃতভাবে আকাঈদ ও শরীয়তের বিষয়ে ঠাট্টা করার বিধান প্রসঙ্গে

যে ব্যক্তি অযাচিত কথা বলে ও অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করে এবং সে এমন এক স্তরের লোক যার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এরূপ লোকের কথা অর্থহীন মনে করতে হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি এমন কথা বলে যা আল্লাহ জালা জালালুহুর মর্যাদার পরিপন্থী হয়। অথবা এমন কোনো বস্তুর সাথে উপমা দেয় আল্লাহর মর্যাদা যেটার উর্ধ্বে। অথবা কোনো সৃষ্টি জীবের সম্পর্কে এমন কথা বলে যা সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কারো মহিমাম্বিত মর্যাদা না হওয়া চাই। তার এরূপ বলার দ্বারা সে না কুফরীর ইচ্ছা করেছে আর না আল্লাহ তা'আলার সাথে তামাশা করার, আর না সে স্বেচ্ছায় কুফরী ইচ্ছা করে। যদি সে এ ধরনের আচরণ বারবার করতে থাকে এবং তাতে প্রমাণিত হয় যে, সে শাস্ত চিরন্তন দ্বীনের সাথে তামাশা করছে বা স্বীয় প্রভুর সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার ইচ্ছা পোষণ করছে। আর তার এ ধরনের কাজ করার কারণ হলো তার স্বীয় রবের মর্যাদা ও মহানুভবতা সম্পর্কে অজ্ঞতা। তাহলে তার এরূপ আচরণ নিঃসন্দেহে কুফরী আচরণ হবে। অনুরূপ এটাও কুফরী যে, কোনো ব্যক্তি নিজ মুখে এ ধরনের কথা উচ্চারণ করে যা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা পরিপন্থী হিসেবে অবধারিত হয়।

কর্ডোবার ফিকহবিদ ইবনে হাবীব ও আসবাগ বিন খলিল একবার এ ধরনের এক ব্যক্তির হত্যার ব্যাপারে ফতোয়া প্রদান করেন যে, সে আজব এর (কর্ডোবার শাসক আবদুর রহমানের জ্বর) ভাতিজা বলে প্রসিদ্ধ ছিলো। ঘটনা হলো, একদা সে বাহিরে যাচ্ছিল হঠাৎ বৃষ্টি এসে যায়, সে বলতে শুরু করে এ বৃষ্টি তার স্বীয় তুক ফুটো করে দিচ্ছে। তখন কর্ডোবার ফকীহদের মধ্যে সুমানীয়ার অধিবাসী আবু যায়িদ, আবদুল আ'লা বিন ওহাব ও আবান বিন ঈসার মতো লোক ছিলো। তারা তার হত্যার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে বলে যে, সে অর্থহীন কথা বলেছে। এ কারণে তাকে শাস্তি দিতে হবে। আর এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে। সেস্থানের বিচারপতি মুসা বিন যিয়াদ ও এ ফতোয়া দেয়। তখন ইবনে হাবীব বলেন, 'তার রক্ত আমার গর্দানের উপর'। এটা কী করে জায়িয হবে যে, আমরা যে প্রভুর ইবাদত করি তাঁকে গালি দেবে আর আমরা তার প্রতিবাদ করবো না? যদি অবস্থা এরূপ হয় তাহলে আমরা নিকৃষ্ট বান্দা হয়ে যাবো। একথা বলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। ওই মজলিশের সংবাদ উমাইয়া শাসক কর্ডোবার আমীর আবদুর রহমানের নিকট পৌঁছানো হয়। তখন অবস্থা এরূপ হয় যে, আজব ওই ব্যক্তির ফুফু ছিলো। আমীর ফিকহবিদদের মতভেদ অবগত হন। তখন ইবনে

হাবীব ও তার সমর্থকদের অভিমত অনুযায়ী ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে হত্যা করার আদেশ জারী করা হয়। উভয় ফিকহবিদদের সামনে তাকে হত্যা করা হয়। আর বিচারপতিকে বরখাস্ত করা হয়। কারণ সে এ মিথ্যা অপবাদের বিষয়ে অবহেলা করেছে। আর অন্য ফকীহদের এ সম্পর্কে ভৎসনা করে সতর্ক করে দেয়া হয়।

কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তির দ্বারা এ ধরনের নিন্দনীয় কাজ একবার প্রকাশিত হয় বা ঘটনাচক্রে তার মুখ দিয়ে এরূপ কথা উচ্চারিত হয়। যদি তা অপমানজনক না হয়, তাহলে ভাল, নতুবা তাকে তার অভিমতের অর্থ জিজ্ঞেস করতে হবে এবং তার আমল অনুযায়ী তাকে শাস্তি দিতে হবে।

ইবনে কাসিমকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। যে এক ব্যক্তিকে ডাকলো, আর সে উত্তরে বললো যে, **لَيْلِكَ اللَّهُمَّ لَيْلِكَ** অর্থাৎ 'আমি উপস্থিত; হে আমার আল্লাহ! আমি উপস্থিত।' তখন তিনি বললেন, যদি সে মূর্খ হয়, তাহলে সে অজ্ঞতাবশতঃ এরূপ কাজ করেছে। তাই এ বিষয়ে তাকে পাকড়াও করা হবে না। কাযী আবুল ফযল বলেন, এর মর্মার্থ হলো- তাকে হত্যা করা যাবে না। কারণ যেহেতু সে মূর্খ তাই তাকে সতর্ক করে দিতে হবে। আর তাকে শিখিয়ে দিতে হবে যে, এ ধরনের বাক্য আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। আর যদি সে নির্বোধ হয় তাহলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। আর যদি সে আহ্বানকারীকে সত্য মনে করে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ বানিয়ে নেয়। তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে, কারণ তার কথার অর্থ বাস্তবেই এটা।

অনেক নির্বোধ কবি তাদের কাব্যে এরূপ অতিরঞ্জন করেছে। আর তারা আল্লাহ তা'আলাকে অপমান করার অপবাদে অভিযুক্ত হয়েছে। কারণ তারা মহান মর্যাদার অধিকারী রবের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করেনি।

আর এমন অর্থহীন কবিতা রচনা করেছে যে, আমি তাদের অর্থহীন কবিতা আমার গ্রন্থে, আমার মুখে ও আমার কলমে উল্লেখ করা ভাল মনে করি না। যদি কথা এরূপ না হতো, তাহলে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতাম। আর কতিপয় মূর্খ ও বোধহীনদের কবিতায় এমন বক্তব্য এসেছে। যেমন কতক আরবীয়দের কবিতায় এসেছে-

رَبِّ الْعِيَادِ مَا لَنَا وَمَا لَكَ قَدْ كُنْتَ تَسْقِينَا فَمَا بَدَا لَكَ

أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْغَيْثَ لَا أَبَا لَكَ.

-হে বান্দাদের প্রভূ! আমার এবং তোমার কী হয়েছে? তুমি প্রথমে আমাকে পানি পান করাতে। এখন তোমার কী হয়েছে? তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করো, তোমার পিতার মৃত্যু হোক (নাউয়ুবিয়াহ)।

এ ধরনের নির্বোধদের কথা আর ওইসব লোকদের কথা যা শরীয়তের মানদণ্ডে সঠিক নয়। বাস্তবতা হলো, এ ধরনের কথা শুধু নির্বোধ লোকেরা বলতে পারে, কিন্তু এ ধরনের লোকদের শিক্ষা দেয়া ও তাদের সাথে কঠোর আচরণ করা উচিত, যাতে তারা পুনরায় এ ধরনের আচরণ করতে সাহস না করে।

আবু সুলায়মান খাস্তাবী বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃসাহসিক কথা। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের কথা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। আউন ইবনে আবদুল্লাহ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, স্বীয় প্রভুর মহত্বের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য সর্বক্ষেত্রে তাঁর নাম নেয়া যাবে না। এটা উত্তম হবেনা যে, কোনো লোকের একথা বলা, আল্লাহ তা'আলা কুকুরকে নিকৃষ্ট জীব বানিয়েছেন, বা তিনি তার সাথে এমন এমন করেছেন।

আমার ওই শায়খগণ যাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে, তারা শুধু আল্লাহর নাম ওইস্থানে স্মরণ করতেন, যেখানে তাঁর আনুগত্যের উল্লেখ করা হতো। কোনো কোনো শায়খ **جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا** অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক বলার স্থলে বলতেন **جَزَيْتَ خَيْرًا** -তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করা হোক। তারা শুধু আল্লাহ তা'আলার নামের সম্মানার্থে এরূপ করতেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ ছিলো, যখন আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য উদ্দেশ্য না হতো তখন তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতেন না।

আমার নিকট এক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, ইমাম আবু বকর শা'শী কালাম শাস্ত্রবিদদের কথার প্রতিবাদ করে বলতেন, তারা আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে অত্যাধিক বিচার-বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছে, আর আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী সম্পর্কে অতিমাত্রায় আলোচনা করছে, অথচ এরূপ করা তাদের উচিত হয়নি। কারণ এ ধরনের আচরণ আল্লাহ তা'আলার মর্যাদার পরিপন্থি। আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব পরাক্রমশালীতার প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক। তিনি বলেন, কালামশাস্ত্রবিদরা আল্লাহ তা'আলাকে হাতের রুমালের অনুরূপ করে দিয়েছে, অর্থাৎ যেভাবে রুমাল ব্যবহার করা হয়, ঠিক সেভাবে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করছে।

এ বিষয় আলোচনা করার সময় ওই অনুমানে আলোচনা করতে হবে, যা পূর্বে হযুর সালাহুদ্দীন আল্লাহি ওয়াসাল্লামের শানে অসৌজন্যমূলক আচরণ সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ওই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আল্লাহ তা'আলাই তাওফীক দাতা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

حُكْمُ سَبِّ بَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ

সম্মানিত নবীগণ ও ফিরিশতকুলের প্রতি গালমন্দের বিধান প্রসঙ্গে
যে ব্যক্তি আশিয়ায়ে কেরাম ও ফিরিশতাদের শানে বে'আদবী করে বা তাঁদের
অপমান করে বা তাঁদের আনীত বিধি-বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন বা অস্বীকার করে,
এর হুকুম হলো হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার
হুকুমের অনুরূপ। আমি এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি। আল্লাহ তা'আলা
ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ
اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ حَقًّا ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٢﴾

-আর নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অমান্য করে আর চায়
যে, আল্লাহ থেকে রাসূলগণকে পৃথক করে নেবে। আর বলে, আমরা
কতকের উপর ঈমান আনি এবং কতকে অস্বীকার করি। আর এটা
চায় যে, ঈমান ও কুফরের মাঝখানে অন্য একটা পথ বের করে নেবে।
এরাই হচ্ছে সত্যি সত্যি কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।^১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلِ سَبَاطٍ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ
لَهُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿٢﴾

^১. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১৫০-১৫১।

-এভাবে আরম্ভ করো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং
সেটারই উপর, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা অবতারণ
করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর
বংশধরদের উপর। আর (সেটার উপরও) যা দান করা হয়েছে মুসা ও
ঈসাকে এবং যা দান করা হয়েছে অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের রবের পক্ষ
থেকে। আমরা তাঁদের কারো উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে পার্থক্য করি না
এবং আমরা আল্লাহর সামনে ঘাড় অবনত রেখেছি।^১

আরো ইরশাদ হয়েছে-

كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ

-সবাই মান্য করেছে, আল্লাহ তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং
তাঁর রাসূলগণকে এ কথা বলে যে, আমরা তাঁর কোনো রাসূলের উপর
ঈমান আনয়নে তারতম্য করি না।^২

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি "ইবনে হাবীব" ও "মুহাম্মদ" গ্রন্থদ্বয়ে এবং
ইবনে কাশিম ইবনে আল মাজশুন, ইবনে আবদুল হাকাম, আসবাগ ও সাহনুন
ওই ব্যক্তি সম্পর্কে ফাতওয়া দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আশিয়ায়ে কেরাম বা তাঁদের
মধ্যে যে-কোনো একজনকে গাল-মন্দ কিংবা মর্যাদাহানি করে তাকে হত্যা করে
ফেলতে হবে, যদি যিম্মীদের কেউ তাদেরকে গালি দেয় তবে মুসলমান না হলে
তাকে হত্যা করতে হবে।

সাহনুন ইবনে কাসেমের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, ইহুদী বা খ্রিষ্টান যদি
আশিয়ায়ে কেরামের শানে অকারণে বে'আদবী করে তবে তাকে হত্যা করে
ফেলতে হবে যদি সে মুসলমান না হয়। এ বিষয়ে যে মতভেদ রয়েছে তা পূর্বে
উল্লেখ করা হয়েছে।

কর্ডোবার বিচারক সাঈদ বিন সুলায়মান তাঁর কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তরে
বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফিরিশতাদের শানে বে'আদবী করে
তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

^১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৩৬।

^২. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:২৮৫।

সাহনুন বলেছেন, যে ব্যক্তি ফিরিশতাদের মধ্যে যে-কোনো একজনকে গাল-মন্দ করবে, তাকে হত্যা করতে হবে।

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে ‘আন- নাওয়াদির’ গ্রন্থে বর্ণিত, যে ব্যক্তি একথা বলে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ওহী আনয়নের ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। মূলতঃ ওহী নিয়ে আসা উচিত ছিলো হযরত আলী রাহিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর নিকট। কারণ তিনি নবী ছিলেন। তাহলে ওই ব্যক্তিকে তাওবা করার নির্দেশ দিতে হবে। যদি সে তাওবা করে তাহলে ভাল নতুবা তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

এরূপ বর্ণনা হযরত সাহনুন থেকেও বর্ণিত আছে। এটা মূলতঃ রাফিজী মতাবলম্বীদের গারাবীয়া উপদলের অভিমত। তাদেরকে গারাবীয়া বলার কারণ হলো, তাদের আকীদা হলো, হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাহিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর পুরোপুরি সদৃশ ছিলেন, যেমনটি একটি কাক অন্য কাকের সদৃশ হয়ে থাকে (নাউয়ল্লাহ)।

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর সহচরবৃন্দের অভিমত হলো, যে ব্যক্তি আশিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে কোনো নবীকে অবিশ্বাস করে, বা তাঁদের মর্যাদাহানি করে বা কোনো নবী সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

কাযী আবুল হাসান কাবিসীর তাঁর ফাতওয়ায় বলেন, যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তোমার মুখমণ্ডল ফিরিশতার চেহারার মতো ক্রুদ্ধ। যদি সে তার ওই কথায় ফিরিশতার নিন্দা করার ইচ্ছা করে, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

কাযী আবুল ফযল আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ সব বিধান ওই ব্যক্তির সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সার্বিকভাবে সমস্ত নবীগণ ও ফিরিশতা আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে অশোভনীয় কথা বলে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা কিতাবে স্পষ্ট বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, অথবা প্রসিদ্ধ ও ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে তাদের নবুওয়াত ও মালাকীয়াতের বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন হযরত জিবরাঈল, হযরত মিকাইল, মালিক, জান্নাত ও জাহান্নামের দারোগা, যবানীয়া, আরশবহনকারী প্রমুখ ফিরিশতা আলাইহিমুস সালাম, যাদের বিবরণ কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে বা ওইসব আশিয়া আলাইহিমুস সালাম যাদের নাম কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ হযরত আজরাঈল, ইসরাঈল, রিদওয়ান, কিরামান-কাতিবীন, মুনকার-নাকীর

আলাইহিমুস সালাম তাঁদের অস্তিত্বের বিবরণের খবর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ওইসব ফিরিশতা বা নবী যাদের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি যে, তাঁরা ফিরিশতা বা নবী ছিলেন, যেমন হারুত-মারুতের ফিরিশতা হওয়া বা খিযির, লোকমান, যুলকারনাইন, মরিয়ম, আছিয়া ও খালিদ বিন সিনান যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁরা মিসরবাসীদের প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। আর অগ্নিউপাসক ও ঐতিহাসিকগণ যাদের নবী বলে জোর প্রচার করেছে। তাদের শানে অসৌজন্যমূলক আচরণকারীদের সম্পর্কে এ আদেশ কার্যকর হবে না, অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। কারণ আশিয়ায়ে কেরাম যে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছেন, তারা সে সম্মানের অধিকারী হননি। যেসব আশিয়ায়ে কেরাম ও ফিরিশতাদের কথা কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, বা যাদের নবুওয়াত ইজমার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তবে যদি কোনো ব্যক্তি তাদের প্রতি মর্যাদাহানি করে কিংবা তাঁদের কষ্ট দেয়, তাহলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। আর শাস্তি দানের ব্যাপারে তাদের মর্যাদার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিশেষ করে ওইসব বরণ্য ব্যক্তি যাদের সত্যতা, সততা ও বুজুর্গী প্রমাণিত হয়েছে।

যদি কোনো লোক ওই হযরতগণের নবুওয়াত অস্বীকার করে, বা তাঁদেরকে ফিরিশতাদের মধ্যে গণ্য না করে, তাহলে দেখতে হবে উক্তিকারী লোক কী ধরনের? যদি সে জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে ক্ষতির কোনো কারণ নেই। কারণ এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। আর যদি সে সাধারণ লোক হয়, তাহলে এ ধরনের কথা বলার কারণে তাকে সতর্ক করে দিতে হবে। যদি সে অস্বীকারকারী হয়, তাহলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। কারণ ওই বিষয়সমূহে সাধারণ লোকের কথা বলার কোনো অধিকার নেই। আর পূর্ববর্তী মনীষীগণ ওই বিষয়সমূহ আলোচনা করা অপছন্দ করেছেন। আর সাধারণ লোকদেরতো তা আলোচনার প্রশ্নই আসতে পারে না।

নবম পরিচ্ছেদ الْحُكْمُ بِالنُّسْبَةِ لِلْقُرْآنِ

কুরআন মাজীদ অবমাননার বিধান প্রসঙ্গে

যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ, এর পাণ্ডুলিপি, বা এর কোনো অংশের অবমাননা করে, বা এ সম্পর্কে অনর্থক কোনো কথা বলে, বা অস্বীকার করে বা এর যে-কোনো একটি বর্ণ বা বাক্যকে অস্বীকার করে, বা কুরআন মাজীদকে ভ্রান্ত বলে, বা কুরআন মাজীদের যে-কোনো বিষয়কে অবিশ্বাস করে, বা কুরআন মাজীদের স্পষ্ট কোনো আদেশ বা খবর অবিশ্বাস করে; বা যেসব বিষয় কুরআন মাজীদে নিষেধ করা হয়েছে, সে সব বিষয় বা কুরআন মাজীদের দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয়কে অবিশ্বাস করে- যদি স্বেচ্ছায় ওইসব করে বা কুরআন মাজীদের যে কোনো বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে আলেমগণের ইজমা অনুযায়ী সে কাফির হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ

حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿١٧﴾

-সেটার প্রতি মিথ্যার রাহা নেই, না সেটার অর্থ থেকে না পশ্চাত থেকে, নাযিলকৃত প্রজ্ঞাময়, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিতের।^১

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

-কুরআন মাজীদ সম্পর্কে সন্দেহ ও ঝগড়া করা কুফরী।^২

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ جَعَلَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ حَلَّ صَرْبُ عُنُقِهِ.

^১ আল কুরআন : সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৪২।

^২ ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবুন নাহী আনিল জিদাল, ১২:২০৫, হাদিস নং : ৩৯৮৭।

খ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ইলম, পৃ. ৫১, হাদিস নং : ২৩৬।

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৬:১৮৯, হাদিস নং : ৭৬৪৮।

-যে মুসলমান কিতাবুল্লাহর কোনো আয়াত অস্বীকার করে, তার শিরোচ্ছেদ করা বৈধ হবে।^১

অনুরূপ যে ব্যক্তি তাওরাত ইঞ্জিল বা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যে কোনো কিতাব অস্বীকার করে, ওইগুলোর প্রতি অভিসম্পাত করে, ওইগুলোকে গাল-মন্দ করে কিংবা ওইগুলোকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে বিশ্ব মুসলিমের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ যা পৃথিবীর সর্বস্থানে প্রতি মুহূর্তে পাঠ করা হয়। আর তা গ্রন্থকারে বিশ্ব মুসলিমের হাতে বিদ্যমান রয়েছে। যা দু'টি সীমা তথা 'আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'- থেকে শুরু হয়ে 'মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস' এ সমাপ্ত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার বাণী। আর আল্লাহ তা'আলার ওই ওহি যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে যা কিছু রয়েছে তার সবই সত্য ও হক। তাই যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এর কোন বর্ণ বিলুপ্ত করবে, বা নিজের পক্ষ থেকে কোন বর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে বর্ণ বৃদ্ধি করে দেবে, যা লিখিত কুরআন মাজীদে বিদ্যমান নেই, এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এটা কুরআন মাজীদের অংশ নয়, তাহলে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যাবে।

একারণে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা শানে কটুক্তিকারী ও মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে হত্যা করার আদেশ দান করেছেন। কারণ সে স্বীয় আমলের দ্বারা কুরআন মাজীদে মিথ্যারোপ করেছে। সুতরাং এ ধরনের লোককে হত্যা করা ওয়াজিব।

ইবনে কাসিম বলেন, যে ব্যক্তি একথা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে কথা বলেননি, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আবদুর রহমান বিন মাহদীও এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মুহাম্মদ বিন সাহনুন বলেন, যে ব্যক্তি 'মু'আভিয়াতাইন' বা সূরা 'ফালাক' ও 'নাসকে' কুরআনের অংশ নয় বলে, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে, যতক্ষণ না সে তাওবা করে। অনুরূপ যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের কোন বর্ণ অস্বীকার করে বা অবিশ্বাস করে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। অনুরূপ যদি এক সাক্ষী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যে, এ ব্যক্তি বলেছে - আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা

^১ ক) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ইক্বামাতিল হুদুদ, ৭:৪৩২, হাদিস নং : ২৫৩০।

খ) ইবনে আদী : আল কামেল, ২:৩৮৬।

আলাইহিস্ সালামের সাথে কথা বলেননি। আর সাক্ষী একথা বলছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে খলীল মনোনীত করেননি। তাহলে তাদের উভয়কে হত্যা করা ওয়াজিব। কারণ তারা উভয়ে হযরত মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

আবু ওসমান হাদ্দাদ বলেন, একত্ববাদে বিশ্বাসী সকলে এ বিষয় ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, কুরআন মাজীদে একটি হরফ অস্বীকার করাও কুফরী। আবুল আলীয়ার সতর্কতার নমুনা এমন ছিলো যে, যদি কেউ তার নিকট কুরআন পাঠ করতো, আর সে কুরআনের আয়াত অশুদ্ধ পাঠ করতো। তিনি তাকে একথা বলতেন না যে, তুমি যেভাবে পড়ছো সেভাবে নয়। বরং তিনি বলতেন, আমি এভাবে পাঠ করি অর্থাৎ তিনি সহীহ শুদ্ধভাবে পাঠ করে দেখিয়ে দিতেন। ইবরাহীম নখরী যখন এ বিষয় জানতে পারেন, তখন তিনি বললেন, মূলকথা হলো, তিনি জানতেন যদি কেউ কুরআন মাজীদে একটি হরফও অস্বীকার করল, সে যেন সম্পূর্ণ কুর'আনকে অস্বীকার করল।

আসবাগ ইবনুল ফারাজ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো সে যেনো সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। আর যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, সে যেন এটাকে অস্বীকার করলো, আর যে এটাকে অস্বীকার করলো সে আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফরী করলো।

কাবিসীকে এক ইহুদীর সাথে ঝগড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে অপর ব্যক্তি বললো, ওই ইহুদি তাওরাতের শপথ করে বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাওরাতের প্রতি অভিসম্পাত করুন (নাউযুবিল্লাহ)। এক ব্যক্তি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, আমি তো ইহুদীর তাওরাতের প্রতি অভিসম্পাত করেছি। তখন আবুল হাসান কাবিসী বলেন, এক সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে হত্যা করার ফয়সালা করা যাবে না। আর এ বিষয়ে সে যা বলছে তাতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্যই, সম্ভবতঃ সে ইহুদীদের এমন কোনো কিতাব যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যার উপর আমল করা কার্যকর মনে করে না, কারণ এ কিতাবে পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয়েছে। তবে যদি দুইজন সাক্ষী এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয় যে, সে সম্পূর্ণভাবে তাওরাতের প্রতি অভিসম্পাত করেছে, তাহলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোনো অবকাশ নেই।

বাগদাদের বিখ্যাত ফকীহ ইবনে মুজাহিদ যিনি প্রসিদ্ধ ক্বারী ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, ক্বারী ইবনে শানবুজ বাগদাদের ক্বারীদের ইমাম ছিলো, তাকে তাওবা করাতে হবে। কারণ তিনি এক অপ্রসিদ্ধ হরফে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে, যা কুরআন মাজীদে নেই। সকলে মিলে তার নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নেয় যে, তাকে তার এ মত থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাওবা করাতে হবে। তিনি তখন বাগদাদের গভর্নর আবু আলীর উপস্থিতিতে ৩২৩ হিজরীতে স্বীয় ভুলের অস্বীকার করে লিখিত অস্বীকারনামায় লিপিবদ্ধ করে দেয়। তাকে তাওবা করানোর ফাতওয়া দাতাদের মধ্যে আবু বকর আবহারী প্রমুখও ছিলেন।

আবু মুহাম্মদ ইবনে আবী যায়িদ ওই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার ফাতওয়া দেয় যে ব্যক্তি এক বালককে বলেছে, যে ব্যক্তি তোমাকে শিক্ষা দেয় আর তুমি যাহা কিছু শিক্ষা করেছো উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত। ওই লোক বললো, আমার উদ্দেশ্য ছিলো, ওই বালকের বে'আদবী। আমি কুরআন মাজীদে সাথে বে'আদবী করার ইচ্ছা করিনি। তখন আবু মুহাম্মদ বললেন, যে-কোনো অবস্থায় বে'আদবী করো না কেন, যখন কেউ কুরআন মাজীদে প্রতি অভিসম্পাত করবে, তখন তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

দশম পরিচ্ছেদ

الْحُكْمُ فِي سَبِّ آلِ الْبَيْتِ وَالْأَزْوَاجِ وَالْأَصْحَابِ

হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি গালমন্দের বিধান

প্রসঙ্গে

হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আহলে বায়ত, তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ ও সাহাবীদের অবমাননা করা, তাঁদের দোষ-ত্রুটি প্রচার করা সম্পূর্ণ হারাম। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে অভিশপ্ত।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبُحِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبُغِضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

-তোমরা আমার সাহাবাগণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। সাবধান! আমার পরে তোমরা তাঁদের লক্ষ্যবস্তু (সমালোচনার পাত্র) বানিয়ে না। কারণ যারা তাঁদের ভালবাসলো, তারা আমাকে ভালবাসলো। আর যারা তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করলো। মূলতঃ তারা আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করলো। আর যারা তাঁদের কষ্ট দিলো তারা মূলতঃ আমাকে কষ্ট দিলো। আর যে আমাকে কষ্ট দিলো, সে আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিলো। অচিরেই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।^১

হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَذْلًا.

-তোমরা আমার সাহাবাদের গালমন্দ করো না। তাঁদেরকে যারা গালি দিলো তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা, তাঁর সকল ফিরিশতা ও -মানবকুলের অভিসম্পাত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা না তাদের দোয়া কবুল করবেন, আর না কোন ন্যায়কর্ম।^২

হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَإِنَّهُ يَجِيءُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَلَا تَصَلُّوا عَلَيْهِمْ، وَلَا تَصَلُّوا مَعَهُمْ، وَلَا تُنَاجِسُوهُمْ، وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، وَإِنْ مَرَضُوا فَلَا تُعَوِّدُوهُمْ.

-তোমরা আমার সাহাবাদের গালমন্দ করো না, কেননা শেষযুগে এমন কিছু লোকের উদ্ভব হবে, যারা আমার সাহাবাদের গালি দেবে। তোমরা তাদের জানাযার নামায পড়বে না, না তাদের সাথে জামাতে নামায আদায় করবে, না তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, না তাদের সাথে উঠাবসা করবে, না তারা অসুস্থ হলে সেবা-শুশ্রূষা করবে।^৩

হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَاضْرِبُوهُ.

-যে আমার সাহাবাদের গালমন্দ করবে, তোমরা তাকে প্রহার করো।^৪

বস্তুত হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও জানিয়ে দিলেন, সাহাবায়ে কেবলমাত্র গালমন্দ করা ও তাঁদের কষ্ট দেয়া হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ারই নামান্তর, যা হারাম বা নিষিদ্ধ।

হযরত সালাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

لَا تُؤْذُوا أَصْحَابِي، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي.

-তোমরা আমার সাহাবাদের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়ো না, যারা তাঁদের কষ্ট দেয় তারা যেন আমাকে কষ্ট দেয়।^৫

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ লা ওসীয়াত লিওয়াল্লিহ, ৭:৪৯২, হাদিস নং : ২০৪৭।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু মান কতাল বিহিজরিন, ১৪:৪৩৬, হাদিস নং : ৪৭০১।

১. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবদিল্লাহ ইবনে ওমর, ১২:৩৪১, হাদিস নং : ৫৮০৪।

২. তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী মান সাব্বা আসহাবিন নবী, ১২:৩৬৩, হাদিস নং : ৩৭৯৭।

৩. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মা ইয়াকরাহু মিনাত্ তামুক, ২২:২৭০, হাদিস নং : ৬৭৫৬।

খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আক লা ওসীয়াত লিওয়াল্লিহ, ৭:৪৯২, হাদিস নং : ২০৪৭।

গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু মান কতাল বিহিজরিন, ১৪:৪৩৬, হাদিস নং : ৪৭০১।

১. তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী মান সাব্বা আসহাবিন নবী, ১২:৩৬৩, হাদিস নং : ৩৭৯৭।

২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মা ইয়াকরাহু মিনাত্ তামুক, ২২:২৭০, হাদিস নং : ৬৭৫৬।

অনুরূপ হযুর সালাহুদ্দাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

لَا تُؤْذُونِي فِي عَائِشَةَ.

-আয়েশার ব্যাপারে (অযাচিত কথা বলে) আমাকে কষ্ট দেবে না।^১

অনুরূপ হযুর সালাহুদ্দাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সম্পর্কেও ইরশাদ করেন,

بُضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِنِي مَا آذَاهَا.

-ফাতেমা আমার দেহের অংশ। যে তাঁকে কষ্ট দিলো, সে যেনো আমাকে কষ্ট দিলো।^২

সাহাবায়ে কেরামকে গালি দানকারীর বিধান সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, এ ধরনের লোককে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই কথাও বলেন, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -যে ব্যক্তি হযুর সালাহুদ্দাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে, আর যারা তাঁর সাহাবাদের গালি দেবে তাদের কঠোরভাবে সতর্ক করে দিতে হবে।

তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি হযুর সালাহুদ্দাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে যে-কোনো এক সাহাবাকে গালি দেবে, বা এরূপ বলবে যে, হযরত আবু বকর, উমর, ওসমান, মুয়াবিয়া, আমর বিন আস রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রমুখ কুফর ও ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ), এ ধরনের লোকদের হত্যা করে ফেলতে হবে। যদি এ ধরনের কথা না বলে, কেবল তাদের সম্পর্কে এ কথা বলে গালমন্দ করে যেমন সাধারণ লোককে করা হয়, তখন তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

ইবনে হাবীব বলেন, কটর শিয়াপন্থীদের মধ্যে অনেকে হযরত ওসমান রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে, তাঁর সম্পর্কে অনেক খারাপ মন্তব্য করে। এ ধরনের লোকদের কঠোর শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অনুরূপ

^১. তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী মান সাক্বা আসহাবিন্ নবী, ১২:৩৬৩, হাদিস নং : ৩৭৯৭।

^২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ৩৭১৪, ৩৭২৯, ৩৭৬৭, ৫২৩০।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ২৪৪৯।

যারা হযরত আবু বকর ও উমর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে, তাদেরকেও কঠোর শাস্তি দিতে হবে। তাদেরকে ক্রমাগত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং মৃত্যু অবধি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে হবে। তবে হযুর সালাহুদ্দাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি না দেয়া ছাড়া হত্যা করা যাবে না।

সাহনুন বলেন, যে ব্যক্তি হযুর সালাহুদ্দাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণের মধ্যে কোনো এক সাহাবীকে কাফির বলবে, চাই হযরত আলী, ওসমান রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বা অন্য কোনো সাহাবী হোক, তাকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

ইবনে আবু যায়িদ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাহনুনের এ অভিমত উদ্ধৃত করে বলেন, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম সম্পর্কে বলবে যে, তারা সকলে ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ), তবে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো সাহাবী সম্পর্কে এরূপ উক্তি করবে, তাকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে একথা বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে গালি দেবে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে। আর যে ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে গালি দেবে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। ইমাম মালিক রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয় কী কারণে এরূপ করতে হবে? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন,

مَنْ رَمَاهَا فَقَدْ خَالَفَ الْقُرْآنَ.

-কারণ যে ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, সে কুরআন মাজীদে বিরোধিতা করেছে।^১

ইবনে শাবান ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই অভিমত উদ্ধৃত করে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

-আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, তবে কখনো তোমরা এরূপ বলোনা যদি তোমরা ঈমান রাখো।^২

^১. তাবহিরাতুল হকাম : ১:২ পৃষ্ঠা : ৩৩১।

^২. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:১৭।

(৬১৪)

সুতরাং যদি তোমরা দ্বিতীয়বার এ ধরনের কথা বলো, তাহলে কাফির হবে এবং হত্যা ওয়াজিব হবে।

আবুল হাসান সাকাল্লী থেকে বর্ণিত, কাযী আবু বকর বিন আততায়িব বলেন, মুশরিকরা যে বস্তকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত করেছে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে সেই বস্তর কথা উল্লেখ করে স্বীয় পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে—

وَقَالُوا آتَخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَهُ ۚ

—আর তারা বললো, পরম দয়াময় পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন। পবিত্র তিনিই।^১

আল্লাহ তা'আলা ওইসব বিষয় থেকে পবিত্র। এ ধরনের কথা অনেক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে। অনুরূপ মুনাফিকরা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা প্রতি মিথ্যা কলঙ্কের কালিমা লেপন করেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا

سُبْحَنَكَ هَذَا بَيِّنٌ عَظِيمٌ

—আর কেন এমন হলো না যখন তোমরা শ্রবণ করেছিলে তখন একথা বলতে, আমাদের জন্য শোভা পায়না এমন কথা বলা। হে আল্লাহ! তোমারই পবিত্রতা! এটাতো গুরুতর অপবাদ।^২

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মন্দ বলার কারণে অসম্ভবতার ভাব প্রকাশ করে নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। এর দ্বারা মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমতের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে গালি দেয়ার শাস্তি হত্যা নির্ধারণ করেছেন। এর মর্মার্থ হলো, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে গালি দেয়া আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেকে গালি দেয়া স্থির করেছেন।^৩ সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অনুরূপ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু

^১ আল কুরআন : সূরা আযিয়া, ২১:২৬।

^২ আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:১৬।

^৩ সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অনুরূপ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে গালি দেওয়ার শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড।

তা'আলা আনহাকে গালি দেয়ার শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে গালি দেয়া হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়ার সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি বা কষ্ট দিলো, সে যেনো আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিলো। আর আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যা আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

এক ব্যক্তি কুফা নগরীতে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে গালি দেয়। এ মোকদ্দমা মুসা বিন ইসা আব্বাসীর সামনে পেশ করা হয়, তখন মুসা জিজ্ঞেস করেন, তাকে গালি দিতে শুনেছে কে? তখন ইবনে আবু লায়লা বললো, আমি শুনেছি। তখন গালি দাতাকে আশি বেত্রাঘাত করে মাথা মুণ্ডানোর জন্য নাপিতের হাতে সোপর্দ করা হয়।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি ওবায়দুল্লাহ বিন আমরের জিহ্বা কেটে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। কারণ সে হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে গালি দিয়েছিলো। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, অপেক্ষা করো আমি তার জিহ্বা কেটে দেবো। যাতে তারপর আর কেউ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবাকে গালি দেয়ার দুঃসাহস না করে।

আবু যর হারবী থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সকাশে এক বেদুইনকে উপস্থিত করা হয়, সে আনসারদের নিয়ে বিদ্রূপ করতো। তখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যদি সে সাহাবী না হতো, তাহলে আমি তোমাদের নিকট থেকে তার দায়িত্বভার বুঝে নিয়ে তার প্রাণনাশ করতাম।

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যে ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাকে মন্দ বলবে, গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তার কোন অংশ থাকবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তিন শ্রেণির লোকের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তন্মধ্যে এক প্রকার হলো অসহায় মুহাজিরগণ তাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُّونَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ

-ওইসব দরিদ্র হিজরতকারীদের জন্য যাদেরকে আপন গৃহ সম্পদ থেকে উৎখাত করা হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সমৃদ্ধি চায় এবং ও রাসুলের সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী।^১

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

-আর যারা প্রথম থেকে এ শহর ও ঈমানের মধ্যে গৃহ নির্মাণ করেছে। তারা ভালবাসে তাদেরকে, যারা তাদের প্রতি হিজরত করে গেছে এবং নিজেদের অন্তরগুলোর মধ্যে কোনো প্রয়োজন খুঁজে পায় না ওই বস্তুর, যা তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে এবং নিজেদের প্রাণের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দেয়। যদিও তাদের অভাব অত্যন্ত প্রকট হয়।^২

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

-আর ওইসব লোক যারা তাদের পরে এসেছে তারা আরয় করে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের ভাইদেরকেও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমাদারদের দিক থেকে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় তুমিই দয়ালু, দয়াময়।^৩

পূর্বে আমি উল্লেখ করেছি, যারা তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে তাদের মুসলমানদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদে কোনো অংশে নেই।

‘ইবনে শা‘বান’ গ্রন্থে বর্ণিত, যে ব্যক্তি তাঁদের মধ্যে যে কোন একজন সম্পর্কে বলবে যে, সে ব্যক্তির পুত্র অথচ তার মা মুসলমান ছিলো, তাহলে আমাদের

^১. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:৮।

^২. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:৯।

^৩. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:১০।

আলেমগণের অভিমত হলো, তার উপর দু'ধরণের শাস্তি কার্যকর করতে হবে, একটি শাস্তি কার্যকর করতে হবে ব্যক্তিকে গালি দেয়ায়, অপরটি তাঁর মাকে গালি দেয়ার কারণে। তার হুকুম ওই ব্যক্তির হুকুমের মতো হবে না, যে এক বাক্যে একদল লোককে গালি দেয়। কারণ তখন তার উপর কেবল একজনেরই শাস্তি কার্যকর হয়। আর যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম অন্যান্য লোকদের মধ্যে অত্যাধিক মর্যাদার অধিকারী। এ কারণে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَأَجِلِدُوهُ.

-যে ব্যক্তি আমার সাহাবাকে গালি দেবে তাকে বেজাঘাত করো।^১

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

وَمَنْ قَذَفَ أُمَّ أَحَدِهِمْ وَهِيَ كَافِرَةٌ حُدَّ حَدُّ الْفِرْيَةِ لِأَنَّهُ سَبَّ لَهَا.

-যে ব্যক্তি সাহাবাদের মাতাপিতাকে মিথ্যা অপবাদ দেবে যদিও তারা কাফির, তবুও তার উপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তি কার্যকর করতে হবে। কারণ তাতে সে সাহাবীদের গালি দিয়েছে।

সুতরাং যদি সাহাবীর কোনো উত্তরাধিকারী জীবিত থাকে, তাহলে সে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি দাবি করবে। আর যদি কোনো উত্তরাধিকারী জীবিত না থাকে তাহলে যিনি মুসলমানদের নেতা হবেন, তিনি এ শাস্তি কার্যকর করবেন। আর ইমামের কর্তব্য হলো এ ফরয দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। সাহাবীর ব্যাপারে যে বিধান অসাহাবীর ব্যাপারে অনুরূপ বিধান হবে না। কারণ সাহাবায়ে কেরাম হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সাহচর্য লাভ করার মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। এটা এক বিশেষ মর্যাদা। যদি কোনো শাসক কোনো ব্যক্তিকে সাহাবী বা তার মাতা-পিতার শানে অনর্থক কথা বলতে শুনে, বা এর সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে শাসকের কর্তব্য হলো ওই শাস্তি কার্যকর করা।

হযরত আয়েশা রাহিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত অন্যকোন উম্মুহাতুল মু‘মিনীনকে গাল-মন্দ করবে তার বিধান সম্পর্কে দুইটি মত রয়েছে।

এক. তাকে হত্যা করে ফেলাতে হবে, কারণ সে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূণ্যবতী স্ত্রীকে গালি দিয়েছে, যা মূলত হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়ার নামান্তর।

^১. ফাওয়ায়িদুত তাওয়াম : আহাদীছু জামি‘য়া ইবনে ছাওব আর রাহবি, ১:২৯৫ হাদীস: ৭৪১।

দুই. অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের মতো তার উপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তি কার্যকর করতে হবে।

আবু মুস'আব মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন, যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কোনো ব্যক্তিকে গালি দেয়, যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে তাকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে, তার শাস্তির কথা ব্যাপক আকারে প্রচার করতে হবে, সে তাওবা না করা পর্যন্ত তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখতে হবে। কারণ সে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ভুলুষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে।

মালেকী ফকীহ আবু যুতাররিফ শা'বীর নিকট ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যে বিচারককে রাতে এক মহিলাকে শপথ দেওয়ার কথা বলে যে, যদি সে হযরত আবু বকর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কন্যাও হতো, তাহলেও আমি তাকে রাতে শপথ করাতাম না। বরং তাকে দিনে শপথ করাতাম। কোনো কোনো ফকীহ তার এ অভিমত সঠিক বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু আবু যুতাররিফ বলেন, সে হযরত আবু বকর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কন্যা সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলেছে, তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া জরুরী এবং তাকে দীর্ঘদিন কারাগারে বন্দী করে রাখতে হবে। আর যে ফকীহ তার অভিমত সঠিক বলেছে, তাকে ফকীহ বলার চেয়ে ফাসিক বলা অধিক যুক্তিসংগত। একবার জোর প্রচারের প্রয়োজন এবং তাকে বিশেষভাবে সতর্ক করা উচিত। বরং আগামী দিনে তার ফতোয়া গ্রহণ না করা উচিত, আর না তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত হবে। এটি স্বীকৃত অপরাধ, এ ধরনের লোকদের সাথে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে শত্রুতা পোষণ করতে হবে।

আবু ইমরান এ ধরনের এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তি একথা বলে যে, “যদি আমার বিরুদ্ধে হযরত সিদ্দীক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও সাক্ষ্য দেন তাহলে তাঁর সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না।” যদি তার এ কথার মর্মার্থ হয় যে, এই মোকাদ্দমায় এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় (চাই সেই সাক্ষী হযরত আবু বকর রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হোক না কেনো) তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে ক্ষতি কোনো কারণ নেই। কিন্তু যদি এছাড়া তার অন্য উদ্দেশ্য হয় (অর্থাৎ যদি সে অপমান করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের কথা বলে থাকে) তাহলে তাকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া পর্যন্ত প্রহার করতে হবে। আলেমগণ উক্ত অভিমত বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

কাযী আবুল ফযল আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি এ পর্যন্ত যা লিপিবদ্ধ করেছি, তা হলো সর্বশেষ অভিমত। আল্লাহর ইচ্ছায় আমার সে উদ্দেশ্য

সফল হয়েছে। আর আমি যে শর্তারোপ করেছি তাও পূর্ণ হয়েছে। আশা করা যায়, আমার এ গ্রন্থে লিখিত প্রতিটি পাঠ জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য উপদেশ হবে এবং প্রতিটি পাঠে পাঠক প্রয়োজনীয় পথের সন্ধান লাভ করবে। আমি এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি যা নিঃসন্দেহে নির্ভুল ও যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। আমি প্রতিটি বিষয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি। যার ফলে আমার পূর্বে রচিত গ্রন্থসমূহে এ ধরনের তথ্য ও তত্ত্বের সমারোহ ঘটেনি। গ্রন্থটিকে আমি একাধিক অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি, যাতে এ ধরনের কোনো লেখক পেয়ে যাই, যিনি আমার পূর্বে ওইসব বিষয় ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছেন। বা তিনি এমন খ্যাতি লাভ করেছেন, যার দ্বারা আমি উপকৃত হবো, বা তার মৌখিক ভাষণ শুনে আমি তা লিপিবদ্ধ করতে পারি। তবে আমার জানা মতে, আমি ওই ধরনের অভিজ্ঞ কোনো লোকের সন্ধান পাইনি। তাই আমি মনে করি এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। আমি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ করি, তিনি যেনো আমার এই পরিশ্রমকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম বানিয়ে দেন, আর আমার ভুল-ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন। আমি আমার এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে যা লিপিবদ্ধ করেছি, তা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ তা'আলার ওহীর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। আমার আশ্বিযুগল শুধু তাঁর মহিমাম্বিত ফযিলত অনুসন্ধানে জাহ্নত রয়েছে। যাতে আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী পরিপূর্ণভাবে বিশ্ব মুসলিমের সামনে উপস্থাপন করতে পারি। মহান আল্লাহ তা'আলা আমি অধমের নশ্বর এ দেহকে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুন থেকে রক্ষা করুন, কারণ আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য রক্ষায় সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। অবশেষে আমি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে আকুল আবেদন করছি যে, তিনি যেন আমাকে কিয়ামতের বিভীষিকায় হাউজে কাউসার থেকে দূরে সরিয়ে না দেন। আর আল্লাহ তা'আলা যেনো আমার এ ক্ষুদ্র গ্রন্থকে বিশ্ব মুসলিম সকলের নিকট পৌছানোর যথাযথ ব্যবস্থা করেন। যাতে প্রত্যেক মুসলমান এ গ্রন্থ পাঠ করে সঠিক পথে চলতে পারে এবং আকাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছে যেতে পারে।

আর হাশরের কঠিন হিসাবের দিনে যেনো এ গ্রন্থকে প্রত্যেকের কৃতকর্মের পাণ্ডেয় রূপে গণ্য করা যায়। যাতে এর মধ্যস্থতায় আমি অনায়াসে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি। আর আমাকে আল্লাহ তা'আলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর শাফায়াত লাভ ও ডানপন্থীদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য দান করেন।

পরিশেষে আমি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করি যে, তিনি আমাকে এ কিতাবের বিষয়বস্তু সংকলনে পথ প্রদর্শন করেছেন। আর আমাকে ইলহামের মাধ্যমে এর হাকীকত জানিয়ে দিয়েছেন। আর আমার অন্তর চক্ষুকে শীতল ও প্রশান্ত করে দিয়েছেন। আর এর হাকীকত যথাযথভাবে অনুধাবন করার যোগ্যতা দান করেছেন। আর সাথে সাথে আমি আরও একটি বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, যেন এমন কোনো দোয়া না করি যা তিনি শুনবেন না, আর এমন ইলম থেকে, যা উপকারী নয়। আর এমন আমল থেকে যা তাঁর মহান দরবারে গৃহীত হয় না। তিনি মহান দাতা, তাঁর মহান দরবার থেকে কেউ রিস্তহস্তে ফিরে না। তিনি যাকে অপদত্ত করেন তার কোনো সাহায্য ও সহায়তাকারী থাকে না। একাত্মভাবে দোয়াকারীর কোনো দোয়া তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না। আর না তিনি ফ্যাসাদ বা বিশৃঙ্খলাকারীদের আমল করার তাওফিক দান করেন। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট ও আমার সর্বোত্তম ভরসাস্থল।

আর সর্বশেষ নবী ও আমাদের মুনিব হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সহচর, পরিবারবর্গসহ সকলের প্রতি লাখো দরুদ ও সালাম পেশ করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর তা'আলার জন্য।

تَمَّ الْكِتَابَ بِعُؤْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ

(মহান আল্লাহর সাহায্য ও সামর্থ্যে গ্রন্থটি পূর্ণতা লাভ করলো)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-
'আমি যখনই 'শিফা' গ্রন্থটি দেখি তখন পবিত্র গুণাবলির
অধিকারী সত্তা মহান নবীর সর্বোত্তম গুণকীর্তন দেখতে পাই।'

হযরত আব্বাস আহমদ শিহাব উদ্দিন খাফাজি রাহমাতুল্লাহি
আলাইহি বলেন-

'সালফে সালেহীনের মতে, 'আশ-শিফা' গ্রন্থের পাঠ রোগের
প্রতিষেধক এবং জটিলতার সমাধান। এটা পরীক্ষিত বিষয়।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে এটার দ্বারা
ডুবে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া এবং মহামারীর মতো ব্যাধি হতে মুক্তি
মেলে। সঠিক ও বিশ্বস্ত আস্থা থাকলে মনের আকাজক্ষাও পূরণ
হয়।'

[নাসীহুর রিয়াজ খ-- ১, পৃ. ৫২]

প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ আব্বাস মুত্তাফা বিন আব্দুল্লাহ (যিনি
হাজি খলিফা নামে প্রসিদ্ধ) বলেন-

'এটা অনেক উপকারী গ্রন্থ; ইসলামের ইতিহাসে এমন আর
কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। আব্বাস তা'আলা গ্রন্থকারের প্রচেষ্টার
প্রতিদান দান করুক এবং তাঁকে তাঁর করুণা ও অনুকম্পা দ্বারা
সিদ্ধ করুক।'

[কাশফুজ্জুজুন, খ-- ২, পৃ. ১০৫৩]

pdf By Syed Mostafa Sakib



সন্জরী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৮০০০

e-mail: sanjarypublication@gmail.com